

বনফুল

রচনাবলী ১৫

বনফুল রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনায় :
সরোজমোহন মিত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬০

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
আনন্দরূপ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রাকর :
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২নং নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ রূপায়ণে :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

উপন্যাস

[illegible]/১৫/১

হাটে বাজারে

উৎসর্গ

আমার বড়-বৌমা
শ্রীমতী পুতুলকে দিলাম।

ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য মাছের বাজারের সামনে তাঁর মোটরটি থামালেন। তারপর ড্রাইভার আলীর দিকে চেয়ে বললেন—"গাড়ি বাঁয়ে দাবাকে রাখ্‌খো। আর টিফিন-কেরিয়ার ঠো লেকে হামারী সাথ আও।"

"বহুত খু—"

বাঁ দিকের গলি দিয়ে মাছের বাজারে ঢুকলেন সদাশিব। গ্রীষ্মকাল। একটা বেজে গেছে। মাছের বাজার উঠে গেছে প্রায়। একটা বুড়ী মেছুনী কানা-উঁচু পরাতের মতো একটা টুকরিতে কিছু তোলা মাছ নিয়ে বসে' আছে তখনও। মাছগুলোর পেট বেলুনের মতো ফোলা।

অসময়ে ডাক্তারবাবুকে বাজারে দেখে সে একটু শশব্যস্ত হ'য়ে উঠল। একটু আগেই তো ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আবার এলেন কেন! আলী টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে পিছু-পিছু আসছিল, সে নীরবে তার বাঁ হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা সংযুক্ত করে' ঠোঁটের উপর রাখল, তারপর চোখের ভঙ্গী করে' জানিয়ে দিল—টুঁ শব্দটি কোরো না।

সদাশিব ভ্রূকুঞ্চিত করে' তাকে প্রশ্ন করলেন—"আবদুল কোথা—"

"আবদুল? গুদামে আছে বোধ হয়। কিংবা হয়তো বাড়ি চলে' গেছে।"

"আলী দেখ তো—"

"বহুত খু—"

আলী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বন্‌বন্‌ করে' চলে' গেল গুদামের দিকে। আলীর ধরন-ধারণ হাব-ভাব অনেকটা সার্কাসের ক্লাউনের মতো। সদাশিব টিনের শেডের ছায়ায় আর একটু সরে' গেলেন। তারপর মেছুনীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"তোর নাতনী কেমন আছে—"

"ভালো আছে ডাক্তারবাবু।"

"যে-কটা ইন্‌জেকৃশন নিতে বলেছিলাম, নিয়েছে?"

বুড়ী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়ের পাতাটা চুলকোতে লাগল, যেন শুনতে পায়নি। কিন্তু সদাশিব ছাড়বার পাত্র নন।

"দশটা ইন্‌জেকৃশন নিয়েছে?"

"না। নেবার সময় পায়নি। তার স্বামী এসে তাকে নিয়ে গেল যে। কত মানা করলুম—"

গুম হ'য়ে রইলেন সদাশিব।

তারপর বললেন—"মজাটা পরে বুঝবে। পটাপট পেট থেকে যখন মরা ছেলে বেরুতে থাকবে তখন বুঝবেন বাবাজী—"

মেছুনীর নাতজামাইকেই বাবাজী বলে' উল্লেখ করলেন সদাশিব।

আবদুলকে নিয়ে আলী এসে হাজির হ'ল।

আলী আশঙ্কা করছিল বোমার মতো ফেটে পড়বেন ডাক্তারবাবু। তা তিনি

পড়লেন না। আবদুলের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন—"টিফিন-কেরিয়ারে তোমার জন্যে মাছ রান্না করে' এনেছি। খাও। আমার সামনে খাও—"

আবদুলের চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে গিয়েছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে সদাশিবের দিকে।

"দেখছ কি, খাও—"

বুড়ী মেছুনী সভয়ে জিগ্যেস করল—"কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?"

"আবদুলকে জিগ্যেস কর। যে মাছ ও টাটকা বলে' একটু আগে আমাকে বিক্রি করেছিল তা ও নিজেই খেয়ে দেখুক টাটকা কিনা।"

"আমি বুঝতে পারিনি হুজুর। আমি ভেবেছিলাম ভালো করে' বরফ দেওয়া আছে, খারাপ হবে না।"

"হয়েছে কিনা খেয়ে দেখ নিজে—"

আলীর হাত থেকে টিফিন-কেরিয়ারটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি। তারপর যা করলেন তা অপ্রত্যাশিত। এক টুকরো মাছ বের করে' গুঁজে দিলেন সেটা আবদুলের মুখে। তারপর টিফিন-কেরিয়ারটা দড়াম করে' ফেলে দিয়ে হনহন করে' চলে' গেলেন চালপট্টির দিকে।

চালপট্টির এক কোণে ডিম বিক্রি করে রহিম। কালো, বেঁটে, মুখে বসন্তের দাগ। ভুরু প্রায় নেই। তার পাশে বসে' আছে তার মেয়ে ফুটফুটে ফুলিয়া। যদিও তার বয়স আট-ন' বছর, কিন্তু বসে' আছে যেন পাকা গিন্নীর মতো। রহিমের উপর নজর রাখবার জন্যে, তার মা তাকে বসিয়ে রেখে যায়। রহিমের একটু 'আলু' দোষ আছে। দবিরগঞ্জের রঙীন-কাপড়-পরা চোখে-কাজল-দেওয়া উন্নত-বক্ষা মেয়েগুলো যখন চাটের জন্য ডিম কিনতে আসে, তখন আত্মহারা হ'য়ে পড়ে রহিম। তাদের বাঁকা চোখের চাউনি আর ঠোঁটটেপা হাসিতে অভিভূত হ'য়ে দামই নিতে ভুলে যায় সে অনেক সময়। কেন ভুলে যায় তা জানে হানিফা, রহিমের স্ত্রী। তাই সে ফুলিয়াকে নিযুক্ত করেছে পাহারায়। ফুলিয়া সম্ভবতঃ নিগূঢ় সব খবর জানে না, তবে সে এইটুকু জানে যে তার বাপজান অন্যমনস্ক হ'য়ে অনেক সময় ন্যায্য পয়সা নিতে ভুলে যায়। অন্যমনস্কতাজনিত এ অন্যায় তাকে সংশোধন করতে হবে, এ জ্ঞানটুকু আছে তার।

সদাশিব রহিমকে বললেন—"আমাকে দু ডজন ভালো ডিম দিয়ে আয় গাড়িতে; দেখিস যেন পচা না হয়। আবদুল আজ পচা মাছ দিয়েছিল, খেতে পারিনি। ফুলিয়া, তুই দেখিস তোর বাবা যেন না ঠকায়।"

একটা পাঁচটাকার নোট বার করে' দিলেন তিনি রহিমকে। ফুলিয়া মিষ্টি হাসি হেসে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে, তারপর ডিম বেছে বেছে জলে ডুবিয়ে দেখতে লাগল যে ডিমটা দিচ্ছে সেটা ভালো কিনা। সদাশিব সানন্দে লক্ষ্য করলেন ফুলিয়া কানে দুটি ছোট ছোট মাকড়ি পরেছে। সোনার নয়, রূপার। কিন্তু মানিয়েছে বেশ। কিছুদিন আগে ডাক্তার সদাশিবই তার কান বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

"ডিমগুলো নিয়ে আয় গাড়িতে—"

চলে' গেলেন তিনি। অন্য কেউ হ'লে প্রত্যেকটি ডিম ভালো করে' দেখে দেখে নিত, কিন্তু সদাশিব দেখলেন না। কখনও দেখেন না, মাঝে মাঝে ঠকেন তবুও দেখেন না। জনশ্রুতি ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কিন্তু অনেকবার ঠকেও সদাশিব ভয় পান না, কারণ তিনি গরু নন, মানুষ। তাই তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করে' আনন্দ পান।

সদাশিব গাড়ির কাছে এসে দেখলেন আবদুল টিফিন-কেরিয়ারটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সদাশিবের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই চোখ নামিয়ে নিলে সে। সদাশিব থমকে দাঁড়ালেন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত কোমলকণ্ঠে বললেন—"আজ কি হয়েছিল তোর! অমন পচা মাছটা আমাকে দিলি—"

"আমি বুঝতে পারিনি। তাছাড়া মাথারও ঠিক ছিল না—"

"মদ খেয়েছিলি নাকি—"

"না হুজুর। রমজুটা জ্বরে বেহোঁশ হ'য়ে গিয়েছিল। এখনও জ্বর ছাড়েনি—"

"ওষুধ দাওনি কিছু?"

"না এখনও দিইনি। ভেবেছিলাম এমনি সেরে যাবে—"

সদাশিবের চোখের দৃষ্টিতে আবার আগুন জ্বলে' উঠল।

"আমাকে বলনি কেন—"

আবদুল ক্ষণকাল চুপ করে' রইল।

তারপর বলল—"আপনাকে বার বার বিরক্ত করতে লজ্জা করে হুজুর—"

সদাশিব কিছু বললেন না। গুম হ'য়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু।

তারপর বললেন—"এখুনি আমি রমজুকে দেখতে যাব। গাড়িতে উঠে বোস—"

ঠিক এই সময় ফুলিয়া হাজির হ'ল ডিম আর বাকী পয়সা নিয়ে। আলী ডিমগুলো নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। সদাশিব পয়সাগুলো গুনে দেখলেন না। কেবল একটা এক-আনি তুলে দিয়ে দিলেন ফুলিয়াকে। ফুলিয়া একমুখ হেসে ছুটে চলে' গেল। স্মিত দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রইলেন সদাশিব। তাঁর মনে হ'ল ফুলিয়া নামটা সার্থক হয়েছে ওর। সত্যিই ফুলের মতো।

দুই

ডাক্তার সদাশিবের মতো লোক সাধারণতঃ দেখা যায় না। কোনো ভালো জিনিসই সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। হীরা-মুক্তা খোলামকুচির মতো পড়ে থাকে না পথেঘাটে। খনির অন্ধকারে অথবা সমুদ্রের অতলে ওদের জন্ম হয়, রহস্যময় উপায়ে। প্রচণ্ড চাপে

কয়লা হীরকে পরিণত হয়, ঝিনুকের ভিতর সূক্ষ্ম বালুকণা প্রবেশ করে' সৃষ্টি করে মুক্তা। প্রচণ্ড চাপ অথবা বালুকণার প্রদাহ না থাকলে হীরা-মুক্তার জন্ম হ'ত না। সদাশিবের জীবনেও চাপ এবং প্রদাহ এসেছিল, কিন্তু সে তো অনেকের জীবনেই আসে, সবাই কি সদাশিব হয়? সদাশিবের সদাশিবত্বের সম্ভাবনা নিগূঢ়ভাবে সুপ্ত ছিল তাঁর চরিত্রে, পরিবেশের প্রভাবে তা পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেয়েছিল।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা নিহিত কারণ থাকে পূর্বপুরুষদের জীবনধারায়। সদাশিবের পূর্বপুরুষদের সকলের খবর জানা নেই, কিন্তু সদাশিবের প্রপিতামহ সুরেশ্বর শর্মা একজন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন একথা অনেকে জানে। রবীন্দ্রনাথের একজন পূর্বপুরুষ যেমন 'ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন, তেমনি 'দেবতা' বলে' বিখ্যাত হয়েছিলেন সুরেশ্বর শর্মা। সবাই তাঁকে 'দেবতা' বলে' ডাকত। বৈষ্ণব সাধু হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কয়েকটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁর নিজের খাবারটা তিনি বিতরণ করে' দিতেন। তিনি সামান্য দুধ এবং ফল খেয়ে থাকতেন। সংসার থেকে তাঁকে যে খাবারটা দেওয়া হ'ত সেটা তিনি পালা করে' এক একজন গরীবকে ডেকে খাওয়াতেন। আর স্বহস্তে সেবা করতেন সেই গাভীটিকে যার দুধ খেতেন তিনি। যে গাছগুলি তাঁকে ফল দিত তাদেরও সেবা করতেন। গাইটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বাগানে বাস করতেন তিনি। সেইখানেই দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন সাধন ভজন করে'। কিছু জমি ছিল তাতেই সংসার চলে' যেত। উদরান্নের জন্য চাকরি বা ব্যবসা তাঁকে করতে হয়নি।

তাঁর ছেলে পীতাম্বরকে কিন্তু করতে হয়েছিল। তিনিই প্রথম গ্রাম ছেড়ে ক'লকাতায় যান একটা মার্চেন্ট আপিসের কেরানী হ'য়ে। প্রথমে দিনকতক একটা মেসে ছিলেন, তারপর বাগবাজারে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ছোট বাসা ভাড়া করেন একটা। সে বাসা আর তাঁরা ছাড়েননি। পুরুষানুক্রমে সেই বাসাতেই বাস করছেন।

সদাশিবের জন্ম ওই বাসাতেই হয়েছিল। ক'লকাতা শহরেই বাল্য ও যৌবন কেটেছিল তাঁর। ওইখানেই তিনি স্কুল আর কলেজের পড়া শেষ করে' মেডিকেল কলেজে ঢোকেন। মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করার আগেই বিয়ে হয়েছিল সদাশিবের। যখন বিয়ে হয়েছিল তাঁর বয়স বাইশ আর স্ত্রী মনুর (মনোমোহিনী) বারো।

নববধূরা তখন পায়ে পাঁয়জোর নূপুর আর মল পরত। ঝুমঝুম করে' শব্দ হ'ত যখন ঘুরে ফিরে বেড়াত তারা। গুরুজনদের দেখলে ঘোমটা টেনে দিত। পায়ে আলতা পরত, গোল খোঁপার মাঝখানে পরত সোনার চিরুনি, খোঁপাকে ঘিরে থাকত বাহারে ফুল-তোলা কাঁটা। খোঁপার বিনুনিই ছিল কত রকম। মনুর এই ছবিটা এখনও মনে পড়ে সদাশিবের। পাঁয়জোর আর মলের ঝুমঝুম শব্দ এখনও শুনতে পান তিনি। বিশেষ করে' একটা ছবি তাঁর মনে অক্ষয় হ'য়ে আছে। মনু যখন রাত্রে শুতে আসত তখন তার মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠত। ঠিক সলজ্জ ভাব নয়, একটু লজ্জার আভাস

থাকত অবশ্য, কিন্তু ভাবটা ঠিক সলজ্জ নয়, দুষ্টু-দুষ্টু। মাথার ঘোমটা সরে' যেত তখন। উপরের দু'-তিনটি দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকত পানে-রাঙা নীচের ঠোঁটটি। ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত, চক্ষু আনত, আর সমস্ত মুখে চাপা হাসির আভাস। সদাশিব ডাকলে বাঁ হাতের ছোট্ট কিল তুলে দেখাত। এই ছবিটি অম্লান হ'য়ে আছে সদাশিবের মনে।

সদাশিব পাস করেই চাকরি পেয়েছিলেন। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল তাঁকে। চাকরি-জীবনেরও অনেক টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি গাঁথা আছে তাঁর মনে। অনেক এবং বিচিত্র। সদাশিব রিটায়ার করেছিলেন বিহারেরই একটা শহরে। সেইখানেই বাড়ি কিনেছেন একটা। আশেপাশে কিছু জমিজমাও। ব্যাঙ্কে টাকাও জমিয়েছেন। জমানো টাকার যা সুদ পান তাতেই সংসার চলে' যায় স্বচ্ছন্দে। সংসারে খাবার লোকও বিশেষ কেউ নেই। মনু যৌবনেই মারা গেছে। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল, মেয়ে। সোহাগিনী। সোহাগিনীর বিয়ে হ'য়ে গেছে অনেকদিন আগে। জামাই সুজিত বড়লোকের ছেলে, বড় চাকরিও করে। বছরে দু'বার তারা সদাশিবের কাছে আসে কেবল। প্রকাণ্ড বাড়িটায় সদাশিব থাকেন তাঁর ভাইপো আর ভাইপো-বউকে নিয়ে।

ভাইপো চিরঞ্জীব কোন কাজকর্ম করে না। সদাশিবের জমিজমার তদারক করে সে, তাঁর নানারকম ফাইফরমাশও খাটে। এককথায় চিরঞ্জীব সদাশিবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সদাশিবের বৈষয়িক ঝামেলা এবং চারিত্রিক খামখেয়ালের সমস্ত ঝঞ্ঝাট সে-ই পোয়ায়। চিরঞ্জীবের বউ মালতীও নিঃসন্তানা। ঘরকন্নার ভার তার উপর। চাকর দাই রাঁধুনী সব আছে, কিন্তু কর্ত্রী সে-ই। মালতীর মোটাসোটা কালো রং। চোখ দুটি বড় বড়। শরীর বেশ আঁটসাঁট। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী, কিন্তু বেশী মোটা নয়। বেশ রাশভারী। চিরঞ্জীব তো বটেই, সদাশিবও ভয় করেন তাকে। সদাশিব আর একটা কারণেও তাকে সমীহ করেন—সে রাঁধে ভালো। নিরামিষ আমিষ দু'রকম রান্নাতেই সিদ্ধহস্ত। খাদ্যরসিক সদাশিব তার এ প্রতিভাকে খাতির না করে' পারেন না। রোজ একটা তরকারি নিজের হাতে করে সে। বাকী রান্না ঠাকুরকে দিয়ে করায়। ঠাকুরকে দিয়ে করায় বটে, কিন্তু ঠাকুরের পিছনে সে দাঁড়িয়ে থাকে নিজে মহিষমর্দিনীর মতো, এক চুল এদিক ওদিক হবার উপায় থাকে না। মৈথিল ঠাকুর আজবলাল মালতীর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রথম শ্রেণীর রাঁধিয়ে হয়েছে। সে-ও মালতীকে ভয় করে খুব। মুখে যদিও বলে 'লছমী মাঈ', কিন্তু মনে মনে জানে ও একটি বাঘিনী। একটু বেচাল হলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

আজবলাল সদাশিবের কাছে অনেকদিন আছে। মনুর আমল থেকে। আট টাকা মাইনেতে বাহাল হয়েছিল। এখন তার সঙ্গে আর মাইনের সম্পর্ক নেই। ঘরের লোক হ'য়ে গেছে, যখন যা দরকার হয় নেয়। বিকেলের দিকে একটু সিদ্ধি খায় সে। ওইটুকুই তার বিলাস। বেশ তরিবৎ করে' সিদ্ধির শরবৎটুকু খায়। সদাশিব আপত্তি করেননি। সিদ্ধি খেয়ে আজবলালই বিপদে পড়ে মাঝে মাঝে। কোন কোন দিন তার মনে হয় সে মালতীর চেয়ে অনেক বড়, প্রায় তার বাপের বয়সী, তার মেয়ে জানকী বেঁচে

থাকলে অত বড়ই তো হ'ত, সে কেন মালতীর ভয়ে গরুড়টি হ'য়ে থাকবে চিরকাল, মালতীরই বরং উচিত তাকে ভয় করা। মেয়েছেলের অমন খাণ্ডারনী হওয়া কি ভালো? তার উচিত মালতীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মেয়েমানুষের বেশী 'তেজ' হওয়া ঠিক নয়। সিদ্ধির ঝোঁকে এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে সে মালতীকে বোঝাতে যায় এবং বোঝাতে গিয়ে আরও বকুনি খায়। নিজেই শেষে সে বুঝতে পারে জল দিয়ে ধুয়ে লালজবাকে সাদাজবা করা যায় না।

কিছুদিন আগে সদাশিব যখন চাকরি থেকে অবসর নেন তখন তিনি অতীতের দিকে চেয়ে খোঁজবার চেষ্টা করেছিলেন জীবনে তাঁর এমন কোন প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় আছে কিনা যার কাছে গিয়ে তিনি বাকী জীবনটা আনন্দে কাটাতে পারেন। যন্ত্রের ইঞ্জিন তেল, কয়লা বা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। মানুষ-ইঞ্জিনের সেটা দরকার, কিন্তু তার আর একটা জিনিস চাই, ভালবাসা। কেবল টাকার জোরে সুখে থাকা যায় না। বেঁচে থাকবার প্রেরণা চাই একটা, সে প্রেরণার উৎস হওয়া চাই মহৎ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথবা ভালবাসা।

সদাশিবের জীবনে কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসার টানে জোয়ার আসেনি কখনও। তিনি সারাজীবন চাকরি করেছেন এবং ডাক্তারি করেছেন। নামকরা ডাক্তার ছিলেন অবশ্য, যেখানেই গেছেন তাঁর পসারের 'গর্জন' শুনেছে সবাই। কিন্তু নামকরা ডাক্তাররা ঠিক বৈজ্ঞানিক নন। তাঁরা অপর বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারকে প্রয়োগ করেন মাত্র। প্রয়োগ করে' পয়সা রোজগার করেন। তাঁরা অনেকটা কেরানীর মতো। আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক যে প্রেরণার আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকেন, সে আনন্দ কখনও স্পর্শ করে না সাধারণ জেনারেল প্র্যাক্‌টিশনার ডাক্তারের চিত্তকে। জেনারেল প্র্যাক্‌টিশনারের একমাত্র লক্ষ্য জনপ্রিয় হওয়া এবং জনপ্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্য উপার্জন। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য সত্যের সন্ধান এবং প্রয়োজন হ'লে তার জন্যে দারিদ্র্য এবং অপমান বরণ করা।

এ প্রেরণা সদাশিবের জীবনে আসেনি কখনও। তিনি টাকা রোজগার করতেই চেয়েছিলেন এবং প্রচুর টাকা রোজগার করতে পেরেওছিলেন। কিন্তু টাকা রোজগার করতে করতে জীবনের শেষের দিকে এসে হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—এসব কিসের জন্যে করছি? কার জন্যে? মনু তো চলে' গেছে অনেকদিন আগে, সোহাগেরও বিয়ে হ'য়ে গেছে—তবে? কিসের জন্যে এত পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তা? অতীতের দিকে ফিরে তিনি অনুভব করলেন ভালবাসবার মতো আর কেউ বেঁচে নেই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা বেঁচে আছে, তারা নামেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। প্রেম নেই কারো মনে। আছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা আর তার উপর একটা প্রেমের ভান। ঝুটো প্রেমের মেকি অভিনয়ে মন আরও বিষিয়ে ওঠে।

যে অদ্ভুত জীবন ডাক্তার সদাশিব আজকাল যাপন করেন--হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ানো—সে জীবন আরম্ভ করবার আগে যে জীবন তিনি যাপন করতেন তার কিছু

আস্বাদ না পেলে বর্তমান জীবনের সম্যক্ অর্থ বোঝা যাবে না। সে জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিতে। স্থান এবং তারিখের উল্লেখ না করে' তারই ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করছি। ঘটনাগুলি একটানা ঘটেনি। মাঝে মাঝে সময়ের ব্যবধান আছে।

তিন

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁর স্ত্রীকে দেখতে। আমি ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি কোনও অসুখ বুঝি। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি বেশ সেজেগুজে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে' আসেন। বললেন সকালের দিকে তাঁর মাথাটা বড্ড ধরে। আর কানের ডগা দিয়ে আগুনের হল্‌কা বের হয়। প্যাল্‌পিটেশনও আছে। শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে মাঝে মাঝে। সব বলবার পর হেসে বললেন, চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করিনি। ক'লকাতার সব বড় বড় ডাক্তাররা দেখেছেন। ইলেক্‌ট্রোকার্ডিয়োগ্রাম, এক্সরে, অপারেশন সব হ'য়ে গেছে। একজন বড় ডাক্তারের নাম করে' বললেন— তাঁরই চিকিৎসায় আছি এখন। একগাদা রিপোর্ট আর প্রেস্ক্রিপ্‌সন্ বার করলেন আর সেগুলো এমনভাবে দেখাতে লাগলেন যেন গয়না দেখাচ্ছেন এবং দেখিয়ে গর্ব অনুভব করছেন।

আমার মনে হ'ল তিনি আমাকে চিকিৎসা করাবার জন্য ডাকেননি, তিনি যে বড় বড় ডাক্তার দেখাতে পারেন এবং হামেশাই দেখিয়ে থাকেন, এইটে সাড়ম্বরে আমার কাছে আস্ফালন করবার জন্যেই আমাকে ডেকেছেন।

ভদ্রমহিলার সন্তান হয়নি। হবার সম্ভাবনাও নেই। বয়স ত্রিশের কোঠায় মনে হ'ল, যদিও আমাকে বললেন পঁচিশ। দেখলুম নানারকম কম্‌প্লেক্স্‌ জট-পাকানো রয়েছে মনে। অকারণে বাপের বাড়ির গল্প করলেন খানিক। তাঁর কোন্ ভাই কবে বিলেত গেছেন তা বললেন। তাঁর যে ভাই এ. পি., সে যে বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে' ফিরেছে তা-ও কথায় কথায় জানিয়ে দিলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নি তাঁর। বললেন—'একা এই জংগুলে দেশে পড়ে' আছি, একটা কথা বলবার লোক পর্যন্ত নেই। উনি তো সমস্ত দিন বাইরে বাইরে থাকেন। আয়া, বেয়ারা আর চাপরাসী নিয়ে কতক্ষণ আর কাটানো যায় বলুন। বই-টই পড়ি। কিন্তু বই সব সময়ে ভালো লাগে না। আপনি দয়া করে' আসবেন মাঝে মাঝে। এই ইন্‌জেক্‌শনগুলো কি নেব?' একজন নামজাদা ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্‌সন্, সুতরাং 'না' বলতে পারলুম না। বললাম, নিন। 'আপনি তাহ'লে দয়া করে' এসে দিয়ে যাবেন। যাবেন তো?' এবারও 'না' বলতে পারলাম না। যদিও বুঝলাম ও ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে তাঁর অসুখ সারবে না। অসুখ সারত একটি ছেলে হ'লে। কিন্তু হবে না, গত বছরই ইউটেরাসটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। টিউমার হয়েছিল নাকি। উনি নিজেও মনে মনে

জানেন যে ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে কিছু হবে না। আমাকে ডাকছেন আমার সঙ্গ কামনায়। আমাকে সামনে বসিয়ে বক্‌বক্‌ করে' বকে' যাবেন খালি, নিজের অন্তর্নিহিত নিদারুণ বেদনাটাকে চাপা দিয়ে বাহাদুরির ঝুলঝুরি কেটে চেষ্টা করবেন নিজেকে এবং আমাকে ভোলাতে। আমাকে চাইছেন উনি ডাক্তার হিসাবে নয়, শ্রোতা হিসেবে। আমার চিকিৎসানৈপুণ্যে ওঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। একটা সাদা পট না থাকলে সিনেমার ছায়াছবি দেখানো যায় না। আমাকে উনি সেই সাদা পটের মতো ব্যবহার করতে চান।

মন্নুকে আজ খুব বকেছি। একটা তরকারী নুনে পোড়া, মাংসটা আলুনি। রাঁধুনী রয়েছে তবু বাহাদুরি করে' নিজে রাঁধতে যাওয়া চাই।...সমস্ত দিন মন্নু আজ কেঁদেছে। আসল কারণ অবশ্য ওর পিসেমশাই নিতাইবাবু। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে দেখিনি কখনও। উনি এসে আমাদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ। বারবার বলছেন কলিযুগে আমাদের মতো দম্পতি নাকি বিরল। হর-গৌরী আখ্যা দিয়েছেন আমাদের। মন্নু যখন রাঁধছিল তখন রান্নাঘরে গিয়েছিলেন তিনি। মন্নুকে রান্না শেখাচ্ছিলেন। মাংসে নুন না দেওয়াটাই বোধ হয় নূতনত্ব।

উনি কেন এসেছেন আমাদের কাছে আর কেনই বা আছেন এতদিন ধরে', তা বুঝতে পারিনি আগে। আজ বিকেলে বুঝতে পারলুম। ভেবেছিলুম মন্নুর প্রতি স্নেহবশতঃ এসেছেন বুঝি। কিন্তু দেখলাম তা নয়। পাওনাদারকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। কালো কুচকুচে তাঁর পাওনাদারটি খুঁজে খুঁজে আজ এসে ধরেছিলেন তাঁকে। দুশমনের মতো চেহারা লোকটার। যদিও বাঙালী কিন্তু কথাবার্তার ধরন থেকে মনে হ'ল কাবুলির বেহদ্দ। প্রথমেই এসে 'শালা' সম্বোধন করলেন পিসেমশাইকে। তারপর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। এই নাটকীয় কাণ্ড ঘটতে লাগল আমার বৈঠকখানার বারান্দায়। বাধ্য হ'য়ে শেষে আমাকে বন্দুক বার করতে হ'ল।

পৃথিবীতে সবাই শক্তের ভক্ত, পাওনাদার মশাইও অবিলম্বে আমার ভক্ত হ'য়ে পড়লেন। শেষে বার করলেন তাঁর ন্যায্য পাওনার দলিলখানা। দেখলাম সুদে-আসলে তিনি পিসেমশায়ের কাছে পাঁচশ' টাকা পাবেন। আর একটা নাটকীয় কাণ্ড ঘটল। পিসেমশাই হঠাৎ আমার পা ধ'রে হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, তুমি আমাকে এখন ওই কশাইটার হাত থেকে বাঁচাও বাবা, আমি ফিরে গিয়েই টাকাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি মন্নু বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাঁদছে। কিছুক্ষণ নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মন্নুর এই নিদারুণ অপমানে আমিও যেন অপমানিত বোধ করতে লাগলাম। অনুভব করলাম টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ড্রয়ার থেকে টাকাটা বার করে' বাইরে গেলাম। পাওনাদারের হঠাৎ একটা অন্য চেহারা বেরিয়ে পড়ল। সে বলল—টাকাটা দিচ্ছেন দিন, আমার ভালোই হ'ল, কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে' দিচ্ছি। নিতাইবাবুর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না।

ও আপনাকে টাকা দেবে বলছে কিন্তু দেবে না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমাকে আজ দু'বচ্ছর ধরে' ঘোরাচ্ছে। আপনি অন্ততঃ একটা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিন ওর কাছে। তা না হ'লে টাকাটা মারা যাবে।

আমি জবাব দিলাম, সবাই তোমার মতো কশাই নয়। মুখে বললাম বটে; কিন্তু মনে মনে তারিফ করলাম লোকটার।

পিসেমশাই সেইদিন রাত্রেই উধাও হলেন। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কিংবা মনুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে' গেলেন না। উনি চলে' যাবার পর মনু আর একটা কথা বললে। 'জান? উনি আমার বিয়ের সময় বাগড়া লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন? বেনামী চিঠি লিখে দু'এক জায়গায় বিয়ে ভেঙেও দিয়েছেন।' এরাই কি আমার আত্মীয়? আশ্চর্য!

বিধুবাবুর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিবেশী, দ্বিতীয়তঃ গরীব মানুষ। ফি না নিয়েই চিকিৎসা করছিলাম। দুবেলা তো যেতামই, কোন কোন দিন তিনবারও গেছি। আজ সকালে গিয়ে দেখি একটি ফরসা ছোকরা বসে' আছে। বেশ ফিটফাট ছিমছাম। চোখে প্যাঁশনে, পরনে আদ্দি, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের 'শু'। আমি ঘরে ঢুকতে বিধুবাবু দাঁড়ালেন, কিন্তু সেই ছোকরা দাঁড়াল না। বিধুবাবু বললেন, ইনিই আমাদের প্রতিবেশী ডাক্তার সদাশিববাবু। পটলার চিকিৎসা ইনিই করছেন। আমি ডাক্তার শুনে ছোকরা এমনভাবে আমাদের দিকে চাইলে যেন সে কোন অদ্ভুত জীব দেখছে। তারপর বাঁ হাতটা তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—অ, আপনি এর চিকিৎসা করছেন। বসুন, বসুন, আপনাকে অনেক কথা বলবার আছে। বিধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি কে? বিধুবাবু হাত কচলে উত্তর দিলেন—এ আমার ভাগ্নে, বিলাস। মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে। পটলের প্রেস্কৃপ্‌সনের ও কিছু অদলবদল করতে চায়। ও বলছে আজকাল মেডিকেল কলেজে না কি···। থামিয়ে দিলুম বিধুবাবুকে। বললুম—আপনার ভাগ্নে এখনও ডাক্তার হন নি। আমি অনেক দিন ধরে' ডাক্তারী করছি। মেডিকেল কলেজে আজকাল কি ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে তা আমিও জানি। আপনার ভাগ্নের মারফত সেটা আমার জানবার দরকার নেই। বিধুবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবে ও কি বলছে সেটা একবার শুনলে হ'ত না? আমি উত্তর দিলাম, না, যে এখনও ডাক্তারী পাস করেনি তার সঙ্গে আমি চিকিৎসা-বিষয়ে কোন কথা বলব না। আপনারা ওকে দিয়েই চিকিৎসা করান, আমি চললুম।

বাঙালীর ভদ্রতাবোধ কি একবারে চলে' গেছে? বিধুবাবু কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই এটা করলেন উনি। উনি বোধহয় অজ্ঞাতসারেই আমার কাছে জাহির করতে চাইলেন—দেখ হে, আমিও নেহাৎ কেউ-কেটা নই। আমার ভাগ্নেও মেডিকেল কলেজে পড়ে, দু'দিন পরে তোমার মতোই ডাক্তার হবে। সত্যি, আমরা চাষা হ'য়ে গেছি। যে

শিক্ষার প্রধান লক্ষণ বিনয়, সেই শিক্ষা লোপ পেয়ে গেছে আমাদের ভিতর থেকে। ছি, ছি।

রঘুবাবু ছেলের বিয়ে দিলেন খুব ধুমধাম করে'। বড়লোক কুটুম হয়েছে। ক'লকাতা থেকে রাঁধুনী এসেছিল, কাশী থেকে সানাই। শহরের অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বেশীর ভাগই অফিসার। হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়েছিলাম আমি। গিয়ে দেখলাম আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই! চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সব রকম ব্যবস্থাই আছে। মদের ব্যবস্থাও ছিল। পরের পয়সায় মদ খাওয়ার সুযোগ যারা ছাড়ে না, বাড়িতে যাদের জোলো চা ছাড়া অন্য কোন প্রকার পান-বিলাস নেই, তাদের অনেককেই দেখলাম দাঁত বার করে' গিয়ে আসর জমিয়েছে মদের টেবিলের ধারে আর উচ্চকণ্ঠে গুণগান করছে রঘুবাবুর কাল্‌চারের! রঘুবাবু নিজে দেখলাম ব্যস্ত আছেন বড় বড় অফিসারদের নিয়ে। কমিশনার সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সাহেব—এই তিনজন সাহেবকে বসিয়ে ছিলেন তিনি একটি বিশেষভাবে সজ্জিত টেবিলে এবং সেইখানেই সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে হেঁ—হেঁ করছিলেন। আমাদের কাছে একবারও আসেননি। আমাদের অভ্যর্থনা করছিল তাঁর একজন মুহুরি।

ওভারশিয়ার সুরথবাবুর চরিত্রের একটা দিক সহসা উদ্‌ঘাটিত হ'ল আজ আমার কাছে। তাঁকে সাধারণ ঘুষখোর ওভারশিয়ার বলেই জানতাম। কিন্তু তিনি যে মানব-চরিত্রের গহনেও সন্ধানী-আলো নিক্ষেপ করতে সক্ষম, তা জানতাম না। এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার গগন বসু প্রবীণ লোক, মাথার চুলে পাক ধরেছে। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

সুরথবাবু কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর বগলে একটা দাদ আছে, সেইটের জন্যে মাঝে মাঝে মলম নিতে আসেন আমার কাছে। কথায় কথায় সেদিন গগনবাবুর কথা উঠল। আমি বললাম, আপনাদের খুব ভাগ্য যে গগনবাবুর মতো পণ্ডিত চরিত্রবান লোক আপনাদের স্কুলের হেডমাস্টার। সুরথবাবুর চোখে-মুখে একটা কুটিল হাসির চমক খেলে গেল। তারপর বললেন, ভাগ্যই বটে। বলে' মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—অমন করে' হাসছেন যে। সুরথবাবু একটু দুলে মাথা নেড়ে বললেন, হাসি পেল বলেই হাসছি। আপনারা সাদাসিধে মানুষ, সকলের ওপরটা দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে যান। আমরা সব জানি কিনা তাই অত সহজে মুগ্ধ হ'তে পারি না। জিজ্ঞেস করলাম, কি জানেন? তিনি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, সব কথা কি বলা যায়! বলেই রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে চলে' গেলেন।

আজ যোগেন এসেছিল। যোগেন আমার বাল্যবন্ধু। সে হেসে আমাকে বললে—

'কি রে, তুই আজকাল ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস নাকি ?' 'কি রকম ?'—আকাশ থেকে পড়লাম আমি। তখন যোগেন বললে—সে ট্রেনে যে কামরায় ছিল সেই কামরায় সুরথবাবু নামে একজন ওভারশিয়ার ছিলেন। তিনি তাঁর ইয়ারবক্সিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন। একজন তোর প্রশংসা করাতে সুরথবাবু বললেন—'তোমরা ওপরটা দেখেই গদগদ হ'য়ে পড়। কিন্তু আমি পারি না, কারণ আমি ভিতরের অনেক খবর জানি যে। কিন্তু সে সব কথা বলে' আর লাভ কি। তবে এটা জেনে রাখ উনি ডুবে ডুবে জল খান।' আমি যে এতবড় একজন ডুবুরী তা আমার নিজেরই জানা ছিল না! দুনিয়ায় কত রকম মানুষই যে আছে!

বাড়িতে মহা হুলুস্থূল পড়ে' গেছে। অনেকদিন পরে আমার এক বোন আমার কাছে চেঞ্জে এসেছে। তার অসুখবিসুখ কিছু নেই। কিন্তু ক'লকাতার লোকেদের চেঞ্জে যাওয়া একটা বাতিক। বিশেষতঃ কোথাও বিনা-পয়সায় থাকবার খাওয়ার জায়গা যদি থাকে তাহ'লে তো কথাই নেই, কোন রকমে থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা যোগাড় করে' ছুটবে সেখানে। আমার আপন বোন নয়, পিসতুতো বোন। সে আসছে বলে' আমি যে অসন্তুষ্ট হয়েছি তা নয়, কিন্তু সে আসাতে আমার ভীষণ অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে।

আমার বোনের ছেলেমেয়েগুলো ভারী অসভ্য। পাঁচটা ছেলে, পাঁচটাই বর্বর। এসেই আমার ঘরের দামী পর্দাগুলো ধরে' দুলতে লাগল সবাই। একটা পর্দা ছিঁড়ে গেছে। ধমক দিলে শোনে না। আমার বোন ইনিয়ে বিনিয়ে তাদের মানা করে বটে কিন্তু ছেলেগুলো তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করে না। বোনের বকুনিটাও বকুনির মতো শোনায় না, মনে হয় মানা করতে হয় তাই করছে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ভর্ৎসনার সুরটা ঠিক ফুটছে না। বড় ছেলেটা, এসেই আমার রেডিওটা খারাপ করে' দিয়েছে। এই মফঃস্বল শহরে সারানো মুশকিল। ক্রিকেট ম্যাচের খবর শুনতে পাচ্ছি না। মেজাজটা বিগড়ে গেছে। ফুলবাগানটাকে তছনছ করে' দিলে। পটাপট করে' ফুলগুলো তো তুলছেই, গাছের ডালও ভাঙছে। আমার স্প্যানিয়েল কুকুরটাকে তো অতিষ্ঠ করে' তুলেছে। কেউ তার কান টানছে, কেউ ল্যাজ, কেউ তার পিঠে চড়ে' ধামসাচ্ছে। ভালো জাতের ভালো কুকুর তাই কিছু বলে না, আভিজাত্য একটু কম থাকলে কামড়ে দিত। আমার শখের বাইনকুলারটা তাক থেকে পেড়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে' দেখছে সবাই মিলে। তার ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় এসব যেন তাদের বার্থরাইট। মামার বাইনকুলার নিয়ে দেখবে না তো কার বাইনকুলার নিয়ে দেখবে ?

একজন ছুতোর মিস্ত্রী কিছুদিন আগে আমার রোগী হয়েছিল। তার স্ত্রীর কুষ্ঠের চিকিৎসা করেছিলাম, কিছু চাইনি। সে একটা ড্রেসিং টেবিল উপহার দিয়েছে আমাকে। চমৎকার একটি আয়না 'ফিট' করা আছে তাতে। আমার বোন সেটা দেখে বললে—দাদা, আমাকে ওটা দাও না। তোমার তো আর একটা রয়েছে। বললাম—

তুই একটা কিনে নিস, আমি দাম দিয়ে দেব। এখান থেকে ওটা নিয়ে যেতে হ'লে ভেঙে যাবে, তাছাড়া একজনের দেওয়া উপহার, নিজের কাছেই রাখা উচিত।

বোনের মুখভাব দেখে বুঝলাম আমার কথায় সে সন্তুষ্ট হ'ল না। মন্থু তাকে অনেকগুলো শাড়ি দিয়েছে, কিন্তু দেখলাম মন্থুর বাটিকের শাড়িটার উপর তার লোভ খুব। মন্থুকে বলেছি ওটা দিয়ে দিতে, আমি আবার তাকে কিনে দেব। মন্থু মুখে বললে, আচ্ছা। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখে বুঝলাম সে মনে মনে পছন্দ করেনি প্রস্তাবটা।

কিন্তু মন্থু সবচেয়ে চটেছে আর একটা ব্যাপারে। আমার বোনের বড় ছেলে টুলটুল আমার মেয়ে সোহাগের গালে কামড়ে দিয়েছে। সোহাগের বয়স পাঁচ বৎসর, টুলটুলের দশ। আমার বোন জিগ্যেস করলে, ও কি রে, ওর গালে অমন করে' কামড়ে দিলি কেন? টুলটুল হেসে উত্তর দিলে—গালটা ঠিক টমাটোর মতো যে! আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না, হাণ্টার বার করে' খুব চাবকেছি ছেলেটাকে। ভেবেছিলাম লাঠ্যৌষধি পড়েছে, এইবার ঠিক হয়ে যাবে সব। কিন্তু হ'ল না। আজ সকালে চাকরগুলো হৈ হৈ করে' ওঠাতে বেরিয়ে দেখলাম আমার বোনের মেজ ছেলে একটা হাঁসের গলা টিপে ধরেছে। পাতিহাঁস। নিখুঁত সাদা রং বলে' কিনেছিলাম একজোড়া। তারই একটার গলা টিপে ধরেছে ছেলেটা। আর একটু হ'লে মরে' যেত।··· ভাবছি কবে এই সব পাপ দূর হবে বাড়ি থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, এদের দূর করতে চাইছি কেন! এরাই তো আমার আত্মীয়!

বিধুবাবুর ছেলে পটল কাল রাত্রে মারা গেছে। মেডিকেল কলেজের আপ-টু-ডেট্ ছাত্র বিলাস তাকে বাঁচাতে পারেনি। আমি তার চিকিৎসা আর করছিলাম না। করলেই বাঁচত কি?

রোগী আসে, রোগী যায়। কেউ বাঁচে, কেউ মরে। কিন্তু মনের উপর কেউ তো দাগ রেখে যায় না। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কিছু বাড়ে শুধু। মনটা যেন নির্মম আয়নার মতো! কোনও ছবিই ধরে' রাখে না। যদি ক্যামেরার মতো হ'ত তাহ'লে কি ভালো হ'ত? অত ছবি রাখতাম কোথায়? মনের চিত্রশালায় অত জায়গা কি আছে? হঠাৎ মনে হ'ল আছে বই কি। অনেক জায়গা আছে। কিন্তু রাখবার মতো ছবি একটাও পেয়েছি কি?

আজ লক্ষ্মীবাজারে রোগী দেখতে গিয়ে অদ্ভুত জিনিস দেখে এসেছি একটা। লক্ষ্মীবাজার এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। লক্ষ্মীবাজারের প্রসিদ্ধি তার বাজারের জন্য নয়, তার গড়ের জন্য। প্রায় আধ মাইলব্যাপী বিরাট বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আছে সেখানে। প্রবাদ, বহুকাল আগে সেখানে এক রাজবংশ বাস করতেন। তাঁদের

উপাধি ছিল চৌধুরী। চৌধুরী বংশের এক রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী (যাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে লক্ষ্মীবাজার গ্রাম) তাঁর যৌবনকালে নব-বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে সহসা অন্তর্ধান করেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন তা কেউ জানে না। তিনি আর ফেরেন নি। কেউ বলে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছেন, কেউ বলে মারা গেছেন, কারও মতে তিনি পর্তুগীজ বম্বেটেদের হাতে পড়েছিলেন, তারা তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে আরবদের কাছে বিক্রি করে' দিয়েছে। এই ধরনের নানা জনশ্রুতি আছে তাঁর সম্বন্ধে। মোট কথা তিনি আর ফেরেননি। কোন খবরও পাঠাননি। তিনি চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অত বড় চৌধুরী গড় খালি হ'য়ে যায়নি। তাঁদের বংশের অনেকেই বেঁচে ছিলেন সেখানে অনেকদিন ধরে'। কিন্তু কালক্রমে ক্রমশঃ সব খালি হ'য়ে গেল। বংশে ছেলে হ'ল না কারও, মৃত্যুর করালগ্রাসে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল অত বড় বংশ। বংশের শেষ প্রদীপ (কমলাপতি চৌধুরী) নির্বাপিত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তারপর থেকে প্রেতপুরীর মতো পড়ে' আছে অতবড় গড়টা। চারদিকে বনজঙ্গল গজিয়েছে, বড় বড় অশ্বত্থ বট বিদীর্ণ করেছে বিশাল অট্টালিকার পঞ্জরকে। জঙ্গলে সাপ আর শেয়ালের আড্ডা, গাছের মাথায় মাথায় শকুনদের। বাড়িটার ভাঙা ঘরগুলোর মধ্যে ভীষণ-দর্শন প্যাঁচাও আছে নাকি। দিনের বেলাতেও চৌধুরী গড়ের জঙ্গলে যায় না কেউ। কিছুদিন আগে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মালমশলা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। সর্পাঘাতে মারা গেছেন। এ ঘটনার পর থেকে আর কেউ ওদিক মাড়ায় না।

আজ কিন্তু দেখে এলাম সেখানে লোকে লোকারণ্য, এক মহাসমারোহ পড়ে' গেছে। দীর্ঘকায় এক কাবুলী ঘোড়সোয়ার এসে হাজির হয়েছে সেখানে। সে আকারে ও ভাষায় কাবুলী বটে, কিন্তু তার পোশাকটা প্রায় বাঙালীরই মতো। তার ঘোড়াটাও প্রকাণ্ড। অত বড় ঘোড়া আমি অন্ততঃ দেখিনি। সে নিজের নাম বলেছে, অ্যাচুট্অ্যাণ্ড। পরে বোঝা গেল ওটা অচ্যুতানন্দের কাবুলী সংস্করণ। তার ভাষা কেউ বুঝতে পারছিল না। পাশের গ্রামের আগা সাহেব এসে তার বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করেছেন। আগন্তুক পোস্ত ভাষায় আগা সাহেবকে যা বলেছে তাও বিস্ময়কর। সে বলেছে যে সে গৃহত্যাগী রাজা লক্ষ্মী চৌধুরীর বংশধর। লক্ষ্মী চৌধুরী কেন গৃহত্যাগ করেছিলেন তারই বিবরণ নিয়ে সে লক্ষ্মীবাজারে এসেছে। 'ল্যাখি চোড্রি'কে সে নিজে কখনও দেখেনি। তার জন্মের বহুপূর্বে তিনি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। তিনি তাঁর গৃহত্যাগের বিবরণ একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুকালে বলে' গিয়েছিলেন খাতাটি যেন লক্ষ্মীবাজারে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে' এখানে আসা এর আগে সম্ভবপর হয়নি এতদিন। তারপর বললে—"হঠাৎ আমরা একদিন লক্ষ্য করলাম যে খাতার কাগজ মলিন এবং ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে। হাত দিলে ভাজা পাঁপরের মতো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন মনে হ'ল, আর দেরি করা উচিত নয়, আর দেরি করলে তাঁর শেষ ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করতে পারব না। তাই আমি এই খাতা নিয়ে এসেছি। ঘোড়াটি শোনপুরের

মেলায় কিনেছি। ইচ্ছে আছে, ফিরবার সময় ট্রেনে যাব না, ঘোড়ার পিঠেই যাব।"

লক্ষ্মী চৌধুরীর লিখিত বিবরণের অধিকাংশই প্রায় পড়া যায়নি। লেখা অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেটুকু পড়া গেছে সেটুকু প্রণিধানযোগ্য। তার মর্ম এই—"আমি এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি যে আমাদের কেউ ভালবাসে না। আমরা প্রতিপত্তিশালী. আমরা ধনী, তাই সকলে বাধ্য হ'য়ে আমাদের আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকে। সেবা করে অর্থের বিনিময়ে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা ভয়ে। কারও মনে আমরা প্রেম সঞ্চার করতে পারিনি। এই সকল প্রভুত্বের সিংহাসনে বসে' আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুখ পেয়েছেন, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। আমার প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমি যেন পাশবিক শক্তিবলে দুর্বলদের পীড়ন করছি। এ আমার পক্ষে অসহ্য। এখানে থেকে আমার সমস্ত সম্পত্তি যদি বিলিয়ে দিই তাহ'লেও আমার কাম্য সুখ আমি পাব না। কারণ এতদিন যেরূপে সকলে আমাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে, সে অভ্যাসের মোহ তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। আমি এমন কোন অপরিচিত স্থানে যেতে চাই যেখানে আমার কৌলীন্যের পরিচয় অর্থ বা প্রতিপত্তি দিয়ে কেউ মাপবে না, আমার চারিত্রিক মহত্ত্ব দিয়ে মাপবে। যে সমাজে আমি অপরিচিত অচেনা আগন্তুক সেই সমাজে গিয়েই আমি নূতন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমার পূর্ব-পুরুষদের অর্জিত সম্পত্তি তাই আমি ত্যাগ করে' চলে' যাচ্ছি। আমার বংশের অন্যান্য শরিকরা অথবা গ্রামবাসীরা সে সম্পত্তির যে-কোনও রূপ সংব্যবস্থা করতে পারেন করুন, আমার আপত্তি নেই। পৈতৃক সম্পত্তির উপর আমার সমস্ত দাবি আমি ত্যাগ করলাম।"

রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী যা যা বলেছেন তা কি সকলের সম্বন্ধেই সত্য নয়? আমাদের দেশে এরকম মহাপুরুষ আরও অনেক আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

প্রাণ-পতি সাধু নাম। সুদখোর বেনে। কারও প্রাণ-পতি হ'তে পারে নি, ধন পতি হয়েছে অনেকের। অনেকের সম্পত্তি নিলাম করিয়েছে। সাধুও নয়, অসাধু। জাল দলিল বার করে' সর্বনাশ করেছে অনেকের। আমি তার বাড়িতে চিকিৎসা করেছিলাম কিছুদিন। অনেক ফি বাকি আছে। আজ দেব কাল দেব করছে। এখনও দেয় নি। ওষুধের দামও বাকি আছে অনেক। আজ সকালে এসে বলেছিল সে নাগেদের দোকানে জিগ্যেস করে' দেখেছে ওষুধের দাম নাকি আমি অনেক বেশি নিয়েছি। অর্ধেক হওয়া উচিত। দারোয়ান দিয়ে দূর করে' দিলাম লোকটাকে। দারোয়ান যখন তার হাত ধরে' টেনে বারান্দা থেকে নামিয়ে দিলে, তখন ভেবেছিলুম একটা প্রতিবাদ অন্তত: করবে। কিন্তু কিছু করল না, সুট সুট করে' চলে গেল। অথচ শুনেছি ওর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নাকি লক্ষ টাকার উপর।

রায়সাহেব উপাধি দিয়ে গভর্নমেণ্ট অকস্মাৎ আমাকে বিব্রত করেছেন। আমি এর জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি, পাবার জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িতও ছিলাম না। কমিশনার সাহেবের হাইড্রোসিলটি ভালো করে' অপারেশন করে' দিয়েছিলাম বলেই সম্ভবতঃ এই অযাচিত পুরস্কারটি পেলাম। এ যেন সাপের ছুঁচো-গেলা হয়েছে। গিলতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না। আমার চেনা-শোনা অনেকেই কিন্তু গদগদ হ'য়ে পড়েছেন দেখছি। রোজই অভিনন্দন জানিয়ে পত্র আসছে। আমার শালী 'রায়সাহেব ডকটর সদাশিব ভট্টাচার্য্য এম-বি' ইংরেজী হরপে ছাপিয়ে লেটার প্যাড করিয়ে পাঠিয়েছে জলন্ধর থেকে। আমার যে বন্ধুর সঙ্গে কোনকালে বন্ধুত্ব ছিল না, যিনি বহুকাল আগে কিছুদিনের জন্য আমার সহপাঠী ছিলেন মাত্র, তিনি সন্দেশ খাওয়াবার দাবি জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। হে সদাশয় কমিশনার সাহেব, এ কি বিপদে ফেললে আমাকে!

আজ আমার ডিস্পেনসারির সামনে বেশ একটা মজার দৃশ্য দেখলাম। উচ্চকণ্ঠের কলরব শুনে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি একদল হাফ্প্যাণ্টপরা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে উত্তেজিত হ'য়ে। কথাবার্তাও উত্তেজিত। কারণটাও চোখে পড়ল। হাফ্প্যাণ্টপরা ছেলেগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করলাম একজন আড়ময়লা খাকি একটা ফুলপ্যাণ্ট পরে' রয়েছে। তার হাতে একটা এয়ারগান। আর একটা ছেলের হাতে একটা মরা পায়রা। বুঝলাম 'এয়ারগান'টিই ওই হতভাগ্য জীবের ভবলীলার অবসান ঘটিয়েছে। ফুলপ্যাণ্টপরা ছেলেটার মুখের গর্বিত ভাব লক্ষ্য করে' অনুমান করলাম সে-ই বোধ হয় শিকারী। একটা রোগাগোছের ছেলে চীৎকার করে' বলছে—আমিই তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম পায়রাটাকে। মোটা বেঁটে চশমাপরা আর একটা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল—মিথ্যুক কোথাকার। তুমি দেখিয়ে দিয়েছিলে, না আমি? পাশেই ছেঁড়া-কেড্স্-পরা ট্যারা যে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল সে রুখে এগিয়ে এল। বেঁটে ছেলেটাকে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফুলপ্যাণ্টপরা ছেলেটাকে সম্বোধন করে' বললে—তুমিই বল না। এই ফ্লাওয়ার মিলের ফোকরে যে পায়রা থাকে, তা আমিই তোমাকে প্রথমে বলিনি? আর একজন ছেলে বলে' উঠল—মাইরি আর কি! বুঝলাম ওই বারো-চোদ্দটা ছেলেই প্রত্যেকেই ওই মৃত পায়রাটির উপর অধিকার সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেরই চোখের দৃষ্টি লোলুপ। কিন্তু হায়, পায়রা যে মাত্র একটি।

এখানে কাল শখের থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' হয়েছিল। আমি যেতে পারিনি। মনু গিয়েছিল। মোটরে তাকে পৌঁছে দিয়ে আমি 'কলে' বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কথা ছিল ফেরবার সময়ে তাকে তুলে নিয়ে যাব। কিন্তু ফেরবার সময় রাস্তায় মোটরটা গেল বিগড়ে। ঠিক করতে বেশ দেরি হয়ে গেল। মনুকে হেঁটেই ফিরতে হয়েছিল। মনু বললে—ফেরবার সময় দেখলুম মণিবাবু মোটরে করে' যাচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও রয়েছে। আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—গাড়ি কোথায়? বললাম,

আসবার কথা ছিল, কি জানি কেন আসেনি। শুনে মণিবাবু মুচকি হেসে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে' গেলেন। তাঁর এটুকু ভদ্রতা হ'ল না যে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

শহরের লোকে জানে মণিমোহন বসু আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু!···একটু পরে সুবলবাবু এলেন। তিনি আমার এবং মণিমোহন উভয়েরই বন্ধু। ইংরেজীতে যাকে 'কমন ফ্রেণ্ড' বলে তাই। তাঁকে মণিবাবুর ব্যবহারের কথাটা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন,—এতেই আশ্চর্য হচ্ছেন? ওর বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ আছে। তার ফল কখনও খেয়েছেন একটাও। প্রত্যেকটি পেয়ারা বিক্রি করে। কখনও হাত তুলে কাউকে কিছু দিতে জানে না। হাড় চামার। আমার ধারণা ছিল মণিবাবু সুবল-বাবুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের নীচে যে এমন বিষফল্গু বহমান তা জানতাম না।

আজ আমার বাগানের ক্রোটন গাছ দুটোর শ্রী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। প্রাণের প্রাচুর্য যেন উথলে উঠেছে রঙে, রূপে, লাবণ্যে। তার পরই মনে পড়ল রাজেনবাবুর কথা। তিনিই এই ক্রোটনের ডাল দুটো এনে পুঁতে দিয়েছিলেন। আমি বাগান ভালবাসি, রাজেনবাবু আমাকে ভালবাসতেন। এই দুই ভালবাসার মণি-কাঞ্চন যোগ হয়েছে ওই ক্রোটন গাছ দুটিতে। রাজেনবাবু আজ কোথায় জানি না, তাঁর যে দান সামান্য বলে' মনে হয়েছিল, তাই আজ অসামান্য হ'য়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে মানবতার নিগূঢ় মহত্ত্ব যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে ওই গাছ দুটিতে। ঝারিতে করে' জল এনে নিজে হাতে গাছ দুটিকে স্নান করালাম। মালীটা অবাক হ'য়ে গেল। সে বুঝতে পারল না যে আমি বাইরে গাছকে স্নান করাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে মনে অভিষিক্ত করছি রাজেনবাবুকে কৃতজ্ঞতা দিয়ে। আজ এটা আমার জীবনের পরম দিন।

সুরেন বক্‌সি তাঁর বড় জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে আজ এসেছিলেন। তাঁর শৌখিন স্প্যানিয়েলটার কানে ঘা হয়েছে তাই দেখাবার জন্যে। এ অঞ্চলে পশু-চিকিৎসক নেই বলে' দরকার হ'লে পশুদের চিকিৎসা আমিই করি। আমি ঘায়ে লাগাবার একটা ওষুধ আমার ডিস্‌পেনসারি থেকেই দিলাম আর একটা ইন্‌জেক্‌শনের কথাও বললাম। বললাম, ওটা এখানে কোথাও পাবেন না, ক'লকাতা থেকে আনাতে হবে। দামী ওষুধ। সুরেন বক্‌সি একটু দম্ভভরেই উত্তর দিলেন, দামের জন্য আমি পরোয়া করি না, আপনি আমার নামে ভি. পি. করতে লিখে দিন। লিখে দিলাম। তারপর তাঁকে বিদায় দেবার জন্যে বাইরে এসে একটা মজার জিনিস চোখে পড়ল। দেখলাম, তাঁর সহিসের বাঁ কানে একটা ঘা হ'য়ে কানটা বেঁকে গেছে। সহিসটি আমাকে দেখে সেলাম করলে। বক্‌সিমশায়ের বাড়িতে অনেকদিন ধরে' আছে লোকটি। বক্‌সিমশাই কুকুরের কান সম্বন্ধে এত সচেতন, অথচ সহিসের কান সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন বুঝতে পারলাম না। একবার মনে হ'ল সহিসের কানের দিকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আবার তখনই মনে হ'ল—না থাক, কি দরকার আমার। এ কথা কেন মনে হ'ল কে

জানে। এখন মনে হচ্ছে সুরেন বক্‌সি তো অদ্ভুত লোক বটেনই, আমিও কম অদ্ভুত নই।

সোহাগের বিয়ে খুব ধূমধাম করে' হ'য়ে গেল। আমার একমাত্র মা-মরা মেয়েটিকে যে সৎপাত্রের হাতে সম্প্রদান করতে পেরেছি, এতে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত। আনন্দিত যে হইনি তা নয় কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণও হয়েছি। যদিও মুখে দেঁতো হাসি হেসে সবাই বললেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু সবাই যে আনন্দিত হননি, অনেকেই যে ঈর্ষা-ক্লিষ্ট হয়েছেন তা বোঝা গেল তাঁদের মুখের ভাব-ভঙ্গীতে। পরশ্রীকাতরতা জিনিসটা বিষ্ঠার মতো, ফুল দিয়ে চাপা দিলেও তার দুর্গন্ধটা গোপন করা যায় না। সেটা প্রকাশ হ'য়ে পড়েই। সরলতা এবং মহত্ত্ব যেমন চোখে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, কুটিলতা এবং নীচতাও তেমনি হয়। প্রকাশ্যভাবে খুঁতও ধরেছেন অনেকে। অনেককে নাকি ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হয়নি, অনেককে নাকি দেরিতে পাঠানো হয়েছে। হয়তো আমার অজ্ঞাতসারে এসব ত্রুটি ঘটেছে কিন্তু যাঁরা সত্যিই আমার আত্মীয় বা বন্ধু, তাঁরা এসব ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? বিনা-নিমন্ত্রণেই তো তাঁদের আমার বাড়িতে আসবার অধিকার আছে, এসেছেনও কতবার, থেকে গেছেন, খেয়ে গেছেন। যাঁরা দূরে আছেন তাঁদের সকলকেই আমি চিঠি লিখেছিলাম, বিয়ের কথা সকলেই জানতেন। ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্রটার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করেছিলেন কেন বুঝতে পারছি না।

এই শহরেও আমার দুই একজন তথাকথিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নিমন্ত্রণ-না-পাওয়ার ছুতো করে' সরে' ছিলেন। একজন বললেন—বরবধূকে উপহার দেওয়াটা এড়াবার জন্যেই আসেননি। এ কথাটা বিশ্বাস হয় না। একটা ঝুটো আত্মসম্মানের কবলে পড়েছেন তাঁরা। আমাকে সত্যি যদি ভালবাসতেন, বিনা-নিমন্ত্রণেই আসতেন। ভালবাসা জিনিসটা সত্যই বড় দুর্লভ।

এ বিয়ে উপলক্ষে আরও যে দু' একটা ঘটনা ঘটেছে তা আরও মর্মান্তিক। বাড়িতে ভিয়ান বসিয়ে অনেক মিষ্টান্ন করিয়েছিলাম। মিষ্টান্নের তদারক করার ভার ছিল গোপীনাথের উপর। লোকটি অনেকদিনের বিশ্বাসী চাকর, সোহাগকে কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছে। সে যা বললে তা শুনে চক্ষুস্থির হ'য়ে গেছে আমার। সে বললে, সোনাপুকুরের বৌদি এবং তার ছেলে-মেয়েরা নাকি মিষ্টান্নের ভাঁড়ারে ঢুকে মিষ্টান্ন চুরি করত। বাল্‌তি বাল্‌তি পানতোয়া, রসগোল্লা, মিহিদানা সরিয়েছে। যদি খেত কষ্ট হ'ত না, কিন্তু খায়নি, সব ফেলে দিয়েছে পাঁদাড়ে। আমাকে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা। তারা যে ফেলে দিচ্ছে এ কথা গোপীনাথ প্রথমে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারামাত্রই আর কাউকে ঢুকতে দেয়নি সে। এতে নাকি অনেক আত্মীয়-আত্মীয়া অপমানিত বোধ করেছেন। এধরনের আত্মীয়-আত্মীয়াদের কবল থেকে কবে আমরা পরিত্রাণ পাব।

আমার একদল আত্মীয় চিঠি লিখেছেন তাঁদের আসবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অনিবার্য 'কারণ'বশতঃ আসতে পারেননি। পরে জানলাম অনিবার্য কারণটা আর্থিক।

নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে আমার নাকি গাড়ি-ভাড়াটাও পাঠানো উচিত ছিল। গাড়িভাড়া আমি দিতাম কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে সেটা পাঠানো কি শোভন হ'ত! সে কথার উল্লেখ করাও যে অশোভন! এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের নমুনা! একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। যিনি গাড়িভাড়ার জন্য আসেননি, তাঁর ছেলের বিয়েতে আমি সপরিবারে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো আমাকে গাড়িভাড়া দেননি, দেবার প্রস্তাবও করেননি। অথচ তিনি যে খুব গরীব লোক তা-ও নন, ছেলের বিয়েতে নগদ মোটা পণও নিয়েছিলেন।

আজ হঠাৎ মুটবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। মুনসেফ ছিলেন ভদ্রলোক, সাবজজ্ হ'য়ে রিটায়ার করেছেন। যখন সাবজজ্ ছিলেন তখন মোটর ছিল, চাপরাসী ছিল, স্যুট পরতেন, হাকিমি গাম্ভীর্যে বিচরণ করতেন বাছা বাছা অফিসারদের সমাজে। আজ হঠাৎ তাঁকে দেখলাম রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন সাধারণ বাঙালী পোষাক পরে'। আধময়লা ধুতি, আধময়লা শার্ট, পায়ে হতশ্রী একজোড়া অ্যালবার্ট শু, হাতে বাজারের থলি। মুখে বার্ধক্যের চিহ্ন, চুলে পাক ধরেছে, সামনের দাঁত নেই। তিনি যে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তা বুঝতে পারিনি। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, দেখে মনে হ'ল আমাকে বোধহয় চিনতে পারেননি। বললাম—"মুটবিহারীবাবু যে। নমস্কার। চিনতে পারছেন?" মুখটা হঠাৎ কালো হ'য়ে গেল তাঁর।

"কে, ও, ডাক্তারবাবু! আজকাল এখানেই আছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, মাস দুই হ'ল বদলি হ'য়ে এসেছি।"

"প্রমোশন হ'ল?"

"মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছেছি—"

"সিভিল সার্জন হয়েছেন তাহ'লে—। ভালো—"

"আপনি বদলি হ'য়ে এসেছেন না কি এখানে?"

"আমি রিটায়ার করেছি। এখানেই আছি একটা বাড়িভাড়া করে'—"

"কোথায় আছেন?"

ঠিকানাটা জেনে নিলাম। সন্ধ্যার পর গেলাম তাঁর কাছে। অনেকদিন এক ডিস্ট্রিক্টে একসঙ্গে ছিলাম। গিয়ে দেখলাম একটা আধময়লা লুঙ্গী পরে' একটা ভাঙ্গা বেতের চেয়ারে বসে' আছেন। আমাকে দেখে নিজেই আর একটা চেয়ার টেনে বার করে' আনলেন। সেটাও খুব মজবুত বলে' মনে হ'ল না। বসলুম। এক কাপ চা-ও খাওয়ালেন। ময়লা পেয়ালায় অতি জোলো চা। গল্প হ'ল খানিকক্ষণ। তাঁর চাকুরী জীবনেরই গল্প। কবে কোন্ সাহেব তাঁকে কি বলেছিল, কার কার চক্রান্তে তাঁর আশানুরূপ উন্নতি হ'ল না—এই কথা খালি। সারাক্ষণ যেন হায় হায় করে' গেলেন। চুপ করে' শুনলাম সব। ভাল লাগছিল না, তবু শুনলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন কি করেন?"

"বাজার করি আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে সামলাই। আর সময়

পেলে অঙ্ক কষি কি করে' আমার পেন্সন দিয়ে সংসার চালাব। সকালবেলা অবশ্য পূজো করি খানিকক্ষণ, স্বামী জীবনানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে চলে' যাই। চিঠিপত্র লেখালেখি করছি—"

ছুটবিহারীর সম্বন্ধে একটা খবর জানি। ছাত্রজীবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্য ভালো করে' পড়েছিলেন। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ। সেকস্‌পীয়র আর ব্রাউনিং সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর নিজের জীবনে কিন্তু সেকস্‌পীয়র বা ব্রাউনিংয়ের চিহ্নমাত্র দেখলাম না। তাঁদের পরীক্ষার খাতায় ফেলে এসেছেন, সঙ্গে করে' আনতে পারেননি। সাধারণ লোকের মতোই হায় হায় করছেন।

তপেনবাবু আমার প্রতিবেশী। এখন এক অফিসে কেরানীগিরি করেন। বিয়ে করেননি। বলেন চাকরির উন্নতি না হ'লে বিয়ে করবেন না।

তপেনবাবুর বাড়িতে কিন্তু তপেনবাবুর চেয়ে অনেক বড় আসন তপেনবাবুর বোন রঙ্গনার। তাকে ঘিরেই বাড়িতে সর্বদাই আসর সরগরম। মেয়েটি রূপসী নয়, রং কালোই। কিন্তু হাবভাবে মুগ্ধ করে' দেয়। চোখের দৃষ্টিতে এবং যৌবনের সাবলীলতায় আগুন আছে। সেই আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে একদল পুং-পতঙ্গ প্রায়ই সন্ধ্যের সময় ভীড় করে। মেয়েটি নাচ গান অভিনয় সব বিষয়েই পটীয়সী। তবলা আর ঘুঙুরের আওয়াজ প্রায়ই শুনতে পাই। তপেনবাবুর অফিসের যিনি হর্তাকর্তা বিধাতা, তিনি প্রবীণ লোক। তিনিও রোজ আসেন সন্ধ্যেবেলায়। স্থতরাং মনে হচ্ছে এবার তপেন-বাবুর চাকরির উন্নতি হবেই।

দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মহাভারতের আমলেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আগে সমাজে তাদের স্থান ছিল একটা বিশেষ পল্লীতে, বিশেষ সীমার মধ্যে। গৃহস্থের অঙ্গনে তাদের বসতি ছিল না। এখন আমাদের সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, তাই সব সীমারেখাও লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। পুরনারীদের মধ্যে কে বরনারী, কে বারাঙ্গনা তা এখন ঠিক করা মুশকিল। মালা ভ্রমে সাপকে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। এদেশেও ফরাসী সমাজ গজিয়ে উঠল।

একটা নূতন ফেরিওলা এসেছিল। এ শহরের প্রায় সব ফেরিওলাকে চিনি আমি। এ লোকটি অচেনা। তার কাছ থেকে একটা ছুরি কিনলাম। তারপর জিগ্যেস করলাম—এখানে কোথায় আছ? সে বললে, ধরমশালায় আছি। কোথাও আমি বেশীদিন থাকি না। এক সপ্তাহের বেশী কোথাও থাকিনি। ভারতবর্ষের সব শহরেই দু' চারদিন করে' থাকবার ইচ্ছা আছে তার। তার জীবনে বেড়ানোটাই লক্ষ্য, ফেরি করাটা উপলক্ষ মাত্র। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক শহরে বেশীদিন থাক না কেন? সে হেসে বললে, বেশীদিন থাকলে মন খারাপ হ'য়ে যায় বাবু। বেশী মাখামাখি করলে মানুষের চকচকে ভাবটা আর থাকে না, গিল্টি বেরিয়ে পড়ে, মন খারাপ হ'য়ে যায়।

তার কথা শুনে চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম। এরকম দার্শনিক ফেরিওলা আগে কখনও দেখিনি। ফেরিওলার কথা শুনে নবকিশোরের কথা মনে পড়ল। লোকটাকে দেবতা মনে করেছিলাম। তার চেহারায় কথাবার্তায় সত্যিই একটা দেবত্ব ছিল। কিন্তু বেশী মাথামাখি করার পর গিল্টি বেরিয়ে পড়ল। একদিন সকালে দেখি সে উধাও হয়েছে। আর উধাও হয়েছে আমার ক্যাশবাক্সটা। তাতে আড়াই শ' টাকা, দুটো গিনি এবং সোনার ঘড়িটা ছিল।

এখান থেকে কিছুদূরে বড় রাস্তার উপর যে পুলটি ছিল সেটি ভেঙে গেছে। পুল ভেঙে যাওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য হলুম স্বয়ং একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার সেটির তদারক করতে এসেছেন দেখে। মফঃস্বলের এক পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় পুল ভেঙেছে তার জন্যে স্বয়ং একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার এসেছেন, এ যে মশা মারতে কামান দাগা। সাধারণতঃ সাব ওভারশিয়ার বা বড়জোর ওভারশিয়ার এসব ছোটখাটো ব্যাপারে আসেন এবং তাঁরা যা রিপোর্ট দেন তদনুসারেই গভর্নমেণ্ট টাকা খরচ করেন; একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ারের আবির্ভাব একটু অস্বাভাবিক বলে' ঠেকল।

তার পরদিন ভদ্রলোক নিজেই এলেন আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে এক শিশি কার্মিনেটিভ মিক্‌শ্চার নিতে। বললেন—"ওটা আমি সর্বদা সঙ্গে রাখি এবং দু'বার করে' খাই। খেলে ভালো থাকি। এক শিশি আমাকে করে' দিন।" করে' দিলাম। তারপর আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে। দেখলাম নগেনবাবু বেশ সদাশয় এবং রসিক। বিলেত-ফেরত, বড় চাকরি করেন, কিন্তু অহংকারের লেশমাত্র নেই। চমৎকার হাসিখুশী লোক। খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেই বললেন—"ও, তাহ'লে তো বেঁচে যাই মশাই। চাপরাসীর হাতের রান্না খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে গেছে। পেঁয়াজ আর লঙ্কা ছাড়া তৃতীয় কোন মসলা জানা নেই মহাপ্রভুদের—কিছু যদি মনে না করেন, একটা অনুরোধ করবো?" "কি বলুন—।" "একটু শুক্তো করাবেন। মুখটা বদলে নেব।" বললাম, "বেশ তো, বেশ তো—এ আর বেশী কথা কি।" আলাপ ঘনিষ্ঠতর হ'তে জিগ্যেস করলুম—"আচ্ছা এই অজ পাড়াগাঁয়ের পুল দেখতে আপনি এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না।" একটু হেসে বললেন—"ওভারশিয়ার চক্রবর্তী আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে।"

জিগ্যেস করলাম—"কে তিনি?"

হেসে বললেন—"তিনি একজন পুরানো পাপী। এখন রিটায়ার করেছেন। এরকম ধূর্ত লোক আমি আর জীবনে কখনও দেখিনি। কালো বামুন। কুচকুচে কালো রং। চোখমুখে একটা শেয়াল-শেয়াল ভাব। প্রতিবছরই সে একটা পুরানো পুলের মেরামতি বাবদ একটা বিল করত। আমি আসবার আগে থেকেই করত। আমার আগে অন্ততঃ পাঁচজন একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার তার এ বিল পাস করেছে। আমিও করে' দিতাম। পুলটি ছিল একটি পাড়াগাঁয়ের রাস্তায়। সেখান থেকে রেলোয়ে স্টেশন কুড়ি মাইল দূরে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি করে' কিংবা বাইকে করে' কিংবা হেঁটে সে জায়গায়

পৌঁছাতে হয়। এ কষ্ট স্বীকার করে' কোনও এক্‌জিকিউটিভ ইনজিনিয়ার সে পুল দেখতে যায়নি। আমিও যাইনি। রিপেয়ারের বিল প্রতি বছর পাস হ'য়ে যেত কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। স্টেশন থেকে ওই কুড়ি মাইল রাস্তা, জঘন্য ছিল সেটা। পাবলিকে অনেকদিন থেকে ওটা পাকা রাস্তা করে' দেবার জন্যে আন্দোলন করছিল। হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেল ওটা পাকা করা হবে। আমাকে যেতে হ'ল সেখানে। ঠিক তার আগেই ওভারশিয়ার চক্রবর্তী ওখানকার পুল রিপেয়ারের জন্য টাকা চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম—'পুলটা একবার দেখব। তারপর তোমার বিল স্যাংশন করব।' গিয়ে কি দেখলুম জানেন?" "কি—?" "কোনও পুল নেই! Non-existent পুলের রিপেয়ার খরচ বছরের পর বছর নিয়ে যাচ্ছে চক্রবর্তী!"

"বলেন কি। কি করলেন?"

"তারপর একটা নাটকীয় কাণ্ড করল চক্রবর্তী! আমার পায়ে পড়ে' পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগল। শৃগালের চোখে কুমীরের অশ্রু ঝরনার মতো পড়তে লাগল। কিছুতেই পা ছাড়ে না। শেষটা তাকে বলতে হ'ল—'আচ্ছা, এবার তোমায় মাপ করলুম, কিন্তু আর এরকম যেন না হয়।' পরের বছর দেখি আবার চক্রবর্তীর সেই পুল রিপেয়ারের বিল এসেছে! তার দিকে চাইতেই সে বললে—'আমার কথাটা শুনুন আগে সার। বিল এনেছি, কারণ বিল না দিলে অডিট্ ধরবে না? যে পুল গত দশ বছর ধরে' বছর-বছর মেরামত হচ্ছে, এবার সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলে সন্দেহ হবে না তাদের? এবার বিলটা পাস করে' দিন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজটা ভেঙে ফেলবার একটা অর্ডার আর এস্টিমেটও দিয়ে দিন। তারপর থেকে আর বিল আনব না।" হো হো করে' হেসে উঠলেন নগেনবাবু। তারপর বললেন, "সেই থেকে কোনও পুল ভাঙলে তা সে যত ছোটই হোক, নিজের চোখে দেখে আসি।"

কাল রাত্রি এগারোটার সময় বিপিন কাকা কোন খবর না দিয়ে এসে উপস্থিত তাঁর বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে। বিপিন কাকার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। বাবাকে উনি দাদা বলতেন বলে' আমরা ওঁকে কাকা বলি। এসেই একটি মিথ্যে কথা বললেন—চিঠি দিয়েছিলাম, পাওনি? চিঠি হারানো যে অসম্ভব তা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ আমার চিঠি হারায় না। তাছাড়া তাঁর চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছিল তিনি মিথ্যে কথা বলছেন। বিপিন কাকা ধার্মিক মানুষ। রাত এগারোটার সময় এসে তিনি গরম জলে স্নান করলেন। তারপর পুজো করলেন একঘণ্টা ধরে'। তারপর চা খেয়ে গল্প করলেন একটু। মধু অত রাত্রে উনুন নিকিয়ে শুদ্ধাচারে তাঁর মেয়ের জন্য লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম করে' দিলে। জিগ্যেস করলাম—"বিপিন কাকা, হঠাৎ এসে পড়লেন যে! কখনও তো খবর নেন না—"

একমুখ হেসে বিপিন কাকা বললেন, "তোমার জন্যে মনটা বড় উতলা হ'য়ে উঠলো। অনেকদিন দেখিনি তো—"

"আপনার মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন কেন—"

"টুপিকে ? পাশের গাঁয়েই ওর শ্বশুরবাড়ি যে। তোমার মোটরটা নিয়ে কালই ওকে পেঁ‍ৗছে দিয়ে আসব—"

বুঝলাম 'উতলা' হওয়ার কথাটাও সর্বৈব মিথ্যে।

শীতলবাবুর বক্তৃতা শুধু যে শোনবার মতো তা নয়, দেখবার মতোও। তিনি বক্তৃতা দিতে দিতে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করেন। তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাবলীই তাঁর বক্তৃতার উৎস। তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করেন, আজকাল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে কোন লাভ নেই। লেখাপড়া শিখে আর ক'টাকা রোজগার করবে ? দলে দলে বি-এ, এম-এ, এম-বি ফ্যা-ফ্যা করে' রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়, শীতলবাবুর বলবার ভঙ্গীও ওজস্বিনী। কিন্তু তাঁর বক্তৃতাটা সার্থক হ'ত যদি তিনি নিজের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'আপ্রাণ' চেষ্টা—তা না করতেন। চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর চারটি ছেলেই বখা হয়েছে, নানারকম শৌখিন বেশভূষা করে' পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়ানোই তাদের কাজ। যাদের ছেলেরা লেখাপড়ায় ভালো শীতলবাবু সাধারণতঃ তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে উক্ত বক্তৃতা অঙ্গভঙ্গী সহকারে করে' থাকেন। তাঁর নিজের পুত্রবধূ সুন্দরী হয়নি, তাঁর বন্ধু বগলাবাবুর পুত্র-বধূটি হয়েছে। শীতলবাবু বগলাবাবুকে বলেছিলেন—বউ সুন্দরী হ'য়ে কি তোমার চারটে হাত-পা বেরিয়েছে ? বউ সুন্দরী হওয়া ভালো নয়। পাঁচজনে নজর দেবে, বখা ছেলেরা বাড়িতে উৎপাত করবে। বগলাবাবু বন্ধুকে চিনতেন, মুচকি হেসে চলে' গেলেন। তিনি চলে' যাবার পর শীতলবাবু বললেন—সুন্দরী না হাতী ! ঢিবির মতো কপাল, ছোট ছোট চোখ, মুখের হাঁ ইয়া বড় ! অঙ্গভঙ্গী করে' দেখালেন সব।

আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়লাম সেদিন একখানা। ইনিয়ে বিনিয়ে কেবল মেয়েমানুষের কথা। কেবল Sex, Sex আর Sex—ও ছাড়া অন্য প্রসঙ্গই নেই। ওর কথাই নানা রঙে ফেনিয়ে নানা ঢঙে বলবার চেষ্টা করেছেন ভদ্রলোক। আমার মনে হ'ল ভদ্রলোক Sex starved : মনে হ'ল গল্পলেখার ছুতোয় তারিয়ে তারিয়ে কামরসটা নিজেই তিনি যেন উপভোগ করছেন। অপরের পক্ষে যা বীভৎস ও ধিক্কারজনক তাঁর পক্ষে তাই স্বাভাবিক। আমি ক্ষুধার্ত লোককে নর্দমা থেকে ভাত তুলে তুলে খেতে দেখেছি। কোনও নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে এদের সংশোধন করা যাবে না। আসল কারণটা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক। জীবনকে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু লোভ আছে প্রচুর।

কাল রাত্রে আমার জীবনে একটি মহা লাভ হয়েছে। পরম প্রাপ্তি। একটি অকৃত্রিম ভক্তের দেখা পেয়েছি। কৃত্রিম ভক্ত জীবনে অনেক জুটেছে। বস্তুতঃ তাদের

জ্বালায় অস্থির হ'য়ে আছি। তাঁরা যখন আমার প্রশংসার তোড়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে' ফেলেন, তখন মনে হয় যেন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা-ধোওয়া হোজ্ পাইপের সামনে পড়ে' নাকানি-চোকানি খাচ্ছি।

কারো মুখের সামনে তার অজস্র প্রশংসা করা যে নিন্দা করার চেয়েও বেশী অশোভন এবং গর্হিত, এ জ্ঞান অনেকের থাকে না। থাকে না, কারণ তাঁরা প্রশংসা করেন কোনও মতলবের তাগিদে। মতলবের তাড়ায় মানুষের শোভন-অশোভন জ্ঞান লোপ পায়। তাঁরা তখন বানরকে কন্দর্পকান্তি এবং ভীরু দুর্বলকে বীরেন্দ্র বলতেও ইতস্ততঃ করেন না। আমার জীবনে এরকম মতলববাজ লোকের দেখা অনেক পেয়েছি।

কিন্তু কাল রাত্রে যে লোকটি বৃষ্টিতে ভিজে রাত বারোটায় স্টেশনে আমার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে অন্য জাতের। আমি কাল রাত্রে সপরিবারে প্রচুর মাল-পত্র নিয়ে ক'লকাতা থেকে ফিরছি। আমার ড্রাইভারকে এবং চাপরাসীকে খবর দেওয়া ছিল, কিন্তু তারা কেউ স্টেশনে আসেনি। এসেছিল ওই লোকটি। জিতু জেলে। বাজারে মাছ বিক্রি করে। হাসপাতালে অনেকদিন আগে তার এক যক্ষ্মাগ্রস্ত আত্মীয়কে নিয়ে এসেছিল, আমি তাকে স্যানাটোরিয়মে পাঠাবার ব্যবস্থা করে' নিই। কর্তব্য হিসাবেই করেছিলাম, কোনও প্রতিদান প্রত্যাশা করিনি। কথাটা মনেও ছিল না আমার। স্টেশনে গাড়ি থামতেই জিতু এগিয়ে এল, আমি প্রথমটা চিনতেই পারিনি তাকে। তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল। আমাকে প্রণাম করে' বললে সে তার সেই আত্মীয়টির খবর দিতে আমার বাসায় আজ গিয়েছিল। গিয়ে দেখল ড্রাইভার আলি মদ খেয়ে বেহোঁশ হ'য়ে পড়ে আছে, আমার চাপরাসী শিউরামের জ্বর হয়েছে খুব। সে-ও প্রায় বেহোঁশ। জিতু ঝড় জল মাথায় করে' নিজে তাই স্টেশনে এসেছে যাতে আমার কোনও কষ্ট না হয়। কুলি ডেকে আনলে, নিজেও কয়েকটা জিনিস নাবালে, একটা গাড়ি আগে থাকতেই ঠিক করে' রেখেছিল। জিতুর মুখভাবে একটা অসাধারণ ভাব ফুটে উঠেছে দেখলাম। অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার আলোকে তার চোখমুখ প্রদীপ্ত। মুগ্ধ হলাম।

মুগ্ধ হলাম বললেও সবটা ঠিক বলা হয় না, বলতে হয় কৃতার্থ হলাম। তারপরেই বিস্মিত হলাম মনে মনে। আমার মধ্যে কি এমন আছে যা দেখে ও এমন ভক্তি-গদগদ হ'য়ে পড়েছে। আমি তো অতি সামান্য লোক। ওর ভক্তিভাজন হবার যোগ্যতা কি আছে আমার? পুরাণের সেই গল্পটা মনে পড়ল। এক ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরেছে। গুরু তাকে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করবার অনুমতি দিয়েছেন। ছেলেটি বাড়িতে এসে কপাটে ধাক্কা দিতেই তার মা কপাট খুলে দিলেন। ছেলে মাকে প্রণাম করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—বাবা কোথায়? মা বললেন, ভিতরে আছেন, এস। ভিতরে এসে কিন্তু তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু দেখা গেল খিড়কির দুয়ারটি খোলা রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া গেল না তাঁকে। তিনি ফিরলেন এক বছর পরে।

ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, তুমি কোথায় চলে' গিয়েছিলে?"

বাবা উত্তর দিলেন, "বনে। তপস্যা করবার জন্যে।"

বিস্মিত হ'য়ে গেল ছেলে। প্রশ্ন করল—"হঠাৎ এ ইচ্ছা হ'ল কেন ?"

বাবা উত্তর দিলেন—"তুমি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ফিরে এসে তোমার মাকে প্রণাম করছিলে তখন আমি তোমাকে উঠোন থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম তোমার ললাটে তপস্যা-লব্ধ জ্যোতি জলজল করছে। দেখে আমার মনে হ'ল—আমি কি ওর প্রণাম নেবার যোগ্য ? সংসারের সংঘর্ষে আমার চরিত্র যে মলিন হ'য়ে গেছে! তাই আমি খিড়কির দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বনে চলে' গিয়েছিলাম তপস্যা করতে, মলিন চরিত্রকে উজ্জ্বল করতে। এক বৎসর অধ্যবসায়ের ফলে আমার সে সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। এখন তুমি আমাকে প্রণাম করতে পার।"

আমার মনে হচ্ছে আমি কি জিতু জেলের ভক্তিভাজন হবার উপযুক্ত ? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, ও যদি জেলে না হ'য়ে কালচার্ড ভদ্রলোক হ'ত তাহ'লে কি রাতদুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে সামান্য উপকারের ঋণ শোধ করবার জন্য আসত ? আমার বিশ্বাস আসত না। আজকাল 'কালচার্ড' মানেই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক।

কানাই মাড়োয়ারির ব্যবহারে সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলুম কেন ওরা ব্যবসায়ী হিসাবে এত উন্নত। আমার এক ভাইঝি প্রসব হবার জন্য আমার কাছে এসেছিল। হাসপাতালের নার্স লুইসাকে সেজন্য মেহনত করতে হয়েছিল খুব। উপর্যুপরি দু'দিন রাত জেগেছিল, প্রায় এক মাস রোজ দু' বার করে এসে 'ড্রেস' করে' দিয়ে গিয়েছিল। অন্য কোন জায়গায় হ'লে অন্ততঃ সে দেড়শ' টাকা রোজগার করত। কিন্তু আমার কাছে 'ফী' চাইতে পারে না। তাই ঠিক করলুম ওকে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দেব। কানাই মাড়োয়ারির দোকান থেকে ভালো শাড়ি নিয়ে এলাম একখানা। হালকা হলুদ রঙের শাড়ি। মনু বললে—কাল ষেটেরা পুজো। কালই ওকে দিও শাড়িখানা। সন্ধ্যের সময় লুইসা এলে তাকে দেখানো হ'ল শাড়িটা। রং পছন্দ হয়েছে কিনা। লুইসা দক্ষিণ-বাসিনী। খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছে বটে, কিন্তু তামিল রক্ত ওর ধমনীতে বহমান। লুইসা হেসে বললে—আমার ডগমগে গাঢ় রং পছন্দ। 'I perfer deep colour'।

তার পরদিন ভোরে উঠেই গেলাম কানাইয়ের দোকানে। কানাই বললে—আজ রবিবার, আমার দোকান বন্ধ। আর আমার সেল্‌স্‌ম্যান মহাদেবের কাছে দোকানের চাবি থাকে। তার বাড়ি মাইল দুই দূরে। কাল যদি শাড়িখানা বদলে দি, হবে না ? বললাম, কিন্তু আজ যে ষেটেরা পুজো। ওই সঙ্গেই শাড়ি দেওয়া নিয়ম আমার স্ত্রী বলছে। বেশ, তোমার যদি অসুবিধা হয়, কালই বদলে দিও। শাড়িটা তার কাছে রেখে এলাম।

ঘণ্টা দুই পরে দেখি মহাদেব রিক্‌শা করে' এসে হাজির। রিক্‌শায় প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের বস্তা। মহাদেব বললে—কানাই নিজে সাইকেল করে' আমার বাড়ি গিয়ে-

ছিল, তার কথামত আমি ব্যাঙ্গালোর শাড়ি দোকানে যতগুলো ছিল সব আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আপনার যে রংটা পছন্দ বেছে নিন। কানাইয়ের ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

এ কাহিনীর আর একটা চমৎকার ভাষ্য করেছেন আমার বাঙালী বন্ধুরা। হাসপাতালের যুবতী নার্স লুইসার শাড়ির জন্য আমি দোকানে ছুটোছুটি করছি—এর একটি অর্থ ই তাঁদের চিত্তে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেটা তাঁরা ফুসফুস গুজগুজ করে' আলোচনা করছেন!

বাংলার বাইরে এই শহরে কিছুদিন থেকে এসেছি। এখানকার যে বাঙালী সমাজ নিজেদের 'প্রবাসী' বলে' চিহ্নিত করে' রেখেছেন তাঁদের দুরবস্থা দেখলে সত্যিই বড় হতাশ হ'য়ে পড়তে হয়।

এককালে বাংলাদেশের কৃতী-সন্তানরা এখানে এসে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেদের। সকলে তাঁদের খাতির করত, তাঁরা খাতিরের উপযুক্তও ছিলেন। তাঁরা অর্থোপার্জন করেছিলেন প্রচুর, এখানকার জনহিতকর কাজে ব্যয়ও করেছেন প্রচুর। এখানকার স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ তাঁদের নামের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের নিজেদেরও প্রত্যেকের প্রাসাদোপম বাড়ি আছে এখানে। জমি-জমাও আছে। জমিদারিও ছিল কারো কারো।

কিন্তু তাঁদের বংশধরদের দেখে হতাশ হ'তে হয়। গরুড়ের বংশে এরকম চামচিকেদের জন্ম হ'ল কি করে'! ছেলেদের মধ্যে অধিকাংশই লেখাপড়ায় খুব খারাপ। সবই প্রায় থার্ড ডিভিসন। গুণ্ডামিও করতে পারে না ভালো করে', ছোঁচামি করে। প্রতি বাড়িতেই বড় বড় মেয়ে, অনেকেরই বিয়ে হয়নি, অনেকেই ব্যভিচারিণী হ'য়ে পড়েছে, অনেক সময় প্রকাশ্যেও। এদের দুর্গাপূজার তিন চারটে দল, লাইব্রেরীও একাধিক, কোনটাই ভালোভাবে চলে না, প্রত্যেকটাতেই দলাদলি আর ঘোঁট। ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর নামে 'জয়ন্তী' মাঝে মাঝে হয়। পঁচিশে বৈশাখটা তো একটা পর্বের মতো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যারা নিজেদের বাপ-মায়ের জন্মদিন কবে তা জানে না, তারা কবির জন্ম-উৎসবে নাচতে, গাইতে বা বক্তৃতা করতে আসে। উৎসবের নামে কি যে প্রহসন হয় তা বোঝবার ক্ষমতাও এদের নেই। বিহারীদের নিন্দায় এরা পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার মনে হয় মানুষ হিসাবে বিহারীরা এদের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বেশী ভদ্র।

বাঙালীর ছেলেরা চাকরি পায় না তার একটা বড় কারণ এখানকার অধিকাংশ বাঙালী ছেলেই চাকরি পাওয়ার যোগ্য নয়। আমি অমুক বাবুর নাতি বা দৌহিত্র—এ বললে তো আর চাকরি মিলবে না। যোগ্য বাঙালীরা চাকরি পায়নি এরকম দৃষ্টান্তও আছে। এই নিয়ে অনেকে গলাবাজি করে' চীৎকার করেন। তাঁরা ভুলে যান যে চাকরির ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই পক্ষপাতিত্ব আছে। নিজেদের লোককে সবাই চাকরি দিতে চায়। এরাও চায়।

এ বিষয়ে কিন্তু বাঙালীরা ব্যতিক্রম, বাঙালী বড় চাকুরেরা সাধারণতঃ বাঙালীদের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না—এইরূপ জনশ্রুতি। যোগ্য বাঙালী চাকুরী-প্রার্থী বাঙালী অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এরকম একাধিক খবর আমি জানি। এত কথা লিখলাম মনের দুঃখে।

একটা খবর পেয়ে দুঃখটা নতুন করে' অনুভব করলাম। জগদীশবাবু মারা গেছেন। তিনি পোস্টাফিসে কাজ করতেন। অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন। পাড়ার ছেলেরা আমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল শবদাহের ব্যবস্থা করবার জন্যে। তাঁর পরিবার নাকি কপর্দকশূন্য।

অতীতের গর্ব আঁকড়ে ধরে' আমরা বেঁচে আছি ভবিষ্যতের আশায়, এ কথা অনেকে বলেন। কিন্তু সেটা কি সত্যি? একজন বাঙালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন বাঙালীদের ইতিহাসের খবর সে রাখে কি না। দেখবেন কিচ্ছু রাখে না। নিজের বংশেরই পুরো খবর রাখে না। আস্ফালন করবার বেলায় কেবল বলে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের অরবিন্দ। কিন্তু একটু চেপে ধরুন, দেখবেন রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানে না সে। নামগুলো জানে শুধু। আর সেইগুলোকে মূলধন করে' মাঝে মাঝে নাচ-গান-বক্তৃতার মজলিস বসায় নিজেকে জাহির করবার জন্যে। হায় ভগবান, কোথায় চলেছি আমরা? সমূলে ধ্বংস হওয়াটাই কি এ জাতির অনিবার্য পরিণাম?

কাল মনের দুঃখে বাঙালীদের সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম আজ নিজেই তার প্রতিবাদ করছি, কারণ আজ অরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অরুণ বসুকে আগে কখনও দেখিনি। তার মায়ের অসুখের জন্যে আমাকে ডাকতে এসেছিল। পিতৃহীন অরুণ নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে। অর্থাভাবে লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, কিন্তু সে মানুষ হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি সে তিন বিঘে জমি পেয়েছিল। একা নিজের হাতে চাষ করে' সে তিন বিঘে জমিতে শাকসব্জির বাগান করেছে। পৈতৃক বাড়ি ছিল একখানা। কিন্তু মেরামতের অভাবে পড়ে' গিয়েছিল সেটা। অরুণ নিজের হাতে মাটির দেওয়াল দিয়ে ছোট বাড়ি করেছে আবার। চমৎকার তকতকে ঝকঝকে বাড়ি। বাড়িটা তার বাগানের মধ্যেই। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজের হাতে করেছে বাড়িখানা। বাড়িতে লোক বেশী নেই, সে আর তার মা। মাকে পরম সুখে রেখেছে দেখলাম। একটি গাই আছে, সেইটি নিয়ে থাকেন তিনি। দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

তার মায়ের ম্যালেরিয়া হয়েছে। একটু খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া, সারতে একটু সময় নেবে। আমি ফী নিতে চাইনি। কিন্তু অরুণ বললে, আপনি ফী না নিলে স্বস্তি পাব না। মনে হবে গরীব বলে' আপনি আমার উপর দয়া করলেন। কিন্তু আমি গরীব নই, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স প্রায় আড়াইশো টাকা।

অরুণের মতো ছেলে বাঙালী জাতির গৌরব। জানি না এরকম ছেলে বাঙালীদের

মধ্যে আরও আছে কিনা, যদি থাকে তাহ'লে বাঙালীরা আবার গৌরবের শিখরে আরোহণ করবে। অরুণ শহর থেকে অনেক দূরে থাকে বলে' তাকে চিনতাম না। শহরের তথাকথিত অভিজাত বাঙালীদের সঙ্গে তার নিজের কোন যোগাযোগ নেই।

এক রিক্‌শাওলার মুখে এক ভদ্রলোকের কথা শুনলাম। যখন ফরসা জামা-কাপড় পরেন, ঘন ঘন সিগারেট খান, পুলিসে চাকরি করেন—তখন তাঁকে 'ভদ্রলোক' বলতেই হবে। কিন্তু মনে মনে ভাবছি—তাঁকে 'মাল' বলব না 'চীজ্' বলব, না স্যাম্পল বলব! কোন্‌টা ঠিক মানাবে ওই পুলিসপুঙ্গবকে? ঘটনাটা এই। পুলিস-অফিসারটি উক্ত রিক্‌শাওলার রিক্‌শায় চড়ে' প্রায় মাইল দুই গেলেন দুপুর রোদে। গলদঘর্ম রিক্‌শাওলা কপালের ঘাম মুছে যখন ভাড়া চাইলে তখন অবাক হ'য়ে গেলেন।

ভাড়া! ভাড়া চাইছে তাঁর কাছে?

বললেন, "আমি কে চেন?"

"না হুজুর—"

"আমি দারোগা। তোমার রিক্‌শার নম্বর কত দেখি। ও, ১৭৫। আচ্ছা। কত ভাড়া চাই তোমার—"

ঘাবড়ে গেল রিক্‌শাওলা। বললে, "মাপ করবেন, আমি চিনতে পারিনি। মেহের-বানি করে' আমার নামে রিপোর্ট করবেন না, হুজুর।"

হুজুর বললেন, "কিন্তু তোমার নম্বরটা যে কাঁটার মতো বিঁধে গেল মনে। সে কি অমনিতে উঠবে?"

ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইল রিক্‌শাওলা।

"ও কাঁটা তুলতে হ'লে কিছু সেলামী লাগবে।"

"কত হুজুর—"

"অন্ততঃ এক টাকা—"

টাকাটা দিয়ে সেলাম করলে রিক্‌শাওলা, তার পর ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

রিক্‌শাওলাটা আমার কাছে এসেছিল তার ছেলের ওষুধ নিতে।

"আমি আপনার পুরো ফী দিতে পারব না। কিছু মাপ করুন, পুলিসের জ্বালায় আমরা মারা যেতে বসেছি—"

বলে', ওই কাহিনীটি আমাকে বললে।

আমি বললাম, "তোমাদের তো ইউনিয়ন আছে। তোমরা এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই পার—"

সে বললে, "ইউনিয়ন? ছিল বটে আগে একটা। এখন সেটা উঠে গেছে—"

"কেন—"

"আমরা চাঁদা দিয়ে যে টাকাটা জমিয়েছিলাম আমাদের প্রেসিডেণ্ট সেটা মেরে দিয়ে সরে' পড়েছেন। শুনছি নাকি বোম্বাই গেছেন।"

"কে ছিলেন প্রেসিডেন্ট ?"

যার নাম করলে সে মোটেই শ্রমিক নয়, এক বড়লোকের বখা ছেলে।

ভাবছি—গরীবগুলোর উপায় কি তাহ'লে ?

মনুর জ্বরটা কাল থেকে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাকে বিছানা নিতে হয়েছে। অনেকদিন থেকেই না কি একটু একটু জ্বর রোজই হ'ত, আমার কাছে গোপন করে' ছিল। কেন করেছিল জানি না। মনুর স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা গোপনতা আছে। তার অন্তরলোকে আমার অবাধ গতি, কিন্তু তবু মনে হয় ওর নিজস্ব আর একটা জগৎ আছে যেখানে ও একাকিনী। অসুখে পড়ে' ও যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছে। অপরাধী ধরা পড়ে' গেলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। আজবলাল আমার চেয়েও বেশী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। চিরঞ্জীব আর মালতীকে টেলিগ্রাম করলুম। ওরা এখানে এসে থাকুক যতদিন না মনু সেরে উঠছে। সারতে দেরি হবে, টাইফয়েড বলে' মনে হচ্ছে।

আমার এক ভাগ্‌নে এসেছিল আমার কাছে। তার পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, সে এসেছিল আমার কাছে একখানা চিঠি নিতে। চিঠি নিয়ে সে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে চাকরির জন্য। বন্ধুটি ইচ্ছে করলে নাকি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে একটা। চিঠিখানা নিয়েই সে চলে' গেল, মনুর অসুখের জন্য তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখলাম না। এসেই চলে' গেল। যেন পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে এসেছিল।…সোহাগকে আজ টেলিগ্রাম করলাম আসবার জন্য ! মনুর টাইফয়েডই হয়েছে। আগেই আন্দাজ করেছিলাম। এখন রক্ত পরীক্ষা করে' নিঃসন্দেহ হয়েছি।

মনুর অসুখে বাড়িতে যেন একটা সাড়া পড়ে' গেছে। দু'বেলায় অন্ততঃ পঞ্চাশ কাপ চা হচ্ছে, বৈঠকখানায় বারান্দায় লোকের ভিড। আমার সহকর্মী ডাক্তাররা সবাই আসছেন, তাছাড়া আসছেন এখানকার প্রতিবেশীরা। আমার রোগীর আত্মীয়-স্বজনের ভীড়ও কম নয়, তারা সবাই রোজ খবর নিতে আসে। এরা গরীব, এরা অনাত্মীয়, কিন্তু এদের উৎকণ্ঠা দেখে মনে হয় এদের চেয়ে বড় আত্মীয় আমার আর কেউ নেই। আমার রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা এখনও কেউ আসেননি। দু'চারজন পোস্টকার্ড-যোগে খবর নিতে চেষ্টা করেছেন। আমি বড় ভীত হ'য়ে পড়েছি। সোহাগ দিনরাত কাঁদছে। মনুর জ্ঞান নাই।

মনুর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছে। ক'লকাতার একজন বড় ডাক্তারকে আনবার জন্য 'তার' করেছি। এর মধ্যেও 'কলে' বেরুতে হয়েছে আমাকে। রোগীদের বাড়ির বিপদের দিকটাও তুচ্ছ করতে পারি না। তিনটে টাইফয়েড কেস

আমার চিকিৎসায় আছে। আমার উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং আমাকে যেতেই হচ্ছে।

আবার এই সব করুণ রসের মধ্যেও হাস্যরসের খোরাক পেয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে। মহাকাল যেন জীবন-মরণের একঘেয়েমি নষ্ট করবার জন্যে মাঝে মাঝে চাটনির ব্যবস্থা করছেন।

একটি বাড়ির কর্তা টাইফয়েডে মরণাপন্ন হ'য়ে আছেন। আজ তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি একটি লোক বাইরের বারান্দায় বসে' হাউ হাউ করে' কাঁদছে। লোকটির এক মুখ কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ভুরুও কাঁচা-পাকা, ভুরু দুটি ঝুলে পড়েছে চোখের উপর। চোখের জলে নাকের জলে এই মুখ পরিপ্লাবিত। আমি ভাবলুম কোন আত্মীয় বুঝি। পরে জানতে পেরেছি, আত্মীয় নয়—পাওনাদার। যিনি রুগী তিনি অসুখে পড়বার ঠিক আগেই ওর কাছ থেকে চড়া সুদে হাজার তিনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। বলেছিলেন হ্যাণ্ডনোটটা কাল লিখে দেব। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই তিনি জ্বরে পড়েন, আর লিখতে পারেননি!

কুলগুরু এসেছেন। তিনি দক্ষিণাকালীর পূজা করছেন। তারস্বরে পাঠ করছেন দক্ষিণাকালীর স্তব। "করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং" যদি দয়া করে' মন্টুকে ফিরিয়ে দেন। বলিদানের ছাগ-শিশুটা আর্তরব করছে। পূজার হট্টগোল ঘণ্টা-কাঁসরে প্রকম্পিত হচ্ছে বাড়িটা। এত গোলমাল আমি কখনও বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু এখন করছি। কিছু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। একটি কথাই কেবল মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে—মন্টুর জীবন-সংশয়—হেমারেজ হচ্ছে। যে কোনও উপায়ে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে, তা সে উপায় যতই হাস্যকর, যতই অদ্ভুত হোক না কেন। এই আগ্রহের কাছে সমস্ত যুক্তি মাথা নত করেছে।

ক'লকাতায় যে ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করেছিলাম তিনি দুঃখিত হ'য়ে টেলিগ্রাম করেছেন যে সাতদিনের আগে আসতে পারবেন না। হেভিলি এন্‌গেজ্‌ড্‌! ওর সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিলাম আমি। আমার চেয়ে ও সব বিষয়েই খারাপ ছিল। ফেল করেছিল দুবার। কিন্তু তার বাবা ছিলেন ক'লকাতার একজন যশস্বী ডাক্তার। টাকার অভাব ছিল না। ছেলেকে বিলেত পাঠালেন এবং সেখানে সে বারকয়েক ফেল করে' অবশেষে একটা বিলেতী ডিগ্রি নিয়ে এল। এসে বসতে লাগল বাবারই ডিসপেন্সারিতে। বছর দশেক সেখানে টিকে রইল কোনক্রমে। তারপর তার প্র্যাক্‌টিস জমল। দশ বছর পরে ক'লকাতার রুগীরা বুঝতে পারল ও একজন দিগ্‌গজ ডাক্তার। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমারও ধারণা হ'ল ও সত্যিই বড় ডাক্তার। মনে হ'ল মন্টুর চিকিৎসা ও আমার চেয়ে ভালো করে' করতে পারবে! টাকার জোরে বারাঙ্গনারাও আজকাল 'দেবী', তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও প্রথম শ্রেণীর প্রথম সারে দেদীপ্যমান। টাকার জৌলুস সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ করে' দেয়।

আমি ভাবতাম আমার বুদ্ধি এসব মেকি জিনিসে অভিভূত হয় না। কিন্তু এখন দেখছি হয়। এখন মনে হচ্ছে কোন্‌টা মেকি কোন্‌টা খাঁটি তা ধরাও শক্ত। হাঁসেদের মধ্যে কোনও বক যদি দীর্ঘকাল বাস করতে পারে, তাহ'লে সবাই তাকেও হাঁসের মর্যাদা দেবে—হাঁসেরা না দিক, মানুষেরা দেবে। অদ্ভুত জীব এই সামাজিক মানুষরা!

আজবলালকে আর সামলানো যাচ্ছে না। সে মাথা খুঁড়ছে, চুল ছিঁড়ছে, পাগলের মতো হ'য়ে গেছে। সোহাগের ফিট হচ্ছে বারবার। একমাত্র মালতীই দৃঢ়হস্তে এই বিপর্যস্ত নৌকোটার হাল ধ'রে বসে' আছে। চিরঞ্জীব নির্বাক হ'য়ে গেছে, আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। মনু কাল চলে' গেছে।

দিন কয়েক হ'ল বদলি হ'য়ে এসেছি। বদলি হওয়ার যে কি ঝঞ্ঝাট তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। গভর্নমেন্টের বাড়ি, গভর্নমেন্টের চাকর-চাপরাসী, যাওয়ার খরচও গভর্নমেন্টের, কিন্তু তবু মনে হয় যেন কি একটা লোকসান হচ্ছে। অর্থের দিক থেকে লোকসান হয় না, কারণ মাইনে যা পাবার ঠিক পাই, নতুন জায়গায় কলও অনেক আসে। কিন্তু তবু মনে হয় লোকসান হ'ল। মনে হয় পুরনো জায়গায় আমার কিছুটা অংশ যেন ফেলে এলাম, তা আর উদ্ধার করা যাবে না, হারিয়ে যাবে।

এখানে এসে ক'দিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি অসুস্থ হ'য়ে আমার বাড়িতেই রইলেন ক'দিন। তাঁর কলগুলো আমাকে সামলাতে হ'ল। অফিসের কাজকর্মও অগোছালো অবস্থায় পেয়েছি, ঠিক করে' নিতে হচ্ছে সেগুলো। হাসপাতালে সার্জিকাল কেসের ভিড় খুব। তিন-চারটে বড় অপারেশন রোজই করতে হয়। তাছাড়া পুলিস কেস আর পোস্টমর্টেম।

কাল, একটা পোস্টমর্টেম করে' মন বিকল হ'য়ে গেছে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে? বিশেষ করে' মেয়েমানুষ? সতীনের ছেলের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে তাকে মেরে ফেলেছে একটা উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। ছেলেটার বয়স মাত্র দশ বছর। মেয়ের আত্মীয়স্বজনেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে মেয়েটা পাগল। তাই ওকে under observation রেখেছি। আমার পাগল বলে' মনে হয় না। খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। দেখে মনে হয় খুব নিশ্চিন্ত ঘুম। যেন ও জীবনের একটিমাত্র কর্তব্য শেষ করে' এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এরপর যাই হোক ও তার তোয়াক্কা করে না।

হঠাৎ মনে হ'ল প্রায় সাত দিন মনুর কথা একবারও মনে পড়েনি। কাজের তোড়ে এই স্মৃতি রঙীন পালকটা ভেসে চলে' গেল না কি! লজ্জিত হলাম।

জিতু জেলে ক'দিন আগে এসেছে একটি রোগী নিয়ে। অতদূর থেকে ট্রেনভাড়া খরচ করে' এসেছে। বিনা পয়সার রোগী নয়, আমাকে রীতিমত ফী দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। এখানে একটা ঘর ভাড়া করেছে।

জিতুকে বললাম—"ওর চিকিৎসা তো ওখানেই হ'তে পারত। এখানে ওকে এত খরচ করিয়ে নিয়ে এলে কেন ?"

জিতু বললে—"আপনার উপর আমাদের বিশ্বাস বেশী। অন্য কোথাও চিকিৎসা করিয়ে ভরসা হয় না।"

মালতী বলছিল জিতু প্রায়ই বাড়ির ভিতরে এসে কাঁদে ! মন্নুর জন্য। আমার সামনে কিন্তু সে শোক প্রকাশ করেনি একদিনও। মালতীর কাছে প্রকাশ করেছে লুকিয়ে। মালতীকে বলেওছে আমাকে একথা যেন না জানানো হয়। আমার মনে তাহ'লে দুঃখ হবে। মালতী কিন্তু কথাটা আমাকে বলে' দিয়েছে।

ডায়াবিটস্ সম্বন্ধে একজন ডাক্তার গড়গড় করে' অনেক নূতন কথা বলে' আমাকে সেদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এত কথা আমি জানতাম না। নবতম সংস্করণের যে বইটা কিছুদিন আগে কিনেছি, তাতেও এসব কথা নেই। শ্রদ্ধা হ'ল ডাক্তারটির উপর। দিন দুই পরে শ্রদ্ধা কিন্তু আর রইল না। আমার নামেও বিদেশী এক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের প্যামফ্লেটটা এল। তাতে দেখলাম ওই সব কথাই লেখা আছে। গান্ধিজীর সেই কথাটা মনে পড়ল—এখনকার ডাক্তাররা বিদেশী ঔষধ ব্যবসায়ীদের দালাল মাত্র।

এসব অবশ্য সত্য যে বিদেশীরাই চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুরকম গবেষণা করছেন, তাদের গবেষণা ডাক্তারি শাস্ত্রে সত্য বলে' স্বীকৃতও হচ্ছে, কিন্তু একথা সমান সত্য যে আমরা মাছি-মারা কেরানীর দল, বিদেশী প্যামফ্লেটে যা কিছু লেখা থাকে তা নির্বিচারে সত্য বলে' বিশ্বাস করি এবং রোগীদের তা কিনতে বাধ্য করি। অনেক সময় রোগীরা এতে সর্বস্বান্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। আমরা আপ-টু-ডেট চিকিৎসা করে' গর্ব অনুভব করি।

একটা আশ্চর্য লোক দেখলাম আজ। 'কল' থেকে ফিরছিলাম। এমন সময় টক্ করে' একটা পাথর এসে আমার গাড়িতে লাগল। আর একটু হ'লে জানালার কাঁচ ভেঙে যেত। গাড়ি থামালাম। দেখি কালো লম্বা শুঁটকো একটা লোক প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গোঁফ দাড়ি মাথার চুল লম্বা লম্বা, অনেকদিন তেল পড়েনি বলে' কটা হ'য়ে গেছে। কোমরে একটা ন্যাকড়া জড়ানো। ঊরুর অর্ধেকও ঢাকা পড়েনি তাতে। আমার ড্রাইভার আলী নেমে গিয়ে তাকে জিগ্যেস করলে কেন সে ঢিল ছুঁড়েছিল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কেবল তার গোঁফের জঙ্গলে একটা শিহরণ বয়ে' গেল দেখলুম। তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হ'ল ক্ষমতা থাকলে আমার মোটরটাকে সে ভস্মীভূত করে' দিত। কিন্তু কোন কথা বললে না সে।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় মোটর দাঁড়ালেই ছেলের দল এসে দাঁড়ায় আশেপাশে। তাদের একজন বললে—ও লোকটা চিড়ি-মার। চিড়িয়া অর্থাৎ পাখী মারে। তীর দিয়ে বা বন্দুক দিয়ে নয়। ঢিল ছুঁড়ে। গুলতি দিয়ে ঢিল ছোঁড়ে না, হাত দিয়ে ছোঁড়ে।

হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। চড়ুই, শালিক, কাক, বক—যা সামনে পায় তাই মারে। মেরে পুড়িয়ে খায়। এক জায়গায় দেখলাম কতকগুলো ইট স্তূপীকৃত করা রয়েছে। আর তার কাছেই পোড়াবার সরঞ্জাম। দু'খানা দাঁড়-করানো ইঁটের মাঝখানে কয়লা। কয়লা সে কেনেনি, শুকনো ডালপালা পুড়িয়ে করেছে।

সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে প্রাগৈতিহাসিক বন্যযুগের নমুনা দেখে বিস্মিত হলাম।

কাল মনুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল। আত্মীয়স্বজনেরা কেউ আসেনি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল এদেশের লোকেরা, যাদের আমরা মূর্খ ছোটলোক বলি, তারা আত্মীয়ের আত্মীয়েরও মৃত্যু হ'লে সবাই মাথা কামায়। গ্রামসম্পর্কের মৃত। আত্মীয়দের সম্মান জানায় এই ভাবে। আমরা সভ্য কিনা, ওদের কাণ্ড দেখে হাসি। এমন বাঙালী বাবুরও খবর জানি যিনি মায়ের মৃত্যুতেও মাথা কামাননি। পুরোহিতকে মূল্য ধরে' দিয়েছেন। স্যুটের সঙ্গে ন্যাড়া মাথা নাকি নিতান্ত বেমানান। সুরুচিতে বাধে।

মনুর শ্রাদ্ধে একটি পেশাদার লোভী পুরোহিতকে ডেকে কাজ করালাম এবং দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ নামধেয় অব্রাহ্মণকে ভোজন করালাম এবং তথাকথিত বন্ধুবান্ধব, যাদের পোলাও মাংস খাইয়ে শতাধিক টাকা ব্যয় করলাম তাঁরা আমার কেহই বন্ধু নন। মনে পড়ল মনু একটা পা-কাটা খোঁড়াকে খাওয়াতে ভালবাসত। কিন্তু সে তো থাকে একশ' মাইল দূরে!

চাপরাসীকে বললাম—শহরে যত খোঁড়া ভিখারী আছে ডেকে নিয়ে এস। তাদের খাওয়াব।

চাপরাসী ফিরে এসে বললে খোঁড়া ভিখারী একটাও নেই। কানা আর নুলো আছে।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল বললে শিবমন্দিরে এক খোঁড়া সাধু থাকে। বলেন তো তাকে ডেকে আনি।

বললাম, আনো। একটু পরেই আবক্ষদাড়ি এক লাল সন্ন্যাসী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে হাজির। মনে হ'ল সোবিয়েত রাশিয়া থেকে এল নাকি! কারণ তার সব লাল। দাড়ি লাল, মাথার পাগড়ি লাল, জামা জুতো এমন কি ছাতা পর্যন্ত লাল। সে বললে সে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না, তার গুরুজীর বারণ আছে। তবে আমি যদি তাকে কিছু টাকা দি তা'হলে সে শিউজির ভোগ চড়িয়ে প্রসাদ পেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা চাই?

সে আমার পিছন দিকে চেয়ে বললে, দশ টাকা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শোভনলাল দু'হাতে দশটা আঙুল তাকে দেখাচ্ছে। দূর করে' দিলাম লোকটাকে। জিতু জেলেকে আজ দশ টাকা পাঠিয়ে দেব মনুর সেই খোঁড়াকে ভাল করে' খাইয়ে দেবার জন্য।

তৃপ্তি-অতৃপ্তির রহস্য ভেদ করা শক্ত। কাল মালতী সামান্য বেগুন বড়ি আর উচ্ছে দিয়ে শুক্তো রেঁধেছিল। এত ভাল লেগেছিল। আজ সেই মালতীই অনেক রকম মসলা দিয়ে মাংসের কোর্মা রেঁধেছে, রান্না ভালোই হয়েছে, চিরঞ্জীব তো বললে চমৎকার, কিন্তু খেয়ে আমার তেমন তৃপ্তি হ'ল না। কালকের শুক্তোটাই বেশী ভালো লেগেছিল। অথচ আগে এই মালতীরই রান্না কোর্মা কত তারিফ করে' খেয়েছি।

মালতীর রান্না ঠিক আছে। আমিই বদলাচ্ছি। ওস্তাদী গানের চেয়ে সাদাসিধে রামপ্রসাদী গানই বেশী ভালো লাগে আজকাল।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল আজ চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। এক পাউণ্ড কুইনিন সরিয়েছিল। যে বাড়ি থেকে কুইনিন উদ্ধার হয়েছে, সকলের ধারণা ছিল সেটা ওরই বাড়ি এবং বাড়ির কর্ত্রী ওর বউ। এখন শুনছি অন্যরকম। বাড়িটি বেশ্যাবাড়ি এবং ওই মেয়েটি ওর রক্ষিতা। আরও শুনছি হাসপাতালের সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জনটি—যিনি চন্দনফোঁটায় চিতেবাঘটি সেজে রোজ হাসপাতালে আসেন তিনি নাকি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনিই পুলিসে খবর দিয়ে শোভনলালকে এই খপ্পরে ফেলেছেন।

আমি পক্ষপাতহীন থাকবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার মনে মনে ইচ্ছেটা শোভনলাল ছাড়া পাক আর ওই চিতাবাঘটা ফাঁদে পড়ুক। এরকম অবৈধ ইচ্ছে মনে জাগা উচিত নয়, কিন্তু জাগছে। বাইরে কিন্তু একটা ন্যায়পরায়ণতার মুখোশ পরে' আছি। আশ্চর্য!

দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফাটল। আলী বললে, "কুছ্ ফিকির নেই হুজুর, আভি হাম সব ঠিক কর দেতে হেঁ। স্টেপ্নি ঠিক হায়।"

কিন্তু দেখা গেল স্টেপ্নিও ঠিক নেই। এতেও দমল না আলী। বললে—"কুছ্ ফিকির নেই হুজুর, আভি বানা লেঙ্গে। আপ পেড়কা ঠাণ্ডে মে মজেসে বৈঠ যাইয়ে—"

কাছেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়া ছিল। আলী সেখানে আমার বিছানা করে' দিলে একটা। আমি ছায়ায় বসে' বসে' তার চাকা-বদলানো দেখতে লাগলাম।

চাকা-বদলানো কাজটা নিতান্ত সহজ নয়। প্রথমে সে স্টেপ্নির ভিতর থেকে টিউবটা বার করলে। তারপর যেখানে-যেখানে ছ্যাঁদা হয়েছে সেগুলো সলিউশন দিয়ে জুড়ে আবার টিউবটাকে তার ভিতরে পুরে পাম্প্ করতে লাগল। পাম্প্ হ'য়ে গেলে সে বেরুলো ইঁট খুঁজতে। কাছে-পিঠে কোথাও ইঁট ছিল না। সে জঙ্গলের মধ্যে চলে' গেল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। তপ্ত 'লু' বইছে। আলী নির্বিকার। জঙ্গল থেকে খুঁজে ইঁট নিয়ে এল। তারপর 'জক' ফিট্ করে' ফাটা টায়ারটা বার করলে। সেটাকে সরিয়ে দিয়ে স্টেপ্নিটা ফিট্ করতে লাগল।

আমি আলীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। রোগা লোকটা, বয়স হয়েছে, মুখে জরার চিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ওর জীবনচরিতও কিছু কিছু জানি। ও সব রকম কাজ

করেছে। রিক্‌শা চালিয়েছে, টমটম চালিয়েছে, একটা ঘোড়া-গাড়ির কোচোয়ানও ছিল কিছুদিন, মুটেগিরি পর্যন্ত করেছে। বহু জায়গায় ঘুরেছে। বহু মনিবের কাছে মোটরের ড্রাইভারি করেছে। মিলিটারিতে ছিল, দেশ-বিদেশেও ঘুরেছে অনেক। হঠাৎ মনে হ'ল অ্যাব্রাহাম্ লিংকনের মতোই ওর জীবন। কিন্তু ও আব্র্যাহাম্ লিংকন হয়নি কেন? ওর দুটো সংঘাতিক দোষের কথা জানি। প্রথমতঃ, ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে। দ্বিতীয়তঃ, সুযোগ পেলেই মদ খায়। চাকা ফিট করে' আলী বললে— আইয়ে হুজুর, গাড়ি তৈয়ার হ্যায়।" গাড়িতে বসে' আলীকে জিগোস করলাম—"আলী, তুম্ ঝুট্ বাত বোলা হ্যায়—"

"কভি নেহি হুজুর—"

"কভি নেহি বোলো"

"বহুত খু"—

"দারু পিতে হো?"

"কভি নেহি হুজুর"

"কভি নেহি পিও"

"বহুত খু—"

হঠাৎ এই মিথ্যেবাদী মাতালটাকে ভালো লেগে গেল। আব্র্যাহাম লিংকনের চেয়েও!

এই পৃথিবীতেই কি স্বর্গ নরক আছে? মহাপ্রভু সিং এই জীবনেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে দেখতে পাচ্ছি। কিছুদিন আগে যখন জরিপ হয়েছিল তখন মহাপ্রভু সিং আমিনকে মোটা ঘুষ খাইয়ে গঙ্গার ধারের প্রায় তিন মাইল-ব্যাপী জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে অনেক বিধবার, অনেক নাবালকের, অনেক গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জমিও ছিল। জমির দখল নিয়ে মকদ্দমা করবার সামর্থ্য ছিল না বেচারীদের। তাদের নীরবে অশ্রুপাত করে' নিরস্ত হ'তে হয়েছিল। মহাপ্রভু সিং সাড়ম্বরে জমিগুলো ভোগ করছিল। গঙ্গার ধারে বিরাট বাড়ি করিয়েছিল, বাড়ির চারদিকে চমৎকার বাগান। শোনা যায় বাগান আর বাড়ি করতে তার হাজার পঁচিশেক টাকা খরচ হয়েছিল। বাড়িটি যেই শেষ হ'ল অমনি কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'তে হ'ল তাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী না বলে' অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী বলাই উচিত। স্বয়ং মা গঙ্গা এসে হাজির হলেন তার বাড়ির সামনে এবং দিন সাতেকের মধ্যে বাড়ি-বাগান সব গ্রাস করলেন।

মহাপ্রভু সিংয়ের টাকা ছিল, সুতরাং রোখ চড়ে গেল। আর একটা বাড়ি করালো, সেটাও কেটে গেল। উপর্যুপরি পাঁচটি বাড়ি কেটে গেছে তার। শেষ বাড়িটি করিয়েছিল গঙ্গার ধার থেকে তিন মাইল দূরে। কিন্তু মা গঙ্গা তাকেও রেহাই দেননি; সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আমিনকে ঘুষ দিয়ে যে-সব জমি সে দখল

করেছিল, সব গঙ্গাগর্ভে গেছে। মহাপ্রভু সিং এখন একটা খোড়ো ভাড়াটে ঘরে বাস করে। পাঁচ ছেলে ছিল, সব মারা গেছে একে একে। চোখে দেখতে পায় না। একটা পুরনো চাকর তাকে হাত ধরে' ধরে' নিয়ে বেড়ায়। কাল আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসা করবার জন্যে। তার সর্বাঙ্গে কি যেন বেরিয়েছে। দেখলাম, কুষ্ঠ হয়েছে। কথাটা শুনে থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগল। তারপর অজ্ঞান হ'য়ে গেল। নরক কি এর চেয়েও বেশী ভয়ংকর ?

আমার এখানে প্র্যাক্‌টিস বেড়েছে বলে' অনেকের রাত্রে ঘুম নেই, অনেকের টনক নড়েছে, অনেকের চোখ টাটিয়েছে। শুনছি আমার বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত গেছে উপরওয়ালার কাছে। আমি নাকি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে কেবল প্র্যাক্‌টিস করে' বেড়াই। আমি নাকি নিজে বাড়িতে ওষুধ রেখে তা বিক্রি করি।

যে ওষুধ হাসপাতালে নেই বা বাজারে সহজে পাওয়া যায় না, কিংবা যে-সব ওষুধ ইমার্জেন্সীর জন্য হঠাৎ দরকার হয় তা নিজের কাছে রাখবার অনুমতি আমি অনেক আগেই নিয়ে রেখেছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে প্র্যাক্‌টিস করছি এ অপবাদও টিকবে না, কারণ আমি এখানে এসে যতগুলো অপারেশন করেছি এবং রোজ করি, তত আমার আগে আর কেউ করেননি। সুতরাং ওই দরখাস্ত আমার কেশস্পর্শ করতে পারবে না। হৃদয় স্পর্শ করেছে কিন্তু। দরখাস্তকারীদের নাম জানতে পেরে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি। সবই প্রায় বাঙালী এবং অনেকেই আমার কাছে উপকৃত।

ব্যাঙ্কের খাতাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই আজ আলমারির ড্রয়ারগুলো খুঁজছিলাম।

অনেক চিঠি আর পুরনো কাগজপত্রের ভিড়ে যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়লাম। অতীতের পুরনো বন্ধুরা যেন ঘিরে দাঁড়াল আমাকে একসঙ্গে। যারা একদিন কত আত্মীয় ছিল আজ তারা কে কোথায় আছে জানি না। কয়েকজনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। অন্যদের কোন খবরই জানি না। যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন আমার ধোপার নাম ছিল কারু। ছোট একখানা খাতার উপর মনুর হাতের লেখা আছে দেখছি—কারুর হিসাবের খাতা।

মনুর একটা চিঠিও পেলাম। মনু লিখেছে, "তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়। তুমি শরীরের যত্ন কোরো। আজবলালকে বোলো যেন তোমার মোটরের টিফিন কেরিয়ারে রোজ লুচি, তরকারি আর ডিমের ওম্‌লেট করে' দেয়। থারমসে ঠাণ্ডা জলও ভরিয়ে নিও। ঠাকুরপো চিঠি লিখেছে তুমি নাকি সকালে খালি পেটে চা খেয়ে বেরিয়ে যাও, আর ফেরো বেলা দেড়টা দুটোর সময়। অতক্ষণ খালি পেটে থাকলে পিত্তি পড়বে না ? আজবলালকে দিয়ে খাবার করিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেও। বাবা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না এখন, তাই আটকে পড়েছি। কিন্তু তুমি যদি শরীরের উপর অত অত্যাচার

কর তাহ'লে আমাকে বাধ্য হ'য়ে চলে' যেতে হবে। আমার জন্যে ভেবো না। আমার শরীর বেশ ভালো আছে। আমি মরব না। এদেশে মেয়েরা অমর। আমার আশেপাশে রোজ যতগুলি মেয়ে দেখি তাদের অধিকাংশই বিধবা। আমার কিছু হবে না, তুমি ভেবো না। নিজের শরীরের যত্ন কোরো তুমি। আমি বোধ হয় দিন পনেরো পরে যাব। এই সপ্তাহেই যেতাম, কিন্তু বাবা ছাড়ছেন না··· ”

মানুষ যখন ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন তার আত্মপ্রত্যয়ের সীমা থাকে না। কিন্তু মহাকালের বিচারে সব ভবিষ্যদ্বাণী বুদ্বুদের মতো ফেটে যায়। মন্টু আজ কোথায়? শুধু সে যে সশরীরে বেঁচে নেই তা নয়, আমার মনের ভিতরও নেই। তার স্মৃতি ক্রমশঃ ঝাপসা হ'য়ে আসছে। আজকাল কচিৎ তাকে মনে পড়ে।

রেভারেণ্ড টমসনের সঙ্গে আজ দেখা হ'ল। দেখা হ'য়ে কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম। অত বড় বিদ্বান্, অমন শান্ত, অমন নিরহংকার পরোপকারী লোক আমি আর দেখিনি। এক অখ্যাত পল্লীর একপ্রান্তে বাস করেন তিনি একটা মাটির খোড়ো ঘরে। সামনে সামান্য একটু জমি আছে। তারই একাংশ কঞ্চি দিয়ে ঘিরে সামনে একটু শাকসব্জির বাগান তাঁর। নিজেই তার দেখা-শোনা করেন। স্বপাক খান। অতি সাধারণ খাওয়া। ওই শাকসব্জি, ভাত আর একটু দুধ। একটু কথা কয়ে' বুঝলাম জ্ঞানের সমুদ্র। ডাক্তারি শাস্ত্রেও আমার চেয়ে বেশী পণ্ডিত বলে' মনে হ'ল। ক্যানসার সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায়-লেখা একটা বই দেখালেন আমাকে।

আমি তাঁকে বললুম— ফরাসী ভাষা আমি জানি না।

তখন তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করে' করে' কিছু পড়ে' শোনালেন। অত বড় পণ্ডিত লোক, কিন্তু কথায় ব্যবহারে বিনয় যেন বিকীর্ণ হচ্ছে আলোর মতো। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইলেন যেন আমি তাঁর গুরু। তাঁর শোবার ঘরে দেখলাম একটি বড় ক্রশ রয়েছে। তার সামনে বসেই তিনি সকাল-বিকেল প্রার্থনা করেন। কাউকে কখনও ক্রিশ্চান হ'তে বলেন না, বলেন, ভালো হও। তাঁর কাজ হচ্ছে সেবা। অনেকগুলি ছোট ছেলেকে বিনাপয়সায় পড়ান রোজ। কারো অসুখ হ'লে শুশ্রূষা করেন। সাধারণ ওষুধ বিতরণ করেন বিনামূল্যে। কাছে একটা জঙ্গল আছে সেখানে রোজ যান সকালে। নিজের রান্নার জন্যে সংগ্রহ করে' আনেন শুকনো ডালপালা আর সংগ্রহ করেন বট্যানিক্যাল গবেষণার জন্য নানারকম নমুনা। একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরি আর মাইক্রোস্কোপও আছে তাঁর। আর আছে অসংখ্য ভক্ত যারা তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যগ্র, কিন্তু তাদের সাহায্য তিনি কদাচিৎ নেন। তাঁর প্যাণ্টে আর জুতোয় দেখলাম নানারঙের তালি। আসবাবের মধ্যে দুটি কেরোসিন কাঠের টেবিল, গুটি চারেক মোড়া, একটি তক্তাপোশ।

এই সামান্য উপকরণেই তাঁর জীবন সমৃদ্ধ, পরম আনন্দে বাস করছেন মহর্ষির মতো। শুনেছি কোনো এক বিলিতী মিশনারি ফাণ্ড থেকে তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা পান।

তা দিয়ে প্রতিমাসে ওষুধ কেনেন প্রায় কুড়ি টাকার। কুইনিন, অ্যাস্‌পিরিন, সাল্‌ফা ড্রাগস্‌, আইওডিন, স্পিরিট আর ওইজাতীয় সস্তা সাধারণ ওষুধ।

আমাকে ডেকেছিলেন নিজের দাঁত তোলবার জন্য। আমি ফী নিতে চাইলাম না। তখন তিনি বললেন—তাহলে আপনার নামে ৫'০০ টাকা আমি ডোনেশনস্বরূপ নিচ্ছি। ডোনেশনের রসিদ একটা দিলেন আমাকে। একাধারে এত গুণের শোভন সমন্বয় আমি আর দেখিনি।

প্রত্যেক লোকই একটা-না-একটা কিছু অবলম্বন করে' টিকে থাকেন। বাইরের অবলম্বন নয়, মনের অবলম্বন। এই অবলম্বন না থাকলে মানুষ নোঙ্গরহীন নৌকার মতো সংসার-সাগরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। এই অবলম্বনই তাঁর শক্তির উৎস, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র। এই অবলম্বনেরই বোধ হয় অপর নাম অহংবোধ বা অহংকার। কারও জ্ঞানের অহংকার, কারও ধর্মের অহংকার, কারও যশের অহংকার, কারও বা টাকার অহংকার। এই সব নোঙ্গরের সহায়তায় আমরা নিজেদের জীবনকে স্থির রাখবার চেষ্টা করি। যিনি ধার্মিক তিনি ধর্মকে আঁকড়ে থাকেন, যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানকে। যিনি ধনী তিনি মনে করেন টাকার জোরেই তিনি টিকে থাকবেন। আজ কিন্তু নেকিচাঁদকে দেখে মনে হ'ল ধনের নোঙ্গরটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশী অপলকা। একটা বড় ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, নেকিরাম ভিখারীর মতো হাহাকার করে' বেড়াচ্ছে। টাকাই তার সর্বস্ব ছিল, এখন সে নিঃস্ব।

আর মাস দুই পরেই আমাকে রিটায়ার করতে হবে। রিটায়ার করে' কোথায় যাব? কি করব? আমাদের সমসাময়িক অনেকেই রিটায়ার করে' প্র্যাক্‌টিস করতে বসেছেন। এঁদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। আলাপ করে' হতাশ হয়েছি। প্রত্যেকেই দেখলাম আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ, অনেকে আবার বিষকুম্ভ পয়োমুখ। কেউ সুখী নয়। অনেকের ধারণা শহরের লোকেরা তাঁদের যথোচিত মর্যাদা দেয়নি, অনেকের বিশ্বাস তাঁরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে এত অধিক উচ্চস্তরের যে সাধারণ লোক তাঁদের নাগাল পায় না। সুতরাং যতটা প্র্যাকৃটিস হবে তাঁরা আশা করেছিলেন ততটা হয়নি এবং সেজন্য তাঁরা মনে মনে ক্ষুব্ধ. যদিও বাইরে একটা 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব ফুটিয়ে রেখেছেন। শহরের অন্য ডাক্তারদের প্রতি অসীম অবজ্ঞা তাঁদের।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এরকম একটা ভণ্ডামির মুখোশ পরবার ইচ্ছে নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকার জন্যে হায়হায় করবারও প্রবৃত্তি নেই আমার! দরকারও নেই। যা রোজগার করেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু করব কি? চুপ করে' তো বসে' থাকা যাবে না। কিছু একটা করতেই হবে। অনেকের বুড়ো বয়সে ধর্মে মতি হয়। আমার কিন্তু সে মতি এখনও হয়নি। জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি। ডাক্তারি ছাড়া আর কিছুতে প্রবৃত্তি নেই। আর কিছু জানিও না। কিন্তু কোথায়

ডাক্তারি করব! যারা মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে, অ্যাবর্শন করিয়ে, দালালকে কমিশন দিয়ে প্র্যাক্‌টিস জমায়, তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে গুঁতোগুঁতি করতে হবে শেষে? ওদের চেয়েও respectable তথাকথিত অনেস্ট ডাক্তারও যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের সবজান্তা ভাব, তাদের আত্মম্ভরিতা, তাদের আন্তরিকতার অভাব, তাদের মেকি হাসি এবং লেফাপাদুরস্ত ভদ্রতা আরও অসহ্য মনে হয় আমার কাছে।

মনে আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। জীবনের শেষে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে গিয়ে বাস করব, তাদের নিয়েই থাকব। কিন্তু এখন অনুভব করছি আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ আমার আত্মীয় নয়। অধিকাংশই শত্রু। হয় প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে, না হয় মনে মনে বিরুদ্ধভাব পোষণ করে। কাউকে আমি আপন করতে পারিনি। হয়তো এটা আমার নিজেরই দোষ, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বুঝেছি যে ওদের সঙ্গে বাস করা যাবে না। কি করব তাহ'লে? কোন্ তীর্থে গিয়ে থাকব? দু'একটা তীর্থস্থানে ইতিপূর্বে বেড়াতে গেছি। ভালো লাগেনি। সমস্যায় পড়েছি কি করব।

এইখানেই একটা বাড়ি কিনে ফেললাম। বাড়িটার অসুবিধা অনেক। শহর থেকে দূরে। পাড়াটাও ভালো নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড হাতা আছে বাড়িটার চারধারে। হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারব। শহরের মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে' থাকতে পারি না আমি। ক'লকাতায় ওই জন্যেই গেলাম না। সেখানে গিয়ে কিই বা করতুম? তাস খেলা, আড্ডা দেওয়া বা পার্কে চক্কোর দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করার বাতিক আমার নেই। ক'লকাতা একটা সমুদ্র বিশেষ। তার মধ্যে সাপ-হাঙরও আছে, আবার মণি-মাণিক্যও আছে।

অনেকদিন ক'লকাতায় বাস করলে মনের মতো সঙ্গী হয়তো পেতে পারতুম। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ গিয়ে তা পাব না। কিছুদিন আগে ক'লকাতায় গিয়েছিলাম। দেখলাম সব অচেনা। চেনা লোকেরাও অচেনা হ'য়ে গেছে। সবাই নিজের নিজের ঘানিতে বাঁধা, অপরের দিকে তাকাবার কারও অবসর নেই। দেখা হ'লেই মুচকি হাসিটা আর নমস্কারটাও যেন বাঁধা ফরমূলার মতো যন্ত্রচালিতবৎ। প্রাণ নেই, আন্তরিকতার অভাব। এরকম মরুভূমিতে টেকা যাবে না। তাই এখানে থাকাই স্থির করলাম। এখানে অনেককেই চিনি, অনেকে আমাকেও চেনে। এদের মধ্যে থেকেই বাকি জীবনটা কাটাব। পুরাতন উপকরণ দিয়েই নূতন জীবনের রাস্তা একটা তৈরী করতে হবে ভেবেচিন্তে। দেখা যাক কি করতে পারি।

এখানকার স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে পাগল হ'য়ে গিয়েছিল। তাকে রাঁকে নিয়ে যেতে বলেছিলুম, কিন্তু নিয়ে যায়নি। নিয়ে গিয়েছিল এক দেহাতী কবিরাজ বজ্‌রংগী মিশিরের কাছে। বজ্‌রংগী মিশির বেশ কৃতবিদ্য কবিরাজ। কাশীতে অনেকদিন পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু তিনি কবিরাজী প্র্যাক্‌টিস করেন না, করেন চাষবাস।

স্বরূপ পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হয়েছিল। স্বরূপ পাণ্ডেকে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি, কি চান?"

"আমার ছেলে পাগল হ'য়ে গেছে"

"তা আমি কি করব—"

"আপনার কাছে চিকিৎসার জন্যে এনেছি—"

"আমি চিকিৎসা করি না। তাছাড়া এখন আমার ফুরসত নেই, আমার গম দৌনি হচ্ছে—"

"যদি দয়া করে' একবার দেখেন ওকে—"

"আমি দয়া করলে কিচ্ছু হবে না। মহাপাপ না করলে লোকে পাগল হয় না। ভগবান দয়া করলে কিছু হ'তে পারে। আমি দয়া করলে কিছু হবে না।"

"না, তবু কিছু ওষুধ বলে' দিন--"

"পাপের ওষুধ প্রায়শ্চিত্ত। তাই কর গিয়ে—"

স্বরূপ পাণ্ডে বিব্রত হ'য়ে পড়লেন।

তারপর বললেন—"আপনার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। আপনার নাম শুনে এসেছি। এমন করে' তাড়িয়ে দেবেন না।"

"ও, আমার উপর বিশ্বাস আছে নাকি? আচ্ছা, তাহ'লে এক কাজ কর। ওই যে কুয়োটা দেখছ ওর জল তুলে ওকে খাওয়াও আর ওই জলে ওকে চান করাও—"

"আর কোন ওষুধ দেবেন না?"

"ওই ওষুধ।"

এই বলে' মিশিরজী তাঁর ছাতা আর লাঠি নিয়ে মাঠের দিকে চলে' গেলেন। মিশিরজীর বাড়ির চাকর দীনু বললে—"উনি যা বললেন তাই এখন করুন কয়েকদিন। যদি ওই করে' কয়েকদিন টিকে থাকতে পারেন তাহ'লে উনি ভালো ক'রে দেখে ওষুধ দেবেন।"

সাত দিন পরে মিশিরজী বললেন—"আচ্ছা, এবার ওকে আন দেখি।"

প্রায় আধঘণ্টা নাড়ী ধরে' বসে' রইলেন। তারপর ওষুধ দিলেন। স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে ভালো হ'য়ে ফিরে এসেছে।

আমার প্ল্যান ঠিক করে' ফেলেছি। খুব বড় একটা 'স্টেশন ওয়াগন' কিনলাম। তাতে শোবার জায়গা, রাঁধবার জায়গা, এমন কি ছোটখাটো একটা ড্রইংরুমের মতোও আছে। শতকরা আশীটা অসুখ যে-সব সাধারণ ওষুধ দিয়ে সারে সেগুলোও অনায়াসে রাখা যাবে ওতে। প্রচুর জায়গা আছে গাড়িটাতে। ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার হব ঠিক করেছি। গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে ঘুরব। চিকিৎসা করব সাধারণ লোকেদের। চিকিৎসা করব পয়সা রোজগার করবার জন্য নয়, নিজের তাগিদে। কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা না করলে হতাশার কবলে পড়তে হবে না।

চার

মৎস্যব্যবসায়ী আবদুলের বাড়ি শহর থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে। সেখানে একটা খোলার ঘরে সে সপরিবারে বাস করে। ডাক্তার সদাশিবের মোটর তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। আর মোটরটা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একপাল উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে।

সদাশিব রমজুকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বেরিয়ে এলেন খোলার ঘর থেকে। আর তাঁর পিছু-পিছু বেরিয়ে এল এক পলিতকেশা বৃদ্ধা। আবদুলের নানী, অর্থাৎ ঠাকুমা। অনেক শোক পেয়েছে সে। স্বামী পুত্র নাতি নাতনী সবই প্রায় মারা গেছে। বেঁচে আছে কেবল আবদুল আর তার ছেলে রমজু। বুড়ীর পরনের কাপড় ছেঁড়া ময়লা। মুখের ভাবে কোন স্নিগ্ধতা নেই। আছে একটা 'মরিয়া' ভাব। সদাশিব মোটরের ভিতর থেকে কয়েকটি গুলি বার করে' তার হাতে দিয়ে বললেন—"চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবি। দেখি, তোর চোখের খবর কি—"

চোখের পাতা তুলে দেখলেন।

"পাকতে দেরি আছে এখনও। আগামী শীতে কেটে দেব তোর ছানি।"

বুড়ী ঝাঁজিয়ে উত্তর দিলে—'দরকার নেই আমার চোখ কাটিয়ে। পারো তো আমার কান দুটোও কালা করে' দাও। আমি কিছু দেখতেও চাই না, শুনতেও চাই না—"

ডাক্তার সদাশিব বুড়ীর থুতনিটি নেড়ে হেসে বললেন—"এত রাগ কেন নানী? ভগবানকে ভুলে গেছিস্?"

এই কথায় ঝরঝর করে' কেঁদে ফেলল নানী। ময়লা কাপড় দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে—"আমি ভগবানকে ভুলিনি ডাক্তারবাবু, ভগবানই আমাকে ভুলেছেন।"

সদাশিব করুণ দৃশ্য এড়িয়ে চলতে চান।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে বললেন—"আলী, হাজিপুর হাটে চল।"

"বহুত খু"—

পাঁচ

হাজিপুরের হাট প্রকাণ্ড হাট। রাস্তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা গাছ আছে। প্রচুর ছায়া। সেই ছায়াতে টেবিল আর চেয়ার পেতে রোগী দেখছিলেন সদাশিব। একটি ফোল্‌ডিং টেবিল আর ফোল্‌ডিং চেয়ারও থাকে তাঁর মোটরে। রোগী অনেক। অধিকাংশই সাধারণ রোগ। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, চোখ-ওঠা, খোস, দাদ। যক্ষ্মাও আছে দু'একটা।

একটা খাতায় নাম, অসুখের লক্ষণ এবং ওষুধের ব্যবস্থা লিখে নিজে হাতেই ওষুধ দেন সদাশিব। ওষুধের প্রকাণ্ড বাক্স একটা পাশেই থাকে। তাতে খোপ-খোপ করা। কুড়িটি শিশি আঁটে। সব ওষুধই ট্যাবলেট-করা। পুরিয়া-করাও আছে কিছু কিছু। আর আছে ইন্‌জেকশন। সেগুলো আর প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি আলাদা একটা বড় ব্যাগে থাকে। স্টেথোস্কোপ, ব্লাড-প্রেসার মাপবার যন্ত্র, থার্মোমিটার, ছোট একটা মাইক্রসকোপ, স্লাইড, স্টেন এই সব। দরকার বুঝলে ওই গাছতলায় বসেই রক্ত, প্রস্রাব, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা করে' নেন সদাশিব। আর একটা তালাবন্ধ বাক্সও থাকে তাঁর পিছন দিকে। সেটার ডালার উপরে লম্বাটে গোছের ছিদ্র আছে একটা। তাতে ওষুধের দাম বাবদ যে যা খুশি দিতে পারে। কারো কাছে তিনি দাবি করেন না কিছু, যার যা খুশি দেয়। কেউ যদি না-ও দেয় আপত্তি করেন না সদাশিব।

তিনি এই বাক্সের ব্যবস্থা করেছেন কারণ অনেক লোক বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করাতে চায় না। আত্মসম্মানে বাধে। তাঁদের সম্মান বাঁচাবার জন্যেই এই বাক্সটি। বাক্সে যে পয়সা রোজ পড়ে তাতে ওষুধের দাম তো উঠে যায়ই, পেট্রোলের দামও উঠে যায়।

সদাশিব রোগী-দেখা শেষ করে' উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি রোগা আধ-ঘোমটা দেওয়া মেয়ে এগিয়ে এসে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে পড়ল।

"এ কে—"

পাশেই একটা ট্যারা লোক দাঁড়িয়েছিল, সে অকারণে একটু হেসে বললে—"ও কেব্‌লী।"

"কি চায়—"

"ওর 'আদমি'কে থানায় ধরে' নিয়ে গেছে। দারোগাবাবু আপনাকে খাতির করেন, আপনি যদি বলে' দেন একটু ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"হঠাৎ থানায় ধরে' নিয়ে গেল কেন?"

"ছবিলাল মোড়লের বাড়ি চুরি হয়েছে। তিনি ওর নাম বলে' দিয়েছেন দারোগাবাবুকে—"

"ওর নামই বা বলতে গেলেন কেন শুধু শুধু।"

"কি জানি। কেব্‌লি বলতে পারবে—"

কেব্‌লী থেমে থেমে বললে—"ছবিলালবাবু আমার 'আদমি'কে তাঁর খাপরার ঘর ছেয়ে দিতে বলেছিলেন। গতবার মজুরি দেননি বলে' এবার ও যায়নি। তাই উনি আমার এই সর্বনাশ করেছেন।"

কেব্‌লী কাঁদতে লাগল।

সদাশিবকে বলতে হ'ল—"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে' দেখব।"

সদাশিব তারপর হাটের ভিতর ঢুকলেন। কিছু কিনতে হবে। প্রতি হাটেই কিছু-না-কিছু কেনেন তিনি। তাঁর সংসারে খাবার লোক কেউ নেই, তবু কেনেন। এর

জন্যে মালতীর কাছে বকুনি খেতে হয়। মালতী বলে—"এত সব খাবে কে। ঘরে পড়ে' শুকোবে, না হয় পচবে!" সদাশিব হেসে উত্তর দেন—"খাবার লোকের কি অভাব আছে। দাই, চাকর, তাদের ছেলেমেয়েরা, ভিকিরি—সবাইকে খাওয়াও না।" "অত ঝক্কি আমি পোয়াতে পারব না"—মালতী বলে বটে, কিন্তু পোয়াতে হয়। রোজই বাড়িতে আট-দশটা পাতা পড়ে। আজবলাল এতে মনে মনে খুব খুশি হয়, কিন্তু মুখে গজগজ করে। বলে—"একি বাজে খরচা!"

হাটে ঢুকেই সদাশিবের দেখা হ'ল বিলাতী সাহের সঙ্গে। চালের বড় ব্যবসাদার। চক্‌চকে টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। ফতুয়া একটা পরেছে বটে, কিন্তু ভুঁড়ি ঢাকেনি। ভুঁড়ো নাক, নাকের নীচে কটা রঙের সামান্য গোঁফ। বেশ ভারী মুখ। হাসলে এবড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ে। সদাশিবকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলে বিলাতী সাহ।

"কেমন আছ বিলাতী?"

"হুজুরকা কিরপা। চলে' যাচ্ছে।"

"আমার জন্যে চাল রেখেছ?"

"ভালো চাল এলে নিজেই পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা।"

এগিয়ে গেলেন সদাশিব তরকারির বাজারের দিকে।

কয়েকটি বড় কুমড়ো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কুমড়ো তিনি খান না। কিন্তু কুমড়োগুলোর নধর চেহারা দেখে কিনতে প্রবৃত্ত হলেন। যে বুড়ী কুমড়ো বিক্রি করছিল সে যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেল। বেশ বড় দেখে ভালো একটা কুমড়ো বেছে দিয়ে বললে—

"এইঠো লে যা বেটা—"

"দাম কত?—"

বুড়ী দেহাতী হিন্দী ভাষায় বললে—"তোর যা খুশি তাই দে—"

সদাশিব তাকে দুটো টাকা দিলেন।

"ওত্‌না দাম নেই হোতে, আট আনা দে—"

সদাশিব হেসে বললেন তিনি কুমড়োর দাম দিচ্ছেন না, তিনি টাকাটা দিচ্ছেন তার মেয়ে রৌশনকে। বছরখানেক আগে বিধবা হয়েছিল সে।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "রৌশনকে দেখছি না, সে কোথা?"

"তার আবার বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু। জোয়ান মেয়েকে কতদিন আর ঘরে রাখব।"

"বেশ করেছিস।"

সদাশিবের সম্মতি পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল বুড়ি।

তারপর সদাশিব অগ্রসর হলেন মাছের বাজারের দিকে। ভালো মৌরলা মাছ ছিল। তাই কিনলেন কিছু। মাছের বাজারে দেখা হ'ল বাবুলাল মেথরের সঙ্গে।

"তোর এ বউ কেমন হ'ল?"

একটু সলজ্জ হাসি হেসে বাবুলাল বলল—"ভালোই তো মনে হচ্ছে—"

"রাধিয়ার সঙ্গে মারপিট করছে না তো !"

"না। দুজনে খুব ভাব।"

প্রথম বউ রাধিয়ার ছেলে হয়নি বলে' বাবুলাল আর একটি বিয়ে করেছে। বাবুলালই মৌরলা মাছগুলি তার গামছায় বেঁধে নিয়ে মোটরে পৌঁছে দিয়ে এল।

একটা ফেরিওলা লাল-নীল কাগজের তৈরী পাখী বিক্রি করছিল। পাখীর পিঠে লম্বা রবারের সরু ফিতে আটকানো। ফিতে ধ'রে নাড়ালে পাখী নাচে। কয়েকটা কিনলেন সদাশিব। 'কেঁদ্' বলে' একরকম ফল বিক্রি হয় এদেশে। কালচে-কমলা রং। খেতে মিষ্টি। একটি লোক এককোণে কয়েকটি 'কেঁদ্' নিয়ে বসেছিল। সদাশিব সেগুলিও কিনে নিলেন। কিছু তরি-তরকারিও কিনলেন। দোকানদাররাই সে-সব পৌঁছে দিয়ে এল তাঁর গাড়িতে।

হাট থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন থানায় সিংহেশ্বর সিং দারোগার কাছে। নাম যদিও সিংহেশ্বর কিন্তু দেখতে জিরাফের মতো। ছিপছিপে রোগা, ঘাড়টা খুব লম্বা। গালে মুখে চোখের কোলে ধবল হয়েছে। সদাশিবই চিকিৎসা করছেন তাঁর। কথা বলার ধরনটা একটু বেশী রকম উচ্ছ্বসিত।

"আইয়ে আইয়ে ডাক্‌টার সাব। কেয়া সৌভাগ্য, কেয়া সৌভাগ্য—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন এবং একটু ঝুঁকে সদাশিবের হাত দুটি ধরে' বললেন,—"আইয়ে, আইয়ে, আইয়ে—"

"কি খবর ! ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার হ'ল ?"

"দো একঠো সাদা দাগকা বিচ্‌মে তো রং লগা হায়।"

"তাহ'লে আস্তে আস্তে সারবে। সময় নেবে কিছু। আমি একটা অন্য দরকারে এসেছি। এখানকার নারাণ বলে' একটা লোককে আপনি ধরে' এনেছেন—"

"হ্যাঁ।"

তারপর তিনি যা বললেন কেব্‌লী তা আগেই তাঁকে বলেছিল। ছবিলাল মোড়লের নির্দেশ অনুসারেই নারাণকে ধরতে হয়েছে।

"নারাণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে ?"

"না। এন্‌কোয়ারি চল রহা হা—"

"ওকে ছেড়ে দিন। ও নির্দোষ।"

গম্ভীর হ'য়ে গেলেন সিংহেশ্বর। সরু গোঁফের উপর আঙুল বুলোতে লাগলেন। হাঁটু নাচালেন বারকয়েক। তারপর বললেন—"আপ যব কহ্‌তে হেঁ তব জরুর দেঙ্গে—"

তারপর তাঁর লম্বা গলাটা বেঁকিয়ে সদাশিবের কানে কানে বললেন, ছবিলাল-বাবুকেও যদি সদাশিব অনুরোধ করতেন তা'হলে তাঁর পক্ষে সুবিধা হ'ত। সদাশিব বললেন—"ছবিলাল লোকটা সুদখোর মহাজন। ওর সঙ্গে আমার তেমন আলাপও নেই।"

সিংহেশ্বর এর উত্তরে হিন্দীতে যা বললেন তার বাংলা মর্মার্থ—"আলাপ করে' রাখুন, আখেরে কাজ দেবে। উনি কংগ্রেসীদের পাণ্ডা, তারপর হরিজন, ওঁর একটা বাজেমার্কা ছেলে কেবল শিডিউল্‌ড্‌ কাস্ট বলে' ভালো চাকরি পেয়েছে। ওই চাকরি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভালো ভালো ছেলেরা পায়নি। ওদেরই এখন প্রতাপ খুব—আলাপ করুন ওর সঙ্গে।"

সদাশিব চুপ করে' রইলেন।

তারপর বললেন—"আপনি নারাণের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ না পান, ছেড়ে দিন। দেবেন তো?"

"আপনি যখন বলছেন তখন দেব। কিন্তু ছবিলালজী ওর উপর চটেছেন কিনা, তাই একটু 'খতরা' আছে,—দেখি।"

তারপর সিংহেশ্বর তাঁর ছোট ছেলে 'মুন্না'কে এনে দেখালেন। সর্বাঙ্গে খোস হয়েছে। তাকে ওষুধ দিয়ে চলে' গেলেন সদাশিব।

সেদিন সদাশিব তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন—

"ইংরেজদের হাত থেকে শাসনভার আজকাল যাঁদের হাতে গেছে তাঁরা শুধু যে অকর্মণ্য তাই নন, তাঁরা অসাধুও। এঁদের শাসনকালে দেশের সত্যিকার উন্নতি কিছু হয়নি। স্কুল-কলেজে ছেলেদের শিক্ষা হয় না। তারা গুণ্ডা হচ্ছে। শিক্ষকদের মারে, ভদ্রলোকদের হুমকি দেয়, মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় অপমান করে, বিনা টিকিটে ট্রেনে বাসে চড়ে। পুলিস এদের কিছু বলে না। যদি কোন পুলিস বলে তাহ'লে তারই সাজা হয়, এদের হয় না। কর্তৃপক্ষ এদের তোয়াজ করেন, কারণ ইলেকশনের সময় এদের উপরই ভরসা তাঁদের। বাজারে খাদ্যদ্রব্য এত দুর্মূল্য যে সাধারণ লোক তা কিনতে পারে না। দুধ মাছ মাংস ডিম খুব কম লোকে খায়। চাল ডাল তরি-তরকারিও এত দুর্মূল্য যে পেট ভরে' খেতে পায় না। অথচ শোনা যায় নাকি সদাশয় গভর্নমেণ্ট চাষের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। টাকা খরচ হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে টাকা ঢুকছে তাঁদের পেটোয়া লোকদের পেটে।

"এখানে একটা পোল্‌ট্রি ফার্ম আছে। সেখান থেকে সাধারণ লোকে মুরগী বা ডিম পায় না। সেখানকার একজন কর্মচারী বলেছিলেন—'অফিসার আর মিনিস্টাররা সব মুরগী আর ডিম নিজেরা খেয়ে ফেলেন। পাব্‌লিককে দেবার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকলে তো দেবে!' বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ধার করে' এনে যে-সব বড় বড় কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে এদেশে সে-সবের মধ্যেও চুরি-জোচ্চুরি এবং পেটোয়া-পোষণের ধূম পড়ে' গেছে নাকি। আসল কাজ যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি।

"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিজন আর শিডিউল্‌ড্‌ কাস্টের লোকেদের পোয়া বারো হয়েছে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা নিষ্পিষ্ট হ'য়ে মারা যাচ্ছে। তাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছেন ওঁরা। মুসলমান আমলে ফারসী আদালতের

ভাষা ছিল, ইংরেজদের আমলে ছিল ইংরেজী—এঁদের আমলে এঁরা করেছেন হিন্দী। অন্যান্য ভাষাকে পিষে হিন্দীর জগদ্দল রোলার চালিয়েছেন এঁরা। সাধারণ স্কুলে ইংরেজী অবহেলিত হচ্ছে। কিন্তু মিনিস্টারদের ছেলেরা বিলাতী স্কুলে, কনভেণ্টে, কিণ্ডারগার্টেনে ইংরেজী ঠিক শিখছে। কারণ তারা জানে যে ইংরেজী না জানলে আধুনিক জগতে এক পা-ও চলা যাবে না। তারা চলবে, কিন্তু পিছনে পড়ে' থাকবে হতভাগ্য তারা যারা হিন্দী ছাড়া আর কিছু শেখেনি।

"আমাদের স্বাধীন ভারতে আর একটা ব্যাপারও হচ্ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লোপ করে' দেবার চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষরা। তারা শিক্ষা পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না। নানা অজুহাতে—কখনও জমিদারপ্রথা লোপ করে', কখনও বা জমির সিলিং করে' —তাদের বিষয়-সম্পত্তিও সরকার বাজেয়াপ্ত করছেন। মজুরদের মাইনে বা মজুরি সাতগুণ আটগুণ বেড়েছে—কিন্তু শিক্ষকদের, ডাক্তারের, কেরানীর, এমন কি গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনও সে অনুপাতে বাড়েনি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরাই এই সব কর্মে নিযুক্ত। এদের কারও চিত্তে সুখ নেই। সবাই মনে মনে গোমরাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ভুলে গেছেন যে স্বাধীনতা-সুখ আজ তাঁরা রাজার মতন ভোগ করছেন সে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই ছেলেরা। তাদের ত্যাগ, তাদের আত্মবলিদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষেরা সে ঋণ সম্বন্ধে উদাসীন।

"প্রাদেশিকতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতি প্রদেশে। প্রতিটি প্রদেশই ছোট ছোট পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। সবাই সবাইকে হিংসা ও ঘৃণা করে।

"আমাদের কর্তৃপক্ষদের আজকাল প্রধান কাজ হচ্ছে বিদেশী তোষণ। রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের নেতারা প্রায়ই এদেশে আসছেন, মালা পরে' খানা খেয়ে রাস্তার দু'পাশে হুজুকে বেকার লোকদের ভিড় দেখে চলে' যাচ্ছেন এবং এই মহৎ কর্মের জন্য আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতাকে নিরাপদ করবার জন্যে শক্তিশালী বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখা হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা মূলতঃ নির্ভর করে দেশের লোকের সদিচ্ছা এবং চরিত্রবলের উপর। এই কথাটা কর্তৃপক্ষেরা ভুলে গেছেন।

"আমি নানা স্থানে ঘুরি, নানা স্তরের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়, বর্তমান গভর্নমেণ্টের উপর কাউকে সন্তুষ্ট দেখি না। ধনী দরিদ্র সবাই এই শাসনব্যবস্থার উপর চটা। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে—এবং অনেক স্থলেই তা অমূলক নয়—যে আমাদের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে যাঁরা অবস্থান করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অপদার্থ, স্বার্থপর এবং অসাধু। তাঁরা অসাধু বলেই তাঁরা দেশের অসাধুতা নিবারণ করতে পারছেন না, তাঁদের কথা মানছে না কেউ। সুতরাং চোর ডাকাত জুয়াচোর কালোবাজারীতে দেশ ভরে' যাচ্ছে।

"ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতারও প্রধান কারণ তাদের সামনে নির্মল-আদর্শনিষ্ঠ কোন নেতা

নেই। নেতারা তোতাপাখীর মতো যে-সব বুলি আওড়ান কার্যকালে ঠিক তার উল্টো কাজটি করেন। সুতরাং তাঁদের কথায় কারও আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস সামনে ভালো আদর্শ থাকলে এই ছেলেরাই অন্যরকম হ'ত।

"ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায় অসাধুতা-অপটুতা-আত্মম্ভরিতার রাজত্ব বেশীকাল টেকে না। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা ভাবলে ভয় হয়। দুঃখও হয়। কোন অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে এগুচ্ছি আমরা!

ছয়

সকাল নটা নাগাদ সদাশিবের মোটর যথারীতি বাজারের সামনে দাঁড়াল। সারি সারি মুরগীগুলো বসেছিল তাদের ঝাঁকা নিয়ে। তারা সাধারণতঃ পথের ধারেই বসে। সদাশিবকে দেখে দু'একজন সেলাম করে' দাঁড়াল।

সদাশিব আলীকে বললেন—"আলী, কয়েকটা ভালো মুরগী বেছে নাও তো।"

"বহুত খু"—

সদাশিব বাজারের ভিতর ঢুকলেন।

আবদুলের মুখ উদ্ভাসিত, তার ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে। সে বললে কিছু বড় বড় মাগুর মাছ সে তাঁর জন্যে কিনে রেখেছে। চারটে মাগুর মাছের ওজন হয়েছে সওয়া সের।

"কোথা আছে সেগুলো—"

"আলাদা হাঁড়িতে করে' গুদামে রেখে দিয়েছি—"

"আমার গাড়িতে দিয়ে আয়।"

ঘাড় ফিরেই সদাশিবের দৃষ্টি পড়ল একটি নবাগত ভদ্রলোকের দিকে। অত্যন্ত মোটা। একটা হিপোপটেমাস যেন মনুষ্যমূর্তি ধারণ করেছে। তাঁর মাছ কেনবার ধরন দেখে বিস্মিত হলেন সদাশিব। এক মেছুনী কতকগুলো ছোট মাছ বিক্রি করছিল। তিনি মাছের স্তূপের ভিতর থেকে একটি ছোট মাছ লেজ ধরে' তুললেন।

"এটার কত দাম নিবি? এক পয়সা?"

"ওই একটা মাছই নেবেন আপনি!"

মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে মেছুনি। নাম ছিপলী। সদ্য যৌবনোদ্গম হয়েছে তার। কথায় কথায় হাসে।

হিপো বললেন—"হ্যাঁ। একটাই নেব—"

"নিয়ে যান। ওর আর দাম দিতে হবে না।"

অম্লানবদনে তিনি মাছটি মাছের থলিতে পুরে ফেললেন। হেসে লুটিয়ে পড়ল মেছুনীটা। হিপো আর একটা মেছুনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে-ও ছোট মাছ বেচছিল। সেখান থেকেও একটি ছোট মাছ বেছে তুললেন তিনি।

"এটার কত দাম নিবি? এক পয়সা?"

এ মেছুনীটা বুড়ী। হিপোর কাণ্ড দেখে চটে' গেল সে। বললে—"একটা মাছ আমি বেচব না। আধ পোয়া নিতে হবে অন্ততঃ—"

"কিন্তু তোর সব মাছ তো টাটকা নয়। বাসী মাছও মিশিয়ে দিয়েছিস অনেক—"

বুড়ী চুপ করে' রইল, কোন জবাব দিল না।

"আচ্ছা, দু'পয়সা দিচ্ছি, দিয়ে দে মাছটা।"

বুড়ীর চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলে' উঠল। মাছটা ছুঁড়ে দিলে হিপোর দিকে। হিপো দুটো পয়সা দিয়ে গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন আর একটা মাছের দোকানে। এ দোকানদারও একটা মাছ বেচতে রাজী হ'ল না। ঝাঁকড়া-গোঁফ ভগলু মহলদার রসিক লোক। সে হাসিমুখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত হিপোর দিকে, তারপর দু'হাত তুলে নমস্কার করল।

"দিবি না মাছটা?"

"একটা মাছ বিক্রি করি না। আপনার মতো লোককে ভিক্ষে দিতেও সাহস পাচ্ছি না। কি করব ভাবছি।"

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে চোখের ইঙ্গিত করতেই ভগলু মাছটা দিয়ে দিলে হিপোকে। ডাক্তারবাবুকে অমান্য করবার সাহস হ'ল না তার। হিপো আর একটা দোকানে গিয়ে আর একটা ছোট মাছ চার পয়সা দিয়ে কিনলেন। এই মেছোটা মোচড় দিয়ে বেশী একটু দাম নিয়ে নিলে।

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

"নমস্কার। আপনাকে তো এর আগে দেখেছি বলে' মনে পড়ছে না—"

"নমস্কার। আমি এখানে থাকি না। চেঞ্জে এসেছি—"

"ও। কোথায় আছেন?"

"ঘোষ-নিবাসে।"

"ও, তাহ'লে তো আমার বাড়ির কাছেই!"

"আপনার পরিচয়টা দিন—"

"আমি রিটায়ার্ড ডাক্তার একজন। এখানেই একটা বাড়ি কিনে বাস করছি—"

"ও তাহ'লে আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে তো সুবিধেই হ'ল। আমি ডায়াবিটিস্ রুগী মশাই। তার উপর বাত। ডাক্তার বলছে ছানা খেতে আর ছোট মাছ। ভাত রুটি বন্ধ—"

"কিন্তু আপনি তো মাত্র চারটি ছোট মাছ কিনলেন—"

"বেশী নিয়ে কি করব। নিজে হাতে কুটতে হবে, নিজে হাতে রাঁধতে হবে। তাছাড়া একটু পচা বা দো-রসা হ'লে আর খেতে পারি না। তাই খুব বেছে বেছে কিনতে হয়—"

"আপনি একাই এসেছেন?"

"দোকা আর পাব কোথা! আমাকে ফেলে সবাই যমের বাড়ি চলে' গেছে। বউ ছেলে মেয়ে সব—"

হিপোর চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত তিনি নিষ্পলক হ'য়ে চেয়ে রইলেন সদাশিবের মুখের দিকে। অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন তিনি। তারপর বললেন, "আচ্ছা, আমি আপনার টাটকা মাছের ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি। এই ভগলু—"

ঝাঁকড়া-গোঁফ ভগলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—"জি হুজুর—"

"এই বাবুর জন্যে রোজ চার-পাঁচটা টাটকা মাছ আলাদা করে' রেখে দিও।"

"চেষ্টা করব হুজুর। তবে আমি তো মাছ পাইকারদের কাছ থেকে কিনি, সব সময় টাটকা মাছ পাই না—"

সেই হাসিমুখী তরুণী মেছুনীটি এগিয়ে এল। বললে—"আমি গঙ্গার ঘাট থেকে মাছ আনি। আমি রেখে দেব রোজ—"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার।"

কোনক্রমে দেহভার বহন করে' ভিড় ঠেলে ঠেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

"এই যে ডাক্তারবাবু! গুড্ মর্নিং। বাজারের সব মাছ কিনে ফেললেন নাকি! আমাদের জন্যে কিছু অবশিষ্ট আছে তো—"

পি. ডব্লিউ. ডি. আফিসের কেরানী খগেন সরখেল। হিংসুকে লোক। সদাশিব যে রোজ এত মাছমাংস কেনেন এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। দেখা হ'লে প্রায়ই যে-সব মন্তব্য করেন তাতে একটু খোচা থাকে। সদাশিব গ্রাহ্য করেন না এসব। প্রায়ই মুচকি হেসে তাঁর কথার জবাব দেন।

"কি মাছ কিনলেন আজ?"

"মাগুর।"

"মাগুর? কই, মাগুর তো কোথাও দেখলাম না। পেলে নিতাম কিছু।"

"নিন না। আমি যেগুলো নিয়েছি সেগুলো আপনিই নিয়ে যান। আমি অন্য মাছ নিচ্ছি। আবদুল, বাবুকে মাগুর মাছগুলো দিয়ে দাও।"

আবদুল বললে—"আচ্ছা। তিন টাকা করে' সের। সওয়া সের আছে। আপনি কিসে করে' নেবেন?"

অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন খগেন সরখেল।

"না না, আপনার মুখের গ্রাস আমি কাড়ব কেন। আপনিই নিয়ে যান। আমি আর একদিন কিনব।"

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিলেন তিনি।

সদাশিব বেরিয়ে আসছিলেন এমন সময় সেই হাসিমুখী তরুণীটি অপাঙ্গে সলজ্জভাবে চাইলে তাঁর দিকে এবং মৃদুকণ্ঠে বললে—"বাবু—"

মনে পড়ে' গেল সদাশিবের।

"হ্যাঁ, তোর জন্যে ওষুধ এনেছি। গাড়িতে আছে। চল দিয়ে দিচ্ছি—রোজ তিনটে করে' খাবি।"

প্রতি মাসে 'মাসিক'-এর সময় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে সে। লজ্জায় অনেকদিন গোপন করে' ছিল। কিন্তু শেষে আর পারেনি। অনেকদিন চোখ নিচু ক'রে অনেকবার ঘাড় ফিরিয়ে ব্যক্ত করেছে সদাশিবের কাছে।

মাছের বাজার থেকে বেরোবার মুখেই আবার থমকে দাঁড়াতে হ'ল সদাশিবকে। তিনি দেখলেন, জগদম্বা জেলে চায়ের দোকান করেছে। চেহারাই বদলে গেছে তার। মাথায় টেড়ি, কানে বিড়ি গোঁজা। পরনে হাওয়াই শার্ট। চায়ের দোকানে সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবি। একটা বড় কাচের 'জারে' রঙিন মাছ রেখেছে।

"কিরে জগদম্বা, মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলি ?"

"ওতে পোষায় না হুজুর। তাছাড়া বড় গন্দা (নোংরা) কাজ। রোজগার হয় না। সব লাভ পাইকার আর গুদামওলা টেনে নেয়।"

আবদুল মাছের হাঁড়ি নিয়ে সঙ্গে আসছিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলল—"জগদম্বা চিরকালই একটু শৌখিন। বেশী পয়সা থাকলে ও আতরের দোকান খুলত।"

জগদম্বা এতে চটল না। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে চেয়ে রইল আবদুলের দিকে। জগদম্বার বয়স বেশী নয়, ত্রিশের মধ্যেই। সদাশিবের মনে পড়ল কিছুদিন আগে তার বউ বাপের বাড়ি চলে' গিয়েছিল আর ফেরেনি। সদাশিবের একবার ইচ্ছে হ'ল তার বউয়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এত লোকের সামনে সেটা অশোভন হবে ভেবে আর করলেন না।

মোটরের কাছে কয়েকজন রোগী দাঁড়িয়ে ছিল। সদাশিব তাদের বললেন—"আজ বিকেলে হাটে যাব। সেইখানেই তোমরা যেও। ওই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভালো করে' দেখতে পারব না তোমাদের। এই ছিপলী তোর ওষুধ নিয়ে যা—"

সেই তরুণী মেয়েটি এসে ওষুধ নিয়ে গেল। মোটরের কাছে আরও চার-পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে। বাজারে ঝাঁকা-মুটের কাজ করে। তাদের গায়ের জামা কাপড় ফরসা, মাথায় চুল আঁচড়ানো। ঝাঁকা-মুটেদের সাধারণতঃ এরকম হয় না। তারা হাসিমুখে সবাই সদাশিবকে সেলাম করে' ঘিরে দাঁড়াল।

"ও তোরা এসেছিস ? বাঃ, কাপড় জামা তো বেশ পরিষ্কার হয়েছে ! দেখ্ তো, সাজিমাটিতে কেমন সুন্দর পরিষ্কার হয়। দেখি তোর দাঁত ?"

সবাই তাদের দাঁত দেখাল। সদাশিব তাদের চোখও দেখলেন।

"ঠিক আছে—"

চারটি করে' পয়সা দিলেন প্রত্যেককে। তাছাড়া হাট থেকে যে কেঁদ্ আর কাগজের পাখী কিনেছিলেন তা-ও উপহার দিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখাবার জন্য সদাশিব এই ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করেন মাঝে মাঝে। অতি সামান্যই খরচ হয় এতে ; কিন্তু এর পরিবর্তে যে আনন্দ পান তা অসামান্য।

আলী এসে মৃদুকণ্ঠে বললে—"চারঠো মুরগি লিয়া হুজুর।"

"ভালো দেখে নিয়েছ তো?"

"জী হুজুর, সব তৈয়ারী পাট্‌ঠা হ্যায়।"

মুরগিওলা রহমান বললে—"পছ্‌ছিম মু হোকে বোলতে হেঁ হুজুর, সব মুরগি আচ্ছা হায়। খাবার হোনে সে জুতা মারিয়ে গা।"

সদাশিব হেসে বললেন—"যদি ঠকাও তোমার খোদাই তোমাকে জুতো মারবে। আমি কেন জুতো মারতে যাব তোমাকে শুধু শুধু—"

আলী বললে—"বেশক্।"

সদাশিব জিজ্ঞাসা করলেন—"মুরগির দাম কত?"

রহমান বললে সে পশ্চিমমুখে দাঁড়িয়ে 'কসম' খেয়ে সত্যি কথা বলছে, সওয়া দু'টাকা করে' খরিদ, এখন হুজুরের যা মরজি।

আবদুল মাছের হাঁড়ি গাড়িতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। সে আলীকে বললে, "ঘুরা দিজিয়ে মুরগি। দেড় দেড় রুপিয়া মে ইস্‌সে আচ্ছা মুরগি হাম লান্ দেঙ্গে।"

সদাশিব বললেন, "না না, গরীব মানুষের আমি লোকসান করাতে চাই না। ওই বলুক না কি হ'লে ওর পোষায়।"

রহমান মাথা চুলকে বললে—"হুজুরকা যেইসে মেহেরবানী। আপকা বাত সে বাহার হাম নেহি যাঙ্গে—"

শেষকালে এক টাকা দশ আনায় রফা হ'ল। রহমান দাম নিয়ে টাকা-পয়সাগুলি তার কোমরে-বাঁধা গেঁজেতে পুরে শেষে বললে, "মাস দুই থেকে আমার ছোট ছেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে ডাক্তারবাবু, যদি কোন দাবাই দেন গরীবের উপকার হয়।"

"কোথা বাড়ি তোমার?"

"হবিগঞ্জ।"

"আমি তো হবিগঞ্জের হাটে যাই। সেইখানেই নিয়ে এস তোমার ছেলেকে। নাকটা দেখে ওষুধ দেব।"

মুরগিওলা রহমান সেলাম করে' বললে—"হুজুরকা মেহেরবানী। মুলাকাৎ করেঙ্গে হাটিয়ামে।"

সদাশিব বললেন—"আলী, চল এবার কমলবাবুর কারখানায়। কমলকে আজ খেতে বলব। আর গাড়ির কারবুরেটারটাও একবার দেখিয়ে নেব।"

"বহুত খু—"

কমলের কারখানায় ঢুকতেই কমলের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল। "পাগল করে' দেবে আমাকে। এই মুন, আমার ড্রয়ার থেকে প্যাঁচকস্ কে নিয়েছে? কতবার মানা করেছি তোমাদের যে আমার ড্রয়ার থেকে প্যাঁচকস্ নিও না কেউ—"

সদাশিবকে দেখেই শান্ত হ'য়ে গেল কমল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"প্যাঁচকস্ হারালে নাকি—"

"কেউ টপিয়ে দিয়েছে। আসল পাকা স্টীলের জিনিস—"

কমলরা বিহারে চার পুরুষ ধরে' আছে। বিহারেই তার জন্ম। সুতরাং ভাষার মধ্যে অনেক হিন্দী কথা ঢুকে গেছে। তাই 'হাতিয়েছে' না বলে' 'টপিয়ে দিয়েছে' বলল।

"গাড়ি ঠিক চলছে তো?"

"মাঝে মাঝে হাঁচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে 'কারবুরেটারে' ময়লা জমেছে বোধ হয়। তোমার কি সময় আছে এখন? খুলে দেখবে কি?"

"হ্যাঁ। এখনি করে' দিচ্ছি। এই ফালতু, ডাক্তারবাবুর গাড়ির 'কারবুরেটার'টা খোল্—"

ফালতুর আসল নাম তমিজুদ্দিন। কমল ওর নামকরণ করেছে 'ফালতু', কারণ যখন ও অ্যাপ্রেন্টিস্ হয়ে কারখানায় ঢুকেছিল তখন বাড়তি (extra) লোক হিসেবে নিয়েছিল ওকে কমল। ফালতুর বয়স ষোল-সতরো। খুব রোগা আর লম্বা। যদিও সর্বাঙ্গ কালি-ঝুলি মাখা, তবু বেশ বোঝা যায় যে ওর রং খুব ফরসা। মুখের মধ্যে একটা শিশু-সুলভ সারল্য, চোখ দুটিতে চাপা হাসি চিক্‌মিক্ করছে সর্বদা। সে সোৎসাহে কারবুরেটার খুলতে লাগল। সে জানে এর জন্যে ডাক্তারবাবু কোন-না-কোন সময়ে তাকে কিছু দেবেন। মাস দুই আগে একটা হাফপ্যান্ট কিনে দিয়েছেন।... মুরগিগুলো কঁ্যাক্-কঁ্যাক্ করে' ডেকে উঠল কেরিয়ারের মধ্যে।

কমল হেসে জিগ্যেস করল—"কত করে' কিনলেন মুরগি—"

"ওহো, বলতেই ভুলে গেছি। তুমি আজ রাত্রে খেও আমার ওখানে।"

"আচ্ছা। আমার কিন্তু আজ যেতে রাত হবে একটু। সাড়ে ন'টা—"

"বেশ—"

"বসুন—"

চেয়ার এগিয়ে দিলে কমল।

"কাজকর্ম কেমন চলছে—"

"ভালোই চলছে আপনার আশীর্বাদে—"

"হরেক রকমের গাড়ি তো অনেক জমিয়েছ দেখছি—"

"হ্যাঁ, তা জমেছে। কতকগুলো গাড়ি জমেই আছে। আর নড়ছে না—"

"কেন বল তো—"

কমল মুচকি হেসে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তত্ত্বকথা বলে' ফেলল।

"গাড়ির পেছনে যে মানুষ আছে তারই উপর নির্ভর করে সেটা। তারা গাড়ি না নিয়ে গেলে গাড়ি যাবে কি করে'!"

'নিচ্ছে না কেন—"

"ওই যে বড় বুইকটা দেখছেন, ওই যে কোণে রয়েছে, মাডগার্ডটা টোল খাওয়া।

ওর মালিকটি মাতাল চরিত্রহীন। তিনবার দেউলিয়া হয়েছে। গাড়ি চালিয়ে দুমকা থেকে আসছিল, একটা সাঁওতালকে ধাক্কা মেরে পালাচ্ছিল সেখান থেকে। পালাতে পালাতে আবার ধাক্কা খায় একটা গাছের সঙ্গে। তারপর রাত্তিরে আমার কাছে গাড়িটি রেখে সেই যে সরেছে আর পাত্তা নেই। কেউ বলছে বম্বে গেছে, কেউ বলছে দিল্লী। ওই যে ছোট্ট বেবি অস্টিনটা দেখছেন ওটা মিস্ মরিসের। নিজেই ড্রাইভ করে আর সঙ্গে থাকে রোজ একজন করে' নূতন বন্ধু। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে এক মাঠে পড়ে' ছিল সমস্ত রাত। সকালে উঠে দেখে গাড়ির চাকাসুদ্ধ দুটো টায়ার চুরি হ'য়ে গেছে। গাড়িটা গরুর গাড়িতে চড়িয়ে আমার এখানে দিয়ে গেছে মাস তিনেক আগে। আর তার পাত্তা নেই, শুনছি বেবি অস্টিনের চাকা এখন এখানে পাওয়া যাবে না। বিলেত থেকে আনাতে হবে। ততদিন ও গাড়ি এখানেই পড়ে' থাকবে—"

"আর ওই যে রং-ওঠা ঝরঝরে গাড়িটা রয়েছে, ওটা কে সারতে দিয়েছে? ওর তো কিছুই নেই দেখছি—"

"ওটার ইনজিন ঠিক আছে। আমি আড়াইশ' টাকায় কিনেছি। ভালো ক'রে সারিয়ে রং ক'রে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করব। তখন ওর চেহারা দেখলে চিনতেই পারবেন না। বেশভূষার চটকে বুড়ো মানুষকে ছোকরা বানিয়ে দেব—"

মুচকি হেসে চেয়ে রইল কমল। সে হা-হা করে' হাসে না। মুচকি হাসে, কিন্তু বেশ বড় 'মুচকি', হাসিটা প্রায় কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও হাসতে থাকে।

ফালতু কারবুরেটার খুলে নিয়ে এল।

কমল কারবুরেটার নিয়ে পড়ল।

কারখানাতেও সদাশিবের রোগী জুটে গেল কয়েকটা। ইদ্‌রিস্ মিস্ত্রীর পায়ের নীচে একটা কড়া হয়েছে, বসতে গেলে লাগে। একটা অ্যাপ্রেন্টিস্ ছোঁড়ার হাঁপানি হচ্ছে। ফালতুর কসের দাঁতে ব্যথা হয়। সদাশিব হাঁ করিয়ে দেখলেন, কেরিজ হয়েছে। বুড়ো জগন মিস্ত্রীর বাত হয়েছে। হাঁটুতে ব্যথা। সদাশিব ওষুধের বাক্স বার করে' ওষুধ দিতে লাগলেন সকলকে।

…চতুর্দিক প্রকম্পিত করে' একটা মোটর বাইক ঢুকল এসে। তার থেকে নামলেন একজন 'খাকি' হাফপ্যান্ট-পরা বেঁটে মোটা লোক। বুলডগের মতো মুখ, হিট্‌লারি গোঁফ। মুখে সিগার। মিস্টার পরসাদ। বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার একজন। নিরঙ্কুশ ব্যক্তি। প্রকাশ্যে ঘুষ নেন, প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ করেন। এঁকে দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে পড়ল কমল।

বলল—"কল্ আপকা গাড়ি দে দেংগে। থোড়া কাম্ বাকি হ্যায়—"

আদেশের কণ্ঠে মিস্টার পরসাদ বললেন—"জল্‌দি কিজিয়ে। বড়া মুশ্‌কিল মে হ্যায়—"

"কল্ জরুর হো যায়গা—"

এমন সময় মিস্টার পরসাদের দৃষ্টি পড়ল ডাক্তারবাবুর উপর।

"নমস্তে নমস্তে। ডাক্‌টর সাহেব, আপ য়ঁহা কৈসে পৌঁছ গ্যয়ে—"

সদাশিব বাংলাতেই উত্তর দিলেন—"রিটায়ার করে' এইখানেই আছি। আপনি কবে এলেন এখানে ?"

"এক মাহিনা—"

ওঁদের নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হ'ল। মিস্টার পরসাদের হিন্দীটা বাংলায় অনুবাদ করে' দিচ্ছি।

"আপনি এখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করছেন ?"

"কি আর করি. কিছু তো একটা করতে হবে—"

"আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। ভাগ্যে আপনি ছিলেন তাই বেঁচে গিয়েছিলাম—"

"কি হয়েছিল আপনার বলুন তো, ঠিক মনে নেই—"

"স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া। আপনি তখন ছাপরায়, আমিও ছাপরায়। আপনি না থাকলে আমি খতম হ'য়ে যেতাম। আপনি চলে' আসবার পর ডক্‌টর ঘোষ এলেন। তিনি চৌবেজির হাইড্রোসিল অপারেশন করলেন। সেপ্‌টিক হ'য়ে মারা গেলেন ভদ্রলোক—"

"দেখুন বাঁচবার বা মারবার মালিক আমরা নই। আমরা সকলকেই ভালো করবার চেষ্টা করি, কেউ হয়, কেউ হয় না। ওপরওলার মর্জিতে সব হয়—"

"সে কথা আমি মানব না। সব ডাক্তারের বিদ্যেও সমান নয়, সবাই সমান যত্নও নেয় না। আপনি এখানে আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। কোথায় বাসা আপনার ?"

"কমল আমার বাড়ি চেনে—"

"আচ্ছা, এখন চলি। এই রোদে মোটর বাইকে করে' ঘুরতে হচ্ছে। চলি, নমস্কার—"

চলে' গেলেন মিস্টার পরসাদ।

উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এল কমল।

"আপনার সঙ্গে খুব খাতির আছে দেখছি। আমার একটু উপকার করবেন ?"

"কি বল—"

"গভর্নমেন্টের কাছে আমার পনরো হাজার টাকার বিল বাকি আছে। দু'বছর হ'য়ে গেল, কিছুতেই আদায় করতে পারছি না। চিঠি লিখে লিখে হয়রান হ'য়ে গেছি, উত্তর পাই না। আপিসে গিয়ে তদ্বির করলুম, দু'একটা ক্লার্ককে ঘুষও দিলুম, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। কানাঘুষো শুনছি ওপরওলাকেও নাকি কিছু সেলামী দিতে হবে। মিস্টার পরসাদের খুব ইনফ্লুয়েন্স, উনি যদি চেষ্টা করেন এখনই পেয়ে যাব টাকাটা। এর আগে ওঁর গাড়ি একবার সারিয়ে দিয়েছি, একটি পয়সা চার্জ করিনি। এবারও করব না।

এইবার ওকে বলব ভেবেছিলাম কথাটা। আপনি যদি বলে' দেন তাহ'লে আরও ভালো হয়—"

"আচ্ছা বলব—"

কমল যত্ন করে' কারবুরেটারটা পরিষ্কার করে' ফিট করে' দিলে।

"আজি রাত্রে যেও মনে করে'—"

"যাব—"

সদাশিব নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন। দেড়টা বেজে গেছে। বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

সাত

সদাশিব ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল একটা প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে, প্রকাণ্ড একটা গাছের ছায়ায়। এখান থেকে মাইল-খানেক দূরে হাজিপুর হাট। বেলা দুটো বেজেছে। হাট তিনটের আগে বসে না। সদাশিব নির্জনে একটু বিশ্রাম করে' নিচ্ছেন। নির্জন প্রকৃতির কোলে মাঝে মাঝে একা বসে' থাকতে ভালবাসেন তিনি।

আলীকে পাঠিয়েছেন গ্রামের ভিতর একটু টাটকা দুধ সংগ্রহ করবার জন্য। সঙ্গে কন্‌ডেন্সড্ মিলক্ ছিল, তবু পাঠিয়েছেন। আসল উদ্দেশ্য আলীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাছে কোন লোক থাকলে তাঁর চিন্তা বিঘ্নিত হয়। স্রোতে লোকে যেমন নৌকো ছেড়ে দেয়, তাঁর মনকেও তেমনি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নানা জায়গায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে সে। সামনে কয়েকটা খঞ্জন ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা নীলকণ্ঠ ছোট্ট একটা গাছের ডালে বসে' 'টক্' 'টক্' শব্দ করছে মাঝে মাঝে। একটু দূরে গরু ভেড়া ছাগল চরছে। একটা গরুর পিঠে ফিঙে পাখী বসে' আছে। লঘু সাদা মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। এলোমেলো হাওয়া বইছে। দোয়েল পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। সদাশিব উঠে নিজের ডায়েরীটা বার করে' আনলেন। তারপর ফোলডিং টেবিল চেয়ারটাও বার করে' পাতলেন। একটু ভেবে লিখতে শুরু করলেন তিনি।

"দেখতে দেখতে এখানে অনেকদিন কেটে গেল। দিন কত শীঘ্র কেটে যায়। মনে হচ্ছে এই সেদিন এসেছি। সকালের পর সন্ধ্যা, তারপর আবার সকাল। কালের প্রবাহ ব'য়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল।

"প্রথমে যখন এখানে জীবন আরম্ভ করেছিলাম তখন আশঙ্কা হয়েছিল সময় কাটবে কি না, মনের অবলম্বন পাব কি না, মনের মধ্যে যে স্নেহের কাঙাল ক্ষুধিত হ'য়ে বসে' আছে সে তার আকাঙ্ক্ষিত সুধা পাবে কি না। আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি আমার সে আশঙ্কা অপনোদিত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার অবসর নেই। মনের

যে অবলম্বন পেয়েছি তার চেয়ে বড় অবলম্বন আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি প্রচলিত-অর্থে 'ধার্মিক' হইনি, রাজনীতি বা সমাজনীতি আলোচনার ছুতোয় পরনিন্দা করিনি, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট কুড়িয়ে 'নেতা' হইনি, আমি যা ছিলাম তাই আছি, যে পথে এতদিন চলে' এসেছি সেই পথই ধরে' আছি। তার থেকে বিচ্যুত হইনি। বরাবর ডাক্তারি করেছি ; এখনও তাই করছি। অন্য কিছু হবার শখ হয়নি আমার। সাধ্যও নেই। এক হিসাবে গীতার নির্দেশই পালন করেছি, 'স্বধর্ম'কেই আঁকড়ে আছি। স্নেহের কাঙাল আমার মনও পরিতৃপ্ত হয়েছে। যে অপরিমেয় সুধা সে পেয়েছে তা তার কল্পনার অতীত ছিল। আমি মহাপুরুষ নই, অত্যন্ত সাধারণ লোক আমি। আমি কি করে' লোকের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ আকর্ষণ করতে পেরেছি? ভাবলেও অবাক লাগে।

"অনেক হয়তো মনে করবেন আমি অসুখে বিসুখে ওদের চিকিৎসা করি বলেই ওরা আমাকে ভালবাসে। বাইরে থেকে বিচার করলে তাই মনে হয়, কিন্তু আসল কারণ বোধ হয় তা নয়। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়, জমিদারবাবু নওলকিশোর প্রতি রবিবারে ভিখারীদের চাল দেন, বেঙ্কট শর্মার ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যহ তৃষিতদের জল আর ছোলা-গুড় দেওয়া হয়। জনসাধারণ কি এদের ভালবাসে? কেউ কেউ হয়তো শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ভালবাসে না। ঘনিষ্ঠ না হ'লে ভালবাসা যায় না। আমরা পোষা কুকুর বিড়ালকে যত ভালবাসি, দূরবর্তী মহৎ লোককেও ততটা বাসি না। আমি ওদের উপকার করেছি বলেই যে ওরা আমাকে ভালবাসে তা নয়, আমি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি বলেই ভালবাসে। আমার যারা রক্তসম্পর্কিত, সমাজের খাতায় যারা আমার আত্মীয় বলে' চিহ্নিত, তাদের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, কারণ তারা দূরে থাকে, কচিৎ তাদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা পর হ'য়ে গেছে। আবদুল, আলী, ভগলু, কেব্‌লী, ফালতু, রহমান, কমল, জগদম্বা, সুখিয়া, বিলাতী সাহ এবং আরও অনেক নগণ্য লোক আজ আত্মীয় হয়েছে আমার। ওদের সুখদুঃখের সঙ্গে আমি জড়িত, তাই আমাকে ওরা আপন লোক মনে করে। আমি পরম সুখে আছি।

"কেবল একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছি একটু। মালতীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ফিট্ হচ্ছে। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি কাঁদছে। কেন কাঁদছে তা বললে না। আমাকে দেখে চোখ মুছে অন্য ঘরে চলে' গেল। আজবলাল বলছিল প্রায় নাকি অকারণে কাঁদে। অকারণে চটেও যায়। আজবলাল ওর নাম দিয়েছে পাগলী। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি কি হয়েছে। বাঁজা মেয়েদের এরকম হয়। সন্তান-পালনের অন্তর্নিহিত কামনা স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ না হ'লে নানা অস্বাভাবিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ওকে একটা কাবুলী বিড়াল, একটা টিয়াপাখী, একজোড়া খরগোশ কিনে দিয়েছি। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? ওর যদি একটা ছেলে হ'ত!"

এই পর্যন্ত লিখেই লেখা বন্ধ করতে হ'ল সদাশিবকে। কারণ তিনি দেখতে পেলেন

আলী একটা বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আনছে আর তার পিছনে আসছে একটা গাই আর তার পিছনে হলদে-শাড়ি-পরা একটা মেয়ে। কাছে আসতেই গীতাকে চিনতে পারলেন তিনি। গোয়ালার মেয়ে। বাপ-মা নাম রেখেছিল গিতিয়া। কিন্তু কাছেই যে মিশনারী স্কুলটা আছে তাতে গিতিয়া পড়েছিল ছেলেবেলায়। সেই স্কুলের মেমসাহেব তার নাম গিতিয়া বদলে গীতা ক'রে দিয়েছেন। গীতা স্কুলে আর পড়ে না। অনেকদিন হ'ল বিয়ে হ'য়ে গেছে তার। যখন তার দশ বছর বয়স তখনই। সম্প্রতি দ্বিরাগমন হয়েছে। চমৎকার বাংলা বলতে পারে গীতা।

"গীতা, কবে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি ?"

"পরশু—"

"আমার জন্মে সামান্য দুধ দিলেই তো হ'ত। একটু চায়ের জন্মে দরকার খালি। তুই একেবারে গাই নিয়ে হাজির হলি কেন ?"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—"

চমৎকার চকচকে একটি কাঁসার ঘটিও এনেছিল সে। তাইতে নিজেই দুধ দুয়ে আলীর হাতে দিতেই আলী হাতের তর্জনী উত্তোলন করে' বললে—"ঠহর যাও এক মিনিট—" কেরিয়ার থেকে বার করলে সে অ্যালুমিনিয়মের একটা মুখ-ঢাকা হাঁড়ি। তাইতেই দুধটা ঢেলে নিয়ে সদাশিবের দিকে একটু ঝুঁকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"চায় কা পানি চঢ়া দেঁ হুজুর ?"

"দাও। গীতা চা খাবি ?"

গীতা লজ্জিত হ'ল।

"আলী, গাড়িতে বেশী গ্লাস আছে ?"

"জী হুজুর, হ্যায়। মগর থোড়া সা চন্‌কা হুয়া—"

আলী তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের একটি ছোট মুদ্রা করে' জানিয়ে দিলে গ্লাসটা সামান্য ফাটা।

"ওতেই গীতাকে চা দাও। তুমি এক কাপ চা বানাও নিজের জন্মে।"

"বহুত খু—"

মাঠের মধ্যে স্টোভ জ্বালা সহজসাধ্য নয়। এলোমেলো হাওয়ার জন্মে সহজে ধরতে চায় না। কিন্তু সদাশিবের মোটরে সব ব্যবস্থা আছে। বড় বড় টিনের পাত দিয়ে ছোট একটা টিনের ঘর মতো করে নিলে আলী। তার ভিতর স্টোভটা ঢুকিয়ে জ্বালতে লাগল।

গীতা সদাশিবের কাছে সরে' এসে মৃদুকণ্ঠে তার দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল। গীতা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তার স্বামী দুশ্চরিত্র, মাতাল। শাশুড়ী দজ্জাল। তিনটি ননদ আছে, তিনটিই হাড়-জ্বালানী। কেউ শ্বশুরঘর করে না। সব মায়ের কাছে আছে। শুধু তারা নয়, তাদের স্বামীরা এবং ছেলেপিলেরাও। গীতাকেই সকলের সেবা করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই মার-ধোর করে। একদিন এমন ইট

ছুঁড়েছিল যে মাথা কেটে গিয়েছিল তার। তাছাড়া তাকে তার স্বামীর মালিকের বাড়িতেও কাজ করতে হয়।

"তোর স্বামী কি করে ?"

"একজন বাভনের জমি চষে। এক পয়সা মাইনে পায় না। কবে নাকি দু'শো টাকা ধার নিয়েছিল তারই সুদের সুদ জমেছে। খেটে শোধ করতে হবে।"

"তোদের চলে কি করে' ?"

"ওই জমি থেকে যা ফসল হয় তাই দেয় আমাদের খাবার মতো। তার দামও হিসেব করে' ধারে জমা করে। ও ধার জীবনে কখনও শোধ হবে না—"

এই একই কাহিনী সদাশিব অনেকের মুখ থেকে শুনেছেন। বার বার অনুভব করেছেন যে দাসত্ব-প্রথা এখনও লোপ পায়নি। কেবল তার বাইরের রূপটা বদলেছে মাত্র। দাস-দাসী বিক্রয়ের আলাদা হাট-বাজার নেই আজকাল। সমাজের বুকের উপরই ঘরে ঘরে সে হাট বসেছে। ধূর্ত ধনীর কাছে অসহায় দুর্বলরা স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করছে। না করে' উপায় নেই তাদের।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"আমি কি করতে পারি—"

গীতা বললে—"দু'-একদিন পরে আমার স্বামী আমাকে নিতে আসবে। আমি যদি যেতে না চাই আমাকে সেই বাভন লোকজন পাঠিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখন ছোলা উঠেছে, আমাকে দিয়ে সেই ছোলা মণ মণ পেষাবে আর ছাতু করাবে। আমি তা পারব না। আমার স্বামী এলেই আমি আপনার কাছে পালিয়ে যাব। আপনি বলবেন আমি ওকে চাকরানী রেখেছি, ওকে যেতে দেব না।"

একটু ইতস্তত করে' সদাশিব বললেন, "সেটা কি ঠিক হবে ? কারও স্ত্রীকে কি তার স্বামীর কাছ থেকে কেউ জোর করে' সরিয়ে আনতে পারে ? সেটা বে-আইনী হবে। তুমি যদি তোমার স্বামীর কাছে না থাকতে চাও, তাহ'লে আদালতের সাহায্যে বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। সে অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে এক কাজ কর, তোমার স্বামীকেও এই শহরে এনে কোন রোজগারের কাজে লাগিয়ে দাও, তুমিও কাজ কর।"

"কিন্তু সেই বাভন তার টাকা ছাড়বে কেন ? নালিশ করবে—"

"তার টাকা শোধ করে' দাও। সে নালিশ করুক, আদালতের বিচারে তার যে টাকা পাওনা হবে তা আমরা দিয়ে দেব।"

"কিন্তু কি করে' দেব অত টাকা। আপনি তো জানেন আমরা কত গরীব। বাবা অন্ধ, মা শুষছে, ভাইটা তাড়িখোর, সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন কাজ করে না। আমরা কি করে' অত টাকা শোধ করব ?"

"আচ্ছা সে একটা ব্যবস্থা হবে' খন।"

"হবে ?"

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল গীতা সদাশিবের মুখের দিকে। সে জানে সদাশিব যদি ভরসা দেন তাহ'লে হবেই একটা কিছু।

"হবে, তোর স্বামী এলে নিয়ে আসিস তাকে আমার কাছে—"

গীতা হঠাৎ হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলে সদাশিবকে। তারপর মোটরের পিছনে বসে' চা খেয়ে গরু নিয়ে চলে' গেল। মনের ভার হাল্‌কা হ'য়ে গেল তার।

হাজিপুর হাটের কাছে সেই গাছের ছায়ায় বসে' সদাশিব যথারীতি রোগী দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ভিড়ের মধ্যে কেবলী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি শঙ্কিত।

"কি হ'ল কেব্‌লী ? নারাণ ছাড়া পেয়েছে ?"

"না বাবু। তাকে জেলে আটকে রেখেছে। আমি কাল দেখতে গিয়েছিলাম, অমন জোয়ান মরদ, মেয়েমানুষের মতো হাউ হাউ করে' কাঁদছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু। আপনিই তো আমাদের মা বাপ।"

কেব্‌লীর ছেকা-ছেনি হিন্দীতে উক্ত উক্তিটি শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন সদাশিব।

"আচ্ছা তুই যা, দেখি কি করতে পারি।"

কেব্‌লী ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে' গেল। সদাশিব রোগী দেখতে লাগলেন। ভিড়ের পিছনদিকে একটা কলরব উঠল। সদাশিব দেখলেন শুকুর কশাই তার ছেলে সিদ্দিককে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

"আদাব। বংগট্টু কো পকড়কে ল্যায়ে হ্যাঁয়, ডাক্‌টার সাব।"

বংগট্টু মানে পাজি।

সদাশিব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং সিদ্দিকের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে' দুটো চড় মারলেন জোরে।

শুকুর চীৎকার করে' উঠল—"আউর মারিয়ে, আউর মারিয়ে—"

সদাশিব কিন্তু আর মারলেন না, চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর বললেন—"উস্‌কো বৈঠাকে রাখ্‌খো, সুই দেঙ্গে—"

সিদ্দিকের বয়স সতরো-আঠারো বছর। গনোরিয়া হয়েছে। শুকুর তাকে সদাশিবের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিল কিন্তু সিদ্দিক রাজী হয়নি। সে বলেছিল উনি তো 'ভিক্‌-মাংগা'-দের (ভিখারীদের) ডাক্তার। উনি আবার চিকিৎসার জানেন কি ? শুকুরের কিন্তু সদাশিবের উপর অগাধ বিশ্বাস। তার সিফিলিস সদাশিবই সারিয়েছেন। শুকুর এসে সদাশিবকে জানিয়েছিল তার কুপুত্র সিদ্দিক সদাশিবের সম্বন্ধে কি অভদ্র উক্তি করেছে। সদাশিব প্রথমে কোন উত্তরই দেননি। কিন্তু শুকুর না-ছোড়।

"অব্ কুছ্ রাস্তা বাত্‌লাইয়ে হুজুর। ক্যা কিয়া যায় ?"

"ওকে এখানে ধরে' নিয়ে এস। আমি ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।"

দুটি প্রচণ্ড চড় খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিল সিদ্দিক। সদাশিব যখন তাকে ইন্‌জেক্‌শন দিলেন তখন আর আপত্তি করল না সে। সদাশিব বললেন—"এ ইন্‌জেক্‌শন রোজ নিতে হবে। দশ দিন। আর এ ওষুধ খাও। রোজ তিনটে করে' ট্যাবলেট—"

শুকুর বললে—"কাল বাজারেই কি ইন্‌জেক্‌শন দেবেন ?"

"তা দিতে পারি। ভোর ৭টার আগে যদি আমার বাড়িতে আসে তাহ'লে বাড়িতেও দিতে পারি।"

শুকুর আদাব করে' সিদ্দিককে নিয়ে চলে' গেল।

সদাশিব অন্যান্য রোগীদের ব্যবস্থা করে' দিয়ে হাটে ঢুকলেন। কিছু কিনলেন। সেই কুমড়ো-উলী বুড়ী বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল তার নাতনী রৌশন। বিয়ে হ'য়ে তার চেহারাই বদলে গেছে। সে উঠে এসে সদাশিবকে প্রণাম করল। সদাশিব তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন একটু। তারপর এগিয়ে গেলেন বিলাতী সাহের দোকানের দিকে।

"দু' মণ কাতারনী চাল আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। খুব ভালো চাল—"

"দাম কত—"

"আমি বিয়াল্লিশ টাকা মণ খরিদ করেছি। এখন আপনি যা দেন—"

এবড়োখেবড়ো হল্‌দে দাঁত বার করে' হাসলে বিলাতী সাহ।

"বেশী ভণিতা কোরো না। কত দেবো বল—"

"একটাকা মণ লাভ দিন।"

"আমার গাড়ির কাছে চল, চেক্‌ দিয়ে দিচ্ছি।"

"চেক্‌ ভাঙানো বড় হাঙ্গামা ডাক্তারবাবু। আমি পরে গিয়ে আপনার বাড়ি থেকে দাম নিয়ে আসব।"

"বেশ।"

গাড়ির কাছে এসে দেখলেন একটা জেলে একটা রুই মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার ছেলে ভালো হ'য়ে গেছে বাবু। আপনাকে তো কিছু দিতে পারিনি, তাই এই মাছটা—"

"ভালো হ'য়ে গেছে? বাঃ! আমাকে কিছু দিতে হবে না। এই মাছটা বেচে তোর ছেলেকে একটা তাগদের ওষুধ খাওয়া। আমি লিখে দিচ্ছি—"

একটা কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিলেন তিনি। জেলেটা তবু কুণ্ঠিত মনে দাঁড়িয়ে রইল।

"কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কেন—"

"এ মাছটা আপনি নিয়ে যান। আপনার নাম করে' এনেছি। এ আমি বেচব না। আমার ছেলেকে তাগদের দাবাই আমি কিনে দেব—"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সদাশিব।

"এই নবাবী আর লৌকিকতা করেই উচ্ছন্ন গেছ তোমরা। দাও, তোমাকে আর ওষুধ কিনতে হবে না। আমিই এনে দেব।"

তার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মোটরে উঠে পড়লেন সদাশিব। আলী গোপনে মাছটি 'কেরিয়ারে' রেখে দিলে। জেলেটা সদাশিবকে কি বলতে যাচ্ছিল।

আলী ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইশারায় জানিয়ে দিলে—একটি কথা বোলো না এখন

হাজিপুরের হাট থেকে সদাশিব সোজা চলে' গেলেন ডি. আই. জি. অব পুলিসের বাড়িতে। যিনি এখন এই পদে অধিষ্ঠিত তাঁর সঙ্গে সদাশিবের আলাপ ছিল চাকরি জীবনে। তখন তিনি এস. পি. ছিলেন। সদাশিব এখন পারতপক্ষে অফিসারদের এড়িয়ে চলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল ইনি তাঁকে চিনতে পারবেন কি না। প্রায় দশ বছর পরে দেখা হচ্ছে। যদি চিনতে না পারেন, যদি তাঁর কথা না রাখেন, তাহ'লে বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। তবু গেলেন তিনি। কেব্‌লীর অশ্রুপ্লাবিত মুখটা বড়ই পীড়া দিচ্ছিল তাঁকে।...

ডি. আই. জি. প্রথমে তাঁকে সত্যিই চিনতে পারেননি। কিন্তু পরিচয় দিতেই চিনতে পারলেন এবং সাদর অভ্যর্থনা করে' বসালেন।

"বসুন, বসুন। আপনার চেহারাটা একটু বদলে গেছে। তাই চিনতে দেরি হ'ল! রিটায়ার করে' এখানে প্র্যাক্‌টিস্ করছেন?"

"হ্যাঁ—"

"কই আপনার কথা শুনিনি তো—"

"আমি যাদের মধ্যে প্র্যাক্‌টিস্ করি তারা আপনার কাছে আসতে পারে না। ইতর লোকেদের ডাক্তার আমি—"

"ওরাই তো এখন দেশের মালিক সার। ওদের এখন আর অবজ্ঞা করবার জো নেই।"

"কিন্তু তবু ওদের সম্বন্ধে এখনও আপনারা সুবিচার করছেন না। ওদেরই একজনের জন্য আজ আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।"

"কি ব্যাপার!"

সদাশিব খুলে বললেন সব।

"ও, এই! আচ্ছা, আজই ছাড়া পেয়ে যাবে। আমি এখনই ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।"

ফোন তুলে তিনি এস. পি. কে বললেন ব্যাপারটা। এস. পি. কি বলছিলেন তা শুনতে পেলেন না সদাশিব। ডি. আই. জি. বললেন, "যেমন করে' হোক ওকে ছেড়ে দিতে হবে। ছবিলালবাবুর চক্রান্তে নির্দোষ বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। ওকে আজই ছেড়ে দিন। আচ্ছা, আচ্ছা—"

ডি. আই. জি. সদাশিবের দিকে চেয়ে বললেন—"আজই ছাড়া পাবে। আজ না পায়, কাল পাবেই। বয়—"

লিভেরি-পরা 'বয়' দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—"হুইস্কি-সোডা।"

তারপর সদাশিবের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

"আপনার চলবে কি?"

"না, আমি ও-রসে বঞ্চিত।"

ডি. আই. জি, আর একবার হাসলেন।

"আপনার খদ্দর দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল। যদিও আজকাল অনেক খদ্দরধারীরাও এ-রসের রসিক হয়েছেন—"

"তা জানি। খদ্দর আজকাল অনেক পাজি লোকদের ইউনিফর্ম হয়েছে।"

"তবে পরেন কেন?"

"ওর পিছনে একটা বড় আদর্শ আছে বলে'। পাজিরা ভাত খায় জুতো পরে বলে' তো আর ভাত খাওয়া জুতো পরা ছাড়তে পারি না—"

হা হা করে' হেসে উঠলেন ডি. আই. জি.।

"ওয়েল সেড্। আসবেন মাঝে মাঝে। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে এলেন আবার।

"একটা যদি প্রস্তাব করি, রাগ করবেন?"

"কি বলুন—"

"একটু আগেই আমার এক জেলে রুগী বড় একটা রুই মাছ উপহার দিয়েছে। মাছটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমি বিপত্নীক। বাড়িতে খাবার লোক বেশী নেই। ঠাকুরটা অসুখে পড়েছে। এই অসময়ে যদি মাছ নিয়ে যাই আমার ভাইপো-বউ মালতী চটে' যাবে। মাছটা যদি আপনাকে দিয়ে যাই, কেমন হয়?"

"এককালে ঘুষ নিতাম, এখন আর নিই না। তবে এতে যদি আপনার সমস্যার সমাধান হয় দিয়ে যেতে পারেন।"

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসলেন তিনি।

তাঁকে মাছটা দিয়ে চলে' গেলেন সদাশিব।

আট

সেদিন বাজারে ঢুকেই সদাশিব দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই একগাদা ছোট মাছের সামনে বসে' সেই গাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কুঁচো-চিংড়ি বাছছেন! বাঁড়ুয্যে মশায়ের বয়স কত তা বলা শক্ত। জরাজীর্ণ চেহারা। মাথায় চুল প্রায় নেই, যে ক'গাছি আছে তা পাকা। ঝোলা গোঁফ, তাও পাকা। রোগা সরু মুখ। চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। ডান দিকের পাকা ভুরুর মাঝখানে একটা কালো আঁচিল তাঁর জরালাঞ্ছিত মুখের মধ্যে নির্জর হ'য়ে আছে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নিকেলের একধারে সুতো দিয়ে বাঁধা। বাঁড়ুয্যে মশাই কারো দিকে তাকান না, তন্ময় হ'য়ে মাছ ঘাঁটেন। চারদিকে জল, কাদা প্যাচপ্যাচ করছে, লোকের ভিড় গিজ্‌গিজ্ করছে, কিন্তু সেদিকে বাঁড়ুয্যে

মশায়ের লক্ষ্য নেই। তিনি ওই জলকাদার উপর উবু হ'য়ে বসে' বহু লোকের পায়ের এবং হাঁটুর গুঁতো সহ্য করে' কুঁচো-চিংড়ি সংগ্রহ করছেন। আধপোয়ার বেশী কিনবেন না, কিন্তু মাছ ঘাঁটবেন অনেকক্ষণ ধরে'। ওতেই আনন্দ।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। কি মাছ কিনছেন—"

বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় তুললেন না। স্বর শুনেই সদাশিবকে চিনতে পারলেন।

"কে, ডাক্তারবাবু, নমস্কার। কুঁচো-চিংড়ি কিনছি। বেগুনও কিনেছি কিছু। নাতনী বলেছে বেগুন দিয়ে কুঁচো-চিঁড়ি রেঁধে দেবে। বেশ রাঁধে।"

"কত করে' দর—"

"এক টাকা। এই পোকার মতো মাছ বলে কিনা এক টাকা! বাজারে কোন জিনিসে কি হাত দেবার জো আছে! সব আগুন!"

ঘাড় না তুলেই কথাগুলি বলে' গেলেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই রোজ বাজারে আসেন। রোজ ওই ছোট ছোট মাছের স্তূপের ভিতর হাত চালিয়ে চালিয়ে নিজের পছন্দমত মাছ বার করেন। কোনদিন কুঁচো-চিংড়ি, কোনদিন মৌরলা, কোনদিন খয়রা, কোনদিন ছোট পুঁটি। আধপোর বেশী কেনেন না কোনদিন। কোন্ মাছের সঙ্গে কোন্ মসলা দিলে মুখরোচক তরকারি হয় তা তাঁর নখদর্পণে। এঁকে দেখলেই সদাশিবের মনে হয় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতীক ইনি। খাদ্য-রসিক, কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত। আত্মসম্মানবোধ খুব প্রবল। কারো কাছে মাথা নত করতে চান না, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় মাঝে মাঝে করতে হয় বলে' মরমে মরে' থাকেন।

জেলেরা ওঁকে খুব খাতির করে। উনি এখানকার স্কুলে অনেকদিন শিক্ষকতা করে' এখন রিটায়ার করেছেন। একমাত্র পুত্রটি অকালে মারা গেছে। তারই মেয়ে ওঁর দেখাশোনা করে। পুত্রবধূও নেই।

"আপনার নাতনীর রান্নার সুখ্যাতি আমিও শুনেছি। একদিন গিয়ে তার হাতের বেগুন-চিংড়ি খেয়ে আসব—"

"যাবেন, যাবেন। সে তো আমার পরম সৌভাগ্য—"

সদাশিব মাংসের দোকানের দিকে গেলেন। আগের দিন রহমন কশাই খবর দিয়ে গিয়েছিল যে সে ভালো ভেড়া কাটবে একটা। ভেড়ার মাংস এ অঞ্চলে দুর্লভ। ছাগলই বেশী পছন্দ করে এদেশের লোক। কশাইরা সবাই জানে ডাক্তারবাবু ভেড়ার মাংস ভালবাসেন, তাই ভেড়া কাটলেই খবর দিয়ে আসে তাঁকে।

রহমনের কাছে যেতেই রহমন তাঁকে বলল—"হুজুরের জন্য একটা 'লেগ' আলাদা করে' রেখেছি—"

"ওজন কর—"

ওজনে আড়াই সের হ'ল। বেশ চর্বিদার 'মাটন', দেখে খুশী হলেন সদাশিব। ভালো রোস্ট হবে। তিনি দামটা মিটিয়ে দিয়ে ফিরেই দেখতে পেলেন খগেন সরখেলকে। লুব্ধদৃষ্টিতে 'মাটন-লেগ'-টার দিকে চেয়ে আছেন।

"আপনি কিনলেন বুঝি ওটা? বড্ড বেশী চর্বি। তা না হ'লে আমি নিতুম সের দুই। আপনি পুরো 'লেগ'-টাই নিলেন? আপনার এ বয়সে অত চর্বি খাওয়া কি ভালো?" পরমুহূর্তেই অপ্রস্তুত মুখে বললেন—"ও আপনি তো নিজেই ডাক্তার।" বলেই সুট করে' চলে' গেলেন তিনি মাছের বাজারের দিকে।

"সেলাম হুজুর—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সিতাবী মেথর। তিনি যখন হাসপাতালে চাকরি করতেন তখন এ-ও ছিল সেখানে। এখনও আছে। সিতাবী এক সের 'মাটন' কিনলে। সদাশিব আন্দাজ করলেন আজ সন্ধ্যায় ওদের তাড়ির আসর ভালো করে' জমবে। আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল তাঁর! এই মেথররা খায় ভালো। কারণ মেথরদের প্রত্যেকেই কাজ করে। সিতাবীর পরিবারে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে পাঁচ-ছ'জন লোক। সকলেই রোজগার করে। ওদের সকলের আয় যোগ করলে মাসে আড়াইশ'-তিনশ' টাকা হবে। সদাশিব ভাবলেন, তাই সিতাবী স্বচ্ছন্দে তিন টাকা খরচ করে' মাটন কিনতে পারল। কিন্তু খগেন সরখেল পারলেন না। তাঁর মাইনে মাত্র একশ' টাকা। একঘর ছেলে-মেয়ে। দু'টি মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মেয়েরা কলেজে পড়ে। ছেলেরা স্কুলে। খগেনের একশ' টাকাতে কুলোয় না। সকাল-বিকেল টিউশনিও করতে হয়।

হঠাৎ সদাশিবের মনে হ'ল খগেন যদি সিতাবী হ'ত তাহ'লে কি ঠিক হ'ত? কথাটা মনে হ'তেই শিউরে উঠলেন তিনি। সিতাবী অশিক্ষিত মাতাল, তার বউও তাই। দুজনেই সিফিলিসগ্রস্ত। ওর ছেলেমেয়েগুলোও কেউ সুস্থ নয়। মাঝে মাঝে ডগমগে রঙিন কাপড় পরে বটে, কিন্তু খুব নোংরা। সিতাবীর জোয়ান মেয়ে-দুটোও পাজি, নানারকম বদনাম ওদের সম্বন্ধে। আর খগেন সরখেল শিক্ষিত ভদ্রলোক। সাহিত্য-প্রীতি আছে, সংগীতানুরাগ আছে। ভালো বেহালা বাজাতে পারেন, যথাসাধ্য সামাজিক শালীনতা বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেন—উনি সিতাবীর স্তরে নেমে যাবেন এটা ভাবাও যায় না। খগেন সরখেলদের জীবনের ট্র্যাজেডি এঁরা আশানুরূপ উপার্জন করতে পারেন না। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি?

স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে এদের সমস্যা তো উত্তরোত্তর জটিলতর হচ্ছে। দম-বন্ধ হ'য়ে আসছে এদের, চারদিকে নানা বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে এদের নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করছেন সরকার। এদের বাঁচবার উপায় কি? বিদ্রোহ? এরা কি বিদ্রোহ করতে পারবে? গান্ধীজীর একটা উক্তি তাঁর মনে পড়ল—'In satyagraha, it is never the number that counts…Indeed one perfect civil resister is enough to win the battle of Right against Wrong'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজনও বিশুদ্ধ-চরিত্র যোদ্ধা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহ'লেই যুদ্ধজয় হবে। এ যুদ্ধে সৈনিকের সংখ্যা বেশী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোথায় সেই একজন বিশুদ্ধ-চরিত্র 'perfect' সৈনিক? এদের মধ্যে আছে কি একজনও? একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন সদাশিব। ছিপলী যে তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তা দেখতে পাননি। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"কি ছিপলী ? তোর পেটের ব্যথা কেমন আছে ?"

"ভালো হ'য়ে গেছে। আপনি ওঁকে একবার দেখুন। দিন দিন কমজোর হ'য়ে যাচ্ছে—"

ছিপলীর স্বামী কাঁচুমাচু মুখে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ছোঁড়া একটা। ছিপলীর চেয়ে বয়স কম বলে' মনে হয়। পাণ্ডুর রক্তহীন চেহারা। সদাশিব ওই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার চোখ দেখলেন, জিব দেখলেন। তাঁর সন্দেহ হ'ল পেটে 'হুকওয়ার্ম' আছে। বললেন, "মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়া, ওষুধ দিচ্ছি।" চলে' গেল তারা।

তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য রোগীদেরও খোঁজ নিলেন। আবদুলের ছেলের আর জ্বর হয়নি। কয়লার চোখ-ওঠা অনেকটা কমেছে। ভগলুর নাতির খোসও প্রায় ভালো হ'য়ে গেছে। সুখনের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। তার জ্বরটা ছাড়েনি এখনও। দামী বিলিতী ওষুধ দিয়েছেন সদাশিব, তবু ছাড়েনি।

হঠাৎ কেব্‌লীর সঙ্গে দেখা হ'ল। দন্ত বিকশিত করে' একটু হেসে আধঘোমটা দিয়ে সরে' দাঁড়াল সে। তার স্বামী নারাণ কয়েকদিন আগে ছাড়া পেয়েছে। কেব্‌লী তার জন্যেই পাঁঠার 'কলিজা' (মেটে) কিনতে এসেছিল। কয়েকদিন জেলে থেকে নাকি কমজোর হ'য়ে গেছে নারাণ।

বাইরে এসে সদাশিব দেখলেন মোটরের কাছেও বেশ ভিড় আর একদল ঝাঁকামুটে ছোঁড়া দাঁড়িয়ে ছিল ফরসা কাপড় পরে'। যথারীতি সদাশিব সকলের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, চারটে করে' পয়সা দিলেন। পাশেই যে দোকানটা ছিল তাকে বললেন—এদের প্রত্যেককে একটা করে' লজেন্‌স্ দিতে। বারোজন ছিল, বারোটা লজেন্‌সের দাম দিয়ে দিলেন। ওদের মধ্যে একটা ছেলে বলল, "ডাক্তারবাবু, যোগীয়া আপনাকে ঠকিয়েছে। ও নিজে কাপড় পরিষ্কার করেনি, আর একজনের পরিষ্কার কাপড় পরে' এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়া মেটাতে দেরি হ'য়ে গেল সদাশিবের। যোগীয়া সত্যিই প্রতারণা করেছিল। ধরা পড়ে' দিয়ে কাঁদতে লাগল খুব। শেষকালে তাকে আর একটা লজেন্‌স্ দিয়ে থামাতে হ'ল। তারপর ছিপলীর স্বামীকে ওষুধ দিলেন তিনি। আরও কয়েকজনকে দিলেন। গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাঁকে।

"ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যেও কিছু কুঁচো-চিংড়ি বাছলুম। বাড়িতে বেগুন আছে তো ? না থাকে তো আধসেরটাক কিনে নিয়ে যান। বেগুন-চিংড়ি করে' দিতে বলবেন আপনার রাঁধুনীকে। মসলা কিছুই নয়। পেঁয়াজের ফোড়ন দিতে হবে বেশী করে'। আর মাছগুলো যেন বেশ লাল করে' ভেজে নেয়। বেগুন ও পেঁয়াজের সঙ্গে বেশ করে' ভাজতে হবে। রুটি বা লুচি দিয়ে খেলে সুখ পাবেন—"

"আপনার মাছগুলোই আমাকে দিয়ে দিলেন নাকি—"

"না, অতটা নিঃস্বার্থপর আমি নই। নিজেরটা রেখে তবে আপনাকে দিয়েছি—"

বাঁড়ুয্যে মশাই বেঁটে লোক। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে থাকেন। মুখে ভাবের

অভিব্যক্তি বড় একটা হয় না। কিন্তু সদাশিব লক্ষ্য করলেন তাঁর মুখে একটা মৃদু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

"অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাতনীর হাতের রান্না খেতে একদিন যাব কিন্তু—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যেদিন খুশী। কমল সেদিন বলছিল আপনি খুব খাইয়েছেন তাকে। আমার তো হজমশক্তি নেই, থাকলে আমিও একদিন আপনার সঙ্গে খেয়ে আসতুম—"

"আসুন না একদিন। আপনার হজমশক্তির মতোই ব্যবস্থা করা যাবে—"

বাঁড়ুয্যে মশাই নমস্কার করলেন।

"না, ও কথা ঠাট্টা করে' বললাম। আমি কোথাও নিমন্ত্রণ খাই না। গুরুদেবের বারণ—"

কমলের কথায় সদাশিবের মনে পড়ল মিস্টার পরসাদের কথা। কমলের কথা তো তাঁকে বলা হয়নি। কমল হয়তো আশা করে' আছে। তখুনি মিস্টার পরসাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

নয়

সদাশিব ডায়েরী লিখছিলেন।

"মালতীকে নিয়ে বেশ একটু চিন্তায় পড়েছি। আজকাল তার বড় ঘন ঘন 'ফিট' হচ্ছে। 'ফিট'-এর ব্যাপারটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাত্রে হঠাৎ যা কানে এল তাতে একটু বিব্রত বোধ করছি। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসছিল না। বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে' ছিলাম। বারান্দার ঠিক পাশেই মালতীর শোবার ঘর। মালতীর সঙ্গে চিরঞ্জীবের কথোপকথন আমার কানে গেল। স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। এ সম্ভাবনাটা আমার মনে একদিনও উদয় হয়নি।

মালতী বলছিল, 'আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। বেঁচে আমার সুখ কি! তোমার কাকার সংসারে রাঁধুনীবৃত্তি করতে করতে তো হাড় কালি হ'য়ে গেল। বিয়ে হ'য়ে ইস্তক তো ওই কাজই করছি। উনি বাহাদুরি করে' রাজ্যের লোককে নিমন্ত্রণ করবেন, আর আমাকে তাদের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি রাঁধতে হবে। সকাল থেকে রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত ওই আজবলালের টিকি ধরে' দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য হয়েছে আমার পক্ষে। আমি আর পারছি না, পারছি না—'

মালতী কান্নায় ভেঙে পড়ল। চিরঞ্জীব নিম্নকণ্ঠে কি বললে ঠিক শুনতে পেলাম না। সম্ভবতঃ সান্ত্বনা দিতে লাগল।

মালতীর যেটা দুঃখের কারণ—বন্ধ্যাত্ব—তা কেউ ঘোচাতে পারবে না। ওরই

দু'চারটে ছেলে-মেয়ে হ'লে ওর অন্যরকম চেহারা হ'ত। কিন্তু আমি ওর দুঃখের নিমিত্ত হ'য়ে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে ওকে আমার গৃহস্থালিতে কর্ত্রীপদে বরণ করে' হয়তো ভুল করেছি।

চিরঞ্জীব এক অজ পাড়াগাঁয়ে একশ' টাকা বেতনে স্কুল মাস্টারি করত। খুব কষ্টে ছিল। প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগত। তাই আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম। যে একশ' টাকা ওখানে মাইনে পেত সে একশ' টাকা আমি ওকে মাসে মাসে হাত-খরচস্বরূপ দিই। ওরা এখানে যে স্টাইলে থাকে সে স্টাইলে ওরা মাসে পাঁচশ' টাকা রোজগার করলেও থাকতে পারত না। মালতীর শাড়ি-গয়নার অভাব রাখিনি। ওর যে-কোনও শখ বলবামাত্রই মিটিয়ে দিয়েছি। বাড়িতে খরগোশ, কাবুলী বিড়াল, কুকুর, পায়রা, নানারকম পাখী—সব ওর জন্যই। তবু দেখছি ও সুখী নয়। আমার সংসারকে ও নিজের সংসার করে' নিতে পারেনি। ওর সর্বদাই মনে হচ্ছে—এটা কাকার সংসার। কিন্তু আমার সংসারে ওরাই তো সর্বেসর্বা।

সোহাগ তার স্বামীর সঙ্গে বিলেত চলে' গেছে। কন্টিনেন্ট টুর করছে। সোহাগের স্বামী বিলেতেই একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। বাড়িও কিনেছে লণ্ডনের কাছাকাছি একটা জায়গায়। হয়তো ওইখানেই শেষ পর্যন্ত বসবাস করবে। অর্থাৎ ওদের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হ'ল যদি না আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে বাস করি। সোহাগ লিখেওছে যেতে। অনেক শিক্ষিত লোক নাকি এদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে বিলেতে বা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছে। সেখানে নাকি সবরকম সুবিধা। হোক সুবিধা, আমি বিদেশে যেতে পারব না। লক্ষ্য করছি সব সময় সব ব্যাপার নিজের সুবিধার মানদণ্ডে মাপতে গিয়ে অনেক লোক পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে। স্বদেশের ঠাকুরকে অবহেলা করে' বিদেশের কুকুরদের আদর করার জন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের গাল দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর গালাগাল গায়ে মাখিনি। সাহেবরা এদেশ থেকে চলে' যাওয়ার পর থেকে আমাদের বিদেশ-প্রীতি যেন হু হু করে' বেড়ে যাচ্ছে। এটা দুর্লক্ষণ। সাহেবদের অনেক সদ্‌গুণ আছে স্বীকার করি, সেই সদ্‌গুণগুলি আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি, কারণ সদ্‌গুণ কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ মানুষদের সম্পত্তি নয়। সেগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে প্যাণ্ট নেকটাই পরবার বা গরু খাবার দরকার নেই, তার জন্যে দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়াও অনাবশ্যক।

এক বিলেত-ফেরত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন—বিলেতে সাহেবরা সামনাসামনি আমাদের সঙ্গে যত ভদ্রতাই করুক, আড়ালে আমরা তাদের চোখে 'ব্রাউনি', একটা অদৃশ্য সীমারেখা টেনে মনে মনে ওরা আমাদের সর্বদাই তফাত করে' রাখে। নিজেদের মধ্যে হয়তো আমাদের নিয়ে হাসাহাসিও করে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোকের সম্বন্ধেও একজন বিখ্যাত লেখকের যে-সব প্রাইভেট চিঠিপত্র বেরিয়েছিল তা পড়বার পর আর ওদেশে যেতে ইচ্ছে করে না। রবীন্দ্রনাথকে তো আমেরিকার লোকেরাও ভারতীয় বলে' অপমান করেছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে চলে' আসেন। আমার

মেয়ে-জামাই সেই বিদেশে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। করুক, আমি যাব না। এই দেশে জন্মেছি, এই দেশেই মরব।"

সদাশিব একটা বড় দীঘির ধারে চেয়ার টেবিল পেতে লিখছিলেন। দীঘির ধারে 'কুঁজড়া' (যারা তরকারি ফলিয়ে বিক্রি করে) জগদীশের ঘর। জগদীশ নবীগঞ্জের হাটে তরকারি বেচে। বুড়ো মানুষ। তার স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া হ'য়ে মর-মর হয়েছিল। খবর পেয়ে সদাশিব এসে সেটা অপারেশন করেছেন। দুঃসাধ্য কাজ। উলফৎ কম্পাউণ্ডার এবং ড্রাইভার আলীর সহায়তায় এটি করেছেন তিনি। সকাল থেকে এইখানেই বসে' আছেন। কম্পাউণ্ডার উলফৎকে বসিয়ে রেখেছেন জগদীশের কাছে। জগদীশের জ্ঞান হয়েছে। তবু বসিয়ে রেখেছেন উলফৎকে। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ছুটি দেবেন। উলফৎ বুড়ো অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার। সদাশিব যখন চাকরি করতেন তখন হাসপাতালে ছিল। এখন সেও রিটায়ার করেছে। সদাশিব বাইরে যখন অপারেশন করেন, উলফৎকে ডাকেন।

জগদীশের মেয়ে এসে বললে—"বাবুজি ভালো আছে। হাসছে—"

"আমার জন্যে একগ্লাস শরবত করে' নিয়ে আয়। আমার গাড়ি থেকে গ্লাস নিয়ে যা—"

মেয়েটা দৌড়ে চ'লে গেল।

দশ

ভোর পাঁচটা। সদাশিব বাইরে 'লনে' চুপ করে' বসে' আছেন একা একটা ক্যাম্প-চেয়ারে। দুটো কোকিল ডাকাডাকি করছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকছে আরও কয়েকটা পাখী। দুটো হাঁড়িচাচা মিষ্টিসুরে কথাবার্তা কইছে পরস্পরের সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন বলছে 'খুকু নেই', 'খুকু নেই'। টংক্ টংক্ টংক্ একঘেয়ে সুরে ডেকে চলেছে স্যাকরা পাখী। কয়েকটা দুর্গাটুনটুনী উড়ে বেড়াচ্ছে কল্‌কে ফুলের ঝাড়ে। কল্‌কে ফুলের ভিতর ঠোঁট চালিয়ে মধু খাচ্ছে আর কিচ্‌কিচ্ কিচ্‌কিচ্ চর্‌চর্ করে' শব্দ করছে। সদাশিবের স্প্যানিয়েল কুকুর 'লোমেশ' সামনে বসে' আছে থাবার উপর মুখ রেখে। উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সদাশিবের মুখের দিকে। সদাশিব যে আজ বিশেষ রকম অন্যমনস্ক তা যেন সে বুঝতে পেরেছে। বাড়ির চাকরটা একটা চৌকো টুল রেখে গেল সামনে। তারপর একটা ট্রের উপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে রাখল তার উপর।

"চা কি ছেঁকে দেব—"

"থাক্। আর একটু ভিজুক—"

সদাশিব অন্যমনস্কভাবে পাখীদের গান শুনতে লাগলেন পা দোলাতে দোলাতে। চায়ের দিকে তেমন মনোযোগ দিলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল লোমেশ উৎসুক-

দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে আর আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়ছে। তিনি ট্রের উপর থেকে একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। লোমেশ সেটাকে আর মাটিতে পড়বার অবসর দিলে না, শূন্য থেকেই লুফে নিলে সেটাকে মুখ দিয়ে। একটা বিস্কুট খেয়ে উৎসাহভরে উঠে পড়ল এবং একটু এগিয়ে এসে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল। আর একটা বিস্কুট দিলেন তাকে, তারপর আর একটা।

"আরও বিস্কুট এনে দেব—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন আজবলাল দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কখন এসেছে তা টের পাননি তিনি। সদাশিব দেখলেন তার চোখে-মুখে একটা কুণ্ঠিত স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে—সদাশিব যেন ক্রীড়ারত শিশু একটা—ক্রীড়াচ্ছলে দামী বিস্কুটগুলো কুকুরকে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর উদারতায় সে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু অপচয়শীলতায় ক্ষুব্ধও কম হয়নি। তার মনে হচ্ছে মালতী থাকলে তাঁকে হয়তো শাসন করত, কিন্তু সে তাঁকে শাসন করতে পারে না। মনিব যে!

"না, আমার আর বিস্কুট চাই না।"

"চা-টা ছেঁকে দেব? ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।"

"দাও—"

আজবলাল চা ছাঁকতে লাগল।

মালতীকে নিয়ে চিরঞ্জীব কাল চলে' গেল কাশ্মীর। সদাশিব জোর করে' পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের।

তাঁর ঃনে হয়েছে বাইরে একটু বেড়িয়ে এলে হয়তো মালতীর মনটা ভালো হবে।

প্রস্তাবটা শুনে চিরঞ্জীব আশ্চর্য হয়েছিল প্রথমটা।

"কাশ্মীর? সেখানে গিয়ে কি হবে!"

"ওর মনটা ভালো হবে। একঘেয়ে জীবন থেকে একটু ছাড়া পেয়ে বাঁচবে। ওকে কিছুদিন নানা জায়গায় নিয়ে ঘুরে বেড়াও। দিল্লী, আগ্রা, কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন—যেখানে ও যেতে চায় নিয়ে যাও ওকে। এতে একটু উপকার হবে মনে হয়। টাকার জন্যে ভেবো না, সে আমি ব্যবস্থা করব—"

চিরঞ্জীব স্বল্পভাষী, কিছু বলল না। কিন্তু সে মনে মনে বুঝল সদাশিব মালতীর পরিবর্তিত মনোভাবের আভাস পেয়েছেন। এজন্য নিজেই সে মনে মনে কুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সে-ও যেন বাঁচল। এতে মালতীর উপকার হবে কি না সে জানত না, কিন্তু মালতীকে যে কাকার কাছ থেকে সে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে, এতেই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তার ভয় ছিল মালতী কোনদিন প্রকাশ্যে কোনও কেলেঙ্কারি করে' না বসে।

মালতী কাল চলে' গেছে। যদিও বাড়িতে চাকরবাকরদের অভাব নেই, তবু যেন বাড়িটা খালি খালি মনে হচ্ছে সদাশিবের। মালতী যে বাড়িটার অনেকখানি পূর্ণ করে'

থাকত। তার চীৎকার চেঁচামেচি, চাকর-ঠাকুরের উপর তার দোর্দণ্ড প্রতাপ, বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াকে সরগরম করে' রাখত। হঠাৎ সব যেন নিঝ্ঝুম হ'য়ে গেছে।

সদাশিব চা খেয়ে চুপ করে' বসে' রইলেন আরও খানিকক্ষণ। খবরের কাগজওলা এসে কাগজ দিয়ে গেল। সদাশিব খবরের কাগজ কেনেন কিন্তু পড়েন না। চিরঞ্জীবই কাগজ পড়ে' দরকারী খবর মাঝে মাঝে শোনাত তাঁকে। কাগজটা দেখে আর একবার চিরঞ্জীবের কথা মনে পড়ল।

একটু পরেই গেটের কাছে মোটর এসে দাঁড়াল একটা। কমল নেমে এল মোটর থেকে।

"কি খবর কমল, এত সকালে হঠাৎ?"

"কাল জগদীশপুর হাটে গিয়েছিলাম। এস. ডি. ও. সাহেবের গাড়ি খারাপ হয়েছিল সেখানে। হাটে দেখলাম, বেশ সস্তায় মুরগি বিক্রি হচ্ছে। কিনে নিয়ে এসেছি গোটা ছয়েক। মালতীদি-কে বলুন ভালো করে' রান্না করতে। রাত্রে এসে খাব। আমার জন্যে যেন রুটি করেন।"

"মালতী কাশ্মীর বেড়াতে গেছে। যাক্, তার জন্যে আটকাবে না—এই আলী—"

"হুজৌর—"

আলী সেলাম করে' এসে দাঁড়াল।

"বাবুর্চি গোলাম রসুলকে খবর দাও, আজ এখানে এসে রাঁধবে।"

"বহুত খু—"

আমি তো এখুনি বেরুব। তখনই যাবার পথে বলে' যাব তাকে—"

"বহুত খু—"

"মুরগিগুলো নাবিয়ে রেখে দাও—"

"বহুত খু—"

আলী চলে' গেল। সদাশিব কমলকে জিগ্যেস করলেন, "তোমার বিল আদায় হ'ল?"

"হয়েছে। মিস্টার পরসাদ এমন জোর কলমে লিখলেন যে বাপ বাপ করে' টাকা দিয়ে গেলেন। তাই না মবলগ দশ টাকা খরচ করে' মুরগি কিনলাম কাল!"

সদাশিব হাসলেন। একবার ইচ্ছে হ'ল তাকে মিতব্যয়ী হ'তে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজের কথা ভেবে তা আর দিলেন না।

"আচ্ছা চলি এখন। একটা মোটর 'চুর' হ'য়ে এসেছে কারখানায়। অ্যাক্সিডেণ্ট করে' এসেছে। গাড়ির ভিতর রক্তও রয়েছে। ওরা বলছে রক্ত মানুষের নয়, ওরা কোথায় যেন পুজো দিয়ে পাঁঠা বলি দিয়েছিল, সেই কাটা পাঁঠাটা গাড়িতে ছিল, তারই রক্ত—"

"চেনা গাড়ি?—"

"না, বাইরের গাড়ি। মোটরের নম্বর রাঁচির। কি করব বলুন তো?"

"পুলিসে খবর দাও। পুলিস এসে দেখে যাক্, তারপর গাড়িতে হাত দিও। তা না হ'লে ফ্যাসাদে পড়ে' যেতে পার।"

"তাই করি তাহ'লে।"

কমল চলে' গেল।

তারপর সদাশিবের মনে পড়ল বন্ধুর ওখানে যেতে হবে। বন্ধু কয়লা-গুদামের কুলি। কাল থেকে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। বন্ধু কয়লা-গুদামেরই একধারে থাকে। তার দেশ কোথায় কেউ জানে না, তাকে সবাই চিরকাল কয়লা বইতে দেখেছে। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা, কুচকুচে কালো। ঘাড়টা একধারে একটু বেঁকা। গলার স্বর ঝাপসা। কাল যখন সদাশিব বাজারে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সামনেই বন্ধু কয়লার বোঝাসুদ্ধ রাস্তায় পড়ে' যায়। তারপর তার মুখ থেকে রক্ত উঠতে থাকে। সদাশিব তাকে গাড়ি করে' হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বন্ধু যেতে চাইলো না। বললে, ওখানে গেলেই পয়সা চাইবে। আমার পয়সা নেই। আমাকে ওই গুদামেই নিয়ে চলুন। গুদামের মালিক সৌখী মাড়োয়ারী একটা ঘর খালি করিয়ে দিয়েছেন। ঠিক পাশেই যে কয়লার গুদাম আছে সেখানে একটা ভালো ঘর ছিল; কিন্তু সে গুদামের মালিক বাঙালী সর্বেশ্বরবাবু। তিনি সর্ববিষয়ে গা বাঁচিয়ে হিসাব করে' চলেন, তাই সে ঘরে টি. বি. রোগীকে ঢুকতে দেননি। বন্ধুর টি. বি. হয়েছে কি না তা সদাশিব এখনও ঠিক করতে পারেননি, কিন্তু সর্বেশ্বর এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময়ে আধঘোমটা দিয়ে কেব্‌লী এসে দাঁড়াল।

"কি খবর কেব্‌লী?"

কেব্‌লী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কি ব্যাপার, কি হয়েছে—"

কেব্‌লী কাঁদতেই লাগল। তারপর অশ্রুজড়িত কণ্ঠে থেমে থেমে বলল যে নারাণ তাকে কাল মেরেছে। তার মাথা ফেটে গেছে।

"সে কি!"

"দেখো নি" (দেখ না)

মাথার কাপড় তুলে সে দেখাল। সামনের চুলগুলো শুকনো রক্তের চাপে জড়িয়ে গেছে। সদাশিব তার চেহারা দেখে ভয় পেলেন। চোখে অশ্রু লেগে আছে বটে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ, যেন সর্পিণী ফণা তুলেছে। কিছুদিন আগে এইরকম এক স্বামী-লাঞ্ছিতা কাহারনী তার স্বামীকে দা দিয়ে কেটে ফেলেছিল। ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ল।

"কেন মারলে কেন তোকে—"

তখন কেব্‌লী আসল কারণটি বিবৃত করল। নারাণ আবার একটি বিয়ে করতে চায়। কেব্‌লী বাঁজা। সুতরাং নারাণের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে চাইছে তার ভাই। তার মায়ের—মানে কেব্‌লীর শাশুড়ীর এতে মত নেই।

"নারাণের মা বেঁচে আছে নাকি এখনও?"

"হ্যাঁ। দেহাতে সে জমিতে কাজ করে—"

"কোথায় নারাণের বিয়ে ঠিক হয়েছে?"

"ওই দেহাতেই। একটা কানী বিধবা ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। কে ভালো মেয়ে দেবে ওই বুড়োকে—"

"এ মেয়েটার বয়স কত –"

"তা জোয়ান আছে—"

"তোকে মারতে গেল কেন শুধু শুধু—"

"বাঃ, আমার মত না পেলে তো বিয়েই হবে না। আমাদের সমাজের নিয়ম যে 'পন্‌চ'-এর (সমাজের মোড়লদের) সামনে আমি যতক্ষণ না বলব যে আমার বিয়েতে মত আছে, ততক্ষণ ওকে কেউ মেয়ে দিতে পারবে না। আমার সেই মত নেবার জন্যে আমাকে মারধোর শুরু করেছে—"

কেব্‌লীরা জাতে মুচি। তাদের সমাজে এরকম নিয়ম আছে শুনে সদাশিব বিস্মিত হলেন।

"এ ব্যাপারে আমি কি করব বল—"

"আপনি দারোগা সাহেবকে বলে' আবার ওকে জেলে পুরে দিন। ওরকম মারমুণ্ডা শন্‌কাহা মানুষের জেলে থাকাই উচিত—"

সদাশিব হেসে ফেললেন।

"সে কি হয়। আচ্ছা তুই বাড়ি যা। নারাণের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে বলব আমি—"

কেব্‌লী চলে' গেল।

সদাশিবের গাড়ি যখন কয়লা-গুদামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেখানে কেউ ছিল না। গুদামের মালিকরা কেউ আসেননি তখনও, কুলিরাও কেউ আসেনি। বন্ধুকে কাল যে ঘরটায় সদাশিব রেখে গিয়েছিলেন সে ঘরের কপাট দুটো খোলা। সদাশিব মোটর থেকে নেবে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য। কয়লার স্তূপগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হ'ল যেন শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছেন। 'কয়লাগুলো তো মৃত অরণ্যের কঙ্কাল, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে আবার সেগুলো পোড়াচ্ছি আমরা'—এই দার্শনিক চিন্তা ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক করে' দিল তাঁকে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন বন্ধুর ঘরটার দিকে। গিয়ে দেখলেন বন্ধু মুখ গুঁজড়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে আর ঘরের কোণে বসে' আছে একটা লোম-ওঠা রাস্তার কুকুর। বন্ধু যখন দুপুরে ছাতু খেত এই কুকুরটাকে ছাতুর গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। সেই কুকুরটা বসে' আছে চুপ করে'। আর একফালি রোদ বন্ধুর মাথায় পিঠে সোনালী চাদরের মতো বিছানো রয়েছে। সদাশিব পরীক্ষা করে' দেখলেন বন্ধু মারা গেছে। নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার ছবি ফুটে উঠল তাঁর মনে। সেদিন রবিবার। সব কয়লার দোকান বন্ধ। তার উপর বৃষ্টি পড়ছে। সেদিন বাড়িতে তিনি কয়েকজনকে খেতে বলেছেন। মালতী খেয়াল করেনি যে আগের দিন রাত্রেই কয়লা ফুরিয়ে গেছে। সকালবেলা চাকর বাজার থেকে ফিরে এসে বলল, সব দোকান বন্ধ, কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না। সঙীন পরিস্থিতি। সদাশিব নিজে বেরুলেন শেষকালে। বৃষ্টি পড়ছিল খুব। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। মাছের দোকানের গলিটার সামনে এসে দেখলেন বন্ধু রাস্তার ধারে মাথায় বোরা-ঢাকা দিয়ে বসে' আছে। নেবে পড়লেন তিনি গাড়ি থেকে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল বন্ধু। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বাঁকা ঘাডটা আর একটু বেঁকিয়ে সেলাম করল তাঁকে।

"বন্ধু, মহা মুশকিলে পড়েছি···"

সকল কথা বললেন বন্ধুকে।

বন্ধু ঝাপ্‌সা গলায় ভরসা দিল।

"আপনি বাড়ি যান, কয়লা পৌঁছে দিচ্ছি আমি—"

"সব দোকান তো বন্ধ, কোথায় পাবে তুমি—"

কোথায় পাবে তা সে বলেনি। কেবল বলেছিল, 'পাব'।

"দামটা নাও তাহ'লে—"

একটা পাঁচটাকার নোট বার করে' দিয়েছিলেন সদাশিব।

"ভাঙানি তো নেই। দাম আমি পরে নিয়ে নেব—"

এক ঘণ্টা পরেই বন্ধু ভিজতে ভিজতে কয়লা দিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে সদাশিব মনে করতে পারলেন না, বন্ধু কয়লার দামটা চেয়ে নিয়েছিল কি না। কারণ তারপর বন্ধুর সঙ্গে আর তাঁর দেখাই হয়নি অনেকদিন। মালতী হয়তো দিয়ে থাকবে—এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। ভাবতে লাগলেন এই আত্মীয়-স্বজনহীন লোকটার এখন আর কি করতে পারেন তিনি। এখন তো ও চিকিৎসার বাইরে চলে' গেছে। সেদিনের সেই কথাটা স্মরণ করে' তিনি অনুভব করলেন আজও তিনি বন্ধুর কাছে ঋণী আছেন। কি করে' এ ঋণ শোধ করা যায়? কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন আরও, তার পর বুঝতে পারলেন এ ঋণ শোধ করা যাবে না। সব ঋণ শোধ করা যায় না।

"রাম রাম ডাক্‌টার সাহেব। বন্ধু কেমন আসে?"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সৌখী মাড়োয়ারী এসে তাঁর আপিসের চাবি খুলছেন।

"বন্ধু মারা গেছে—"

"মরিয়ে গেলো? সরবোনাস্‌ হ'ল তাহ'লে। ও মুরদাকে এখন ফেক্‌বে কে—"

বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা মনে হ'ল সদাশিবের। বললেন, "সে ব্যবস্থা আমি করছি—"

"আপনে কোরবেন ? কম সে কম দশ পন্‌দরহ্‌ টাকা খরচা হইয়ে যাবে—"

"দেখি—"

তখনি মোটরে করে' বেরিয়ে গেলেন সদাশিব। বন্ধুকে বাজারে সবাই চিনত ; লোক সংগ্রহ করতে বিলম্ব হ'ল না। সদাশিব খাটিয়া, শালু আর ফুল কিনে দিলেন। বাজারে যত ফুল পাওয়া গেল সব কিনলেন। ছিপলী, আবদুল আর ঝকমুও যোগাড় করে' নিয়ে এল কিছু ফুল। একদল কীর্তনীয়াও জুটে গেল। বেশ বড় শোভাযাত্রা করে' মহাসমারোহে বন্ধু চলে' গেল মহাপ্রস্থানের পথে। সদাশিব লক্ষ্য করলেন শোভাযাত্রার পিছন পিছন সেই লোম-ওঠা কুকুরটাও চলেছে। সদাশিবের সবসুদ্ধ খরচ হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এত কম টাকার বিনিময়ে এমন প্রচুর আনন্দ তিনি জীবনে আর কখনও পাননি। অনেকদিন পরে তাঁর মন অনাবিল তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। একটু দূরে দূরে তিনিও শবানুগমন করতে লাগলেন তাঁর মোটরে।

"রাম রাম ডাক্‌টার সাহেব—"

সৌথী মাড়োয়ারীকে দেখে গাড়ি থামালেন সদাশিব। "হামার বড় তাজ্জব লাগছে। আপনে এক কুলিকে লিয়ে কাহে এত্‌না রুপিয়া খরচ কর ডালা, হমরা সমঝ্‌মে নেহি আতা হ্যায়—"

সদাশিব দেখলেন এর আধ্যাত্মিক দিকটা সৌথী মাড়োয়ারীকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললেন—"বন্ধুর কিছু টাকা আমার কাছে জমা ছিল। সে টাকাই লাগিয়ে দিলাম এতে।"

"ও আব্‌ সমঝা। ভালো করিয়েসেন—রাম রাম।"

সৌথী মাড়োয়ারী চলে' গেলেন।

আলী আবার স্টার্ট দিলে মোটরে।

"আস্তে আস্তে চল—"

কিছুদূর যাবার পর একটা খুব রঙচঙে রিক্‌শা সামনে এসে দাঁড়াল। রিক্‌শার পিছনে একটি উন্মুক্ত-বক্ষা অত্যাধুনিকা অভিনেত্রীর ছবি রয়েছে। রিক্‌শার গদি লাল সাটিনের, হুডটা সবুজ রঙের। হুডের চারিধারে চমৎকার ঝালর দেওয়া। সাইকেলের হাতলে একরাশ সোঁদাল ফুল। রিক্‌শাচালক নেমে খুব ঝুঁকে সেলাম করলে সদাশিবকে। শুকুরের ছেলে সিদ্দিক। একেই তিনি কিছুদিন আগে হাটে চড় মেরেছিলেন। গনোরিয়া হয়েছিল ছোকরার।

"কৈসা হ্যায়—"

"ছুট্‌ গিয়া হুজুর। আওর কি সুই লেনা পড়েগা ?"

"কল্‌ পেসাব লে কর্‌ আও, দেখেঙ্গে—"

শোভাযাত্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে' সিদ্দিক আলীকে জিগ্যেস করলে, "ইয়ে জুলুস কিস্‌কা হ্যায়—"

আলী তখন তাকে বললে যে বন্ধু মরে' গেছে, তাকেই শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

'ম্যায়্ ভি যাউঙ্গা—"

সিদ্দিক তার রঙীন রিক্‌শা চালিয়ে চলে' গেল ভিড়ের মধ্যে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে।

শ্মশান থেকে সদাশিব গিয়েছিলেন তিরমোহানীর হাটে। সেখানে অনেকগুলি রোগীর আসার কথা ছিল। সেখানে দেখা হ'ল গীতার সঙ্গে। গীতা সেখানে মহুয়া দই বিক্রি করছিল। সে উদ্ভাসিত মুখে সদাশিবের দিকে চেয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিল একটু। তারপর তার পাশেই যে বলিষ্ঠ গুঁপো লোকটি বসে' ছিল তাকে ফিসফিস করে' কি বললে। নমস্কার করে' উঠে দাঁড়াল লোকটি।

"কে তুমি, চিনতে পারছি না তো—"

"শকলদীপ—"

পাশের একজন পরিচয় করিয়ে দিলে শকলদীপ গীতার স্বামী। শকলদীপ আহীর গোয়ালাদের মিষ্টি ভাষায় মৃদুকণ্ঠে বলল যে সে তাঁরই ভরসায় গ্রাম ছেড়ে চলে' এসেছে। একদিন সে তাঁর কাছে যাবে।

"যেও—"

সদাশিব হাটে ঘুরতে লাগলেন। তিরমোহানীর হাটে ভালো পেঁপে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। সেদিন কিন্তু পেঁপে দেখতে পেলেন না। অন্যান্য তরকারিওলার কাছে খবর পেলেন শিবুর একমাত্র ছেলেটি নাকি মারা গেছে দু'দিন আগে। শিবুই হাটে পেঁপে আনত।

"কি হয়েছিল তার ছেলের?"

"মেয়াদী বোখার—"

টাইফয়েড-জাতীয় কোন জ্বর হয়েছিল সদাশিবের মনে হ'ল।

"কে দেখছিল?"

"বিলাতী ডাক্‌টার দৎ সাহেব—"

সদাশিবের আত্মসম্মানে যেন একটু আঘাত লাগল। শিবুর বাড়ির অনেক অসুখ তিনি সারিয়েছেন। আজ শিবু বিলাতী ডাক্তার দৎ সাহেবের কাছে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছে শুনে তাঁর খারাপ লাগল।

দৎ সাহেবের বয়স বেশী নয়, বিলেত থেকে সম্প্রতি ডি. টি. এম. পাশ করে' এসেছেন। লোকটির চিকিৎসা-নৈপুণ্য আছে কি না তা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু ব্যবসায়-নৈপুণ্য যে আছে তা ইতিমধ্যেই বেশ বোঝা গেছে। অনেক দালাল লাগিয়েছেন, তারা রোগীপিছু কমিশন পায়। তাদের আরও একটা কাজ হচ্ছে আকারে-ইঙ্গিতে প্রচার করা যে সদাশিবকে দিয়ে চিকিৎসা করানো নিরাপদ নয়। তিনি বুড়ো হয়েছেন, সেকেলে মতে চিকিৎসা করেন, অনেক কিছু ভুলেও গেছেন। এবং এই কারণেই 'ফি' নেন না, ওষুধের দামও দাবি করেন না। এই প্রচারে সদাশিবের

অবশ্য ক্ষতি হয়নি, কারণ তিনি লাভের আশায় প্র্যাক্‌টিস্ করতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে কষ্ট হয় তাঁর। মানুষের মনের বিচিত্র মতিগতি দেখে কৌতুকও অনুভব করেন।

…হাট থেকে যখন ফিরলেন তখন অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। প্রায় দুটো। এসে দেখেন দ্বিজেনবাবু বসে আছেন একটা নীল চশমা পরে'। দ্বিজেনবাবু একজন মোক্তার। সদাশিবের সঙ্গে তাঁর ক্বচিৎ দেখা হয়। প্রোটিন খাদ্যের মহার্ঘতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন—"আজকাল পাকা রুই সাড়ে তিন টাকা সের, মাংসও তাই। ভালো ডিম এক টাকায় সাতটা বা বড়জোর আটটা। দুধ টাকায় পাঁচপো। তাই কিনে খাই, কি আর করব। যা রোজগার করি খাওয়াতেই যায়। ভিটামিনের জন্য ফলও খেতে হয় কিছু—লেবু, বেদানা এই সব। শসা-টসা আমার রোচে না। খেয়েই সর্বস্বান্ত হলাম মশাই" —বলেই অধরোষ্ঠের সহযোগে আক্ষেপসূচক 'মছ'-গোছের একটা শব্দ করেন। তাঁর চেহারাটি কিন্তু খাদ্যপুষ্ট নয়। চোখের কোল বসা, গালের হাড় উঁচু, নাকটা খাঁড়ার মতো। দেখলেই মনে হয় ভুক্ষা যেন মূর্তিমতী হ'য়ে রয়েছে তাঁর চেহারায়।

"নমস্কার ডাক্তারবাবু, অনেকক্ষণ থেকে বসে' আছি আপনার অপেক্ষায়—"

"নমস্কার। হঠাৎ এ সময়ে কেন ?"

"চোখটাতে ভালো দেখতে পাচ্ছি না ক'দিন থেকে। নতুন বিলেতফেরত ডাক্তারটার কাছে গিয়েছিলাম, এক কাঁড়ি টাকা খরচ হ'ল খালি, চোখের তো কোনও উপকার দেখছি না।"

"বসুন দেখছি।"

তখনই ভালো করে' পরীক্ষা করলেন চোখটা। দেখে তাঁর যা মনে হ'ল তা বলতে পারলেন না তিনি দ্বিজেনবাবুকে। যে ব্যক্তি বরাবর বড়াই করে' এসেছেন যে ভালো ভালো খাবার খেয়েই তিনি সর্বস্বান্ত তাঁকে কি করে' বলা যায় যে ভালো খাদ্যের অভাবেই তাঁর চোখের এই দশা হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল তাঁর এক বন্ধু জ্ঞানবাবুর কথা। জ্ঞানবাবু একদিন বলেছিলেন—"এটা সার জেনে রেখো পেট না মারলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে পয়সা জমানো অসম্ভব। যারা মুখে বলে হাতী খাচ্ছি ঘোড়া খাচ্ছি তারা জেনো বাহাদুরি করছে। ছেলে পড়িয়ে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে, বাড়িভাড়া গুণে আর লোক-লৌকিকতা করে' কটা পয়সা বাঁচে যে খাবে ? জান, অনেক বাড়িতেই দাই চাকর নেই, অনেক বাড়িতেই দু'বেলা রান্না হয় না। সব জানা আছে আমার। সুতরাং পয়সা যদি বাঁচাতে চাও নোলাটি কমাও।"

জ্ঞানবাবুর এ সারগর্ভ উপদেশ সদাশিব পালন করেননি। দ্বিজেনবাবুর চোখ দেখে জ্ঞানবাবুর কথাগুলো অনেকদিন পরে মনে পড়ল। হয়তো এতদিন লোকটা মিথ্যে বাহাদুরি করে' এসেছে।

"কি দেখলেন চোখে ?"

"হ্যাঁ, একটু খারাপ হয়েছে। আপনি ডিম আর দুধ কি ভাবে খান ?"

"দুধের ক্ষীর আর ডিমের ডালনা।"

"এগ্‌ফ্লিপ্‌ করে' খাবেন। আধকাপ দুধে একটা কাঁচা ডিম মিশিয়ে তাই ঢক করে' খেয়ে ফেলবেন রোজ সকালে—"

"আঁশটে গন্ধ ছাড়বে যে—"

"নাক টিপে ওষুধের মতো খেয়ে নেবেন।"

"ওষুধ দেবেন না কিছু?"

"দিচ্ছি—"

সদাশিবের কাছে ভিটামিনের স্যাম্পল্‌ ছিল নানারকম। সেইগুলোই দিয়ে দিলেন।

"আপাতত এইগুলো খেয়ে দেখুন। যদি না কমে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে—"

"আপনার ফি—আর ওষুধের দাম—"

"না, ওসব দিতে হবে না। এখন আমি কেবল ডাক্তারি করি, ডাক্তারি ব্যবসা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি—"

"আচ্ছা, তা'হ'লে চলি। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।"

দ্বিজেনবাবু চলে' গেলেন।

আজবলাল আড়ালে এতক্ষণ 'টাইম-বমে'র মতো চুপ করে' ছিল। দ্বিজেনবাবু চলে' যাবার পর বিস্ফোরণ হ'ল।

"মালতী দিদি চলে' যাবার পর থেকে আপনি বাবু শরীরের উপর বড়ই জুলুম লাগিয়েছেন। আমাকে শেষে জবাবদিহিতে পড়তে হবে।"

"দাও, খাবার দাও—"

"চান করবেন না? গরম জল তৈরি আছে—"

"না থাক।"

এতে অসন্তুষ্ট হ'ল আজবলাল। তার চোখ-দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হ'ল। এই না-চান-করাটাও সে শরীরের উপর আর একটা জুলুম বলে' গণ্য করলে। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না আর। হন হন করে' ভিতরের দিকে চলে' গেল।

খেতে বসে' সদাশিব তাই লক্ষ্য করলেন, মালতী চলে' যাওয়ার পর থেকে যা রোজই লক্ষ্য করছেন। আজবলাল অনেকরকম রান্না করেছে,—মাছ, মাংস, লাউ, কুমড়ো, আলুর দম, শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল কিচ্ছু বাদ দেয়নি। তার চেষ্টা মালতীর অভাবে তিনি যেন কষ্ট না পান। আজবলাল রাঁধে ভালো, কেবল তার মসলার হাতটা একটু বেশী। সে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে কোন্‌ তরকারিটা কেমন হয়েছে।

"মাংস সিদ্ধ হয়েছে তো বাবু? আজ মাংসটা খুব কচি ছিল না।"

"বেশ হয়েছে মাংস। খুব নরম হ'য়ে গেছে—"

"মাছের ঝালটা দেখুন তো, দিদিমণির মতো পেরেছি কি—"

"চমৎকার হয়েছে…"

প্রতিটি জিনিসের প্রশংসা না করলে আজবলাল মনে মনে দুঃখিত হয়। একবার

খুব ঝাল হয়েছিল বলে' মাংসের বাটিটা সদাশিব ঠেলে দিয়েছিলেন, খাননি। আজবলালও খায়নি সেদিন। শুধু তাই নয়, তার পরদিন এসে বলেছিল—"আমি বুড়ো হয়েছি বাবু, সত্যিই আর র াঁধতে পারি না। আমাকে এবার ছুটি দিন।"

সদাশিব শুধু একটা কথা বলেছিলেন—"মালতী চলে' গেছে, সোহাগ চলে' গেছে, তুমি যাবে ? যেতে চাও যাও। ওদের আটকাইনি, তোমাকেও আটকাব না।"

আজবলাল আর যায়নি। শুধু সে যায়নি তাই না; তারপর থেকে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন ঘটেছে তার চরিত্রে। বহুদিনের কু-সংস্কার সে বর্জন করেছে। আজবলাল মুরগির মাংস ছুঁতো না। মুরগির মাংস মালতী র াঁধত আলাদা উনুনে। মালতী চলে' যাওয়ার পর মাঝে মাঝে বাবুর্চি আনিয়ে সদাশিব মুরগি রান্না করেছেন। হঠাৎ আজবলাল একদিন বললে—"বাবুর্চিকে ডাকবার দরকার নেই। আমিই পাখী রেঁধে দেব। রেঁধে না হয় চান করে' নেব। রোজ রোজ আপনার খাসির মাংস খাওয়ার দরকার নেই। মুরগি খেলে যখন ভালো থাকেন, আমি রেঁধে দেব—"

তারপর থেকে আজবলাল রোজ মুরগি র াঁধছে।

খেতে খেতে সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "মহেন্দ্রবাবুর খাবার রোজ পাঠাচ্ছ তো ?"

"হ্যাঁ। ছানা পাঠাই রোজ আধসের দুধের। উনি বলে' পাঠিয়েছেন ওঁর জন্যে আলাদা করে' ছোট মাছ পাঠাবার দরকার নেই। বাড়িতে যা রান্না হয় তাই পাঠালেই চলবে। ওঁকে মাছ মাংস সবই দিই—"

মহেন্দ্রবাবু মানে সেই 'ছিপো' যাঁকে একদিন সদাশিব বেছে বেছে চারটি ছোট মাছ কিনতে দেখেছিলেন। এখন তিনি সদাশিবের চিকিৎসাধীন আছেন। সদাশিব তাঁকে আর বাজার করতে দেন না, আজবলালকে বলে' দিয়েছেন তাঁকে যেন খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সদাশিবের মনে হ'ল অনেকদিন তাঁর খবর নেওয়া হয়নি। কেমন আছেন ভদ্রলোক কে জানে !

এগারো

খুব ভোরে সদাশিব বাড়ির সামনে 'লনে' চুপ করে' বসে' থাকেন। কিছু করেন না, কেবল পা দোলান আর বসে' বসে' চেয়ে দেখেন চারদিকে। পাখী, ফুল, গাছ, আকাশ —চিরপুরাতন তাঁর এই সঙ্গীরা নিত্য-নূতন আনন্দ দেয় তাঁকে। লনে বসেই চা খান এবং চা খাওয়ার পরও চুপ করে' বসে' থাকেন তাঁর ড্রাইভার আলী যতক্ষণ না আসে। আলী এলেই বেরিয়ে যান তিনি।

সেদিন ভোরে ছিপলী এসেছিল, কিছু মাছ আর তার স্বামীকে নিয়ে। সদাশিব দেখলেন ছিপলীর স্বামীর হুকওয়ার্মের চিকিৎসা করে' স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে।

আগে চোখ মুখ বিবর্ণ ছিল, এখন একটু রক্তের আভাস দেখা দিয়েছে। ছিপলী কিন্তু বললে, ওর 'তাগত' নেই কিছু। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সদাশিব। ছিপলীকে বললেন, "তুই মাছগুলো নিয়ে বাড়ির ভেতরে যা। আমি দেখছি একে। আজবলালের কাছ থেকে বঁটি নিয়ে মাছগুলো বেছে দিগে যা।"

ছিপলীর স্বামীকে মৃদুকণ্ঠে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন সদাশিব। ছিপলীর স্বামী অপ্রতিভ মুখে কাঁচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সত্য কথা বলল। লোকটা পারুষ্য-হীন। পূর্ণ যুবতী হাস্যমুখী ছিপলীর ঢলঢলে চেহারাটা ফুটে উঠল সদাশিবের মানসপটে।

"নাম কি তোমার—"

"জিতু—"

"তোমার যে অসুখ হয়েছে তা তো বাপু চট্ করে' সারবে না। এর জন্যে যে-সব ইন্‌জেক্‌শন নিতে হবে তার দামও অনেক। তুমি কি পারবে?"

"ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করতে হবে। কত টাকা লাগবে—?"

"আমি ওষুধের নাম লিখে দেব। তুমি দোকানে গিয়ে খোঁজ কর, কত দাম লাগবে—"

"আচ্ছা যদি অসুখ সেরে যায় তাহ'লে আমি যেমন করে' হোক ওষুধের দাম জোটাব—"

"আচ্ছা তুমি বস। আমি ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি। ছিপলী আসুক—"

জিতু একধারে বিমর্ষ মুখে বসে' রইল। সদাশিবও একটু দ্বিধায় পড়ে' গেলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় এ অসুখ প্রায় দুরারোগ্য। ওষুধও দুর্মূল্য। এ অবস্থায় এই গরীব লোকটাকে কি এত খরচের মধ্যে ফেলা উচিত হবে?

ছিপলী একটু পরে বেরিয়ে এল।

তাকে স্পষ্ট কথাই বললেন সদাশিব—"তোর স্বামীর যা হয়েছে তা প্রায় সারে না। একরকম ইন্‌জেক্‌শন আছে, তাতে কিছু উপকার হ'তেও পারে, না-ও হ'তে পারে। তোমরা যদি সে ইন্‌জেক্‌শন কিনতে পারো, তাহ'লে উলফৎ সে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দেবে, পয়সা নেবে না। ওষুধটা কিন্তু কিনতে হবে। আমার কাছে নেই—"

"বেশ, লিখে দিন, কিনে নেব—"

ওষুধের প্রেসক্রপশন নিয়ে ছিপলী আর তার স্বামী চলে' গেল।

ওরা চলে' যাবার পর সদাশিব ভাবতে লাগলেন। জিতুর অসুখ যদি না সারে, তা'হলে কি হবে? আইনতঃ ছিপলী তার স্বামীকে ত্যাগ করে' অন্য বিবাহ করতে পারে। কিন্তু ছিপলী কি তা করবে? মনে হয় ওর স্বামীকে ও ভালবাসে। দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে বলেই সব ভালবাসা উবে যাবে? কেবল আইন বা শাস্ত্র মেনে চললেই কি মানুষ সুখী হয়? কি জানি ওর কিসে সুখ হবে।

বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। ভবদেববাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর কথা।

ভবদেববাবুরও কোনও পারুষ্য ছিল না। সাবিত্রী দেবী সাবিত্রী নামের মর্যাদা রাখতে পারেননি। অনেক প্রণয়ী ছিল তাঁর। ভবদেববাবুও জানতেন একথা, কিন্তু কিছু বলতেন না। স্ত্রীকে ভয় করতেন তিনি, সর্বদাই যেন তাঁর কাছে অপরাধী হ'য়ে থাকতেন। আড়ালে সকলেই ভবদেববাবুকে নিয়ে পরিহাস করতেন। নিজেকে এরকম হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলার চেয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা ঢের ভালো।

আজবলাল চা নিয়ে এল।

চায়ের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে সে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একধারে।

"তুমি যাও, আমি নিজে ছেঁকে নেব—"

"একটা কথা ছিল বাবু। আমি মাসখানেকের জন্যে বাড়ি যেতে চাই। দেশে আমাদের কিছু জমি আছে, আমার ভাইপোটাই এতদিন সব দেখাশোনা করত। কিন্তু সে পুলিসের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে' গেছে, বাড়িতে কেউ নেই, আমি একবার বাড়ি না গেলে সব বরবাদ হ'য়ে যাবে। আমি রামলক্ষ্মণ ঠাকুরকে বলেছি, এখানে এসে কাজ করবে।"

"এখান থেকে যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও কোনও ব্যবস্থা হ'তে পারে না?"

"শুধু টাকা পাঠালে কিছু হবে না। আমাকে নিজে যেতে হবে। জমিগুলো ভাগে বন্দোবস্ত করে' দিয়ে আসব। যাবার সময় আমাকে কিছু টাকাও নিয়ে যেতে হবে।"

সদাশিব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে' রইলেন।

তারপর বললেন, "বেশ—"

চা খেয়ে সদাশিব চুপ করে' বসে' রইলেন। কাগজওলা কাগজ দিয়ে গেল। আলী এসে সেলাম করে' গাড়ির চাবি নিয়ে গাড়ি বার করল। সদাশিব চুপ করে' বসে' রইলেন। সোহাগ গেছে, মালতী গেছে, আজ আজবলালও চলল। ও বলছে বটে ফিরে আসবে, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ফিরবে না। দেশে ওর ভাইপো ছিল বলেই এতদিন ও একটানা এখানে থাকতে পেরেছিল। আর থাকবে না। হঠাৎ যেন তিনি চমকে উঠলেন। মনে হ'ল মনু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আর দেখতে পেলেন না। চোখের ভুল? কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে! অনেকক্ষণ নির্বাক হ'য়ে বসে' রইলেন তিনি। তারপর তাঁর সমস্ত হৃদয় অদ্ভুত একটা সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তাঁর বিশ্বাস হ'ল আর কেউ না থাক মনু তাঁর কাছাকাছি আছে এবং চিরকাল থাকবে।

বারো

নবীগঞ্জের হাটের কাছে সেই বড় দীঘিটার ধারে চেয়ার টেবিল পেতে বসেছিলেন সদাশিব। দীঘির ধারে জগদীশ কুঁজড়ার বাড়ি। অপারেশন করবার পর জগদীশ ভালো

হ'য়ে গেছে। আজবলাল চলে' যাওয়ার পর থেকে তিনি দুপুরে আর বাড়িতে খেতে যান না। আলীর সহায়তায় বাইরের কোথাও না কোথাও রান্না করে' নেন। আলীও রাঁধে ভালো। তাছাড়া যেখানে রান্না করা হয় সেখানে আশেপাশে তাঁর চেনা রোগী থাকেই। তারাও এসে আলীকে সাহায্য করে। সেদিন জগদীশের বউ ছেলেমেয়েরা আলীর সহকারী হয়েছিল। কেউ মসলা বেটে দিচ্ছে, কেউ জল তুলে আনছে, কেউ তরকারি কুটে দিচ্ছে। নতুন-ধরনের এক যাযাবর জীবন যাপন করছেন সদাশিব। রোজই কোথাও না কোথাও যেন পিকনিক হচ্ছে।

সদাশিব ডায়েরি লিখছিলেন।

"আজবলাল আর ফেরেনি। লিখেছে তার জমি নিয়ে বড্ড বেশী জড়িয়ে পড়েছে, তার এক জ্ঞাতি নাকি তার সঙ্গে মকদ্দমা করছে জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে। লিখেছে মকদ্দমা শেষ হ'লেই ফিরে আসবে। আমি জানি আসবে না। জমির মকদ্দমা সহজে মেটে না।

"মালতীর খবরও পাই মাঝে মাঝে। উত্তরপ্রদেশের তীর্থগুলি একে একে দেখে বেড়াচ্ছে। কোন কোন জায়গায় থেকেও যাচ্ছে বেশ কিছুদিন। চিরঞ্জীব লিখেছে মালতী অনেক ভালো আছে। 'ফিট্' আর হয়নি। মালতী নাকি প্রত্যেক তীর্থস্থানে গিয়ে মন্দিরেই অধিকাংশ সময় কাটায়। চিরঞ্জীবই একটু মুশকিলে পড়েছে। তার ধর্মে তেমন মতি নেই। লিখেছে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলো আবার পড়তে শুরু করেছি। আরও লিখেছে— টাকা যদি বাঁচে কাশ্মীরটা দেখে আসবার ইচ্ছে আছে। আমি তাকে লিখে দিলাম, টাকার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর বেড়িয়ে এস। যারা যেখানে থেকে সুখী থাকে থাক। আমার জন্যে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

"সোহাগরাও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বিলেতেই থাকবে। লিখেছে বছরে একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করে' যাবে। প্লেনে আসতে-যেতে বেশী সময় লাগবে না। আসে যদি ভালোই, না-ও যদি আসে তাতেই বা ক্ষতি কি! কারো জন্যে কিছু আটকায় না। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা ঝুমকোলতা ছিল। বাঁশের একটা মাচার উপর ভর করে' অজস্র ফুল ফোটাত সে। একদিন ঝড় হ'য়ে তার মাচাটা পড়ে' গেল। নূতন মাচা আর কেউ দিলে না তাকে। লতাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে' রইল দু'চারদিন। পাশেই ঝোপঝাড় ছিল কতকগুলো বুনো গাছের। লতাটা ক্রমশঃ সেই দিকে তার ডালপালা বিস্তার করতে লাগল। বছরখানেক পরে কলেজের একটা ছুটিতে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখি ভাঙা মাচাটা অন্তর্ধান করেছে, কিন্তু ঝুমকোলতাটা সগৌরবে বেঁচে আছে তখনও। পাশের ঝোপটা আশ্রয় করেই অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে। ঝোপেঝাড়ে খ্যাতিহীন অন্য ফুলও ফুটেছে অনেক। অনেক বুনো-লতাও জড়িয়ে গেছে ঝুমকোলতাটার সঙ্গে। তাদেরও ফুল ফুটেছে। তাদের দলে ঝুমকোলতাকে কিছু বেমানান মনে হয়নি। মাচার আশ্রয় হারিয়ে ঝুমকোলতা মরে' যায়নি, নূতন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে, সেইখানেই সার্থক করেছে নিজেকে।

"আমার জীবনের মাচাও বার বার বদলেছে। বার বার বদলির চাকরি করেছি, আজ-এখানে-কাল-ওখানে করেই কেটেছে জীবনের বেশীর ভাগ। পুরাতনকে ছেড়ে নূতনের কাছে বার বার গেছি, তার সঙ্গে নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়েছি, পুরাতন বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়েছে। সেই নূতনও পুরাতনে বিলীন হয়েছে আবার, তাকে আঁকড়ে বেশী দিন থাকতে পারিনি। এর নামই জীবন। আমার জীবনের মঞ্চে যাদের স্থায়ী সম্পদ বলে' মনে হয়েছিল, আজ দেখছি তারাও একে একে সরে' গেছে। চিরঞ্জীব, মালতী, সোহাগ আজ কোথায়? মনু অনেক আগেই চলে' গেছে। সেদিন সকালে তার যে আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেটা বোধ হয় আমার অবচেতন মনেরই সৃষ্টি। আমার যে কামনা মনের নিগূঢ় লোকে বসে' তাকে চাইছে, সেই কামনাই হয়তো মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। কই, আর তো তাকে কোনদিন দেখিনি। ওদের চিন্তা, ওদের সুখদুঃখ আগে আমাকে বিচলিত করত, এখন তো আর করে না। আমার গাড়ি ওদের স্টেশন ছেড়ে চলে এসেছে। এখন নূতন স্টেশনে নূতন লোকের ভিড়। মন তাদের নিয়েই ব্যাপৃত আছে। আজ কেব্‌লী, ছিপলী, গীতা, জগদীশ এদের সুখদুঃখেই আমি বেশী আন্দোলিত।

"কেব্‌লীর স্বামী নারাণ আমাকে এড়িয়ে চলছে। দেখা হবেই কোথাও-না-কোথাও। আলীকে বলেছি তাকে খবর দিতে। ছিপলীর স্বামী জিতু ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে ভালো আছে বলছে। আমার কিন্তু মনে হয় না ও সেরে যাবে। যদি কিছু উপকার হ'য়ে থাকে সেটা সাময়িক। ছিপলীর হাতে রুপোর খাড়ু ছিল, এখন সেগুলো নেই দেখছি। সম্ভবতঃ ওষুধ কেনবার জন্য সেগুলো বেচে দিয়েছে। আমি ওকে বলেছিলাম আমি ওষুধ কিনে দিচ্ছি, তুই পরে টাকা দিয়ে দিস। কিন্তু ছিপলী তাতে রাজী হয়নি। বলেছিল, টাকার বন্দোবস্ত আমরা করেছি।

"আশ্চর্য মেয়ে এই ছিপলী। সদা হাস্যমুখী, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। চালচলন দেখে মনে হয় ভ্রষ্টা নয়। ওর সঙ্গে হাসিঠাট্টা অনেকে করে বটে, কিন্তু মনে হয় তার বেশী আর কেউ অগ্রসর হ'তে পারে না। ছবিলাল মোড়লের ছেলে একদিন বাজারে ওকে কি একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। ছিপলী বঁটি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল, তোর নাক কেটে দেব। তা ও পারে।

"গীতার সেই বাভন মহাজন সেদিন এসেছিল তার দলিলপত্র নিয়ে। দেখলুম গীতার স্বামী বহুদিন আগে দু'শ' টাকা নিয়েছিল। দু'বছর ধরে' ওরা স্বামী-স্ত্রী ওর বাড়িতে বিনা বেতনে খেটেছে, কিন্তু ধার এখনও শোধ হয়নি। বাভন বলেছে এখনও দেড়শ' টাকা বাকি আছে। আমি আর ও নিয়ে কচলাকচলি না করে' টাকাটা দিয়েছি ওকে।

"গীতা বলেছে দুধ দিয়ে আর ঘুঁটে দিয়ে টাকাটা শোধ করে' দেবে। আমি তাতেই রাজী হয়েছি। আর একটা প্রস্তাব করেছিল গীতা, আমি তাতে রাজী হইনি। সে বলেছিল, মালতী দিদি তো এখন নেই, তিনি যতদিন না আসবেন আমি আপনার

বাড়িতে কাজকর্ম করে' দেব। বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে নেই ; আপনার হয়তো কষ্ট হচ্ছে। এ প্রস্তাবে রাজী হইনি আমি। এমনই তো আমার নামে নানারকম নিন্দা রটিয়ে থাকেন আমার তথাকথিত বন্ধুরা। গীতার মতো এক রূপসী যুবতী যদি আমার বাড়িতে ঘুরঘুর করে তাহ'লে তো খই ফুটবে সকলের মুখে।

"·· এদের কেন্দ্র করেই নূতন জীবন গড়ে' উঠেছে আবার। বাঁচবই বা আর ক'দিন ? শমনের নোটিশ এসে গেছে। ইউরিনে অ্যালবুমেন দেখা দিয়েছে, ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। এর চিকিৎসা হচ্ছে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হিন্দুবিধবার আহার খেয়ে জড়ভরতের মতো পড়ে' থাকা। তা আমি পারব না। জীবন্মৃত হ'য়ে থাকার চেয়ে মরে' যাওয়া ঢের ভালো। মরে' না গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে থাকলে অবশ্য শোচনীয় ব্যাপার হবে সেটা। কিন্তু যারা খুব নিয়মে থেকেছে এরকম লোকেরও তো পক্ষাঘাত হ'তে দেখেছি···"

সদাশিবের লেখায় বাধা পড়ল।

জগদীশের ছোট মেয়ে ফুদিয়া ছুটে এসে জিগ্যেস করলে, "মা ঠেকুয়া বানিয়েছে, খাবেন ?"

"নিশ্চয় খাব। তবে একটার বেশী নয়—"

সুসংবাদ বহন করে' ছুটে চলে' গেল ফুদিয়া।

ডাক্তারবাবু তাদের বাড়ির তৈার ঠেকুয়া খাবেন এটা যেন একটা আশাতীত ব্যাপার।

আলী এসে চুপি চুপি বললে—"হুজুর, খানা তো পক্ গিয়া। অভি খাইয়ে গা ?"

"একটু পরে খাব—"

"তব্ হম্ নারাণকো পকড়কে লে আবেঁ ?"

"নারাণকে কোথা পাবে এখানে ?"

"বহ্ দেখিয়ে, খাপরা ছা রহা হ্যায়—"

আলী একটু ঝুঁকে ডানহাতের তর্জনী-মধ্যমা একত্র করে' দুটো গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখাতে লাগল। সদাশিব দেখতে পেলেন একটা খাপরার ঘর ছাওয়া হচ্ছে।

"ডেকে নিয়ে এস—"

আলী চলে' গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইক করে' এসে হাজির হল ফালতু।

কমলের কারখানার অ্যাপ্রেন্টিস্।

"হুজুর, মুর্গ মসল্লম্ ভেজ্ দিহিন কমলবাবু—"

কমলের একটা চিঠিও ছিল।

"ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যে একটা মুর্গ মসল্লম্ পাঠালাম। আপনি খেলে বিশেষ আনন্দিত হব। ফালতুকে বলেছি আপনি যেখানেই থাকুন সে আপনাকে খুঁজে গিয়ে দিয়ে আসবে—"

"তুই কি করে' খোঁজ পেলি যে আমি এখানে আছি?"

"উলফৎ বললে—"

ফালতুর বুদ্ধি দেখে প্রীত হলেন সদাশিব। তাঁর দৈনন্দিন গতিবিধি যে উলফৎই জানে একথা ফালতু কি করে' জানল? খুশী হলেন সদাশিব। ফরসা লম্বা কিশোর ছেলেটির মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। ফালতুরও চোখের দৃষ্টি হাস্য-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। সদাশিব পকেট থেকে একটা টাকা বার করে' দিতে গেলেন তাকে।

"নেহি হুজুর—"

সেলাম করে' সরে' দাঁড়াল সে মুচকি হাসতে হাসতে। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

"পিছেকা চাক্কা মে হাওয়া নেহি হ্যায়!"

"পাম্প করে' দাও—"

"আলী কাঁহা?"

"সে আসছে এখুনি। সে এসে পাম্প বের করে' দেবে। তুই এখানেই খেয়ে যা—"

ফালতু হেসে একবার চাইলে তাঁর দিকে, যেন এমনই একটা কিছু প্রত্যাশা করছিল সে। তারপর সে গাড়িটাকেই প্রদক্ষিণ করে' ঘুরতে লাগল যদি আরও কিছু গলদ চোখে পড়ে। হঠাৎ সদাশিব লক্ষ্য করলেন তার কামিজটা বড্ড ছেঁড়া। পিঠের মাঝামাঝি লম্বালম্বি ছিঁড়ে গেছে। তিনি একটা কাগজে একটা চিঠি লিখে ফালতুকে বললেন—"তুই যখন ফিরে যাবি তখন বাজারে হরিকিষুণবাবুর দোকানে এই চিঠিটা দিয়ে দিস—"

"কাপ্‌ড়াকা দোকান যিন্‌কা হ্যায়?"

"হাঁ—"

সদাশিব হরিকিষুণবাবুকে লিখে দিয়েছিলেন ফালতুকে ফালতুর গায়ের মাপে একটা কামিজ তিনি যেন দিয়ে দেন। তিনি দাম পরে পাঠিয়ে দেবেন। ফালতুকে সে কথা আর বললেন না। যদি না নেয়! ওদের আত্মসম্মানজ্ঞান খুব বেশী।

একটু পরেই আলীর সঙ্গে নারাণ এসে হাজির হ'ল। নারাণের রং নিকষকৃষ্ণ, শরীর বেশ বলিষ্ঠ। মনে হয় কষ্টিপাথর কুঁদে কোনও শিল্পী যেন সৃষ্টি করেছে ওকে। যেন একটা কাফ্রী অসুর। তার চলনে এবং দৃষ্টিতে একটা মার্জার-সুলভ ভাব আছে। এদিক-ওদিক চেয়ে ঈষৎ হেলে-দুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলাফেরা করে, দেখলেই চোর বা ডাকাত বলে' সন্দেহ হয়।

"কি নারাণ, শুনছি তুমি বিয়ে করতে চাইছ আবার—"

"জি হুজুর—"

নারাণ বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিলে।

"কেব্‌লী তো আছে, আবার বিয়ে কেন—"

"ভিতর মে বাত্‌ ছে হুজুর—"

ছেকা-ছিনি ভাষায় আলাপ হ'ল। তার মর্মাথ এই—

"ভিতরে আবার কি কথা আছে?"

"কেব্‌লীর যে ছেলেপিলে হয়নি। আমার বংশ লোপ পেয়ে যাবে যে—"

"কিন্তু এতে কেব্‌লীর মনে কষ্ট হবে না?—"

"দুদিন কষ্ট হবে। তারপর ঠিক হ'য়ে যাবে। আমাদের সমাজে তো এরকম আখছার হচ্ছে। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সে বিধবা। তার আগেকার স্বামীর জমি ও পেয়েছে। তাই ওর বাবা বলেছে যে কেব্‌লীকে ও দু'বিঘে জমি লেখাপড়া করে' দিয়ে দেবে। এতে কেব্‌লীর আখেরে সুবিধে হবে কত।"

"কিন্তু তোমার বদলে দু'বিঘে জমি পেলে কি কেব্‌লী সুখী হবে? হবে না। ও তোমাকে খুব ভালবাসে। এটা জেনে রেখ ওর জন্যেই তুমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ। ওর মনে কষ্ট দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আর ছেলে না-হওয়ার কারণ যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহ'লে হাজারটা বিয়ে করলেও তোমার ছেলে হবে না—"

চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল নারাণ।

তারপর বলল, "আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব—"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন। কেব্‌লীকে তুমি মারধোর করেছ কেন?"

নারাণের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

"না, মারব কেন। মারিনি তো। আমি কিচ্ছু করিনি।"

"কিন্তু ওর মাথায় রক্ত দেখলাম যে—"

"ও মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নিজেই রক্ত বার করেছে কপাল থেকে। আমি কি করব!"

"তাই নাকি!"

কেব্‌লী-চরিত্রের আর একটা দিক সহসা প্রতিভাত হ'ল সদাশিবের কাছে। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন কেব্‌লী নারাণকে কতটা ভালবাসে। তাঁর ভয় হ'ল নারাণ বিয়ে করলে কেব্‌লী আত্মহত্যা করে' বসবে না তো?

"আমি এবার কাজে যাই হুজুর?"

"যাও। কথাটা ভেবে দেখো—"

"জি হুজুর।"

কিন্তু নারাণের মুখভাব দেখে সদাশিবের মনে হ'ল ও বিয়ে করবেই।

"খানা ঠাণ্ডা হো রহা হুজুর—"

ফিসফিস করে' আলী এসে বললে।

"হ্যাঁ, এবার খেতে দাও—"

আলী প্লেট সাজাতে লাগল।

জগদীশের দুই ছেলে এক মেয়েও খেতে বসল। কালভুও। একটু পরে জগদীশ এসে বসল একধারে।

"আমাকে আর কতদিন ঘরে বসিয়ে রাখবেন ডাক্তারবাবু, আমি তো ভালো হ'য়ে গেছি। হাটে না গেলে পেট চালাব কি করে' ?"

"তোমার বউ হাটে যাক না—"

"ও বড় সরমিলা (লাজুক), কোথাও যেতে চায় না। যাওয়াও মুশকিল। আজকালকার ছোঁড়াগুলো বড় পাজি। রাস্তায় জোয়ান মেয়ে দেখলেই পিছু নেয়—"

"আর সাতটা দিন কোনরকম করে' কাটিয়ে দাও। অতবড় অপারেশন হয়েছে, ভারী ভারী মোট তোলা এখন চলবে না—"

জগদীশ চুপ করে' রইল।

"আর কাউকে বলো না, তোমার তরি-তরকারিগুলো নিয়ে বেচে দিক—"

"বিরজু নিয়ে যায়। কিন্তু হিসেব ঠিক দেয় না। সেদিন কুড়িটা কদ্দু (লাউ) বিক্রি করে' মাত্র আড়াই টাকা এনেছে। চার আনার কম কি কোন কদ্দু বিক্রি হয়? অথচ ওকে কিছু বলা যায় না, গোতিয়া (জ্ঞাতি)—"

"আর সাতটা দিন কাটিয়ে দাও কোনরকমে।"

সদাশিব যে এখানে এসে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তার একটা কারণ, তিনি এখানে খেলে ওরাও খেতে পাবে। সে কথাটা প্রকাশ্যে ওদের বলেননি। কিন্তু আলীকে গোপনে বলে' দিয়েছেন। আলী বেশী বেশী করে' রান্না করেছে। পাছে ছোঁয়া যায় বলে' ভাত-ডালটা জগদীশের বউই নাবিয়ে দিয়েছে। কিছু নটে' শাক সে সকালবেলাই তুলে রেখেছিল তাই ভেজেছে, আর লাউয়ের তরকারি করেছে একটা। ডাল আর আচার সহযোগে এই এদের কাছে রাজভোগ। ডাল-ভাতই প্রচুর পরিমাণে জোটানো শক্ত, রোজ জোটে না। সদাশিব ক'দিন থেকে এখানে খাচ্ছেন বলে' পেট ভরে' খেতে পাচ্ছে ওরা।

...খাওয়া-দাওয়ার পর গাছতলায় ইজিচেয়ারটা পেতে শুয়ে পড়লেন সদাশিব। বরাবর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর শোয়া অভ্যাস। এই সেদিন পর্যন্ত পালঙ্কের উপর শুভ্র বিছানায় ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় ঘুমিয়েছেন। ইচ্ছে করলে এখনও ঘুমুতে পারেন। কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করে না। গাছতলায় খোলা হাওয়ায় ফোল্ডিং ক্যাম্প-চেয়ারে শুয়েই বেশী আনন্দ পান এখন। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন মন্নু এসেছে। হেসে বলছে, কাশী গিয়েছিলাম, খুব ভালো জর্দা এনেছি। ঘুমটা ভেঙে গেল। মন্নু যে জর্দা খেত একথা তাঁর মনেই ছিল না।

তেরো

নবীপুর হাটে সদাশিব সেদিন একটা নাটকীয় কাণ্ড করে' বসলেন। ডাক্তারি-বিদ্যার প্রয়োগ হিসাবে তাতে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু হাটসুদ্ধ লোক

চমৎকৃত হ'য়ে গেল, হাট ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল প্রায়। সবাই রাধাকিষুণ বাবাজিকে ঘিরে দাঁড়াল এসে। লোকটির নাম রাধাকিষুণ নয়, মঙ্গলদাস। কিন্তু সকলেই তাকে রাধাকিষুণ বলে' ডাকে, কারণ রাধাকিষুণ বললে সে ক্ষেপে যায়। প্রকাণ্ড একটা টিকি আছে মঙ্গলদাসের। রাস্তায় বেরুলেই ছেলের দল তার পিছনে লাগে—'টিকৃকি মে রাধাকিষুণ', 'টিকৃকি মে রাধাকিষুণ'—বলতে বলতে ছোটে পিছু-পিছু। মঙ্গলদাস দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যায় তাদের। তারা হৈ হৈ করে' হাসতে হাসতে দুড়দাড় করে' ছুটে পালায়। এ খেলা অনেকদিন থেকে চলছে। অনেকে বলে, ওই তেড়ে যাওয়াটা মঙ্গলদাসের মেকি রাগ-দেখানো, আসলে ও ছেলেদের মুখে রাধাকিষুণ নামটা শুনতেই চায় বার বার। বাইরে সে কালীসাধক। টিকিতে জবাফুল বাঁধা থাকে। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লোকে বলে মঙ্গলদাস খুব চালাক লোক। বাইরে সে কালীপূজা করে, আবার ছেলেদের মুখ থেকে রাধাকৃষ্ণের নামটাও শুনে নেয়। গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়।

ইদানীং কিছুদিন থেকে মঙ্গলদাসকে আর পথে-ঘাটে দেখা যাচ্ছিল না। কারণ সে একটি সাধক-সঙ্গিনী জুটিয়ে কামরূপে গিয়ে সাধনা করছিল নাকি। কিন্তু সেখানে আর একটি বেশী শক্তিশালী সাধক ছিলেন। মঙ্গলদাসের সাধন-সঙ্গিনী তাঁর খপ্পরে গিয়ে পড়ল। মঙ্গলদাস হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছে দিন কয়েক আগে। শুধু যে সাধক-সঙ্গিনীকে হারিয়েছে তা নয়, স্বাস্থ্যটিকেও হারিয়েছে। অতিরিক্ত 'কারণ' পান করার ফলে লিভারটি গেছে। প্রকাণ্ড উদরী হয়েছে এখন। সদাশিবের কাছে মঙ্গলদাস এসেছিল কয়েকদিন আগে। সদাশিব বলেছিলেন, এ রোগ সারবে না। তবে পেটের জলটা বার করে' দিলে কিছুদিন আরামে থাকবে। নবীপুরে মঙ্গলদাসের বাড়ি। সদাশিব হাটে এসে দেখলেন বিরাট পেট নিয়ে মঙ্গলদাস বসে' আছে।

"পানি নিকাল দিজিয়ে হুজুর। জান যা রহা হ্যায়।"

সদাশিব বললেন, "আচ্ছা, একটা বালতি আনাও। কত জল বেরুবে সেটা দেখতে হবে।"

বালতি যোগাড় হ'য়ে গেল একটা। তারপর সদাশিব তার ব্লাডপ্রেসার আর নাড়ী দেখলেন। ধী-বিশাল পাণ্ডের দোকানে বড় চৌকো-গোছের টুল ছিল একটা। সেইটের উপর বসালেন মঙ্গলদাসকে। তারপর পেটের নিচের দিকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে অসাড় করে' দিলেন জায়গাটাকে। তারপর পট্ করে' মোটা একটা ট্রোকার দিয়ে ছ্যাঁদা করে' দিলেন। পিচকিরির মতো জল বেরুতে লাগল আর পড়তে লাগল বালতিতে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে' গেল চারদিকে। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড!

মঙ্গলদাস চোখ বুজে বসে' ছিল।

হঠাৎ সে চোখ খুলে বললে—"নাম শুনাও বিরিঞ্চিয়াকে খবর দেও।"

একটু পরে বিরিঞ্চিয়ার দলবল খোল মাদল আর খঞ্জন নিয়ে এসে হাজির হ'য়ে নাম শোনাতে লাগল মঙ্গলদাসকে। "জে জে রাধা, জে জে কিষুণ, জে জে রাধা,

জে জে কিষুণ"—জে জে মানে জয় জয়। সদাশিব বাধা দিলেন না, উপভোগ করতে লাগলেন।

সদাশিবের একটু পরে চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে ছিপলীও দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে তিনটে বখা গোছের ছোঁড়া। প্রত্যেকেরই মাথায় বাহারে তেড়ি, চোখে রঙীন চশমা, পরনে হাওয়াই শার্ট আর ঢিলে পা-জামা। কথায় কথায় ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে' হাসছে।

ওদের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারলেন সদাশিব।

একজন স্থানীয় এক ডাক্তারের ছেলে। জাতে সোনার বেনে। ঠাকুর্দা তেজারতি করে' বড়লোক। জমিদারি কিনেছে। এ ছোক্‌রার কলেজে নাম লেখানো আছে। প্রফেসারদের ঘুষ দিয়ে কিংবা হুমকি দিয়ে পরীক্ষা পাস করে' যায়। সেদিন দলবল নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা দোকান লুঠ করেছে। পুলিস এদের কিচ্ছু বলে না। সবাই টাকার বশীভূত।

দ্বিতীয় ছোক্‌রা ছবিলাল মোড়লের ছেলে। ছবিলাল একজন কংগ্রেস-অনুগৃহীত ব্যক্তি। সুতরাং ছেলেটি একটি অকুতোভয় গুণ্ডা। এর প্রধান কাজ হচ্ছে পরের পাঁঠা চুরি করে' খাওয়া। গরীব মানুষেরা প্রায়ই ছাগল পোষে, ছাগলের বাচ্চা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। এ ছোক্‌রা সুবিধে পেলেই গ্রাস করে সেগুলি। ওদের পাড়ার গরীব লোকেরা অস্থির হ'য়ে উঠেছে ওর জ্বালায়। অথচ ভয়ে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিস ওদের সহায়।

তৃতীয় ছোক্‌রাটিকে সদাশিব চিনতে পারলেন না।

ওরা খুব সম্ভবতঃ ছিপলীকে নিয়েই হাসাহাসি করছিল। ছিপলীর কুঞ্চিত ভ্রূ এবং অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি দেখে তাই অনুমান করলেন সদাশিব। ছিপলী ভিড় ঠেলে ঠেলে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে তাঁর চেয়ারের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল। হো হো করে' হেসে উঠল ছোক্‌রা তিনটে।

একজন বলে' বসল—"বুড্‌ঢার কাছে গিয়ে কি মজা পাবে সহেলি— !"

ছিপলীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল। সদাশিব গম্ভীর হ'য়ে বসে' রইলেন। তারপর উঠে মঙ্গলদাসের কাছে গেলেন। অনেক জল বেরিয়েছিল। ট্রোকারের ক্যানুলাটা বার করে' নিয়ে বেন্‌জোইন্ দিয়ে সিল করে' দিলেন জায়গাটা।

সেই ছোক্‌রা তিনজন এগিয়ে এল এবং ছিপলীর উপর প্রায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে' সদাশিবকে বাংলায় জিগ্যেস করতে লাগল—"শিলাই করে' দিলেন না কি—"

সদাশিব আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না।

"নিকল্ যাও হিয়াঁসে—"

"নিকল্ যায়েঙ্গে! হাটিয়ামে তো সব কোইকো equal right হ্যায়—"

সদাশিব জনতার দিকে চেয়ে বললেন—"নিকল্ দেও এই তিন ছোক্‌রা কো—"

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠল সবাই এবং 'মার' 'মার' শব্দে তেড়ে গেল তাদের। দেখতে

দেখতে দাঙ্গা বেধে গেল একটা! প্রচণ্ড মার খেলে ছোক্‌রা তিনটি। চুলের ঝুঁটি ধরে' টানতে টানতে বার করে' দিল তাদের হাট থেকে। ধী-বিশাল পাণ্ডে একটু ভয় পেয়ে গেল। সদাশিবকে বললে, "ও তিনটেই হারামি ডাক্তারবাবু। ওদের ঘেঁটিয়ে ভালো করলেন না। আমার দোকানেই ব্যাপারটা ঘটল, হয়তো কোনদিন আমাকে এসে বে-ইজ্জত করবে। লুটও করতে পারে—"

"কোনও ভয় নেই। কি করবে ওরা। আমি এখনই থানায় ডায়েরি করে' দিচ্ছি। মঙ্গলদাস তুমি শুয়ে পড় এবার। কেমন লাগছে—"

"অনেক হাল্‌কা লাগছে। বিরিঞ্চ ভাই, আউর থোড়া নাম শুনাও—"

দাঙ্গার গোলমালে কীর্তন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। আবার শুরু হ'য়ে গেল—"জে জে রাধা, জে জে কিষুণ—"

ধী-বিশাল পাণ্ডের 'ধী' কতটা বিশাল তা বলা শক্ত কিন্তু দেহটি যে বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। বৃহৎ একটা ষাঁড়ের মতো চেহারা তার। সে নিজেই দোকানের বড় বড় চাল-ভরতি বোরাগুলোকে তুলে তুলে ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। দুটো উদ্দেশ্য। প্রথম, এইখানে খাটিয়া বিছিয়ে মঙ্গলদাসের জন্য বিছানা করে' দেওয়া। দ্বিতীয়, চালের বোরাগুলোকে ভিতরে সরিয়ে রাখা। কি জানি যদি ও গুণ্ডার দল এসে পড়ে তাহ'লে চালের বোরা পেলে নয়-ছয় করে' দেবে সব। চালের বোরাগুলি ভিতরের ঘরে পুরে তাতে তালা লাগিয়ে ধী-বিশাল একটা দড়ির খাটিয়া নিয়ে এল পিছন দিক থেকে। একটা ডগমগে রঙের শতরঞ্চি বিছালো তার উপর। তারপর বালিশ আনল একটি। বালিশটির বিশেষত্ব, খুব ছোট এবং টাইট্। মনে হয় দম বন্ধ করে' আছে, এখনি বুঝি ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়বে।

"ডাক্তারবাবু, মঙ্গলদাসজী এখানে কতক্ষণ থাকবে—"

"আজ দিনভোর থাক। সন্ধ্যের পর আস্তে আস্তে বাড়ি চলে' যাবে গাড়ি করে'।"

বিরিঞ্চ আর ধী-বিশাল মঙ্গলদাসকে ধরে' আস্তে আস্তে খাটিয়ায় শুইয়ে দিলে। মঙ্গলদাসের সঙ্গে বিরিঞ্চ বা ধী-বিশালের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যারা একথা জানে না, তাদের মনে হবে ওরাই এর পরমাত্মীয়।

সদাশিব নবীপুরের হাট থেকে সোজা থানায় চলে' গেলেন। যাবার সময় ছিপলীকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে'।

চৌদ্দ

জিরাফ-প্রতিম সিংহেশ্বর সিং দারোগা সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করলেন সদাশিবকে।

"আইয়ে আইয়ে ডাক্‌টার সাহেব, কেয়া সৌভাগ্য। পধারিয়ে। আপকা 'কিরপা' সে মুন্না তো একদম cured হো গয়া। আরে মুন্না, ডাক্‌টার সাহেবকো প্রণাম কর—"

একটা ফরসা কিশোর এসে লজ্জিতভাবে প্রণাম করল।

"ডাক্‌টার সাহেবকো কুছ্ নাশ্‌তা (জলখাবার) লা দেও—"

সদাশিব বললেন, "না, আমি এখন কিছু খাব না—"

"চায় ?"

"না। আমি যেজন্য এসেছি তা শুনুন।"

নবীপুর হাটের ঘটনা সব খুলে বললেন তাঁকে। তারপর বললেন, "ওই তিন ছোক্‌রার বিরুদ্ধে ডায়েরিতে লিখে নিন। এই ছিপলী মেয়েটাকে ওরা হাটে জ্বালাতন করছিল, হাটের সবাই দেখেছে। ওকে যা জিগ্যেস করতে চান করুন—"

সিংহেশ্বর গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। তারপর হিন্দীতে যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে, "ও ছোক্‌রা তিনটে যে পাজি তা তো সুবিদিত। কিন্তু ওরা আঁটঘাট বেঁধে এমনভাবে বদমায়েশী করে যে ওদের ধরা-ছোঁয়া যায় না। আমরা যদি কিছু করতে যাই আমরাই বিপদে পড়ে' যাব। কারণ যাদের অধীনে আমরা চাকরি করি, যাদের হুকুম অনুসারে আমাদের চলতে হয়, তারা ওদের সপক্ষে। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমি ডায়েরিতে লিখে নিচ্ছি। আপনি ব্যাপারটা এস. পি. এবং ডি. আই. জি-র কানেও তুলে দিন। ওঁরা বড় অফিসার, ওঁরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন।" তারপর হেসে বললেন—"যা 'জমানা' (দিনকাল) পড়েছে তাতে ওঁরাও পারেন কিনা সন্দেহ। চাকরির মায়া তো সকলেরই আছে।"

দারোগা সাহেব ছিপলীকে আপিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তারপর যথারীতি ডায়েরিটা লিখে নিলেন।

…ছিপলীকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে সদাশিব গেলেন ডি. আই. জি.-র কাছে। যেতে যেতে তাঁর মনে হ'তে লাগল তিনি ডাক্তার, ডাক্তারি ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা-গলাতে যাওয়াটা কি তাঁর উচিত হচ্ছে ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়ে গেলেন নিজের মনের ভিতর থেকেই। বহুকাল আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটা লেখা পড়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, কেমিষ্ট হ'য়েও তিনি কেন দেশের কাজে নেমেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ Henry Moissau-এর একমাত্র পুত্র Louis বিশ্বমহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যান। তিনিও একজন রসায়নবিদ্ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র Laski-র বিখ্যাত প্রবন্ধ—The Danger of Obedience থেকে কিছু উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই কথাগুলো সদাশিবের মনে পড়ল।

Men who insist that some particular injustice is not their responsibility sooner or later become unable to resent any injustice. Tyranny depends upon nothing so much as the lethargy of a people. Autocracy is born above all of the experience that it need not expect active resentment against injustice. This is the inner truth of Thoreau's famous sentence that 'under a government with

imprisons any unjustly the true place for a just man is also a prison'.

আরও খানিকটা কি ছিল কিন্তু সদাশিবের তা মনে পড়ল না। তবে তাঁর মনের সংশয় কেটে গেল। অন্যায় অসভ্য অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। ডাক্তার হয়েছেন বলেই তিনি এ কর্তব্যের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। দেশ এখন স্বাধীন বলেই এ দায়িত্ব আরও প্রবল হয়েছে। বহুকালের পরাধীনতা আর অশিক্ষার ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় লাগবে। বর্তমান সমাজের ও শাসনব্যবস্থার ভয়াবহ চেহারা দেখে ভয় পেলে চলবে না, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা যদি প্রাণপণে লেগে না থাকেন তাহ'লেই ভয়ের কথা। এই সব ভাবতে ভাবতে সদাশিব ডি. আই. জি.-র বাংলোয় পৌঁছলেন।

ডি. আই. জি. অফিসে কাজ করছিলেন। সেইখানেই সদাশিবকে ডেকে পাঠালেন।

"নমস্কার। আসুন, আমিই আপনার ওখানে যাব ভাবছিলাম।"

"কেন বলুন তো ?"

"সিরোসিস্ অব্ লিভার সারে কি ?"

"সেটা নির্ভর করে লিভারটা কতটা খারাপ হয়েছে তার উপর। কেন, কার হয়েছে সিরোসিস্ অব্ লিভার—"

"আমার। পাপী লোক তো! কতটা খারাপ হয়েছে তা কি পেট টিপে বুঝতে পারবেন ?"

"খানিকটা পারব। তবে ভালো করে' জানতে হ'লে কতকগুলো ল্যাবরেটরি টেস্ট্ আছে তা করতে হবে। তা এখানে হবে না, কোলকাতায় যেতে হবে—"

"তাই যাব। তবে, কোলকাতার ব্যাপার কি জানেন, কে ভালো ডাক্তার, কে রিলায়েবল্, কে নয়, তা ঠিক করা বড় শক্ত। অনেক ডিগ্রীধারী জুয়াচোর ফাঁদ পেতে বসে' আছে তো, প্রত্যেকের টাউট্ও ঘুরছে বাজারে। আপনি যদি কোন ভালো লোকের কাছে পাঠিয়ে দেন সেইখানেই যাব—"

"কি কষ্ট হয় আপনার ?"

"ডিস্পেপ্সিয়া। অম্বলে বুক জ্বালা করে বিকেলের দিকে—"

"সেটা সিরোসিস্ অব্ লিভারের জন্য না-ও হ'তে পারে।"

"মদ খাই যে। গিল্টি কন্‌শেন্স তো। এখন যিনি সিভিল সার্জন আছেন তিনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। ইন্‌জেক্‌শনও দিয়ে যাচ্ছেন রোজ একটা করে'। কিচ্ছু ফল হচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম আপনাকে একবার কন্‌সাল্ট করব।"

"মদ খেলে যে সিরোসিস্ হবেই এমন কোনও কথা নেই। হিন্দু বিধবাদেরও

সিরোসিস্ হ'তে দেখেছি। তারা মদ খায় না, ঝাল খায়, আর প্রোটিন্ নামমাত্র খায়। অনেকের মতে প্রোটিন ফুডের অভাবই সিরোসিসের একটা কারণ।"

"আমি তো রোজ দুটো করে' মুরগি খাই।"

"আপনি এক কাজ করুন, খাবার পর ফোঁটা-কয়েক অ্যাসিড্ খেয়ে দেখুন না, আপনার কষ্ট কমে কিনা।"

"বেশ, লিখে দিন প্রেসক্রপশন্ একটা।"

কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলেন। প্রেসক্রপশন্ লিখে বললেন, "আমার মোটরেই ওষুধ আছে। বলেন তো দিয়ে দি।"

"দিন—"

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এলেন একটা ছোট শিশি আর একটা ড্রপার নিয়ে।

"এটা অ্যাসিড্ হাইড্রোক্লোরিক ডিল। এর দশ ফোঁটা খাবেন একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে, খাবার পরই দু'বেলা। আউন্সখানেক জল দেবেন, বেশ টক।"

"থ্যাঙ্কিয়ু। এর দাম-টাম—"

"দাম অতি সামান্য, তা আর দিতে হবে না। তবে আমি একটা কাজের জন্যে এসেছি, যদি একটু সাহায্য করেন উপকৃত হব।"

"কি বলুন। আপনার সে লোকটা তো ছাড়া পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই—"

"হ্যাঁ। এ একটা অন্য ব্যাপার—"

সব বললেন খুলে।

ডি. আই. জি. একটু চুপ করে' থেকে বললেন, "থানায় ডায়েরি করিয়ে ভালোই করেছেন। আমি দেখব। ওই ছিপলীর সঙ্গে আপনার আলাপ হ'ল কি করে'?"

"ওদের বাড়িতে আমি চিকিৎসা করি। ওরা ঘরের লোকের মতো হ'য়ে গেছে।"

"ও, আচ্ছা আমি দেখব।"

তারপর হেসে বললেন, "আপনি যদি আপত্তি না করেন একটা হুইস্কি সোডা অর্ডার করি—"

"না না, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে আপনার সিরোসিস্ হয়েছে।"

টং করে' ঘণ্টা টিপতেই এক আরদালী এল।

"হুইস্কি সোডা—"

হুইস্কি-সোডায় এক চুমুক দিয়ে বললেন, "আপনার রিভলবার আছে?"

"আছে।"

"সঙ্গে থাকে তো?"

"না।"

"সঙ্গে রাখবেন। যে গুণ্ডা তিনটির নাম করলেন তারা সাংঘাতিক লোক। ওদের

কথা আমি শুনেছি। ওদের গায়ে হাত দেওয়া শক্ত। ওদের খুঁটির জোর আছে। অবশ্য আমি কিছু কেয়ার করি না। আমার রিটায়ার করবার সময় হ'য়ে এসেছে, ওরা আমার বেশী কিছু করতে পারবে না। তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন—"

"স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতাটা একটু বেড়েছে—"

"বাড়বেই তো। আমি তো ইংরেজ আমলের লোক, এদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। খদ্দর পরে' যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেবেছিল তাদের মধ্যে ওয়ান পারসেণ্ট লোক ভালো ছিল কিনা সন্দেহ। তাদের হাতেই রাজত্ব গেছে, তারা লুটেপুটে খাচ্ছে। সেদিন এক গ্রামে এক বড় গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে, গ্রামের লোক তাড়া করাতে ডাকাতগুলো পালিয়েছিল। কিন্তু তারা যে জীপ্‌টায় এসেছিল সেটা নিয়ে যেতে পারেনি। দেখা গেল যে জীপ্‌টা একজন হোমরাচোমরা রাজপুরুষের—"

"কি করলেন আপনারা—"

"কি আর করব। তিনি বললেন, তাঁর জীপ্‌টাও ডাকাতরা চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা ধামা-চাপা পড়ে' গেল। দুরাত্মার পিছনে যদি রাজবল থাকে তাহ'লে সে দিন-দুপুরে হাতে মাথা কাটবে—"

"এর প্রতিকার কি ?"

"প্রতিকার ? It will come in time! ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ইতিহাস পড়েছেন ?"

"ভালো করে পড়িনি।"

"পড়ে' দেখবেন। ওর মধ্যে অনেক শিক্ষাপ্রদ জিনিস আছে।"

ডি. আই. জি. হাসিমুখে হুইস্কি-সোডা সিপ করতে লাগলেন।

"আচ্ছা, এবার উঠি আমি।"

"আচ্ছা। নমস্কার। দিন আষ্টেক পরে খবর পাঠাব কেমন আছি। নমস্কার।"

পনেরো

সদাশিবের মোটর বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাজারে তিনি রোজ একবার করে' যান, শুধু বাজার করবার জন্যেই নয়, বাজারের লোকদের খবর নেবার জন্যেও বটে। মাঝে কয়েকদিন যেতে পারেননি। সেদিন গিয়ে আবদুলকে দেখতে পেলেন না। শুনলেন তার জ্বর হয়েছে। তার জায়গায় জগদম্বা বসে' মাছ বিক্রি করছে।

জগদম্বা মাছের ব্যবসা ছেড়ে চায়ের দোকান করেছিল, তার দোকানের বড় কাচের বোতলে রঙীন মাছ ছিল, সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবিও টাঙানো ছিল অনেকগুলো। চা বিক্রিও হ'ত খুব। হঠাৎ সে আবার মাছ বিক্রি করতে বসল কেন ? জগদম্বা বললে,

লোকে ধারে চা আর পান খেয়ে দোকানটা তার উঠিয়ে দিলে। সে কাকে 'না' বলবে? বাবুভেইয়ারা পর্যন্ত ধারে নিতে আরম্ভ করেছিল। তার পুঁজি আর কতটুকু! সুতরাং দোকান তুলে দিতে হয়েছে। এখন সে আড়তদারের মাছ বিক্রি করে। যা লাভ হয় ভাগাভাগি করে' নেয়।

ছিপলী তার কোণটিতে ঠিক বসে' ছিল। তাঁকে দেখে মৃদু হেসে বললে যে তাঁর জন্তে সে সন্থ-ধরা টাটকা রুই মাছের পেটি খানিকটা রেখে দিয়েছে। আরও একটি সুখবর দিল সে। সেই গুণ্ডা ছোঁড়া তিনটিকে পুলিসে ধরে' নিয়ে চালান দিয়েছে। তার কাছে ভগলু মহলদার বসে' ছিল প্রকাণ্ড একটা চিতল মাছ নিয়ে। সদাশিব দেখলেন তার একটা চোখ বেশ ফুলে রয়েছে।

"চোখে কি হ'ল ভগলু?"

ভগলু মৃদু হেসে চুপ করে' রইল, তার ঝাঁকড়া গোঁফগুলো কম্পিত হ'তে লাগল শুধু।

"কি হ'ল চোখে—"

চিতল মাছটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—"ই শালা মারিস হ্যায়।"

চিতল মাছের ল্যাজের ঝাপটায় চোখটা জখম হয়েছে তার। সদাশিব চোখটা দেখলেন। তারপর বললেন, "বিশেষ কিছু হয়নি, সেক দিও। আর আমি ওষুধ একফোঁটা দিয়ে দেব চোখে "

বাঁড়ুয্যে মশাই যথারীতি মাছ ঘাঁটছিলেন বসে'।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। ভালো আছেন? ক'দিন আসতে পারিনি।"

বাঁড়ুয্যে ঘাড় তুললেন না। হেঁটমুণ্ডেই উত্তর দিলেন, "নমস্কার। আপনি আমার ওখানে খাবেন বলেছিলেন, কই এলেন না তো!"

"নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। ভুলেই গেছি।"

"তা বুঝতে পেরেছি। গরীবের কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন সদাশিব।

"আচ্ছা, আজই যাব। বারোটা নাগাদ যাব আপনার বাসায়।"

"বেশ—"

হঠাৎ সরখেলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল। তাঁর বাঁ হাতে রুমালে বাঁধা কতকগুলি কুঁচো মাছ। চোখেমুখে একটা চাপা অপ্রসন্নতা ফুটে রয়েছে। দারিদ্র্য-জনিত যে অসন্তোষের আগুন তাঁর অন্তরে ধিকিধিকি অহরহ জ্বলে তার শিখা তাঁর চোখেমুখে পরিস্ফুট। সৌভাগ্যবান লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। সদাশিবকে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলেন। বাজারের সেরা মাছ মাংস তাঁর বাড়িতে রোজ যায় এইটেই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। সদাশিবকে দেখলেই তাঁর চোখেমুখে একটা উগ্রভাব দেখা দেয়। ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসেন অবশ্য, কিন্তু তা ঈর্ষা-ক্লিষ্ট তিক্ত হাসি।

"নমস্কার। আপনার জন্তে তো রুই মাছের পেটি কেটে রেখেছে মেছুনীটা। আমিও নিতুম, কিন্তু একটু দোরসা মনে হ'ল, তাই আর নিলাম না। খুব 'রেয়ার' জিনিস পেয়ে গেছি একটা—"

"কি—"

"টাট্‌কা ট্যাংরা মাছ। এ দেশে দুর্লভ—"

"তা বটে—"

নমস্কার করে' সরখেল কেটে পড়লেন।

তারপর দেখা হ'ল প্রফেসার জলধরবাবুর সঙ্গে। থলথলে মোটা মানুষ। বাজারে কখনও আসেন না। ভিড়ে আর ঠেলাঠেলিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন।

"নমস্কার, নমস্কার, আপনি হঠাৎ বাজারে যে!"

"আর বলেন কেন। জামাই এসেছে। গিন্নী বললেন তুমি নিজে গিয়ে রুই মাছের মুড়ো নিয়ে এস একটা। কিন্তু রুই মাছ তো নেই। সবই দেখছি আড়, শিলং আর বাঘাড়। এই ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে' খোঁজাও তো মুশকিল—"

"দাঁড়ান দেখছি—"

তিনি এগিয়ে গেলেন ছিপলীর কাছে।

"তুই যে রুই মাছটা কেটেছিলি তার মুড়োটা কোথা?"

"তোরহ্ বাস্তে রাখলি—"

ছিপলী আলাদা করে' রেখে দিয়েছিল মাছ আর মুড়ো পিছনের দিকে একটা ঝুড়িতে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে।

"মুড়োটা প্রফেসার সাহেবকে দিয়ে দে। জলধরবাবু, মুড়ো পাওয়া গেছে একটা—"

জলধরবাবু আকর্ণ হাসি হেসে বললেন—"বাঁচালেন মশাই। মুড়ো না নিয়ে গেলে জামাইয়ের কাছে মান থাকত না। এর দাম—"

ছিপলী দাম নিতে চাইছিল না। সদাশিব ধমক দেওয়াতে নিলে।

জলধরবাবু একটু অবাক হলেন—"দাম নিতে চাইছে না কেন!"

"ও আমার বেটী কিনা। তাই আপনাকেও খাতির করছিল।"

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জলধরবাবু চলে' গেলেন।

সদাশিব চারদিক একবার চেয়ে দেখলেন। পরিচিত সবাইকেই দেখতে পেলেন। বাজারে এসে নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকে স্বরূপ প্রকাশ করে' ফেলেন। পবিত্রবাবু মাছের বাজারে ঘোরেন যেন তিনি নিজের জমিদারি পরিদর্শন করছেন। স্কুলমাস্টার শম্ভুবাবু সর্বদাই কুণ্ঠিত, ভিড়ের মধ্যে সাইকেল ঠেলে' ঠেলে' ঢোকেন, দেখা হ'লেই ঘাড়টি নুইয়ে নমস্কার করেন। তাঁর সাইকেলটি একটি জবড়জং ব্যাপার। সামনে পিছনে বেতের ঝুড়ি নানারকম জিনিসে ভরা। তরি-তরকারি, ওষুধ, কাপড়।

শম্ভুবাবু ভোর সকালে টিউশনি করতে বেরোন। দুটো টিউশনি সেরে' এসে বাজার করেন। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করেই স্কুলে ছোটেন। স্কুল থেকে আর

বাড়ি ফেরেন না, টিউশনি করতে যান। রাত দশটা পর্যন্ত টিউশনি করেন। ঘানির বলদরাও বোধ হয় এত খাটে না। অথচ তাঁর মুখে কোন অসন্তোষ বা ক্ষোভের গ্লানি নেই। মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে।

ত্রৈলোক্যবাবুর স্বভাব কলহ করা। তিনি মাছ কিনবেন একপো কি দেড়পো কিন্তু তার বায়নাক্কা অনেক। ওজনদাঁড়ির 'পাষাণ' দেখবেন, মাছ টাটকা কি বাসি দেখবেন, মাছের সঙ্গে 'কানকো' বা ফুলখারা দিচ্ছে কিনা দেখবেন, পরিশেষে দর নিয়ে কচলা-কচলি করবেন। তাঁর মুখটা নাক-সর্বস্ব। খাঁড়ার মতো নাক। টকটকে ফরসা রং, কটা চোখ। মনে হয় কোন সাহেব যেন বাঙালী পোশাক পরেছে। জেলেরা তাঁর নাম দিয়েছে সাহেববাবু। তিনি মাছ কেনবার সময় এত হাঙ্গামা করেন, কিন্তু জেলেরা এতটুকু বিরক্ত হয় না। তাঁর এই সব অন্যায় আবদার হাসিমুখে সহ্য করে তারা।

কতরকম লোকই যে আসে বাজারে। একদল আসে তাদের ব্যক্তিত্ব বলে' কিছু নেই। মুখের দর্পণে কোন ভাব প্রতিফলিত হয় না। বোদা চেহারা। ভিড়ের মধ্যেও যেমন, ফাঁকা জায়গাতেও তেমনি। কথা বলে না, গা বাঁচিয়ে চলে, টুক করে' বাজারে ঢোকে, টুক করে' বেরিয়ে যায়। অনেকটা শশক-প্রকৃতির।

হঠাৎ যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তিনি একজন খবরের কাগজের ঘুণ। দু'তিনটি কাগজ তন্ন তন্ন করে' পড়েন এবং কারো সঙ্গে দেখা হ'লেই খবরের কাগজের খবর নিয়েই আলোচনা করেন।

"ডাক্তারবাবু নমস্কার। নেহেরুর কাণ্ডটা দেখেছেন? আমাদের অতখানি জায়গা পাকিস্তানকে দিয়ে দিলে! যেন ওর বাপের সম্পত্তি। ও যদি আর কিছুদিন প্রাইম মিনিস্টার থাকে আমাদের প্রত্যেকের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে দেবে—"

সদাশিব সাধারণতঃ রাজনৈতিক তর্ক করেন না। মুচকি হাসলেন একটু। উত্তেজিত যোগেনবাবু বললেন, "আপনি কেন যে খদ্দর পরেন বুঝি না। ওই খদ্দরধারীরাই তো আমাদের দফা নিকেশ করে' দিলে। বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করে' দেবে ওরা, দেখে নেবেন। দেখবেন ঠিক দেবে। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি হয়।"

যোগেনবাবুর ক্ষোভের কারণ আছে। তিনি রিটায়ার করবার পর এক্‌স্‌টেনশন পাননি। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পাননি। তাঁর ছেলে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক, একবার ফেল করে' আই. এ., দু'বার ফেল করে' বি. এ. পাস করেছে। কোথাও তাকে ঢোকাতে পাচ্ছেন না। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পাচ্ছেন না। আহা, আজ যদি হ্যামিলটন সাহেব থাকত তাহ'লে তাঁর ছেলের চাকরির ভাবনা! সেলাম করলেই চাকরি হ'ত। বার বার এই কথাই বলেন।

যোগেনবাবু একটি সাংঘাতিক খবর দিলেন।

"মহেন্দ্রবাবুর খাবার আপনার বাড়ি থেকে যায় তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁর খবর জানেন?"

"না। অনেকদিন দেখা হয়নি।"

"শুয়ছে—"

"তাই না কি?"

"যান একবার দেখে আসুন।"

"শুয়ছে? আমাকে তো কোন খবর দেননি।"

"খবর দিলে যদি খাওয়াটি বন্ধ করে' দেন, সেই ভয়ে দেননি। রোজ রসগোল্লা কিনে খেতেন। আপনি নাকি খেতে বলেছিলেন।"

"না। আমি মিষ্টি খেতে বারণই করেছিলুম।"

"উনি এখন দোষটা আপনার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ওঁর খাওয়ার খরচটা তো আপনার ঘাড় দিয়ে চলে' যেত, যা বাড়তি পয়সা হাতে থাকত তাই দিয়ে রসগোল্লা কিনতেন।"

সদাশিব গিয়ে দেখলেন মহেন্দ্রবাবু সত্যিই মরছেন। শেষ অবস্থা। আচ্ছন্নের মতো পড়ে' আছেন। অনেক ঠেলাঠেলির পর চোখ খুললেন।

"কে ডাক্তারবাবু! নমস্কার—"

খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে আবার বললেন, "অনেক করলেন আমার জন্যে। অনেক ধন্যবাদ। আপনার কথা একটাও শুনিনি। বাঁচতে চাই না বেঁচে সুখ নেই—"

একটু পরেই মারা গেলেন।

শবদাহের ব্যবস্থা করে' বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে আসতে প্রায় একটা বেজে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাইদের বাড়ি বেশ বড়। কিন্তু পরিবার বড় বলে' ভাগ ভাগ হ'য়ে গেছে। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের ভাগে দু'খানি ঘর, একফালি বারান্দা, একফালি উঠোন, আর উঠোনের পাশে ছোট রান্নাঘর। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের নাতনীটি ছাড়া আর কেউ নেই। নাতনীটির চেহারা বীভৎস। মুখের আধখানা পোড়া। স্টোভে পুড়ে গিয়েছিল। সদাশিব গিয়ে দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই নিজেই রাঁধছেন। শুধু গা, পরনে একটি গামছা। রান্নাঘর থেকে তিনি বললেন, "ওরে, ডাক্তারবাবুকে ঘরে বসিয়ে হাওয়া কর। একটু বসুন। বেগুন-চিংড়িটা নাতনীকে দিয়ে রাঁধিয়েছি, ওটা ওর স্পেশালিটি। আমি লাউঘণ্টটা রাঁধছি, ওটা আমার স্পেশালিটি। খেয়ে দেখুন কেমন লাগে—"

সদাশিব ঘরের ভিতর গিয়ে বসলেন। নাতনী একটি ভাঙা হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। ঘরের চারিদিকেই দারিদ্র্যের ছাপ। দেওয়ালে বহুকাল চুনকাম করা হয়নি। দু' এক জায়গায় নোনা ধরেছে। চেয়ারটা ভাঙা, নড়বড়ে, একটি হাতল নেই। বিছানার চাদর ময়লা। মাছি ভন ভন করছে চতুর্দিকে। পাশের নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ উঠছে একটা।

সদাশিব কখনও বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে আসেননি। যখন হাসপাতালে সিভিল সার্জন ছিলেন তখন এই নাতনী স্টোভ জ্বালতে গিয়ে পুড়ে যায়। বাঁড়ুয্যে মশাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন একে। বাঁচবার আশা ছিল না। অনেক চেষ্টা করবার পর বাঁচল বটে, কিন্তু মুখটা বীভৎস হ'য়ে রইল।

সদাশিবের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি যেন হঠাৎ একটা রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী গৃহস্থের নগ্নরূপটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল এদের দশা কি হবে? এরা কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে? কে বাঁচাবে এদের? ভারত স্বাধীন হ'য়ে এরাই তো সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে। উদ্বাস্তুদের কথা মনে পড়ল, তারা নাকি আরও বিপন্ন। শিয়ালদহ স্টেশনে তাদের যে চেহারা একবার দেখেছেন তা মর্মন্তুদ। মানুষ নয়, যেন পশুর দল। তিন-চারজন নেতা মিলে দেশটাকে ভাগ করে' দিলে ক্ষমতার লোভে! ভাঙা দেশ আবার কি জুড়বে? কতদিনে?

এই সব নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই এলেন একটু পরে।

"হয়ে গেল, এইবার খেতে বসুন। মুখপুড়ী জায়গা করে' দে। কার্পেটের আসনটা বিছিয়ে দিস—"

নাতনী বেরিয়ে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাই আবার চেঁচিয়ে বললেন, "কাঁসার গেলাসটা মেজেছিস তো?"

"হ্যাঁ"—মৃদুস্বরে উত্তর এল বাইরে থেকে।

বাঁড়ুয্যে মশাই (তখনও গামছা-পরা) ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর তাঁর ভাবলেশহীন মুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল একটু।

বললেন, "ওর মা ওর নাম স্বর্ণলতা রেখেছিল। দেখতে স্বর্ণলতার মতো না হোক, তাম্রলতার মতো হয়েছিল। এখন ওকে মুখপুড়ী বলে' ডাকি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ভাগ্যে ওর মুখ পুড়েছিল. তাই তো ও আমার কাছে আছে, আমাকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছে। মুখ না পুড়লে তো এতদিন বিয়ে হ'য়ে আমাকে ছেড়ে চলে' যেত। বিয়ে দিতেই হ'ত, ভদ্রাসনটুকু বিক্রি করেও দিতে হ'ত। কিন্তু তা আর হ'ল না, ভগবান আমার উপর দয়া করল, মুখটা ওর পুড়ে গেল—"

ভগবানের এই দয়ার জন্যে বাঁড়ুয্যে মশাই যে কৃতজ্ঞ তা কিন্তু মনে হ'ল না। কারণ তাঁর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

সদাশিব বললেন, "আমার একটু সংকোচ হচ্ছে। এমনভাবে বিব্রত করলুম—"

"কিছুমাত্র না। এ তো ভাগ্য, ভাগ্য, পরম ভাগ্য। বেশীদিনের কথা নয়, আমার ঠাকুরদার আমলেই আমাদের বাড়িতে দু'বেলায় পঞ্চাশজন লোকের পাতা পড়ত— পাড়ার লোক, বাইরের লোক, অতিথি বন্ধু, আত্মীয় অনাত্মীয় কেউ বাদ পড়ত না। আমাদের ঠাকুমারা রূপোর গয়না পরতেন, শাড়ীর বাহার ছিল না, কিন্তু তাঁরা দশজনকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন, নিজেরাই পরিবেশনও করতেন। দাসী চাকরানীর মতো গজগজ করে' করতেন না, হাসিমুখে করতেন। দেখতে দেখতে সব মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। এক জীবনে কতোই না দেখলুম। চলুন—"

সদাশিব গিয়ে দেখলেন প্রচুর আয়োজন করেছেন বাঁড়ুয্যে মশাই। নানারকম তরকারি, নিরামিষই প্রায় আট-দশ রকম।

"করেছেন কি! এতো কি খেতে পারব?"

"আপনি পারবেন না তো পারবে কে। আপনি তো খাইয়ে লোক—"

"আপনি খাবেন না?"

"আমার দেরি আছে। স্নান করব, আহ্নিক করব, তবে খাব। ভাবছি একেবারে ওবেলায় খাব। একবেলাই খাই আমি। দু'বেলা খাওয়া সহ্য হয় না। আপনি বসে' খান, আমি হাওয়া করি—"

"না না, আপনি হাওয়া করবেন কি—"

"যা মাছি, খেতে দেবে না আপনাকে। ফিনাইল কিনেও কূল পাই না, তাই আজকাল কেনা ছেড়া দিয়েছি—"

খেতে খেতে গল্প হ'তে লাগল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "আপনাদের পরিবার এককালে নিশ্চয়ই খুব বড় ছিল—"

"বড় বলে বড়, রাবণের গুষ্টি। বিষয় ভাগ করতে করতে প্রত্যেকের ভাগে চটকস্থ মাংসও হয়নি। এ পাড়াটাই বলতে গেলে আমাদের। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মকদ্দমা করছে—ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।"

"মকদ্দমা কেন—"

"মতিচ্ছন্ন আর কি! আমি নিজেই সাতবার মকদ্দমা করেছি। যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল ওতেই গেছে। এখন পেন্সনটির উপর ভরসা। বেগুন-চিংড়ি কেমন হয়েছে, বলুন?"

"খাসা—"

"মুখপুড়ী ওটা রাঁধে ভালো—"

"আপনার লাউঘণ্টও চমৎকার হয়েছে। এমন ঘণ্টও বহুকাল খাইনি। আপনি এত চমৎকার রাঁধেন! বাঃ—"

"ও রান্নাটি আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছিলাম। তিনি শিখেছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। ওর একটু ট্রিকস্ আছে, সেটা সবাইকে শেখাই না।"

বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মুখে আবার একটু হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল।

"এতো রকম করেছেন, আবার মাংস করতে গেলেন কেন?"

"আপনি যে রোজ মাংস খান। আমি সব খবর রাখি—"

খাওয়া শেষ করে' সদাশিব যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন বাঁড়ুয্যে মশাই হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে' বসলেন। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন সদাশিবকে!

"আপনি যে গরীবের বাড়ি পাত পেড়ে দুটো খেয়ে গেলেন, এতে কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম আমি—"

টপ্ করে' একফোঁটা চোখের জল পড়ল সদাশিবের পায়ের উপর। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকে চলে' গেলেন! কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। তারপর গিয়ে মোটরে উঠলেন।

ষোল

খুব সকালে গীতিয়া এসেছিল। আর তার সঙ্গে এসেছিল একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

"এরা সব কে—"

"আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়ে। সব চোখ উঠেছে। আপনি তো আমাদের পাড়ায় অনেকদিন যাননি, তাই ডেকে নিয়ে এলাম। নিজেদেরই তো গরজ।"

গীতিয়ার কণ্ঠস্বরে একটু অভিমানের সুর। সে যে ডাক্তারবাবুর বিশেষ স্নেহাস্পদা একথা সে পাঁচজনের কাছে খুব বড় গলা করে' বলে' বেড়ায়, ডাক্তারবাবু অত টাকা দিয়ে তাদের মহাজনের কবলমুক্ত করেছেন, কিন্তু সদাশিবের উদাসীন ব্যবহারে সে যেন একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে ইদানীং। সদাশিব যদি তাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন তাহ'লে একমাসের মধ্যে একবারও কি খবর নিতেন না? আজবলাল চলে' যাওয়ার পর সে সেখানে এসে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু উনি রাজী হননি। সদাশিবের একটু স্নেহ পেলে সে কৃতার্থ হ'য়ে যায়। এর মধ্যে কোনও খারাপ ভাব নেই, খারাপ ভাব যে থাকতে পারে, তা তার চিন্তারও অতীত। সে সদাশিবের কাছে কন্যা-স্নেহ প্রত্যাশা করে। সদাশিব হয়তো তাকে স্নেহও করেন, কিন্তু তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। গীতিয়ার তাই অভিমান হয়েছে একটু।

সদাশিব ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের চোখে ওষুধ দিয়ে দিলেন। একটা শিশি করে' কিছু ওষুধ আর একটা ড্রপারও দিলেন।

"রোজ সকাল-বিকেল দিয়ে দিস—"

গীতিয়া তখন আঁচল থেকে খুলে খানকয়েক নোট সদাশিবের হাতে দিয়ে বললে, "এইটে রাখুন—"

"কি এটা—"

"দু'জনে খেটে কিছু টাকা জমিয়েছি, ধারে সেটা শোধ করে' নিন—"

"ঘুঁটে আর দুধ দিয়ে শোধ করবার কথা ছিল। নগদ টাকা কেন? কোথা পেলি নগদ টাকা? কারো কাছে ধার করেছিস নাকি?"

চুপ করে' রইল গীতিয়া। তারপর বলল, "টাকা যে অনেক। ঘুঁটে আর দুধ দিয়ে ও-টাকা জন্মে শোধ হবে না।"

"তুই টাকা কোথা পেলি বল না—"

গীতিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করে' থেকে বলল, "ছবিলাল মোড়লের বাড়ি 'গিন্না নোক্‌রি'তে বাহাল হয়েছি। খাওয়া-পরা দেবে, তা ছাড়া ২৫ টাকা মাইনে দেবে। ওঁকেও কংগ্রেস-আপিসে একটা চাকরি করে' দিয়েছে, মাইনে ৪৫ টাকা, পিওনের কাজ করতে হয়। এ মাসে পঞ্চাশ টাকা জমাতে পেরেছি. সেটা দিয়ে গেলাম। ঘুঁটে আর দুধে টাকা তিরিশেক শোধ হবে"—

সদাশিব টাকাগুলি পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, "ছবিলাল লোকটা পাজি শুনেছি—"

"খুব পাজি। কিন্তু কি করব, ভালো লোকে না রাখলে পাজি লোকের কাছেই যেতে হবে—"

গীতিয়ার চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

চুপ করে' রইলেন সদাশিব, কি আর বলবেন। সেই পুরাতন সত্যটাই উপলব্ধি করলেন, অসাধু লোকেদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, সাধুদের এখন পরিত্রাণ নেই। ছলে বলে কৌশলে ওরাই এখন ভোগদখল করবে।

প্রশ্ন করলেন, "ছবিলাল মোড়লের ছেলেটাকে তো পুলিসে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল—"

"ছাড়া পেয়ে গেছে। ওদের টাকার জোর আছে, কংগ্রেস ওদের সহায়, ওদের কি কেউ আটকে রাখতে পারে?"

স্তম্ভিত হ'য়ে বসে' রইলেন সদাশিব। মনে হ'ল তিনি হেরে গেলেন। আর একটা কথাও মনে হ'ল—গীতিয়ার মতো মেয়ে এইবার ওর লম্পট ছেলেটার কবলে পড়বে। একটা ছবি ফুটে উঠল মনে—হরিণী যেন ময়াল সাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"আমি যাই তাহ'লে—"

গীতিয়া প্রণাম করে' কিছুদূর চলে' গেল।

"গীতিয়া, শোন—"

"কী—"

"ও চাকরি ছেড়ে দে তুই—"

সোৎসুক হ'য়ে উঠল গীতিয়ার চোখের দৃষ্টি। নির্বাক আগ্রহে সে চেয়ে রইল সদাশিবের দিকে। সদাশিব কোন কথা কইলেন না। তখন গীতিয়া জিগ্যেস করল, "চাকরি ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কি করে'?"

"তোরা স্বামী-স্ত্রী আমার এখানে এসেই থাক। তুই তো লেখাপড়া জানিস, আমার বাড়ির 'আউট হাউসে' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল কর একটা। আর তোর স্বামী আমার গরু-বাছুর ঘর-দোর দেখাশুনা করুক। দুটো গাই এবার বিয়োবে। দু'জনে আমার এখানেই খাবি-দাবি থাকবি। তোদের আর যা যা দরকার হয় তা-ও পাবি।"

গীতিয়া হাতে যেন স্বর্গ পেল।

উদ্ভাসিত মুখে বলল, "এই তো আমি চাইছিলুম। যাই ওকে বলে' আসি—"

"এগুলো নিয়ে যা—"

"কি—"

টাকাগুলো—"

"ও নিয়ে আমি কি করব?"

"পোস্টাফিসে একটা পাস বুক করে' জমা করে' রাখ—"

"কিন্তু—"

"আর 'কিন্তু' শুনতে চাই না। যত শিগ্‌গির পার এখানে এসে পড়—"

গীতিয়া একছুটে বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েগুলোও ছুটতে লাগল তার পিছু-পিছু।

রামলক্ষ্মণ ঠাকুর এসে বলল, "চাল ডাল নুন তেল সব ফুরিয়ে গেছে।" সদাশিব বললেন, "আচ্ছা, স্লিপ লিখে দিচ্ছি, দোকান থেকে আনিয়ে নাও।" সদাশিব আজকাল বাইরে বাইরে খান। কিন্তু বাড়িতে অনেক লোক খায়, অনেক গরীবদুঃখী।

সতেরো

নবীপুরের হাটে দেখা হ'ল কেব্‌লী আর কেব্‌লীর স্বামী নারাণের সঙ্গে। কেব্‌লী একটি নূতন শাড়ি হলুদ রঙে ছুপিয়ে পরেছে, নারাণের পরণেও একটি গোলাপী রঙের ধুতি। নারাণ এগিয়ে এসে প্রণাম করল সদাশিবকে। কেব্‌লী তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি নারাণ, কি খবর, হঠাৎ প্রণামের ধূম কেন?"

"সাধি ভে গেলে হুজুর—"

কেব্‌লী মুখে কাপড় দিয়ে খুব হাসতে লাগল। নারাণের দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে হওয়াতে সে যে খুব দুঃখিত হয়েছে তা মনে হ'ল না।

ধী-বিশালের দোকানের দিকে গেলেন সদাশিব। মঙ্গলদাসের খবর নিলেন। মঙ্গলদাস ভালো আছে। কিন্তু আবার জল জমেছে পেটে।

"ও তো জমবেই। ও অসুখ সারবে না। বেশী জল জমলে আবার বার করে' দিতে হবে। এইভাবে যে ক'দিন চলে।"

ধী-বিশাল বললে মঙ্গলদাসও সে কথা বুঝেছে। তার বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা নামসংকীর্তন হচ্ছে। তারপর ধী-বিশাল নিম্নকণ্ঠে বললে যে, সেই 'বদমাশ' ছোক্‌রা তিনটে পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। কাল সন্ধ্যের সময় তার দোকানের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধী-বিশাল ভয় খেয়ে তিনজন তীরন্দাজ সাঁওতাল বাহাল করেছে দোকান পাহারা দেবার জন্যে।

"তুমি থানাতেও একটা ডায়েরি করিয়ে দাও—"

"আচ্ছা—"

হাটে অনেক রোগী অপেক্ষা করছিল মোটরের আশেপাশে। সদাশিব সেইদিকে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখলেন, কেব্‌লী দাঁড়িয়ে আছে, নারাণ সঙ্গে নেই।

ভিড় কমে' যাবার পর কেব্‌লী কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে' বললে, দু' নৌকোয় পা দিয়ে নারাণ এখন মহাবিপদে পড়েছে। নারাণের মা ওই কানী বিধবাকে ঘরে নিতে চাইছে না। আর ওই কানীর বাবা যে জমি দেবে বলেছিল সে জমিও দেয়নি। সে

বলেছে আগে দেখি আমার মেয়ের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে, তবে জমি লিখে দেব।

"তোকে তো জমি দেবে বলেছিল, তাও দেয়নি?"

"না—"

"তুই কিছু বললি না?"

"কানী হামরা মারে লে দৌগেছে। বড় বরিয়ার ছে। হাম্ ভাগীকে চললো আইলি। বড় মারখুণ্ডা ছে। ওকরো ভী মারেলা দৌগেছে—"

"কানী বিধবাকে বিয়ে করে' নারাণ তো তাহ'লে মহাবিপদে পড়েছে। কোথায় আছে এখন ও?"

"হিয়াঁই। কাঁহা যাইতে—"

মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেব্‌লী হাসতে লাগল। তারপর সে আসল কথাটি ভাঙল।

আবার 'পঞ্চ' ডাকা হয়েছে। কেব্‌লীর প্রাপ্য জমি তাকে দেওয়া হবে কিনা সেই 'পঞ্চ' ঠিক করবে। সেই পঞ্চের দু'জন মাতব্বর লোক সদাশিবকে খুব খাতির করে। তাদের কঠিন কঠিন অসুখ সদাশিবই নাকি একদিন সারিয়েছিলেন। তারা আবার ওষুধ নিতে সদাশিবের কাছে আসবে। তখন সদাশিব যদি তাদের একটু বলে' দেন তাহ'লে কেব্‌লী জমিটা পেয়ে যাবে।

সদাশিব বললেন, "কবে কার অসুখ সারিয়েছি আমার তো কিছু মনে নেই!"

কেব্‌লী মনে করিয়ে দিলে তিনি তখন সরকারী কাজ করতেন। একজনের 'পোতা' (হাইড্রোসিল) আর একজনের 'গুরা' (ফোড়া) কেটেছিলেন। সদাশিবের মনে পড়ল না। বললেন, "আচ্ছা আমার কাছে আসে তো বলব। নারাণ আর একটা বিয়ে করেছে বলে' তোর দুঃখ হয়নি একটুও—"

"দুঃখ করে কি করবো। ওই সেই ওকরো মতি-গতি আর হমরা কপার—"

কেব্‌লী খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে' দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল, তারপর চলে' গেল।

তারপর এল কয়েকটা ছোট ছেলে। ফরসা জামা-কাপড় পরা। সদাশিব তাদের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, খুশী হলেন খুব।

"আলী, এদের প্রত্যেককে দুটো করে' সন্দেশ দাও—"

আসবার সময় দীনু হালুয়াইদের দোকান থেকে সের দুই সন্দেশ কিনে এনেছিলেন তিনি। তারা সন্দেশ নিয়ে কলরব করতে করতে চলে গেল।

"আলী—"

"হুজৌর—"

আলী এসে সামনে দাঁড়াল।

"তুমি সন্দেশ খেয়েছ?"

আলীর মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে বললে—"হুজুর হুকুম নেহি দেনে সে কৈসে খায়েঙ্গে?"

"খাও চারটে সন্দেশ। আজ আমাদের রান্নার ব্যবস্থা কি করেছ? হাটে মাছ তেমন পেলে কি?"

"নেই হুজুর! মুরগি লেয়া দোঠো।"

"মুরগির ঝোল আর ভাত বানাও আজকে।"

"বহুত খু—"

"বেশী মসলা দিও না। সাদা ঝোল বানাও—"

"বহুত খু—"

"কোথায় রাঁধবে আজ? ওই বড় তালাওটার ধারে চল—"

"বহুত খু—"

আলী কয়েক মুহূর্ত ঘাড়টা একদিকে বেঁকিয়ে এবং দুটি আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করে' ফেলল। তারপর মোটরের পিছনে চলে' গেল।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময় দেখতে পেলেন নারাণ আসছে। একা আসছে। সঙ্গে কেব্‌লী নেই।

"কি নারাণ, আবার এলে যে—"

নারাণ একটু চুপ করে' রইল, তারপর বললে—গোপনে সে তাঁকে একটা কথা বলতে চায়। এতক্ষণ সে হাটে অপেক্ষা করছিল। রোগীর ভিড় কমে' যাবার পর এসেছে।

"কি কথা—"

নারাণ হিন্দীতে বললে—"আপনি কেব্‌লীকে একটু শাসন করে' দিন। ও একটা সিপাহীর সঙ্গে বড্ড বেশী মাখামাখী করছে। ভেবেছিলাম 'দোসরা' একটা 'সাধি' করে' আমি আলাদা সরে' থাকব, ও যা খুশী করুক। কিন্তু আমার মা ওই কানী বিধবাকে কিছুতেই ঘরে নিতে চাইছে না। আমাকে বাধ্য হ'য়ে কেব্‌লীর কাছে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু কেব্‌লী যদি একটা সিপাহীর সঙ্গে লট্‌পট্‌ করে তাহ'লে তো বরদাস্ত করতে পারি না। শেষকালে একটা খুনোখুনি কাণ্ড হ'য়ে যাবে একদিন।"

সদাশিব প্রশ্ন করলেন, "এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? ও তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, তোমরাই ঠিক কর—"

হঠাৎ নারাণ সদাশিবের পা জড়িয়ে ধরল।

"আপ একদফে কহ্‌ দেনে সে সব ঠিক হো যায়েগা। উ আপকো বাপকো এইসা মানতা হ্যায়।"

হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগল নারাণ।

সদাশিব বললেন, "ওকে যদি চরিত্রহীন বলে' মনে হয়, ছেড়ে দাও না ওকে—"

নারাণ বললে কেব্‌লীকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

"আবার বিয়ে তো করতে গেছলে—"

নারাণ নিজেই নিজের দু'কান মলে' গালে ঠাস ঠাস করে' চড়াতে লাগল।

"কসুর হো গিয়া হুজুর। কসুর হো গিয়া—"

সদাশিব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'আচ্ছা, আমি শাসন করে' দেব। কিন্তু আমার কথা শুনবে কি ?"

"জরুর শুনে গা, জরুর শুনে গা, উস্‌কো বাপ শুনে গা—"

একটু পরেই রাস্তায় কেব্‌লীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে একাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হাট থেকে কিছু তরি-তরকারি কিনে। সদাশিব মোটর থামালেন। নাবলেন মোটর থেকে। কেব্‌লীকে ডেকে নিয়ে গেলেন একটু দূরে।

"শুনেছি তুই কোন্‌ এক সিপাহীর সঙ্গে লটপট্‌ লাগিয়েছিস্‌ ?"

কেব্‌লী ঘাড় ফিরিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল মুখে আধঘোমটা টেনে।

সদাশিব সংক্ষেপে বললেন, "ফের যদি শুনি চাবকে তোর পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব। মনে থাকে যেন ; কথাটা মনে থাকবে তো ?"

কেব্‌লী সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে' জানাল, থাকবে।

সদাশিব ফের এসে মোটরে উঠলেন।

হঠাৎ একটা নির্মল আনন্দে তাঁর সমস্ত মন ভরে' গেল যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি এদের যথার্থ আত্মীয় হ'তে পেরেছেন—এই উপলব্ধিতে তন্ময় হ'য়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

আঠারো

কিন্তু হঠাৎ সব শেষ হ'য়ে গেল একদিন। গভীর রাত্রে সদাশিবের ঘুম ভেঙে গেল কুকুরের ডাকে। কুকুরটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে খুব ডাকছিল। রামলক্ষ্মণ ঠাকুর, গীতিয়া, গীতিয়ার স্বামী সবাই উঠেছিল। সদাশিব উঠে আলোটা জ্বাললেন। রামলক্ষ্মণ এসে বলল যে ছিপলীর স্বামী এসে ডাকাডাকি করছে। তাদের বাড়িতে নাকি ডাকাতি হচ্ছে। ডাকাতি হচ্ছে ? ছিপলীর স্বামীকে ডাকতে বললেন। সে এসে ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে' কাঁপতে লাগল। তারপর তাঁর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে' একটি কাতরোক্তিই সে করলে—"বাঁচাইয়ে হুজুর!" অনেক জেরার পর জানা গেল ছবিলালের ছেলেটি দলবল জুটিয়ে তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে, আর ছিপলীর উপর বলাৎকার করেছে। জিতু বাধা দিতে গিয়েছিল, পারেনি। সে তাই ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছে।

আলী সাধারণতঃ রাত্রে নিজের বাড়ি চলে' যায়। সদাশিব নিজেই গাড়ি বের করে'

বেরিয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে রইল রামলক্ষ্মণ ঠাকুর, গীতিয়ার স্বামী আর জিতু। রিভলবারটাও সঙ্গে নিলেন।

সদাশিব যখন পৌঁছলেন তখন যা হবার হ'য়ে গেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। টর্চ ফেলতে ফেলতে সদাশিব ঘরে ঢুকলেন। গিয়ে দেখলেন মেঝের উপর বিস্রস্তবাসা ছিপলী পড়ে আছে। ঘরের কোণে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে ছিল একটা লাঠি। সদাশিবকে দেখেই সে লাঠি চালাল। লাঠিটা সজোরে এসে লাগল সদাশিবের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে' গেলেন।

উনিশ

সদাশিব অনুভব করলেন তিনি যেন কার কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন।

তিনি জিগ্যেস করলেন—"কে—"

"আমি ছিপলী—"

ছিপলীই তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিল।

"এখনও কি রাত পোহায়নি?"

গীতিয়া বললে, "অনেকক্ষণ সকাল হ'য়ে গেছে।"

"কই, আমি তো আলো দেখতে পাচ্ছি না—"

সদাশিবের চোখের ভিতর হেমারেজ হয়েছিল। তিনি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন।

শহর থেকে একজন ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেন।

সদাশিব যেতে চাইলেন না।

আস্তে আস্তে বললেন, "আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।"

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে।

হাটের লোক, বাজারের লোক ভেঙে পড়ল ছিপলীর বাড়িতে। বাঙালীরা কেউ যাননি। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল অবশ্য। কেউ বললেন, লোকটা এক্‌সেনট্রিক, কেউ বললেন, বাহাদুরি করতে গিয়েই মৃত্যু হ'ল লোকটার, কারও মতে আসলে উনি চরিত্রহীন লোক ছিলেন, হাটে-বাজারে যুবতী মেয়েদের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াতেন। এর নজীরস্বরূপ তিনি হ্যাভলক এলিস, ফ্রয়েড থেকে বচন উদ্ধৃত করলেন। বাঁড়ুয্যে মশাই-ই নাকি কেবল বলেছিলেন—"উনি নররূপী দেবতা ছিলেন।" ডি. আই. জি. ছিপলীর বাড়ির চারদিকে সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করে' দিয়েছিলেন। আলী হাউ হাউ করে' কাঁদছিল কেবল। গীতিয়া, কেব্‌লী, নারাণও কাঁদছিল। সবারই চোখে জল।

আচ্ছন্নের মতো পড়ে' ছিলেন সদাশিব। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিলেন।

"কে আবদুল, জ্বর ছেড়েছে ? এখন বাজারে যেও না, দু'দিন বিশ্রাম নাও—"

"কালতু তোর কামিজটা তো ঠিক ফিট্ করেনি। রমজান দরজির কাছে যাস, সে মাপ নিয়ে নেবে একটা—"

"না, মঙ্গলদাস, নুনটা তুমি ছেড়েই দাও। নুন খাচ্ছ বলেই পা দু'টো ফুলছে। নুন ছেড়ে দাও। দুধ-ভাত খাও—"

"কে, আবদুলের মা ? নানি, তোর চোখ ঠিক করে' দিতে পারলাম না। আমি অন্ধ হ'য়ে গেলাম।"

"নারাণ নাকি, কেব্‌লী বলেছে ভালোভাবে থাকবে এবার।"

"ও কে ? সরখেল মশাই, ইলিশ মাছ পেয়েছেন ? বাঃ—"

"আজবলাল এসেছে ? আজ ফিস্ট লাগাও একটা। সবাই খাক। ভালো মাছ মাংস পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"মহেন্দ্রবাবু নাকি ? সেরে গেছেন ? রসগোল্লা খেয়ে সেরে গেলেন ? এ তো বড় আশ্চর্য ! রোগা হ'য়ে গেছেন দেখছি। আমার মনে হয় কিন্তু রসগোল্লাটা বেশী না খাওয়াই ভালো—"

"মালতী ? কেদার-বদরি ঘুরে এলি ? বাঃ, কাশ্মীর কেমন লাগল ? ভালো তো লাগবেই, ভূ-স্বর্গ ওর নাম। এইবার দাক্ষিণাত্যে বেড়িয়ে আয়। কন্যাকুমারী শুনেছি অপূর্ব—"

"কে ভগলু মহলদার ? সন্দেশ এনেছ ? তোমার বেটীর সাদি হ'য়ে গেল। বাঃ বাঃ। থাক আর প্রণাম করতে হবে না।"

"ছিপলী আমার রিভল্‌বারটা তুই রেখে দে। তোর নামে লাইসেন্স করিয়ে দেব। ওটা সঙ্গে থাকলে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না।"

"গীতিয়ার স্কুলটাকে আরও বড় করতে হবে। গীতিয়া পারবি তো ? তুইও পড়, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে' ফেল—"

"মনু ? ওই দেখ, তোমার জন্যে জর্দা আনতে ভুলে গেলাম। তোমার কাশীর জর্দার কৌটোটা আলমারির মধ্যে আছে। ভেবেছিলাম নিয়ে আসব। সোহাগ বিলেতে চলে' গেছে, সেখানেই বাড়ি করেছে, সুখে আছে—"

ক্রমশঃ প্রলাপও বন্ধ হ'য়ে গেল। ঠোঁট দুটো নড়ত খালি, কি বলতেন কিছু বোঝা যেত না।

দিন দুই পরে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

মালতী বা সোহাগকে খবর দিতে পারা যায়নি। ছিপলীই তাঁর মুখাগ্নি করল।

পীতাম্বরের পুনর্জন্ম

উৎসর্গ

শ্রীমান চিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

চার্লস ডিকেন্সের

ক্রিশমাস ক্যারল অনুসরণে লিখিত

Verily, verily, I say unto you,
Except a corn of wheat fall into
the ground and die, it abideth
alone : but if it die, it bringeth
forth much fruit.

S. JOHN XII. 24.

প্রথমেই শুনে রাখুন, ঘোষ মারা গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবসর নেই। যারা তাকে কাঁধে করে' শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল--নরেন, হাবুল, টপু, জগু, মানে সৎকার সমিতির সেই দলটাই,—তারা এর সাক্ষী আছে। দত্তও ছিল সেই শব যাত্রার নাতিক্ষুদ্র অনুসরণকারীদের মধ্যে। সে নিজের চোখে দেখেছে ঘোষকে চিতায় চড়ানো হ'ল। তারপরই অবশ্য তাকে চলে' আসতে হয়েছিল দোকান খোলবার জন্য। তার দোকান থাকবে বন্ধ আর সে বসে' বসে' ওই ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মড়া-পোড়ানো দেখবে এতো বেকুব লোক দত্ত নয়।

ঘোষ পটল তুলেছিল।

তবে একটা কথা, মৃত্যুকে কেন যে লোকে পটল-তোলা বলে তা আমি জানি না। পটল নামক নিতান্ত নিরীহ তরকারিটি তোলা কি এমন ভীতিকর ব্যাপার যে তার সঙ্গে ভয়ংকর মৃত্যুর উপমা দিতে হবে তা আমার মাথায় আসে না। সরলভাবেই বলছি, আসে না। তোলা কথাটা যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে হেঁচকি তোলা, তাঁবু তোলা প্রভৃতি অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারত। কিন্তু আমাদের মাননীয় পূর্বপুরুষরা তা করেন নি। মরে' যাওয়াকে তাঁরা পটল-তোলাই বলেছেন, আমিও তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি করলাম। পূর্বপুরুষদের 'হাঁ'-য়ে হাঁ না মেলাতে পারলে যে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে! সুতরাং আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি আবার বলছি ঘোষ পটল তুলেছিল।

দত্ত কি নিঃসংশয়ে জানত যে ঘোষ মারা গেছে? নিশ্চয় জানত। যদিও দত্ত স্বচক্ষে ঘোষকে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে দেখে নি, যদিও চিতা থেকে বেঁচে উঠেছে এরকম কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে, তবু দত্ত জানত যে ঘোষ মারা গেছে। ঘোষ-দত্ত কোম্পানিতে ঘোষ দত্তের অংশীদার ছিল। সমান অংশীদার। দত্তই ছিল নিঃসন্তান ঘোষের একমাত্র উত্তরাধিকারী, একমাত্র উত্তরসূরী, একমাত্র ব্যবস্থাপক, এককথায় একমাত্র সর্বেসর্বা। ঘোষই দত্তের একমাত্র বন্ধু ছিল এবং ঘোষের মৃত্যুতে একমাত্র দত্তই শোকাচ্ছন্ন হয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য। কিন্তু শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে সে দোকান বন্ধ করে নি, সেদিন দোকান খুলে রেখেছিল ব'লে কেনা-বেচাও ভালো হয়েছিল।

শোকাচ্ছন্ন কথাটার সূত্র ধরে' আমি আবার সেইখানে ফিরে যাচ্ছি যেখানে আমি গল্পটা শুরু করেছিলাম। ঘোষ নিঃসন্দেহে মারা গিয়েছিল। এই কথাটা ভালো করে' মনে রাখতে হবে, তা না হ'লে গল্পের রসই জমবে না। যেদিন হ্যামলেট নাটক শুরু হয় সেদিন আমরা সবাই জানতাম যে হ্যামলেটের বাবা আগে মারা গেছেন। এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হ'লে নাটকই জমত না। তিনি গভীর রাত্রে ঠাণ্ডা আর পূবে হাওয়া তুচ্ছ

করে' নিজের প্রাসাদের আশেপাশে পায়চারি করে' বেড়াচ্ছেন এ ঘটনায় এমন আর কি রস পেতুম তাহলে আমরা? ছেলে আর বউকে বিব্রত করে' অমন অনেক বুড়ো টো টো করে' রাত্রিবেলা ঘুরে বেড়ায়।

দোকানের সামনে যে সাইনবোর্ড টাঙানো ছিল তার থেকে ঘোষের নামটা তিনি তুলে দেন নি। ঘোষের মৃত্যুর পরও সাইনবোর্ডের উপর লেখা ছিল ঘোষ-দত্ত কোম্পানি। দোকানের সামনেই টাঙানো থাকত সেটা। নূতন খদ্দেরদের মধ্যে কেউ কেউ দত্তকে দত্ত বলে' সম্বোধন করতেন, কেউ আবার বলতেন ঘোষ। দত্ত দু' নামেই সাড়া দিতেন। তাঁর কাছে দুই-ই এক ছিল।

দত্তের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় নি এখনও। শুনুন। কঠিন লোক ছিল দত্ত, হাত দিয়ে জল গলত না। অমন কঞ্জুষ, কৃপণ, জাঁহাবাজ, দমবাজ, ছিনে-জোঁক, অমন লোভী ইতর পয়সা-পিশাচ দেখা যায় না সাধারণতঃ। পাথরের মতো কঠিন ছিল লোকটা কিন্তু সে পাথর থেকে লোহা মেরেও কেউ কখনও প্রসন্নতার স্ফুলিঙ্গ বার করতে পারে নি। প্রাণ খুলে কথা কইত না কারো সঙ্গে। একা একা চুপচাপ থাকত, যেন ঝিমুকটি। তার মনে সম্ভবতঃ বরফ জমে' থাকত। তাকে আনন্দ করতে দেখে নি কেউ, হাসতে দেখে নি। এই জন্যেই সম্ভবতঃ তার নাকের ডগাটা ঈষৎ বেঁকে গিয়েছিল, সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন ঠাণ্ডা-লাগা বোদা-গোছের ছিল। তার গাল দুটো চোপসানো, পায়ে গেঁটে বাত, চোখ ল্যাল, ঠোঁট নীল, কথাবার্তা ঝাপসা-ঝাপসা। তার মাথার চুল, চোখের পাতা, ভুরু, আর সরু চিবুকের উপর সামান্য দাড়ি সাদা ছিল, অথচ পাকা মনে হত না, মনে হ'ত ওগুলোর উপর বরফ পড়েছে যেন। জীবনের উত্তাপের কোন প্রকাশ ছিল না তার মধ্যে, বরং উলটোটাই ছিল। সে যেখানে যেত সেখানে একটা হিম-শীতল পরিবেশ ঘনিয়ে আসত। এমন কি তার আপিসেও কোন উচ্ছ্বাস বা হাসি শোনা যেত না। সব চুপচাপ, সব ঠাণ্ডা।

বাইরের ঠাণ্ডা বা গরম কাবু করতে পারত না দত্তকে। গ্রীষ্মকালে সে ঘামত না, শীতকালে বেশী শীত করত না তার। শীতকালের কনকনে উত্তুরে হাওয়ার চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা ছিল সে নিজে। আর ছিল ভীষণ একগুঁয়ে। যেটা ঠিক করেছে তা করবে, করবেই। বৃষ্টি বা ঝড়কে বরং অনুরোধ করে' থামানো সম্ভব, কোনও মুনি ঋষি হয়তো তপস্যাবলে তা পারলেও পারতে পারেন। কিন্তু এটা বলতে পারি দত্তের কাছে হার মানতে হবে তাঁদের। ঝড় বৃষ্টির মতোই অনিবার্য আর দুর্বার ছিল লোকটা। ঝড়-বৃষ্টির সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়, মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির আগমনে প্রাণে আনন্দ জাগে, মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির প্রকাশ সত্যিই মনোহর হয়, কিন্তু যেঁচি দত্তের বেলায় তা বলা যাবে না।

কেউ কখনও রাস্তায় তাকে থামিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে নি—'দত্ত যে। কেমন আছ ভাই? কবে আমাদের বাড়ি আসছ'। কোনও ভিখারী তার কাছে ভিক্ষা চাইত না, স্কুলের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় তার কাছে কখনও জানতে চাইত না কটা

বেজেছে, কেউ জানতে চাইত না অমুকের বাড়িতে যাব, রাস্তাটা কোন্ দিকে বলুন তো। এমন কি রাস্তার কুকুরগুলোও তাকে চিনতো। দেখলেই ল্যাজ গুটিয়ে চলে' যেত অন্য ফুটপাথে।

কিন্তু দত্ত কি এসব গ্রাহ্য করত? মোটেই না। বরং এইটেই ভালোবাসত সে। সমস্ত রকম ভদ্রতা ভালোবাসাকে এড়িয়ে পথের এক পাশ দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলে' যাওয়াটাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। সে চাইতো লোকে তাকে 'তুখোড়' বলুক। কিছুর তোয়াক্কা করত না সে।

সেবার পুজোর সময় দত্ত নিবিষ্টমনে তার দোকানে কাজ করছিল। সেবার পুজোয় বৃষ্টি নেমেছে খুব। ষষ্ঠীর দিন থেকেই মুষলধারা শুরু হয়েছিল। শুধু বৃষ্টি নয়, ঝোড়ো হাওয়াও ছিল সঙ্গে সঙ্গে। চারিদিকে একটা প্যাচপেচে ঠাণ্ডা ভাব। দত্ত বসে' বসে' শুনতে পাচ্ছিল তার দোকানের সামনে দিয়ে লোকেরা ছপ ছপ করে' যাতায়াত করছে। কারো মাথায় ছাতা, কারো টোকা, কারো গামছা, কারও আবার কিছু নেই। ভিজতে ভিজতেই চলেছে। একটু আগেই টং টং করে' তিনটে বেজেছে লাহাদের ঘড়িতে। কিন্তু তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে গেছে বেশ। দু'একটা বাড়িতে আলোও জ্বালা হয়েছে। আবছা অন্ধকার মাখানো দিনের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে সে আলো জানলা দিয়ে। ক্রমশঃ অন্ধকার আরও গাঢ় হ'য়ে এল। রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোকে ভূতুড়ে বাড়ি বলে' মনে হ'তে লাগল। দু'একটা বাড়িকে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড হাতী দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাড়িটা দেখে দত্তর কেরানী যদুবাবুর একটা পৌরাণিক কথা মনে জাগল। সে ভাবল মেঘবাহন ইন্দ্র বুঝি স্বয়ং মেঘে চড়ে পূজো দেখতে এসেছেন। আর তাঁর ঐরাবত খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকে।

দত্ত আর যদুবাবু দু'জনে দু'ঘরে, মাঝখানে একটি কপাট। সেই কপাটের ভিতর দিয়ে দত্ত যদুবাবুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। যদুবাবুর ঘরটি এমনিতেই একটি অন্ধকূপ বিশেষ। সেদিন সেটি একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল। যদুবাবু তাঁর টেবিলটির উপর ঝুঁকে পড়ে' চিঠি লিখছিলেন। একটা আলো জ্বেলে নেওয়া উচিত ছিল। লণ্ঠনও কাছে ছিল একটা। কিন্তু যদুবাবু দত্তর ভয়ে লণ্ঠন জ্বালতে পারছিলেন না। জ্বালবার উপায়ও ছিল না। তেল ছিল না লণ্ঠনে। যখনই লণ্ঠন জ্বালবার দরকার হয় দত্ত নিজে হাতে মেপে তেল ঢেলে দেয় তাতে। তেলের টিন দত্তর ঘরে, দত্তর চেয়ারের ঠিক পিছনে। লণ্ঠনের কাজ হ'য়ে গেলে যদুবাবুকেই বাকি তেলটুকু আবার টিনে ঢেলে রেখে যেতে হয়। অত হাঙ্গামা করতে ইচ্ছে করছিল না যদুবাবুর। অন্ধকারেই ঝুঁকে প'ড়ে চিঠিগুলো লিখে ফেলছিলেন তিনি। মেজাজ খারাপ ছিল, পুজোর সময়ও ছুটি পান নি। দত্ত কোন পালা-পার্বণেই দোকান বন্ধ করত না। এখনকার মতো কড়া আইন তখন ছিল না। মালিকরা যা খুশী করতেন।

"মামা আছো! যাক্, বাঁচা গেল! উফ"—তরুণ কণ্ঠে কলরব করে' আপাদমস্তক

ভিজে ঢুকল প্রমোদ। দত্তর ভাগনা। লোকে বলে নরানাং মাতুলক্রমঃ। কিন্তু প্রমোদকে দেখলেই বোঝা যায় কথাটা সব সময় ঠিক নয়।

"বুঝলে মামা, এবার আমরা পুজোয় থিয়েটার করছি। ফরচুনেট্‌লি মিত্তিরদের বড় হলটা আমরা পেয়ে গেছি। বাইরেই করতুম, কিন্তু যা বৃষ্টি—"

ভ্রূকুঞ্চিত করে' দত্ত আপাদমস্তক নীরবে নিরীক্ষণ করলে তার ভাগনেকে। তারপর বলল—"থিয়েটার করবে? খুব ভালো কথা। তা এখানে কেন!"

"চাঁদা চাই। অন্ততঃ দশটা টাকা দিতে হবে।"

"চাঁদা? থিয়েটারের জন্যে চাঁদা? ফক্কুড়ি করবার জায়গা পাওনি!"

"ফক্কুড়ি! থিয়েটার ফক্কুড়ি! গিরিশ ঘোষের 'জনা' করছি আমরা। 'জনা' ফক্কুড়ি?"

"সব ফক্কুড়ি। বিলকুল ফক্কুড়ি। পুজোয় এতো ফূর্তি করা মানেই ফক্কুড়ি। বেফয়দা পয়সার শ্রাদ্ধ।"

"শ্রাদ্ধ! পুজোয় ফূর্তি করব না?"

"কেন করবে। তোমার ফূর্তি করার কি হেতু আছে। তোমার মা রাঁধুনিবৃত্তি করে' সংসার চালায়, তুমি থিয়েটার করবে কেন জবাব দাও।"

প্রমোদ গুম হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বলল, "বেশ তুমিও তাহলে একটা কথার জবাব দাও। তোমার তো পয়সার অভাব নেই। তুমি এই পুজোর দিনে গোমড়া মুখ করে' দোকানে বসে' আছ কেন!"

"দেখ, ফক্কুড়ি ছাড়। বাড়ি গিয়ে ভিজে জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল গে। অসুখে পড়লে তোর মা বিপদে পড়বে।"

'না, আগে আমার কথার জবাব দাও। তুমি পুজোর দিনে দোকানে বসে' আছ কেন।"

"কি করব তাহলে—!" খেঁকিয়ে উঠল দত্ত।

"থিয়েটার করবে। শকুনির পার্ট তোমাকে চমৎকার মানায়। কাত্যায়নও করতে পার—"

"যা যা ফাজিল কোথাকার—"

"রাগ কোরো না মামা, লক্ষীটি। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—"

থিয়েটারি ভঙ্গীতে লাইনটা আবৃত্তি করে' দিলে প্রমোদ।

"আনন্দময়ী? আনন্দ কোথা দেখলি? অ্যাঁ? কারো তো অন্ন-বস্ত্র নেই। সব অন্নে চিঁ চিঁ করে' ঘুরছে। ভিকিরির দল সব। আনন্দ! পুজো মানেই তো খরচ, কুমোরকে দাও, কামারকে দাও, পুরুতকে দাও, কতকগুলো অপোগণ্ডকে গেলাও আর নতুন জামা কাপড় কিনে দাও। টাকা কই? টাকা কে দেবে! পুজোয় কি দশটা হাত

পা গজাবে দশভুজার মতো! পুজো এলো মানে এক বছর বয়স বেড়ে গেল। বুড়ো হ'য়ে গেলাম। এতে আনন্দের কি আছে! অঁ্যা? থিয়েটার করবেন বাবু! আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো এই ক'দিন তোদের মতো গরুকে খোঁয়াড়ে আটকে রেখে দিতুম! চাবকাতুম!"

"ছি ছি মামা! কি সব বলছ পুজোর সময়—"

"ঠিকই বলছি! তোমার পুজো তোমার পকেটে রেখে দাও। আমার পুজো আমার কাছে থাক।"

"কোথায় থাকবে—"

"যেখানে রোজই থাকে।"

"কোথা?"

দত্ত নিজের কাঠের হাতবাক্সটি দেখিয়ে দিল।

'ফচ্‌' করে' একটা শব্দ করে' হেসে ফেললে প্রমোদ।

হাসির বেগ চাপতে গিয়েই ওই রকম শব্দটা হ'ল।

"কি যে বলছ তুমি মামা!"

"ঠিক বলছি। আমাকে বিরক্ত কোরো না। তোমরা পুজো থিয়েটার যা করতে চাও বাইরে গিয়ে কর গে। আমার কাজে বাধা দিও না। যাও—"

দত্তর কণ্ঠস্বর রূঢ় হ'য়ে উঠল।

"আমি সব বিষয়েই তোমার চেয়ে ছোট, আমার যা হওয়া উচিত ছিল আমি তা হ'তে পারি নি। আমি"—প্রমোদ একটু হেসে শুরু করল—"মানে আমি যাকে এক কথায় বখাটে বলে তাই হয়তো। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বরাবর আমি পুজোকে একটা বিশেষ মর্যাদা দিয়ে এসেছি। বাঙালীর জীবনে পুজো একটা, মানে পবিত্র অনুষ্ঠান। পুজোর হয়তো আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু পুজোটা যে একটা পবিত্র জিনিস, আনন্দের জিনিস, পুজোয় যে আমরা জীর্ণ পুরাতনকে ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় পরি, কোলাকুলি করি, প্রাণভরে খাই আর খাওয়াই, মহামিলনের আবেশে ভরপুর হ'য়ে যাই, এমন কি যারা ছোটলোক তারাও যেন পুজোর সময় আমাদের আত্মীয় হ'য়ে যায়, মনে হয় সত্যিই তো আমরা সকলেই এক নৌকায় চড়ে' অনন্তের দিকে ধাবিত হচ্ছি, কেউ পর নয়, সব আপন—এটা আমি বুঝি, অনুভব করি। এই অনুভূতিতে আমার কোনও আর্থিক লাভ হয় নি—বরং পয়সাকড়ি একটু বেশীই খরচ হ'য়ে যায়, কিন্তু এ ভেবে আমি সুখ পেয়েছি, এবং আমার বিশ্বাস বরাবরই পাব। পুজোটাকে তুমি এমন হতচ্ছেদ্দা করলে, জগদম্বা তোমার মঙ্গল করুন। মা মঙ্গলচণ্ডী মামার উপর রাগ কোরো না।"

ওঘর থেকে যদুবাবু হঠাৎ আপন মনে বলে' উঠলেন, "বাঃ বাঃ, ঠিক বলেছ ছোকরা।" বলেই বুঝতে পারলেন কাজটা অন্যায় হ'য়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও ঝুঁকে চিঠি লেখবার ভান করতে লাগলেন।

"দেখ যদু ফের যদি তোমার মুখ থেকে একটি শব্দ শুনি"—যদুবাবুর দিকে চেয়ে দত্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—"তাহলে তোমার চাকরিটি যাবে। তোমাকে দূর করে' দেব। কোনও দশভুজা এসে আটকাতে পারবে না।"

তারপর প্রমোদের দিকে চেয়ে বলল—"বাবাজীবনের বক্তৃতা করবার শক্তি তো বেশ আছে দেখছি। কাউন্সিলে ঢুকে পড় না।"

"রাগ কোরো না মামা। কাল সপ্তমী—আমাদের বাড়িতে খেও। তোমার বৌমা নিরামিষ মাংস খুব ভালো রাঁধে।"

"নিরামিষ মাংস—! বৌমা!"

"পুজোর মাংসে তো আর পেঁয়াজ দেওয়া চলবে না।"

দত্ত বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল প্রমোদের দিকে।

"তুমি বিয়ে করেছ?"

"করেছি।"

"কেন।"

প্রমোদ একটু ইতস্ততঃ করে' বলল—"সত্যি কথাটা বলব?"

"তাই তো শুনতে চাইছি।"

"টুনিকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ভয়ে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে পারি নি।"

"ভালোবেসে ফেলেছিলে! ভালোবেসে বিয়ে করেছ!"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা বাড়ি যাও।"

"এতে রাগ করছ কেন মামা। বিধবারাও আজকাল বিয়ে করছে—"

"আচ্ছা বাড়ি যাও।"

"আমি তোমার কাছে একটি পয়সা চাইছি না। কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা তুমি মানবে না কেন · তুমি আমার মামা—"

"বাড়ি যাও, বাড়ি যাও।"

"তোমার আচরণে বড়ই দুঃখ পেলাম মামা। আজ পর্যন্ত কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয় নি। তোমার কাছে অনেক দিন আসি নি অবশ্য, আজ পুজো বলেই এলুম, আর তুমি এমন ব্যবহার করছ।"

"বাড়ি যাও—"

"বিজয়ার দিনও আমাদের বাড়িতে আসবে না! পাতিপুকুরে বাড়ি করেছি, ঠিকানাটা দিয়ে যাব?"

"বাড়ি যাও, বাড়ি যাও।"

কোনও কটু কথা না বলে' প্রমোদ বেরিয়ে গেল।

বেরবার সময় যদুবাবুকে বলে' গেল—"এই আমার কার্ড দিয়ে গেলুম। বিজয়ার দিন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন।"

"ওই আর একজন"—বলে' উঠল দত্ত—"মাত্র আশী টাকা মাইনে পায়। বিয়ে করেছে, বছর বছর ছেলে হচ্ছে! বিল্পয়া করতে যাবেন! আন্দামান যাওয়া উচিত!"

প্রমোদ চলে' যেতেই আর দু'জন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সম্ভ্রান্ত বলে' মনে হয়। তাঁরা নমস্কার করে' হাসিমুখে দত্তর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁদের হাতে কিছু কাগজ আর একটি রসিদের খাতা ছিল।

"এইটেই তো ঘোষ-দত্ত কোম্পানি? আপনি মিস্টার ঘোষ, না মিস্টার দত্ত?"

"ঘোষ সাত বছর আগে মারা গেছে"—আরও পরিষ্কার করে' দত্ত বলল—"সাত বছর আগে ঠিক এই তারিখে রাত্রিবেলা স্বর্গারোহণ করেছে সে—"

"তিনি খুব উদার লোক ছিলেন শুনেছি। আশা করি সে উদারতার পরিচয় আপনার কাছেও আমরা পাব।"

এই বলে' তাঁরা নিজেদের কার্ড এবং কাগজপত্রগুলি দত্তকে দিলেন। 'উদারতা' কথাটা শুনেই দত্তের ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে কাগজগুলি ফিরিয়ে দিলে দত্ত।

"এই পূজোর সময় দত্ত মশায় একটা ভালো কাজ করব বলে' ঠিক করেছি আমরা। আমাদের পাড়ায় অনেক গরীব ছেলেমেয়ে আছে। খেতে পায় না, পরতে পায় না। এই পূজোর ক'দিন তারা যাতে দুটি ভালো খেতে পায় আর অন্ততঃ একখানা করেও নতুন কাপড় পরতে পায়, তাহলে সত্যিই মায়ের পুজো সার্থক হবে। আমরা আমাদের পাড়ার কথাই ভাবছি—সমস্ত দেশের কথা ভাবলে তো লক্ষ লক্ষ টাকাতেও কুলোবে না—হাজার হাজার দরিদ্র ছেলেমেয়ে! আমাদের পাড়াতেই শ'চারেক আছে। দু'হাজার টাকা তুলতে হবে; আপনার নামে কত লিখব?"

ভদ্রলোক পকেট থেকে কলম বার করলেন।

"আমার নামে! আমি কি করতে পারি! নেহেরুজির কাছে যান। তিনি তো দেশের সব ছেলেমেয়েদের চাচা। আমার মতো দরিদ্র—"

"আপনি দরিদ্র নন মিস্টার দত্ত। অনায়াসে আপনি একশ' টাকা দিতে পারেন।"

"ওরে বাবা! কুড়ুল নিয়ে এসে একশ'বার আমাকে কোপালেও আমি কিছু দিতে পারব না। বিজনেস্ খুব ডাল।"

"না, না, কিছু দিতে হবে বইকি।"

"মাপ করবেন।"

"পূজোর সময় গরীব ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি না ফুটলে—"

"মাপ করবেন।"

"গোটা পঞ্চাশেক টাকা লিখি?"

"মাপ করবেন।"

"কিছুই দেবেন না?"

"না। একটি ছিদামও না। পাড়ার ছোঁড়াদের আমি চিনি। এক একটি বিচ্ছু!

ওদের মুখে হাসি ফোটাবার দরকার নেই—ওরা হল ফোটাতে ওস্তাদ। হাসি ওদের মুখে ফুটবে না।"

"না, না, এ কি বলছেন। এই পুজোর সময় কি করবে বেচারারা—"

"মরুক।"

"এ উত্তর আপনার কাছে আশা করি নি।"

"এ উত্তর ছাড়া অন্ত উত্তর আমার জানা নেই। পুজোর সময় আমি নিজে নতুন কাপড় কিনি না, কোনও ফুর্তিবাজিতে মাতি না। কতকগুলো বখাটে বিচ্ছু ত্যাঁদড় ছেলেমেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্তে পয়সা দিতে আমি পারব না। অত পয়সা আমার নেই। ওই সব আপদ মরলে দেশের পপুলেশন কমবে, আমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে! এ সমস্তার ওই সমাধান।"

"পাঁচটা টাকাও দেবেন না?"

"মাপ করবেন।"

"আপনি সমাজে বাস করেন তো? সমাজের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে তো!"

"একটি কর্তব্যকেই আমি একমাত্র কর্তব্য বলে' মনে করি। সেটি হচ্ছে নিজের চরকায় তেল দেওয়া। তাই দিয়ে যাচ্ছি। বাজে ব্যাপারে আমি মাততে চাই না। আমাকে মাপ করবেন।"

ভদ্রলোক দু'জন স্পষ্ট অনুভব করলেন এখানে সময় নষ্ট হচ্ছে। একটা দায় সারা গোছ নমস্কার করে' বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

একটা মৃদু প্রসন্ন হাসি ফুটল দত্তের মুখে। সে আবার কাজে মন দিল। সে সুদের হিসাব কষছিল!

বাইরে কিন্তু বৃষ্টি বাড়তে লাগল। রাস্তায় লোকের ভিড় কিন্তু কমল না। ভিজে ভিজেও পুজোর বাজার করছিল সবাই। বৃষ্টির শব্দকে তুচ্ছ করে' পুজোর বাজনাও বাজছিল, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পাড়ার শিবমন্দিরের চূড়াটা দেখা যাচ্ছিল। দত্তর মনে হ'ল মন্দিরটা যেন উঁকি মেরে তাকে দেখছে। হঠাৎ একটা বাজ পড়ল কোথায়। দত্ত চমকে উঠল। তার মনে হ'ল মন্দিরটাই বুঝি ধমক দিল তাকে। দত্ত চুপি চুপি উঠে জানলার কাছে গেল, উদ্দেশ্য জানলাটা বন্ধ করে' দেওয়া। বৃষ্টির ছাট আসছিল। কিছু কেরোসিন তেল খরচ হয় হোক, জানলাটা খুলে রাখা চলবে না। জানলার কাছেই অনেক দরকারি কাগজপত্র ছিল। জানলার কাছে যেতেই তার চোখে পড়ল রাস্তার জনারণ্য। এই বৃষ্টিতেও লোকে হৈ হৈ করে' পুজোর বাজার করছে। কারো বগলে কাপড়ের পুলিন্দা, কেউ ফল নিয়ে যাচ্ছে, কারো পিছনে কুলি, কুলির মাথায় নানারকম জিনিসের বোঝা। ঘোড়া-গাড়ি চেপেও যাচ্ছে অনেকে। ঘোড়ার গাড়ির মাথায় নানারকম জিনিস। কলার কাঁদি আর নারকেল দেখে মনে হল পুজোর জিনিস ওগুলো। আর একটা দৃশ্য দেখে বিস্মিত হ'ল দত্ত। বহু ছেলেমেয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করে' ভিজছে।

একজনের ছাতের নালি থেকে হুহু করে' জল পড়ছিল, তারই তলায় দাঁড়িয়েছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। মহানন্দে দু'হাত তুলে ভিজছে। রাস্তার নালি দিয়ে কলকল করে' ময়লা জল বইছে, তাতে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে আরও কয়েকটা ছেলে। আশ্চর্য ব্যাপার! দড়াম করে' জানলাটা বন্ধ করে' দিলে দত্ত।

"যদু, লণ্ঠনটা জেলে ফেল—"

যদুবাবু উঠে লণ্ঠনে তেল ভরতে লাগলেন।

হঠাৎ বন্ধ জানলার ভিতর দিয়ে একজনের বাজখাঁই গলা শুনতে পাওয়া গেল।

"আরে না না। আড়াই মণ মিষ্টিতে কুলুবে না। আমরা এক হাজার কাঙালীকে খাওয়াব। দশ মণ দইয়ের অর্ডার দিয়েছি—"

দত্ত শিউরে উঠল। তার মনে হ'ল এই অপব্যয়ের বন্যায় দেশটা ভেসে যাবে, ডুবে যাবে।

লণ্ঠন জ্বালা হ'লে দত্ত হাতের কাজটা শেষ করে' ফেলল। আর একটা দলিলেরও সুদ কষতে বাকি ছিল। কিন্তু কেরোসিন তেল পুড়িয়ে তা করতে প্রবৃত্তি হ'ল না।

"যদু, এবার দোকান বন্ধ কর—"

যদুবাবু উঠে বাকি জানলাগুলো বন্ধ করতে লাগলেন। যদুবাবুর দিকে কটমট করে' চেয়ে দত্ত বলল—"কাল নিশ্চয় সমস্ত দিন কামাই করবে?"

সবিনয়ে যদুবাবু বললেন, "আপনার যদি অসুবিধে না হয়—"

"অসুবিধে হবেই। আমার প্রতি অবিচার করাও হবে। আমি যদি মাইনে কেটে নি তাহলে মুখ ফুলে ঢোল হবে নিশ্চয়।"

যদুবাবু হাসলেন। কিছু বললেন না। স্বল্পবাক লোক তিনি।

"তুমি কাজ করবে না অথচ মাইনেটি নেবে, এইটে কি আমার উপর সুবিচার?"

যদুবাবু বললেন, "বছরে একটিবারই তো ছুটি নি—"

"ওটা কোন যুক্তি নয়, বুঝলে যদু। তুমি যদি বল আমি তো বছরে একটিবার পিকপকেট করি—"

আবার বজ্রপাত হল বাইরে। দত্ত থেমে গেল।

"কাল সমস্ত দিন আসবে না?"

"আজ্ঞে না। কাল উপবাস করি। অঞ্জলি দিতে হবে।"

"পরশু দিন তাহলে এসো। অনেক কাজ বাকি পড়ে গেছে।"

"পরশু দিন আসব। তবে মহাষ্টমীর দিন ঘণ্টাখানেকের ছুটি চাই। মাকে একবার প্রণাম করেই চলে আসব।"

দত্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর ঘোঁৎ করে' একটা শব্দ করে' বেরিয়ে গেল।

যদুবাবু তাড়াতাড়ি আপিসে তালা লাগিয়ে গলার চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে' বেঁধে নিলেন। তারপর জুতো জোড়া হাতে করে' ছুটতে লাগলেন। তিনি তাঁর ছেলে-

মেয়েদের বলে' এসেছিলেন তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন। যদুবাবু এই বুড়োবয়সেও লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসেন।

দত্ত গেল ভোলাবাবুর হোটেলে। দত্তের বাড়িতে কেউ নেই। ভোলাবাবুর হোটেলেই দু'বেলা খায় সে। ভাত, কলাইয়ের পাতলা ডাল, কুমড়ো ভাজা, আলু পটলের ডালনা, আর কুচোচিংড়ির অম্বল—এই খাবার। দত্ত এই খাবারেই সন্তুষ্ট। খাওয়া শেষ করে' দত্ত নগদ পয়সা (চার আনা) সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়। তারপর ভোলাবাবুর কেনা খবরের কাগজটি নিয়ে তন্ন তন্ন করে' পড়ে। পড়ে' তারপর বাড়ি গিয়ে শোয়। সেদিনও তাই করল।

দত্ত যে বাড়িতে থাকত সেটা এককালে ঘোষের ছিল। বাড়িটা বহুকালের পুরোনো, প্রায় পোড়ো বাড়ি। কি রকম যেন হুমড়ি-খাওয়া গোছ চেহারা। আশপাশে ছোটখাটো অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে, তার সঙ্গে এ বাড়িটা নিতান্তই বেমানান। মনে হয় বহুকাল আগে বাড়িটা যখন শিশু ছিল তখন বোধহয় এখানে লুকোচুরি খেলতে এসেছিল, আর বেরোতে পারে নি। খুবই জরাজীর্ণ এখন। দত্ত ছাড়া আর কেউ এখানে থাকে না। বাকি ঘরগুলো সব ভাড়াটে গুদোম ঘর। চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জমি। সেকালে জমি শস্তা ছিল বলে' অনেকটা জমি কিনেছিল ঘোষ। অনেকখানি জমি পেরিয়ে তবে বাড়ির সিঁড়িটা পাওয়া যায়। বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল, কিন্তু টিপটিপ করে' পড়ছিল তখনও। আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। চতুর্দিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার। দত্ত রাস্তার প্রতিটি ইটের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু তবু তার পক্ষেও স্বচ্ছন্দে এগুনো সম্ভব হচ্ছিল না। এক একবার সে ভাবছিল হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে না কি শেষ পর্যন্ত! এ কি অন্ধকার বাবা! স্বয়ং মা কালী এসে ভর করেছেন না কি এখানে।

বাড়ির কপাটের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যই ছিল, সেটি রং-চটা পুরোনো সেকেলে কপাট। এ-ও সত্য কথা, দত্ত ওই কপাট বহুবার দেখেছে। সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় বহুবার ওই কপাটের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। এ কথাও নির্জলা সত্য যে দত্তের কল্পনার বালাই নেই। এ শহরে অনেক কবি, অনেক লেখক আছেন, অনেক সাধারণ মানুষও আছেন যাঁরা কল্পনাবিলাসী। কিন্তু দত্ত তাঁদের দলে নয়, দত্ত নিরেট নিভাঁজ বস্তুতান্ত্রিক। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে প্রিয়ার মুখ বা প্রিয়ার পায়ের নখের কথা কখনও মনে হয়নি তার। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখুন সেদিন দত্ত তার প্রাক্তন বন্ধু ও পার্টনার ঘোষের কথা একবারও ভাবে নি। শুধু সেদিন কেন, গত সাত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভাবে নি। কিন্তু তবু সেদিন যা ঘটল তা কেমন করে' ঘটল? কে এর জবাব দেবে! কিন্তু ঘটল। দত্ত যখন কপাটের তালার চাবি খুলতে যাচ্ছে তখন কপাটের উপর সে স্পষ্ট একটা মুখ দেখতে পেলে। হাঁ, একটা মুখ।

ঘোষের মুখ। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা, কিন্তু ঘোষের মুখ স্পষ্ট। তার মুখ থেকে অদ্ভুত একটা আলো বেরুচ্ছিল। মুখে কোনও রাগ বা হিংসার ভাব ছিল না। ঘোষ বরাবরই যেভাবে দত্তর দিকে চাইত তখনও ঠিক সেই ভাবে চাইছিল—প্রকাণ্ড

কপালের উপর চশমাটা তোলা। মাথার চুলগুলো একটু একটু নড়ছিল, চোখ দুটো বিস্ফারিত, আর নিস্পন্দ। ভয়ংকর দেখাচ্ছিল ঘোষকে। শুধু মুখ নয়, চোখ নয়, চুল নয়, নীলচে রঙের ওই আলোটাও নয়—এসব ছাড়াও আর একটা কি ছিল যা বর্ণনার বাইরে। চোখ দুটো বুজে ফেললে দত্ত। আবার যখন চাইলে তখন মুখ নেই, কপাটটা রয়েছে কেবল।

দত্ত ভয় পায় নি, কিংবা তার বুকের ভিতর তোলপাড় করে নি এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে মূর্ছা যায় নি সে। দৃঢ়হস্তে তালাটা খুলে গটগট করে' সে ঘরে ঢুকে গেল। ঢুকে আলো জ্বালল।

আলোটা জ্বেলে একটু ইতস্ততঃ করে' কপাটটা বন্ধ করবার আগে সে থমকে দাঁড়াল একবার, সন্তর্পণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সে যেন প্রত্যাশা করছিল ঘোষের টিকিটা দেখতে পাবে। কিন্তু কিছু দেখা গেল না। কপাটের বড় বড় কাঁটিগুলো ছাড়া আর কিছু নেই।

"বাজে সব!"

দত্ত দড়াম করে' কপাটটা বন্ধ করে' দিলে। শব্দটা বজ্রের শব্দের মতো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল সারা ঘরময়। উপরের ঘরে, নীচের ঘরে যেন গমকে গমকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রতিধ্বনি শুনে ভয় পাবার ছেলে দত্ত নয়, সে কপাটে ভালো করে' খিল এঁটে দিয়ে ঘরের ওধারে গেল। লণ্ঠনটা উসকে দিলে একটু। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

প্রকাণ্ড চওড়া সিঁড়ি। ছ' ঘোড়ার গাড়ি অনায়াসে তা দিয়ে চড়তে পারে। একটা মড়াকেও আড়াআড়ি নাবালে সিঁড়ির দেওয়ালে কারও গা ঠেকবে না, এত বড় সিঁড়ি। সেইজন্যই বোধহয় দত্তর মনে হচ্ছিল তার আগে আগে একটা মড়াকে আড়াআড়ি ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে কারা যেন। এই বাড়িতেই ঘোষ মারা গিয়েছিল। এই সিঁড়ি দিয়েই আড়াআড়ি করে' নাবানো হয়েছিল তাকে। রাস্তার আলো সব নিবে গিয়েছিল। দত্তর লণ্ঠনের আলোও প্রকাণ্ড সিঁড়ির জমাট অন্ধকারকে ভেদ করতে পারছিল না। দত্তর গা-টা ছমছম করতে লাগল।

তবু দত্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল যা থাকে কপালে ব'লে। দত্ত অন্ধকারকে ভয় করত না, ভালোই বাসত বরং। আলো করতে পয়সা খরচ হয়, অন্ধকার আপনা-আপনি হয়। তবু ঘোষের মুখটা মনে পড়াতে দত্ত যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে খিলটা লাগিয়ে ফেললে।

সব ঠিক আছে। বসবার ঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর যেমন ছিল তেমনি আছে। খাটের তলাতে, সোফার নীচে, আলমারির পিছনে কেউ নেই। স্টোভের ছোট সস্প্যানটি ঠিক আছে। হঠাৎ চমকে উঠল দত্ত, তারপর বুঝতে পারল ওটা তারই ড্রেসিং গাউন কোণে ঝুলছে। কি যে দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, গতবার শীতের সময় একজনের পরামর্শে ড্রেসিং গাউন করিয়েছিল! এক গাদা পয়সা খরচ করে' একটা আলখাল্লা

কেনবার মানে হয় কোনও? এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং গাউনটা নেড়ে দেখল। না, এর ভেতরও কেউ নেই, খাটের নীচে কেউ নেই, ভাঁড়ার ঘরে নেই, আলমারির পিছনেও কেউ নেই। জুতোটা ঠিক আছে, ব্রাকেট, ঘড়ি সব ঠিক আছে।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে দত্ত ভিতর থেকে কপাটে তালাও লাগিয়ে দিলে একটা। শীত করতে লাগল তার। পুরোনো কম্বলটা বাক্স থেকে বার করে' গায়ে জড়িয়ে বসল। জরাজীর্ণ কম্বল, সত্যিই কম বল, শীতের কাছে হেরে গেল। দেওয়ালে সারি সারি কতকগুলো ছবি টাঙানো ছিল। বাজে ছবি সব। দুর্গা, সরস্বতী, কালীঘাটের কালী, কুইন্ ভিক্টোরিয়া, তার নিজেরও একটা ফোটো। কিন্তু ঘোষের মুখটা ভেসে উঠল আবার মানসচক্ষে—সাত বছর আগে ঘোষ মারা গেছে, তার এ কি কাণ্ড! প্রত্যেকটি ছবির উপর ঘোষের মুখ। আবার মিলিয়ে গেল!

"বাজে!"

কম্বলটা ফেলে দিয়ে দত্ত ঘরে পায়চারি করে' বেড়াতে লাগল। কয়েকবার ঘুরে এসে বসল আবার। চেয়ারে বসে' হেলান দিলে ভালো করে'। হেলান দিতেই তার চোখে পড়ল ঘণ্টাটা। ওই ঘণ্টাটা ছাত থেকে তেতলার ঘর থেকে ছাতের ভিতর দিয়ে এককালে কেন যে টাঙানো হয়েছিল তা দত্ত জানে না। সম্ভবতঃ চাকরদের ডাকবার জন্তে। এখন ওটা কেউ ব্যবহার করে না। হঠাৎ দত্তর মনে হ'ল ঘণ্টাটা দুলছে। খুব ধীরে ধীরে দুলছে, কোন শব্দ হচ্ছে না, কিন্তু দুলে যাচ্ছে। বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল দত্ত। প্রথমে ধীরে ধীরে দুলছিল, কিন্তু ক্রমশঃ জোরে জোরে দুলতে লাগল, তারপর হঠাৎ বেজে উঠল। বেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সব ঘরে যেন ঘণ্টা বাজতে লাগল। হকচকিয়ে গেল সে।

ব্যাপারটা হয়তো আধ মিনিট বা এক মিনিট ছিল, কিন্তু দত্তর মনে হ'তে লাগল এক ঘণ্টা ধরে' চলছে। হঠাৎ সব ঘণ্টাগুলো থেমে গেল এক সঙ্গে। তারপরই একটা খনখনে আওয়াজ হ'তে লাগল। একটা শিকলকে কে যেন টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দত্তর মনে পড়ল ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতেরা শিকল টেনে নিয়ে বেড়ায়!

হঠাৎ ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। তখন শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা গেল। দত্তর মনে হ'ল নীচে থেকে আসছে শব্দটা, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে আসছে, তার ঘরের দিকেই আসছে।

"কি বাজে জিনিসে ভয় পাচ্ছি। ভীমরতি হয়েছে আমার।"

তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিল কিন্তু। তারপর যা ঘটল তা ভয়ানক। বন্ধ দ্বারের ভিতর দিয়ে তার ঘরে কে যেন ঢুকল। ঢোকবামাত্রই লণ্ঠনের আলোটা যেন লাফিয়ে উঠল, যেন বলে' উঠল—"এই যে ঘোষ! ঘোষ এসেছে"—তারপর আবার যেমন ছিল তেমনিভাবে জ্বলতে লাগল।

সেই মুখ: একেবারে সেই। সেই ঘোষ, মাথায় সেই টিকি, গায়ে সেই ফতুয়া, পায় সেই তালতলার চটি। চটির শুঁড়টা যেন বেশী খাড়া, টিকিটাও তাই। মাথার

চুলগুলোও যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোমরে প্রকাণ্ড একটা শিকল বাঁধা, মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড লেজ গজিয়েছে ঘোষের। আর সেই শিকলে বাঁধা রয়েছে ক্যাসবাক্স, চাবি, তালা, হিসাবের প্রকাণ্ড লেজার (খাতা), দলিলের বাণ্ডিল আর কয়েকটা টাকার থলি। তার শরীর স্বচ্ছ, তার শরীরের ভিতর দিয়ে দত্ত পিছনের কপাটটা দেখতে পাচ্ছিল। ঘোষ কম খেত বলে' অনেকে ঠাট্টা করত, তার পেটে নাড়িভুঁড়ি কিচ্ছু নেই। এখন দত্ত সত্যিই দেখল নেই। সত্যিই পেটের ভিতরটা ফাঁকা।

দত্ত নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ঘোষের প্রেতাত্মা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুহিম চোখের দৃষ্টি থেকে হিমানী-প্রবাহ বেরুচ্ছে যেন। দত্তর হাড়ে একটু কাঁপন লাগল। কিন্তু তবু তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, তার মনে হচ্ছিল সে ভুল দেখছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে লাগল সে।

"কি ব্যাপার"—অবশেষে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে জিগ্যেস করে' ফেললে দত্ত—"আমার কাছে কি দরকার।"

"অনেক কিছু।"

ঘোষেরই কণ্ঠস্বর, কোনও সন্দেহ নেই।

"তুমি কে?"

"জিগ্যেস কর আমি কে ছিলাম।"

"তুমি কে ছিলে তাই বল তাহলে"—একটু গলা চড়িয়ে বলল দত্ত—"তোমাকে দেখে তো একটা ছায়া মনে হচ্ছে।" দত্ত বলতে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছে তুমি একটি মূর্তিমান ধাপ্পা, কিন্তু কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ভদ্রভাবে বলল ছায়া।

"যখন বেঁচে ছিলাম তখন আমি তোমার ব্যবসার অংশীদার ছিলাম। আমার নাম ছিল নগেন ঘোষ।"

"তুমি কি—তুমি কি বসতে পার?" একটু সন্দিগ্ধভাবে দত্ত প্রশ্ন করল।

"পারি বই কি।"

"বস তাহলে।"

দত্ত একথা জিজ্ঞেস করল, কারণ তার সন্দেহ হচ্ছিল এরকম একটা স্বচ্ছ ভূত হয়তো চেয়ারে বসতে পারবে না। শরীর বলে' তো কিছু নেই। আর সে যদি বসতে না পারে তাহলে ওরকম একটা দাঁড়ানো ভূত নিয়ে কি করবে সে এখন। সে তো আরও মুশকিল! তাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

ভূতটি গিয়ে সামনের চেয়ারে বসল। এমনভাবে বসল যেন চেয়ারটি তার পরিচিত।

"আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?"—ভূত বলল।

"না, হচ্ছে না।"

"দেখছ, অথচ বিশ্বাস হচ্ছে না, এ তো ভারি আশ্চর্য। চাক্ষুষ প্রমাণের বেশী আর কি প্রমাণ চাও তুমি।"

"জানি না।"

"তোমার ইন্দ্রিয়কে তুমি অবিশ্বাস করছো কেন!"

"সামান্য সামান্য কারণে ইন্দ্রিয়রা প্রতারণা করে। হজমের গোলমাল হ'লে সব গোলমাল হ'য়ে যায় অনেক সময়। আজ হোটেলে ডালটা ভালো সিদ্ধ হয় নি, তোমার আবির্ভাব হয়তো আমার বদহজমের ফল। কিছুই বলা যায় না। তাছাড়া তোমার শরীরে তো কোনও বস্তুই নেই দেখছি। নগেনের শরীর বেশ মজবুত ছিল"—দত্ত সাধারণতঃ ঠাট্টাবিদ্রূপের ধার ধারত না, তখন তার ঠাট্টাবিদ্রূপ করবার মেজাজও ছিল না। আসল কথা, বাইরে ঠাট্টাবিদ্রূপের ভান করে' সে ভয়টা ঢাকতে চাইছিল। ঘোষের কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ংকর ভয় পেয়েছিল সে। তার মেরুদণ্ডটা পর্যন্ত শিরশির করছিল।

সামনাসামনি বসে' ওই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে হলেই তো আমার দফা নিকেশ, মনে মনে ভাবছিল দত্ত। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ভূতটার মাথায় একটা রুমালও বাঁধা রয়েছে। রুমালটা মাথা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে থুতনির নীচে বেঁধেছে। মনে পড়ল নগেন ওই রকম বাঁধত মাঝে মাঝে। আর একটা ভয়ংকর জিনিসও লক্ষ্য করল দত্ত। ওই ভূতটাকে ঘিরে যেন একটা অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল আলোড়িত হচ্ছে। কারণ ভূতটা যদিও চুপ করে' বসে' আছে, কিন্তু তার মাথার চুল, রুমালের খুঁট দুটো, পরনের কাপড় সব নড়ছে। ওরে বাপরে! শিউরে উঠল দত্ত।

দত্তর পকেটে সর্বদা একটা লোহার খড়কে থাকত। সেইটে দিয়ে যখন তখন দাঁত খুঁটত সে। বিভ্রান্ত হ'য়ে হঠাৎ সেইটে সে বার করে' ফেলল পকেট থেকে।

"এটা দেখতে পাচ্ছ—!"

ভূতটার নির্নিমেষ স্থির দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্যেই তুলে ধরল সে খড়কেটাকে।

"পাচ্ছি—"

"কিন্তু তুমি তো এদিকে চোখ ফেরাচ্ছ না।"

"না ফেরালেও দেখতে পাচ্ছি ওটা—"

"এটা আমি গিলে ফেলে এখুনি আত্মহত্যা করছি। তাহলে নিজেই ভূতের দলে মিশে যাব, আমাকে আর এমনভাবে ভয় দেখাতে পারবে না কেউ। এসব বাজে ভয়ে যদিও আমি বিশ্বাস করি না—"

এ শুনেই ভূতটা নিদারুণ চীৎকার করে' তার শিকলটা আছড়াতে লাগল। এমন একটা বিকট বীভৎস শব্দ হ'ল যে দত্ত অনড় হ'য়ে বসে' রইল চেয়ারের হাতল দুটো দু'হাতে চেপে। তার ভয় হচ্ছিল এখনি মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে' যাবে সে। কিন্তু সে আরও ঘাবড়ে গেল যখন ভূত তার মাথার রুমালটা খুলে ফেলল। খোলামাত্রই তার থুতনিটা ঝুঁকে পড়ল তার বুকের উপর। সাংঘাতিক কাণ্ড!

দত্ত হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে' বসে' পড়ল মেঝের উপর।

"দয়া কর! ঘোষ, ঘোষ, এ বিপদে আমাকে ফেললে কেন।"

"মায়াবদ্ধ জীব"—ঘোষের প্রেতাত্মা গম্ভীর কণ্ঠে বলল—"আমার এই অস্তিত্বে তুমি বিশ্বাস কর কি না।"

"করি, করি। করতেই হবে। কিন্তু একটা কথা বল ভূতেরা পৃথিবীতে বেড়িয়ে বেড়ায় কেন! আমার কাছে এসেছ কেন তুমি।"

"ভগবান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে প্রাণ দিয়েছেন, যে উৎসাহ দিয়েছেন তার ধর্ম হচ্ছে পৃথিবীর চতুর্দিকে সঞ্চরণ করে' বেড়ানো, স্থাণু হ'য়ে আবদ্ধ হ'য়ে একজায়গায় বসে' থাকবার জন্য ভগবান প্রাণ সৃষ্টি করেন নি। সে প্রাণের, সে উৎসাহের, সে আত্মার একমাত্র সার্থকতা পৃথিবী পরিভ্রমণে, মানুষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়াতে। যারা জীবনে তা করে না মৃত্যুর পর তাদের তা করতে বাধ্য হতে হয়। যা উপভোগ হ'তে পারত, তাই দুর্ভোগ হ'য়ে দাঁড়ায় তখন। তাই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, জীবনের নানা প্রকাশ দেখছি, কিন্তু তাতে যোগ দিতে পাচ্ছি না। দূর থেকে লোভীর মতো দেখছি। ভাবছি হায় হায় কেন জীবনকে ভোগ করি নি। কেন বঞ্চিত করেছি নিজেকে—"

বলে' আবার সে কান্না জুড়ে দিলে, আবার নাড়তে লাগল শিকলটা। দত্তর মনে হ'ল তার হাত দুটোও যেন কচলাচ্ছে সে।

"মনে হচ্ছে তুমি শিকল দিয়ে বাঁধা আছ—"

"হ্যাঁ।"

কাঁপতে কাঁপতে দত্ত বলল—"বাঁধা কেন?"

"যে শিকল আমি সারাজীবন ধরে' তৈরি করেছি, সেই শিকলই জড়িয়েছে আমাকে। এ শিকল আমারই তৈরি, এর প্রতিটি আংটা আমি প্রতিদিন স্বহস্তে তৈরি করেছি, দিনের পর দিন নিজেই আমি একে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছি। নিজেই তৈরি করেছি, নিজেই গায়ে জড়িয়েছি একে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি এ শিকলের প্যাটার্ন কি তুমি চিনতে পারছ না?"

দত্ত আরও কাঁপতে লাগল।

"তোমার কোমরে যে শিকলটা এখন তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ সেটা কত লম্বা আর ভারী তুমি জানতে চাও? সাত বচ্ছর আগে সেটা আমার শিকলেরই মতো লম্বা আর ভারী ছিল। সাত বচ্ছরে সেটাকে তুমি আরও অনেক বাড়িয়েছ। তোমার শিকল এখন বিরাট।"

দত্ত সভয়ে নিজের চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে—সত্যিই তাকে ঘিরেও একটা লম্বা ভারী শিকল আছে না কি? কিন্তু কিছু দেখতে পেলে না।

"ঘোষ"—সানুনয়ে দত্ত বলল—"ভাই নগেন ঘোষ, সব খুলে বল ভাই। অভয় দাও ভাই, অমন করে' ভয় দেখিও না। সাহস দাও—"

"সাহস বা অভয় দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ওসব অন্য জায়গা থেকে আসে, পীতাম্বর দত্ত, অন্যরকম দূত তা বহন করে' আনে অন্য জাতের লোকের কাছে। আমি

যা বলতে চাই তা-ও বলতে পারব না। সামান্য একটু বলবার অনুমতি আমি পেয়েছি। আমার শান্তি নেই, আমি কোথাও থাকতে পারি না, কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়াবার উপায় নেই আমার। আমার আত্মা আমাদের দোকানের চারপাশেই আবদ্ধ ছিল। ভাল করে' শোন, দোকান আর দোকানের আশপাশ ছেড়ে সে কোথাও যেতে পায় নি। সারাজীবন টেবিলে বসে' বসে' সে সুদের হিসাব কষেছে খালি। এখন তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অনেক দূর যেতে হবে, অনেক পথ বাকী, আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।"

মাথায় কোনও চিন্তা এলে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ গোঁফের ডগাটা পাকানো দত্তের একটা মুদ্রাদোষ ছিল। এখন সে তাই করতে লাগল। হাঁটু গেড়ে বসে' বসেই তাই করতে লাগল।

"কিন্তু ঘোষ, তুমি তো খুব আস্তে হেঁটেছ মনে হচ্ছে।"

ভয় পেয়েছিল যদিও, তবু দত্তের হিসাবী মন সজাগ ছিল।

"আস্তে ?"

"হ্যাঁ। সাত বছর আগে মারা গেছ তুমি। এবং তারপর থেকে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছ বলছ—"

"ক্রমাগত। আমার বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। অনুতাপের অনলে পুড়ছি—"

"খুব দ্রুতগতিতে ঘুরেছ কি ?"

"আমি হাওয়ায় ভর করে' ঘুরি।"

"তাহলে সাত বছরে তো তোমার বহুদূর যাওয়ার কথা।"

এই শুনে ভূতটা আবার হাউ হাউ ক'রে চীৎকার শুরু করে' দিলে আর তার শিকলটা ঝনঝন করে' আছড়াতে লাগল। সে চীৎকার আর শব্দ এতো ভয়ানক যে দত্তর ভয় হ'তে লাগল ঘুম ভেঙে গিয়ে পাড়ার লোকেরা না মারমুখী হ'য়ে ছুটে আসে।

"তুমি মূর্খ, তুমি অন্ধ, তুমি বন্দী তাই তুমি বুঝতে পারছ না কোটি কোটি বছর ধরে' অমরবৃন্দ যদি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাহলেও এ পৃথিবীর যতটা উন্নতি হ'তে পারত তা হবে না, তার আগেই এ পৃথিবী অনন্তে বিলীন হ'য়ে যাবে। তুমি বুঝতে পারছ না যে কোনও ভদ্রলোক যদি তার ক্ষুদ্র পরিবেশেও সৎকার্য করতে চায় তাহলে তার জীবনে সে কাজ শেষ করতে পারবে না। তুমি বুঝতে পারছ না যে যত অনুতাপই কর না যে সব সুযোগ জীবনে হারিয়ে যায় তা আর ফিরে আসে না। আমি সব সুযোগ হারিয়েছি। সব—"

"তুমি অনুতাপ করছ কেন ঘোষ, তুমি তো পাকা ব্যবসায়ী ছিলে। চুটিয়ে ব্যবসা করেছ যতদিন আমার সঙ্গে ছিলে—"

"ব্যবসা!"—ভূত চীৎকার করে' উঠল। দত্ত দেখতে পেল সে হাত দুটোও আবার কচলাতে শুরু করেছে। এই রে লেগেছে, মনে মনে ব'লে উঠল সে।

"ব্যবসা! মানুষের ভালো করাই আমার ব্যবসা হওয়া উচিত ছিল। ক্ষমা, দয়া,

দান দাক্ষিণ্য, পরোপকার এই সবই আমার ব্যবসা হওয়া উচিত ছিল। আমি যা করেছি তা কিছু নয়, কিছু নয়। তা সিন্ধুতে বিন্দুবৎ—"

এই বলে' সে তার শিকলটাকে সামনে টেনে এনে তুলে ধরল, যেন সেইটেই তার সমস্ত দুঃখের মূল। তুলে ধরে' আবার ঝনঝন করে' মাটিতে ফেলে দিল সেটা।

"পুজোর সময়েই আমার সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়। মনে হয় যখন মানুষের মধ্যে বেঁচে ছিলাম তখন এই পুজোর সময় কি কোনও দুঃখীর দুঃখ দূর করতে পেরেছি? ইচ্ছে করলেই পারতাম, কিন্তু আমি চোখ তুলে চাই নি কারও দিকে। মাথা হেঁট করে' মাটির দিকে চেয়ে পথ চলতাম কানে তুলো গুঁজে। কারও কান্না শুনি নি, শুনতে চাই নি।"

এই ধরনের কথা শুনে দত্ত আরও ঘাবড়ে গেল। কাঁপুনি বেড়ে গেল তার।

"আমার কথা শোন"—ভূত বলল—"আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। আমার সময় কম—"

"শুনব, বল। কিন্তু ভাই আমার প্রতি দয়া কর। অমন শক্ত শক্ত জ্ঞানের কথা বোলো না, ঘোষ। তোমাকে অনুরোধ করছি। ওসব শুনলে আমার ভয় করে—"

"আজ হঠাৎ কি করে' মূর্তি ধরে' তোমার সামনে দাঁড়াতে পেরেছি তা জানি না। আজ তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ। কিন্তু তোমার পাশে আমি দিনের পর দিন বসে' ছিলুম অদৃশ্যভাবে। আজ এতদিন পরে তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ—"

ঘোষের অদৃশ্য প্রেতাত্মা তার ঠিক পাশে এতদিন বসে' ছিল ওৎ পেতে, এ চিত্রটা মোটেই সুখকর নয়। দত্তর কপাল ঘেমে উঠল। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে সে কপালটা মুছে ফেললে।

"তোমাকে আজ যে আমি সাবধান করতে এসেছি এটাও আমার প্রায়শ্চিত্ত, কঠিন প্রায়শ্চিত্ত, এর জন্যে আমি খুব কষ্ট ভোগ করছি, কিন্তু তবু এসেছি। তোমাকে সাবধান করতে এসেছি দত্ত। তুমি বেঁচে আছ, আমি যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি তার থেকে তুমি এখনও বাঁচতে পার। তোমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করেছি সেই জন্য।"

"তুমি তো বরাবরই আমার হিতৈষী বন্ধু ছিলে ভাই। কি ব্যবস্থা করেছ বল। নিশ্চয় তোমার কথা আমি শুনব।"

"ব্যবস্থা করেছি আরও তিনটি ভূত তোমার কাছে আসবে।"

দত্তের মুখ হাঁ হ'য়ে গেল, ঝুলে পড়ল থুতনিটা।

"এই ব্যবস্থা করেছ!"

"হ্যাঁ—"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—ও থাক—"

"ওই একমাত্র উপায়। আমি যে নিদারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি তা যদি এড়াতে চাও ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে হবে। ওদের কথা শুনতে হবে। প্রথম ভূতটি আসবে কাল, ঠিক একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে।"

"সবাইকে একসঙ্গে আসতে বল না ভাই। ব্যাপারটা তাহলে একেবারেই চুকে যাক—"

"দ্বিতীয় ভূত আসবে তার পরদিন, ঠিক ওই সময়ে। আর তৃতীয় ভূত, তার পরদিন রাত্রে বারোটার ঘণ্টা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না। আমি যা বললাম তা কিন্তু ভুলো না।"

এই বলে' ভূতটি টেবিল থেকে রুমালটি তুলে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে থুতনির নীচে গেরো দিলে। চপাৎ করে' শব্দ হ'ল একটা। ঘোষের থুতনিটা ওপরের মাড়িতে যেন বসে' গেল। দত্ত চোখের দৃষ্টি নামিয়ে ফেলেছিল। আস্তে আস্তে চোখ তুলে দেখলে ভূত তার শিকলটাও তার হাতে আর কোমরে জড়িয়ে নিচ্ছে।

তারপর সে পিছু হেঁটে হেঁটে জানলার দিকে যেতে লাগল। আর, কি আশ্চর্য, তার প্রতি পদক্ষেপে জানলাটা মেঝে থেকে উঠতে লাগল উপরের দিকে। অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল দত্ত। ভূত যখন জানলার কাছে পৌঁছল তখন জানলাটা উপরে উঠে গেছে, দেওয়ালে রয়েছে মস্ত বড় একটা ফাঁক। ভূতটা সেখানে পৌঁছে হাতছানি দিয়ে ডাকল দত্তকে। বিহ্বলের মতো এগিয়ে গেল দত্ত। যখন তার সঙ্গে ভূতের মাত্র হাত দুয়েক তফাত, তখন আবার হাত তুলে ভূত তাকে আর এগোতে মানা করল। দত্ত থেমে গেল।

ভূতের কথায় যে দত্ত থামল তা নয়, ভয়ে এবং বিস্ময়ে থেমে গেল সে। বাইরে কেমন একটা অস্পষ্ট অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল, যেন কারা হায় হায় করে' কাঁদছে—অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে আর্তনাদ করছে। ভূতটা খানিকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে শুনল, তারপর সেও হাহাকার করতে করতে মিলিয়ে গেল তাদের সঙ্গে অন্ধকার মহাশূন্যের মধ্যে।

দত্ত আর একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করল ব্যাপার কি।

দেখল আকাশ বাতাস ভূতে ছেয়ে রয়েছে। ছুটোছুটি করছে সব, হাহাকার করছে। ঘোষের যেমন শিকল ছিল এদেরও প্রত্যেকেরই কোমরে তেমনি শিকল। দু'চারটে ভূত পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দেখা গেল। হয়তো তারা কোনও কোম্পানি বা গভর্নমেন্টের সভ্য ছিল! অনেককেই চেনা মনে হ'ল। বিশেষতঃ একজনকে মনে হ'ল খুবই চেনা। বড় ব্যবসাদার ছিল, সায়েবি পোশাক পরত। দত্ত দেখল সে এখনও সাদা ওয়েস্টকোট পরে' রয়েছে, তার পায়ের গোড়ালিতে প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক আটকানো। চীৎকার করছে লোকটা তারস্বরে। চীৎকারের কারণ অনেক নীচে একটা দ্বারের কাছে তার বিধবা বউ আর শিশুপুত্র দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে শত চেষ্টা করেও তাদের সাহায্য করতে পারছে না। দত্ত হৃদয়ঙ্গম করল তাদের আসল কষ্ট, তারা মর্ত্যের লোকের সঙ্গে মিশতে চায়, তাদের সাহায্য করতে চায়—কিন্তু পারছে না।

তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। আরও তুমুল মেঘ ঘনিয়ে এল আকাশে। এরা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল, না মেঘই এদের ঢেকে ফেলল, তা দত্ত ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু

তারা এবং তাদের আর্তনাদ একসঙ্গে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল হঠাৎ। ভয়ংকর রাত আজ মনে হ'ল পীতাম্বর দত্তের।

জানলাটা যেমন ছিল তেমনি হ'য়ে গিয়েছিল আবার। জানলা কপাট ভালো করে' বন্ধ করে' দিতে গিয়ে দত্ত দেখল যে, যে কপাট দিয়ে ভূতটা ঢুকেছিল সে কপাটে তালা যেমনকার তেমনি লাগানো রয়েছে। ছিটকিনিও স্থানচ্যুত হয় নি একটু। সে নিজেই তালা ছিটকিনি লাগিয়েছিল। 'সব বাজে'—সে আর একবার বলতে গেল। কিন্তু পারল না। 'সব' বলেই থেমে গেল সে। তার ঘুম পাচ্ছিল খুব। মনের অদ্ভুত আলোড়ন, সমস্ত দিনের খাটুনি, অদৃশ্য জগতের অলৌকিক আভাস, ঘোষের বিচিত্র আলাপ তার সমস্ত মনকে কেমন যেন অসাড় করে' দিয়েছিল। তা ছাড়া রাতও হয়েছিল অনেক। ঘুম পাচ্ছিল তার। সে জামা কাপড় না ছেড়েই সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল।

দুই

দত্তর যখন ঘুম ভাঙল তখন সে চোখ খুলে দেখল যে সমস্ত ঘরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। এতো অন্ধকার যে ঘরের দেওয়াল আর জানলা সব একাকার হ'য়ে গেছে। সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকারকে ভেদ করবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তার কানে এল গির্জার ঘড়িটা বাজছে।

আশ্চর্য হ'য়ে সে শুনতে লাগল, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো। বারোটা বেজেই থেমে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড! সে যখন শুতে গিয়েছিল, তখনই তো দুটো বেজেছিল। ঘড়িটা নিশ্চয় ভুল আছে। যে লোকটা দম দেয় সে নিশ্চয় দম দিতে গিয়ে কোনরকম গোলমাল করে' ফেলেছে। বারোটা? হতেই পারে না।

"এ তো অসম্ভব! আমি কি তাহলে সমস্ত দিন ঘুমিয়েছি পরের দিন রাত বারোটা পর্যন্ত। দুপুর বারোটা নয় তো? কিন্তু এতো অন্ধকার কেন। সূর্য নিবে গেছে নাকি?"

মাথার বালিশের নীচে তার একটা ছোট ঘড়ি থাকত। অন্ধকারে দেখা যায় তাতে। সেটা বার করে' দেখল! হ্যাঁ, ঠিক বারোটাই বেজেছে।

কি রকম হ'ল?

বিছানা থেকে নেবে পড়ল দত্ত। হাতড়ে হাতড়ে জানলার কাছে গেল। জানলার কাচগুলো বৃষ্টির জলে ঝাপসা হ'য়ে গেছে। বিন্দু বিন্দু বাষ্প জমেছে ভিতরের দিকে। জামার হাতা দিয়ে পুঁছে ফেললে সে কাচগুলো। বাইরে অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোনও লোকজনও নেই রাস্তায়। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। সূর্য নিবে গেলে নিশ্চয় হৈচৈ পড়ে' যেত একটা। কিন্তু কোথাও তো কিছু নেই। সব ঠাণ্ডা, সব নিস্তব্ধ। একটি

লোক নেই রাস্তায়। প্রকৃতির রাজ্যেও স্বরাজের মতো কিছু একটা হ'য়ে গেল নাকি! সূর্য কি স্ট্রাইক করল? একটা কথা ভেবে কিন্তু একটু আনন্দ হ'ল তার। সেদিন তার ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু সূর্যই যদি না ওঠে, তাহলে টাকা জমা দেবে কি করে'! ব্যাঙ্কই তো খুলবে না।

দত্ত আবার গিয়ে বিছানায় শুল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ব্যাপারটা কি। ক্রমাগত ভাবতে লাগল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পেলে না। যতই ভাবতে লাগল ততই জটিল হ'য়ে উঠতে লাগল চিন্তাগুলো, তার জট ছাড়াতে আবার ভাবতে হ'ল তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে সে।

ঘোষের প্রেতাত্মাই কাবু করে' ফেলল তাকে। সে ভুরু কুঁচকে ভালো করে' ভেবে বার বার এই সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করছিল যে ওটা কিছু নয়, স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছবামাত্র—টেপা-স্প্রিং ছেড়ে দিলে তা যেমন নিমেষে পূর্বমূর্তি ধারণ করে—তেমনি গোড়ার প্রশ্নটা আবার মনে জাগছিল তার—সত্যিই ওটা স্বপ্ন? না, সত্যিই ঘোষের ভূত এসেছিল?

এই অবস্থায় অনেকক্ষণ শুয়ে রইল দত্ত। দূরে টং করে' শব্দ হ'ল একটা। গির্জার ঘড়িতে আধঘণ্টার ঘণ্টাটা বাজল। তখন দত্তর হঠাৎ মনে পড়ল ঠিক একটার সময় দ্বিতীয় ভূতটি আবির্ভূত হবে। মানে, আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি আছে। দত্ত ঠিক করল জেগেই শুয়ে থাকবে সে, কারণ এ অবস্থায় ঘুমের কথা ভাবাই হাস্যকর। ঘুম আসবে না। জেগেই থাকবে সে। চোখও বুজবে না। চোখ চেয়েই থাকবে। যা থাকে কপালে! দেখা যাক—। মরিয়া হ'য়ে জেগে রইল দত্ত।

অনেকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। অনেকক্ষণ যেন নিঃশব্দে কেটে গেল। দত্তর সন্দেহ হ'তে লাগল সে ঘুমিয়ে পড়ে নি তো! বিচিত্র নয় কিছু। আপিসে কাজের মধ্যেও তার ঢুল ধরে মাঝে মাঝে। তার ঘুমের মাঝে একটার ঘণ্টাটা বেজে যায় নি তো! একটা তুচ্ছ কথা মনে পড়ল। আপিসে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাছি এসে একবার তার চায়ের কাপে পড়েছিল—!

'টং—'

বাইরের অন্ধকারকে প্রকম্পিত করে' একটা বাজল। শব্দটা যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল তার ঘরের দেওয়ালে। মনে হ'ল যেন কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত হ'য়ে গেল ঘরটা। কে যেন তার মশারিটা তুলল। তারপর যে হাতটা মশারি সরিয়েছিল সেই হাতটা দেখতে পেল। তার পিছন দিকের বা পায়ের দিকের মশারি নয়, ঠিক তার মুখের সামনে মশারির যে অংশটা ছিল সেইটে তুলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা। দত্ত তড়াক করে' উঠে বসল। আরও বেশী মুখোমুখি হ'য়ে গেল।

অদ্ভুত ভূত—একটা ছেলের মতো: অথচ খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, না, ছেলে নয় বুড়ো। একটা যেন অলৌকিক অপার্থিব আশ্চর্য কাচের ভিতর দিয়ে তাকে দেখা

যাচ্ছে। সে যেন কাছে থেকেও অনেক দূরে রয়েছে, তাই বুড়ো হলেও ছেলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। তার মাথায় চুল লম্বা, ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। সব সাদা। অথচ তার মুখে জরার কোন চিহ্ন নেই। কোথাও বলিরেখা নেই একটিও। চামড়া কচি ছেলের চামড়ার মতো, রং যেন ফেটে পড়ছে। হাত দুটো খুব লম্বা, আর বেশ বলিষ্ঠ। হাতের আঙুলগুলোও সেইরকম। দেখে মনে হয় খুব জোর আছে। একবার চেপে ধরলে আর নিস্তার নেই। পা এবং পায়ের পাতাও দেখা যাচ্ছে, বেশ সুন্দর, সুগঠিত। কিন্তু কোনও আচ্ছাদন নেই। গা-ও অনাবৃত। কোমর থেকে হাঁটু অবধি একটা ধপধপে সাদা খদ্দরের ছোট কাপড়। আর কোমরে বাঁধা আছে একটা চকচকে উজ্জ্বল বেল্ট। অদ্ভুত উজ্জ্বল। হাতে একগোছা কাশফুল, গলায় শিউলি ফুলের মালা। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তার মাথার ঠিক মাঝখান থেকে একটা আলোর ফোয়ারা উঠছিল আর সেই আলোতেই দেখা যাচ্ছিল সব। আর ওই আলোটা নেবাবার জন্যই সম্ভবতঃ সে জরির কাজ করা একটা মখমলের টুপি বগলদাবা ক'রে রেখেছিল।

দত্ত নিরীক্ষণ করে' দেখল এ ছাড়াও ভূতটার অন্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। তা ভয়ানক। ওই বেল্টটা উজ্জ্বল বটে, কিন্তু সব জায়গায় সমান উজ্জ্বল নয়। কখনও সামনেটা, কখনও ডান পাশটা, কখনও বাঁ পাশটা বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। যেখানে এখনই আলো ছিল পর-মুহূর্তে অন্ধকার হ'য়ে যাচ্ছে সেখানটা, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সারা শরীরেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছে। সেখানেও জোয়ার-ভাঁটা খেলছে যেন। কখনও মনে হচ্ছে তার একটা হাত, কখনও মনে হচ্ছে একটা পা। কখনও কুড়িটা হাত, কুড়িটা পা, কখনও মাত্র দুটো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে ধড়টা, মুণ্ড নেই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন অন্ধকারে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শেষ হ'য়ে যাচ্ছে না, একটু পরেই আবার ফিরে ফিরে আসছে সেগুলো।

বিস্ফারিত-চক্ষু দত্ত গুম হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, "স্বর্গীয় নগেন ঘোষ কি আপনার কথাই বলে' গেল একটু আগে?"

"হ্যাঁ।"

বেশ স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠস্বর। দত্তর মনে হ'ল খুব আস্তে কথা বলছে, যেন সে কাছে সামনে দাঁড়িয়ে নেই, অনেক দূর থেকে কথা বলছে।

"আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন।"

"আমি অতীত কালের পুজোর ভূত।"

"বহুদূর অতীত?"

তার ছোট বালকের মতো চেহারা দেখে এই কথাটা হঠাৎ মনে হ'ল দত্তর।

"না। তোমার অতীত।"

দত্তর হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল কেন জানি না, নিজেও সে বোধ হয় বলতে পারত না জিগ্যেস করলে, হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল ভূতটা তার টুপিটা পরে' মাথার আলোটা নিবিয়ে ফেলুক। সে কথা মুখ ফুটে বলেও ফেললে সে।

"কি ! এত শীঘ্র আলো নিবিয়ে দিতে চাও ? এ আলো তো নিবে গেছেই, তোমাদেরই স্বার্থপরতা নিবিয়ে দিয়েছে একে। অনেক কষ্টে আজ জেলেছি। আমার বগলে এই যে টুপি দেখছ, এটা কি জান ? তোমাদের স্বার্থপরতাই টুপি-রূপ ধরেছে, ওই টুপি যুগযুগান্ত পরে' বসে' থাকতে হয় আমাকে। আলো জালতে পারি না। অনেক কষ্টে আজ জেলেছি।"

দত্ত ভদ্রভাবে বলবার চেষ্টা করল যে সে অন্তত: কোনদিন সজ্ঞানে এমন কিছু করে নি যাতে কারো মাথার আলো নিবে যায়। তারপর সাহস ক'রে জিগ্যেস করলে—"আপনি এখানে এসেছেন কেন ?"

"তোমার মঙ্গলের জন্য।"

দত্ত ধন্যবাদ দিলে তাকে। কিন্তু মনে মনে বলল—এই রাত দুপুরে এমন করে' টেনে হিঁচড়ে আমাকে না তুলে, যদি ঘুমুতে দিতেন তাহলেই আমার বেশী মঙ্গল হ'ত। শরীরটা অন্তত: বিশ্রাম পেত।

ভূত বোধহয় তার মনের কথা শুনতে পেল, কারণ সঙ্গে সঙ্গে সে বলল—"তোমার উদ্ধারের জন্য। মন দিয়ে শোন। তোমার উদ্ধারের জন্য।"

তারপর সে তার লম্বা হাত তুলে তার কাঁধটা চেপে ধরল।

"এস। আমার সঙ্গে চল।"

দত্ত বলতে যাচ্ছিল যে এই বৃষ্টিবাদলে এত রাত্রে রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়ানো কি সমীচীন ? এ সময় ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। গায়ে তেমন গরম জামা নেই, পায়ে পুরোনো চটিটা মাত্র রয়েছে, তাছাড়া কাল থেকে ঠাণ্ডাও লেগেছে তার একটু—কিন্তু দত্ত নিঃসংশয়ে অনুভব করল এসব বলা বৃথা। কোনও ফল হবে না। ভূত চটে গেলে হয়তো উল্টো উৎপত্তি হতে পারে। কাঁধের উপর যে হাতটা সে রেখেছিল সেটা যদিও নারীহস্তের মতোই কোমল, কিন্তু দত্ত উপলব্ধি করল সেটাকে উপেক্ষা করা যাবে না। সে আস্তে আস্তে তার পিছু-পিছু চলতে লাগল। কিন্তু যখন দেখল ভূতটা জানলার দিকে যাচ্ছে তখন সে তার কাপড়টা ধরে' সানুনয়ে বলল, "আমি সাধারণ মানুষ, ভূত নই, আমি জানলা গলে' যেতে পারব না। পড়ে' যাব।"

"আমি তোমার বুকটা স্পর্শ করে' দিচ্ছি। কোন ভয় নেই। তোমার কিচ্ছু হবে না। তুমি সর্বত্র যেতে পারবে।"

এই বলে' সে তার বুকটা ছুঁয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা অতি সহজে জানলা গলে' দেওয়াল পেরিয়ে এসে হাজির হ'ল এক গ্রামের পথে। শহর সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গেল। চারিদিকে মাঠ। মাঠে ফসল রয়েছে। অন্ধকার নেই, রোদ উঠেছে। শরতের আলোয় হাসছে ধানের ক্ষেত। দূরে নদীর ধারে কাশবন দেখা যাচ্ছে। দোয়েল, কোকিল ডাকছে আশেপাশে। সহসা দত্তর মনে পড়ে' গেল সব।

"আরে ! এযে আমারই স্কুলের গ্রাম, হিজলপুর। এখানেই আমার জন্ম। আমার ছেলেবেলাটা এখানেই কেটেছে ! এখানকার বোর্ডিং-এ আমি ছিলাম।"

ভূতটা মৃদু হেসে চাইতে লাগল তার দিকে। তার হাতের মৃদু স্পর্শ তখনও যেন দত্তর বুকে লেগে আছে মনে হ'ল। অপূর্ব গন্ধ ভেসে আসছে চারদিক থেকে, তার সঙ্গে কত স্মৃতি বিজড়িত, কত আশা, আনন্দ। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের কত ছবি।

"তোমার ঠোঁট কাঁপছে যে"—ভূত বলল—"তোমার গালের ওপর ওটা কি ?"

কথা বলতে গিয়ে দত্তর গলাটা কেঁপে গেল।

"ওটা ছোট একটা ব্রণ। আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন।"

"রাস্তা চিনতে পাচ্ছ তো ?"

"পাচ্ছি না ? আমার চোখ বেঁধে দিলেও এখন আমি চলে' যেতে পারি।"

"এতোদিন সব ভুলে ছিলে! আশ্চর্য নয় ? চল যাওয়া যাক।"

সেই রাস্তা ধরেই চলতে লাগল তারা। দত্তর সব চেনা। চেনা আমগাছ, চেনা তালগাছ, চেনা বেড়া, চেনা বাগান, চেনা ভাঙা দেওয়াল, চেনা টেলিগ্রাফের পোস্ট, তার উপর যে ফিঙেটা বসে' আছে সেও যেন চেনা। হাঁটতে হাঁটতে সেই পুরোনো পুলটা পেরিয়ে তারা অবশেষে হাটের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হ'ল। পাশেই বয়ে' চলেছে শিউলি নদী। শিউলি হাটটাকে যেন বেড়ে ধরেছে। গরুর গাড়ি চলেছে সারি সারি। প্রতি গাড়িতে নানারকমের ছেলেমেয়ে। কি আনন্দ তাদের! হাসছে, গান গাইছে, তাদের কলরবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ।

"যা ছিল তারই ছায়া এসব"—ভূত বলল—"ওরা আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না।"

হৈ হৈ করতে করতে ছেলেদের দল আরও কাছে এগিয়ে এল। দত্ত সবাইকে চেনে, সবাইয়ের নাম পর্যন্ত জানে! এদের দেখে কেন তার বুক আনন্দে ভরে' উঠছে ? কেন তার ক্ষীণদৃষ্টি-চোখে ফুটে উঠছে নূতন আলো ? কেন ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওদের দলে যোগ দি, আগে যেমন দিতাম ? সামনে পূজো। পূজোরই গল্প করছে সবাই। সাজু কুমোর এবার কটা প্রতিমা গড়ছে, কোথায় কোথায় যাত্রা হবে, একটা নাগরদোলাও আসবে না কি এবার—সবারই গায়ে পূজোর নতুন কাপড় জামা, কারো হাতে মোয়া, কারো হাতে বাঁশী। হাসতে হাসতে চলে' গেল তারা। পূজোর ছুটিতে সব বাড়ি যাচ্ছে! স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেছে নাকি!

"স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেছে বটে। কিন্তু একটি ছেলে ছুটি পায় নি। সে একা স্কুলে বসে আছে—"

দত্ত বলল, "আমি জানি, মনে পড়েছে—"

হঠাৎ তার চোখ দুটো জলে ভরে' এল।

তারা তখন সদর রাস্তা ছেড়ে বাঁ-হাতি একটা গলির ভিতর ঢুকল। গলিটাও দত্তর খুব চেনা। একটু এগিয়েই লাল বাড়িটা চোখে পড়ল। ছাতের উপর সামনেই দুটো সিংহ, পরস্পর লড়াই করছে। ওই ঘণ্টাটা ঝুলছে বারান্দায়। বাড়িটা প্রকাণ্ড, কিন্তু পোড়ো বাড়ি। দেওয়ালে শ্যাওলা জমেছে, সামনের ঘরগুলো খালি, ঘরের দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে। জানলাগুলোর খড়খড়ি নেই। সামনের গেটটাও পড়ে' গেছে। সবই যেন

ভাঙাচোরা। দূরে কয়েকটা পাতিহাঁস প্যাকপ্যাক করছে ডোবার ধারে। ছুটো শালিক বসে ছিল, পিং করে' উড়ে গেল। চারিদিকে ঘাস গজিয়ে গেছে, যেখানে গজায় নি সেখানে ঘুঘু চরছে একজোড়া। নিবিষ্টমনে চরে' যাচ্ছে, কারোও প্রতি দৃকপাত নেই। বাড়িটার ভিতরও দুর্দশাপন্ন। বড় হল ঘরটায় ঢুকে তারা দেখতে পেল চতুর্দিক খাঁ-খাঁ করছে। সব কপাট জানলা খোলা, কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, বড় বড় ঘরগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো বাড়িতে যেমন হয়—সোঁদা সোঁদা গন্ধ ছাড়ছে চারদিকে। দত্তর পুরোনো বোর্ডিং হাউসকে মনে পড়ে' গেল। ভালো করে' খেতে দিত না।

হল পেরিয়ে পিছনের দিকে একটা ঘরে ঢুকল তারা। এটাও লম্বা একটা হল। একটু অন্ধকার। সারি সারি বেঞ্চি আর ডেস্ক রয়েছে, আবছা অন্ধকারে সেগুলোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঘরের এক প্রান্তে একটি ছেলে স্বল্পালোকে পড়ছে জানলার ধারে বসে'। দত্ত একটা বেঞ্চিতে বসে' পড়ল, বসে' কাঁদতে লাগল। যে ছেলেটি বসে' আছে ও তো সে নিজে! পুজোর সময় বোর্ডিং থেকে কেউ তাকে নিতে আসে নি। বোর্ডিংয়ের সব ছেলে বাড়ি চলে' গেছে, সে-ই কেবল যায় নি।

অদ্ভুত নিস্তব্ধ বাড়িটা। তবু কিন্তু শব্দ হচ্ছে একটু একটু। ইঁদুরে খুট্ করে' একটু শব্দ করল, অনেক দূরে কুয়ো থেকে কে যেন জল তুলছে, পিছনের নিমগাছটার ডালপালায় অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি জাগছে একটা, কোথায় যেন একটা কপাট খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে হাওয়ায়, দূর থেকে ভেসে আসছে 'চোখ গেল' পাখীর ডাক। সবাই আগেকার মতো। দত্তর কান্না আরও বেড়ে গেল।

ভূত আস্তে তার গা স্পর্শ করল আবার, তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সেই কিশোরকালের দত্তকে যে দত্ত আর নেই। মন দিয়ে গল্পের বই পড়ছে। হঠাৎ একটা আরবী পোশাক-পরা অদ্ভুত লোককে দেখা গেল জানলার বাইরে, ছুঁচলো দাড়ি, কোমরের বেল্টে একটা ছোট কুড়ুল গোঁজা। পাশে একটা গাধা, গাধার পিঠে কাঠের বোঝা।

"আর ওই যে আলিবাবা"—বলে' উঠল দত্ত সোল্লাসে, চেঁচিয়ে উঠল, ভুলে গেল যে সে বুড়ো হয়েছে—"আরে, তুমি কোথা থেকে এলে। তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম যে। কি ভালোই বাসতুম তোমাকে।"

আলিবাবা অদৃশ্য হ'ল। নূতন দৃশ্য জেগে উঠল একটা। মাথায় রাঙা উষ্ণীষ, সাদা ঘোড়ায় চড়ে' কে যেন চলেছে।

দত্ত আবার চীৎকার করে' উঠলো—"ওই যে রাজপুত্র! তেপান্তরের মাঠ পার হ'য়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত রাজকন্যার কাছে। মায়া রাক্ষসী রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তাকে। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাবে তাকে রাজপুত্র। মন্ত্রীপুত্র কোথা? কোটালপুত্র? একলাই চলেছে না কি রাজপুত্র?"

হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে বলে' যেতে লাগল দত্ত। রূপকথার দেশে গিয়ে

যেন নবীন জীবন ফিরে পেয়েছিল সে। তার আপিসের লোকেরা তাকে এখন দেখলে অবাক হ'য়ে যেত। তার চোখে আলো জ্বলছে, মুখ উদ্ভাসিত। ললাটে জরা বা ভ্রূকুটি কিছু নেই।

"ওই যে রবিন ক্রুশো! টিয়াপাখীটা। সবুজ গা, হলদে ল্যাজ, মাথার উপর সুন্দর ঝুঁটিটি। ওই তো রয়েছে। রবিন ক্রুশো যখন দ্বীপটা ঘুরে ফিরে এসেছিল তখন তাকে বলেছিল—কোথা ছিলে তুমি রবিন ক্রুশো? ওই যে ফ্রাইডে প্রাণের ভয়ে দৌড়চ্ছে!"

হঠাৎ থেমে গেল দত্ত। ঘরের কোণে ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, আহা, বেচারা!

আবার তার চোখে জল ভরে' এল।

"আমার ইচ্ছে করছে"—হঠাৎ বলে' উঠল সে পকেটে হাত দিয়ে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, "না, এখন আর উপায় নেই, দেরি হ'য়ে গেছে!"

"কি হ'ল?"—জিজ্ঞাসা করল ভূতটি।

"কাল আমার আপিসের সামনে একটা ভিখারী আগমনীর গান গাইছিল। তাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে—"

ভূতটি হেসে তখন নিজের হাতটা শূন্যে তুলে বলল, "এস, এবার আর একটা পুজো দেখি।"

নিমেষের মধ্যে বদলে গেল সব। দেখা গেল যে ছোট ছেলেটি কোণে বসে' পড়ছে সে একটু বড় হয়েছে। ঘরগুলো যেন আরও অন্ধকার, আরও পুরোনো। ছাত থেকে প্লাস্টার খুলে পড়ছে, ভিতরের ইটগুলো দেখা যাচ্ছে। কি করে' এ পরিবর্তন হ'ল তা দত্ত বুঝতে পারল না। তবে এটা সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল ভুল কিছু নেই; এই রকমই ছিল, এই রকমই ঘটেছিল। যখন সব ছেলে পুজোর ছুটিতে বাড়ি চলে' গেছে তখন এমনি করেই শূন্য বোর্ডিং-এ একা একা থাকতে হয়েছিল তাকে।

এবার সে পড়ছিল না, মাথা হেঁট করে' পায়চারি করছিল মনের দুঃখে। দত্ত একবার ভূতটার দিকে আর একবার দরজাটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইলে। এর পরের ঘটনাটা ঘটবে কি? ঘটল। কপাটটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে ছুটে ঘরে ঢুকল কলরব করে'।

"দাদা, আমিও এসে গেছি তোমাকে নিতে। বাড়ি চল। গণশুদার গাড়িতে লুকিয়ে চলে' এসেছি। বাড়ির কেউ জানে না। চল, চল, চল, শিগ্‌গির চল—"

"বাড়ি যাব পারুল? বাবার রাগ পড়েছে?"

একমুখ হেসে পারুল বলল—"একদম পড়ে' গেছে। তোমাকে আর ইস্কুল বোর্ডিংয়ে থাকতেই হবে না। সব জিনিসপত্র নিয়ে চল। বাবার রাগ একদম পড়ে' গেছে। বাড়ির আবহাওয়াই এখন অন্যরকম। পরশু দিন রাত্রে বাবা খুব খোশমেজাজে ছিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁকে জিগ্যেস করলাম, বাবা, দাদা পুজোতে আসবে না? ওই বোর্ডিংয়ে কতদিন রাখবে তাকে। বাবা বললেন, গণেশকে কাল পাঠিয়ে দেব,

তাকে নিয়ে আসবে। আমি গণেশের সঙ্গে লুকিয়ে চলে' এসেছি। আর বাবা কি বলেছে জান?"—পারুলের চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে গেল—"বাবা বলেছে তোমাকে আর পড়তে হবে না। এবার থেকে আপিস করতে হবে তোমাকে। কি মজা! কি মজা! পুজোটা এবার কি আনন্দেই কাটবে! সেজমামা একটা লুডো পাঠিয়েছে!"

"পারুল তুই তো খুব বড় হ'য়ে গেছিস দেখছি—"

পারুল আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল। আর হেসে কুটিকুটি হ'তে লাগল অকারণে। পীতাম্বর তাকে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না, ঘরময় হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল পারুল। খুশীতে একেবারে ফেটে পড়ছে।

"পীতাম্বর দত্তর বাক্স বিছানা নাবিয়ে নিয়ে এস।"

হেডমাস্টার মশাইয়ের গলা। তিনি নিজেও এসে ঘরে ঢুকলেন। কটমট করে' চাইলেন পীতাম্বরের দিকে। তারপর এগিয়ে এসে তার পিঠে চাপড়ে বললেন, "আশা করি ভালোভাবে থাকবে এবার।" তারপর পারুলের দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাসি ফুটল না। সে মুখে হাসি ফোটে না। ঠোঁট আর গাল এবড়ো-খেবড়ো হ'য়ে বেঁকে গেল একটু।

"এস, এই ঘরে এস মা লক্ষ্মী।"

পাশের ঘরে গেল তারা। কি ঠাণ্ডা আর অন্ধকার ঘরটা! দেওয়ালে একটা ম্যাপ টাঙানো রয়েছে। টেবিলের উপর একটা গ্লোব।

"এইটে আমার ঘর। খুকী, মোয়া খাবে?"

একটা টিন খুলে মোয়া বার করে' দিলেন তাকে। পীতাম্বরকেও দিলেন একটা। "তোমাদের গাড়োয়ানকেও দাও গিয়ে" এই বলে' আর একটা বার করে' দিলেন পারুলকে। পারুল ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গণেশকে দিতে গেল সেটা। গণেশ বলল, "টিন থেকে বের করে' দিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"ও আমার চাই না। সেবার পিতুকে যখন এনেছিলাম তখনও দিয়েছিলেন একটা। বাবা কি শক্ত, যেন পাথর—!" গণেশ না খেয়ে সেটা গাড়ির ঝোলার মধ্যে রেখে দিলে।

গণেশের বিছানা বাক্স বইপত্র গাড়ির পিছনে বাঁধা হবার পর পীতাম্বর মাস্টার মশাইকে প্রণাম করল। পারুলও করল। তারপর মহানন্দে গাড়িতে চড়ে' বসল তারা। গাড়ি চলতে শুরু করল। ঝনঝন করে' বাজনা বাজতে লাগল গরুর গলার কণ্ঠী থেকে।

"বড্ড রোগা ছিল পারুল"—ভূত বলল—"কিন্তু মন ওর খুব বড় ছিল।"

"ছিল।"

দত্তর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

"ঠিক বলেছেন, খুব বড় মন ছিল পারুলের।"

"আমার যতদূর মনে পড়ছে তার ছেলেও ছিল একটি।"

"ছিল। আমার ভাগ্নে প্রমোদ।"

"প্রমোদ পারুলের ছেলে?"

'হ্যাঁ।"

দত্তর কেমন যেন অস্বস্তি হ'তে লাগল।

স্কুল ছেড়ে চলে' এল তারা।

এরপর তারা যেখানে এল, সেটা একটা রাস্তা, শহরের রাস্তা। অনেক লোক চলাচল করছে কিন্তু কারও মুখ স্পষ্ট করে' দেখা যাচ্ছে না, সব যেন ছায়া। ছায়ার মিছিল চলেছে। ভিড়ে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে, ভিড় খুব, কিন্তু সব ছায়া। দোকান দেখা যাচ্ছে, কাপড়ের দোকান, খাবারের দোকান, ফলের দোকান, প্রতিমার সাজের দোকান। সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ আলো জ্বলে' উঠল। সব স্পষ্ট হ'য়ে গেল তখন।

ভূত একটা বড় আপিসের সামনে দাঁড়িয়ে দত্তকে জিগ্যেস করল—"এটা চিনতে পারছ?"

"পারছি বই কি! এইখানেতেই আমি প্রথম কাজ শিখি।"

"চল ভেতরে ঢোকা যাক।"

একটা টেবিলের পাশে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে' ছিলেন। ভদ্রলোক এত লম্বা যে মনে হচ্ছিল আর ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হ'লে তাঁর মাথা ছাতে ঠেকে যেত। গালে জুলফি, কাঁচাপাকা পুষ্ট গোঁফ।

"এ কি, এ যে নিবারণবাবু! নিবারণবাবু আবার বেঁচে উঠেছেন দেখছি—"

টেবিলের উপর কলম রেখে নিবারণবাবু দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চাইলেন। সাতটা বাজে। হাত দুটো ঘষে', গায়ের কোটটা ঠিক করে' নিলেন, তারপর হাসলেন। মনে হ'ল যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসলেন, যেন তাঁর পায়ের জুতো থেকে চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত খুশীতে ঝলমল করে' উঠল। তারপর তিনি শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর কোমল কণ্ঠে বললেন, "কই হে, পীতাম্বর, চারু—"

দত্তর অতীত প্রতিমূর্তি বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে, তখন সে নবীন যুবা, আর তার সঙ্গে এল আর একজন, চারু রায়।

"ও, এই যে চারু"—দত্ত ভূতকে বলল—"আমরা একসঙ্গে অ্যাপ্রেন্টিস ছিলুম। হ্যাঁ সেই তো। ভারী ভাব ছিল আমাদের। চারু খুব ভালোবাসত আমাকে—"

"ওহে ছোকরারা শোন"—প্রসন্ন হাসি হেসে নিবারণবাবু বললেন, "আইনতঃ মহালয়ার দিন থেকে আপিসের ছুটি। কিন্তু তার তো এখনও দু'দিন দেরি। আমি আজ থেকেই আপিস বন্ধ করে' দিচ্ছি। বছরের পুজো, দু'দিন বেশী আমোদ কর

তোমরা। আজই মেরে দাও তালা আপিসের দরজায়। বাইরের জানলার খড়খড়িগুলোও বন্ধ কর দিকি ভালো করে'। যাও, আর দেরি কোরো না—"

ছুটে বেরিয়ে গেল তারা রাস্তায়। বাইরের চারটে বড় বড় কাঠের জানলা বন্ধ করে' দিলে ভালো করে', তারপর বাইরে থেকে লোহার বারগুলো ভালো করে' লাগালে। ছিটকিনি টেনে টেনে দেখলে। তালাও লাগালে প্রত্যেক জানলায় দুটো করে'। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল।

"বাস্, জানলা বন্ধ করেছ তো! বাস এইবার"—তড়াক করে' নেবে এলেন তিনি চেয়ার থেকে—"এইবার এইখানটা পরিষ্কার কর দিকি। চেয়ার বেঞ্চি সব সরিয়ে ফেল। জায়গা করে' ফেল এখানটায়। চটপট কর। রোহিতলাল এখুনি এসে পড়বে—"

নিবারণবাবুর হুকুম তারা অমান্য করতে পারে নি। দেখতে দেখতে চেয়ার টেবিল, ডেস্ক টুল—সব পাশের ঘরে সরিয়ে ফেললে নিজেরাই। নিমেষের মধ্যে সরিয়ে ফেললে। বিখ্যাত বেহালা-বাদক রোহিতলাল আসবে। এ যে অপ্রত্যাশিত খবর। দুজনে দুটো ঝাড়ু নিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করে' ঝাড়ু দিতে লাগল। তারপর নিবারণবাবু বললেন, "ওপর থেকে শতরঞ্জি, চাদর আর তাকিয়া আন। রোহিতলাল আসবে। একটু খুঁত থাকলে চলবে না—"

তারপর বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে বললেন, "শুধু রোহিতলাল নয়, কানু কীর্তনীয়াও আসবে। অনেককে আসতে বলেছি। চটপট আসরটা তৈরি করে' ফেল দিকি। ওই পুব কোণে রোহিত বসবে আর তার ঠিক পাশেই কানু। মখমলের গালচে আর বালিশ দুটো নিয়ে এস ওপর থেকে। তোমার মাসীমাকে বোলো আতরদান গোলাপপাশটাও যেন বার করে' দেন। রোহিত শৌখিন লোক।"

দেখতে দেখতে সব ঠিক হ'য়ে গেল। নিবারণবাবু দোতলায় থাকেন, একতলায় তাঁর আপিস। নামজাদা আপিস। সেই আপিসের মেঝেতে এ বছর গানের আসর বসিয়েছেন নিবারণবাবু। অন্যদিন রোহিতলালকে পাওয়া যায় না, তাই দু'দিন আগেই বায়না করেছেন তাঁকে।

যথাসময়ে রোহিতলাল এলেন। সার্থকনামা লোক। পাকা রুইয়ের মতো চেহারা। মাথায় বাবরি চুল, ফুলেল তেলে চুপেচুপে। গলায় বেলফুলের মালা। তাঁর সঙ্গে এলেন তবলচী এবং তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর চেলা বিঠল চৌবে। তিলক-কণ্ঠী-পরা কানু কীর্তনীয়াও এসে পড়ল। বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারা। তারপর লোক আসতে লাগল। পাড়ার মুরুব্বী চৌধুরী মশায় এলেন প্রকাণ্ড পানের ডিবে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে ঢুকলেন যোগেন বসাক, টুনু সেন আর তাঁর বন্ধু সর্বেশ্বর সিং। নুনু, চারু, বিশু, পল্টু প্রভৃতি ছোকরার দলও এল। তারপর মেয়েরা আসতে লাগলেন। নিবারণবাবুর স্ত্রী, তাঁর ছেলেমেয়েরা, পাড়ার গিন্নীবান্নিরা। সকলেরই মাথায় ঘোমটা দেওয়া। তাঁরা আলাদা একটা কোণে জমায়েত হ'য়ে বসলেন। পাড়ার চাকর ঠাকুররাও এসে বসল সব একধারে। রাস্তার লোকেরাও ঢুকে পড়ল দু'একজন। ভরে গেল হলটা।—তারপর

রোহিতলাল বাজনা শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি সংস্কৃতে গুরুবন্দনা করে' জোড়হাতে বসে' রইলেন। তারপর প্রণাম করলেন তাঁর বেহালাটাকে। তারপর ছড় তুলে টান দিলেন। অপূর্ব শব্দ বেরুল। মনে হ'ল একটা পাখী ডেকে উঠল যেন। দেখতে দেখতে শুরু হ'য়ে গেল আলাপ। তিনি বাজাচ্ছিলেন ইমন কল্যাণ, কিন্তু নিবারণবাবুর মনে হ'ল বেহাগ বাজাচ্ছেন, চৌধুরী মশায় ভাবলেন পিলু, টুনু সেন সর্বেশ্বরের কানে কানে বললেন, "হিন্দোল ধরেছেন"। কেউ কিন্তু মুখ ফুটে টু শব্দটি করতে পারলেন না। বসে' বসে' সমঝদারের মতো মাথা দোলাতে লাগলেন। যোগেন বসাক টুসকি দিতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু রোহিতলাল সেদিকে একবার চাইতেই থেমে গেলেন তিনি। রোহিতলাল অত্যন্ত রাশভারী লোক। সামান্য গোলমাল হলেই বাজনা বন্ধ করে' দেন। একটু পরেই সবাই আনন্দে দুলতে লাগল। নিবারণবাবুর মুখের অবস্থা অবর্ণনীয় হ'য়ে উঠল। তাঁর মুখ হাসছিল, আর জল পড়ছিল চোখ দিয়ে। প্রায় এক ঘণ্টা বেহালা আলাপ করে' থামলেন তিনি। যখন শেষ হ'ল তখন মনে হ'ল একটা বিরাট কিছু থেমে গেল যেন। তাঁর তবলচী থেমে গিয়েছিল। পকেট থেকে রঙীন রুমাল বার করে' তিনি কপাল ঘাড় মুছতে লাগলেন। তারপর কীর্তন ধরলেন কাম্নু। তিনি কীর্তনের সুরে আগমনী গাইতে লাগলেন। তাঁর অনুরোধে বিঠল চৌবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত্ করতে লাগলেন বেহালায়। চমৎকার জমে' গেল। কীর্তনীয়ার কীর্তন শেষ হ'লে আবার বেহালা ধরলেন রোহিতলাল। রোহিতলালের বাজনা শেষ হ'লে কাম্নু গান ধরলেন। এইভাবে চলতে লাগল। মনে হ'তে লাগল যেন আনন্দের সমুদ্র থই থই করছে চারিদিকে।

রাত্রি এগারোটা বাজল টং টং করে'। এইবার আসর ভাঙল। নিবারণবাবু হাতজোড় করে' দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বিদায় দিলেন। প্রত্যেককে বললেন যে বারোয়ারিতলায় আবার দেখা হবে। প্রত্যেককে অনুরোধ করলেন বিজয়ার দিন সকলে যেন পায়ের ধুলো দেন।

সবাই যখন চলে' গেল তখন নিবারণবাবু দত্ত আর চারু রায়ের দিকে ফিরেও ঠিক ওই সব কথাই বললেন। "তোমরা আজ এইখানেই খেয়ে যেও, তোমাদের মাসীমা আমাকে সকালেই এটা বলতে বলেছিল কিন্তু আমি ভুলে মেরে দিয়েছি।"—হা হা করে' হেসে উঠলেন।

এই সব দেখতে দেখতে দত্ত একেবারে নির্বাক হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছিল পাগল হ'য়ে গেলাম নাকি। আগে যে সব ঘটনা সত্যি ঘটেছিল, যা দেখে তার প্রাণ একদিন আনন্দে নেচে উঠেছিল, তার আগেকার সেই তরুণ মূর্তি—সব এমনভাবে চোখের উপর ভেসে উঠেছে কি করে'। এ কি স্বপ্ন? না, মতিভ্রম? না, মায়া? অদ্ভুত একটা অনুভূতি হ'তে লাগল তার। যখন তার আগেকার তরুণ মূর্তি আর চারু রায় অন্তর্হিত হ'ল তখন তার মনে পড়ল ভূতকে। দেখল ভূত তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তার মাথার সেই আলোটা আরও স্বচ্ছ, আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

সে বলল, "এতগুলো লোক যে এত আনন্দ পেয়ে গেল, তার তুলনায় নিবারণবাবুর সামান্যই খরচ হয়েছে।"

"সামান্য ?"

"ওই শোন না, চারু রায় আর যুবক পীতাম্বর দত্ত কি বলছে—"

সত্যি তারা প্রশংসায় মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল।

ভূত বলল, "বড়জোর শতখানেক টাকা খরচ করেছেন নিবারণবাবু কিন্তু এর জন্যে যে প্রশংসা, যে কৃতজ্ঞতা তিনি অর্জন করলেন তা কত বেশী।"

কথাটা শুনে দত্ত চটে' গেল। বুড়ো দত্ত নয়, যুবক দত্ত যেন জবাব দিলে—"টাকাকড়ির ব্যাপারই নয়। নিবারণবাবু লোকটিই এমন যে তিনি ইচ্ছে করলেই আমাদের সুখী কিংবা অসুখী করতে পারেন, আমাদের কাজ সহজ কিংবা কঠিন করে' দিতে পারেন, তাঁর মরজি হ'লে লোহার মতো ভারী ডিউটিও তুলোর মতো হালকা হ'য়ে যায়। তাঁর এই ক্ষমতা তাঁর টাকায় নেই, আছে তাঁর মুখের কথায়, চোখের দৃষ্টিতে আর প্রাণখোলা হাসিতে। টাকা দিয়ে কি এসব মাপা যায় ? যায় না।"

ভূতের চোখে একটা বিশেষ দৃষ্টি দেখে সে থমকে থেমে গেল।

"কি হ'ল ?" জিজ্ঞেস করলে ভূত।

"না কিছু হয় নি।"

"হ্যাঁ, কিছু হয়েছে।"

"না, আমার কেরানী যদুর কথা হঠাৎ মনে পড়ে' গেল। এ সময় সে যদি থাকত তাহলে তাকে—"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল।

মিলিয়ে গেল সব। তারা আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

"আমার সময় নেই"—ভূত বললে—"চটপট সেরে নাও।"

এ কথা ভূত দত্তকে বলল না, কাকে যে বলল তাও বোঝা গেল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন দেখা গেল। দত্ত আবার নিজের আর একটা ভূতপূর্ব-চেহারা দেখতে পেল। এবার একটু বেশী বয়স হয়েছে। পূর্ণ যৌবন। বুড়ো বয়সে মুখে যে সব কুটিল বলিরেখা হয়েছিল, যে কুচুটে কঠোর ভাব ফুটে উঠেছিল, সে সবের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে চিন্তার আর লোভের ছায়া পড়েছে। চোখের দৃষ্টি ব্যগ্র, লুব্ধ, যে প্রবৃত্তি পরে তার চরিত্রে শিকড় গেড়েছিল তার আভাস বেশ বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে গাছের ছায়াটি কোন্ দিকে পড়বে।

দত্ত দেখল সে একলা নেই, তার পাশে একটি মেয়ে বসে' আছে। বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন, তার বেশবাসেও সে বিষাদ ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি কাঁদছে। ভূতের মাথায় যে আলো জলছিল সেই আলোয় চকমক করতে লাগল অশ্রুবিন্দুগুলি।

"তোমার কাছে হয়তো এটা খুবই সামান্য ব্যাপার। আর একজন এসে আমার

স্থান অধিকার করেছে। ভবিষ্যতে আমি তোমাকে যে আনন্দ, যে সুখ দিতে পারতাম সে-ও যদি তা পারে তাহলে আমার বলবার কিছু নেই।"

"কে তোমার স্থান অধিকার করছে।"

"অর্থ! অর্থ-লোভ।"

"পৃথিবীর এই রকমই বিচার!"—দত্ত উত্তর দিল—"যখন দারিদ্র্যের চাপে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করে, তখন সকলে অভিশাপ দেয় দারিদ্র্যকে। দারিদ্র্যকে দূর করবার জন্য মানুষ যখন আবার টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করে, তখনও আবার লোকে তাকে গালাগালি দিতে ছাড়ে না। আশ্চর্য, সমাজের বিচার!"

"তুমি আজকাল সমাজকে একটু বেশী ভয় করছ"—মাথা নীচু করে' মেয়েটি বলল —"আগে এত করতে না। এখন তোমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ওই একটি জিনিসেই নিবদ্ধ হয়েছে, কি করে' সমাজের চোখে তুমি বড়লোক বলে' প্রতিপন্ন হবে। তোমার ভাল গুণগুলো একে একে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কি করে' বেশী টাকা হবে একমাত্র এই চিন্তাতেই এখন তুমি মগ্ন। এই চিন্তা বানের মতো এসে তোমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।"

"তাতে কি? তখন আমার সাংসারিক বুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েছে। কিন্তু তোমার প্রতি আমি বিরূপ হয়েছি কি।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

"হই নি তো? তবে—"

"আমাদের দুজনের ভাব ছেলেবেলা থেকে। তখন আমরা দুজনেই গরীব ছিলাম। ভেবেছিলাম গরীব গৃহস্থের মতোই সুখে দুঃখে আমাদের জীবন কেটে যাবে। তখন তুমি দেবতার মতো ছিলে। এখন তুমি বদলে গেছ। ছেলেবেলায় তুমি আমার কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করে' নিয়েছিলে তা এখন বিভীষিকার মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে। তুমি বদলে গেছ। টাকার লোভে তুমি পাড়ার নিধু মামার বিষয়-সম্পত্তি নীলাম করিয়ে নিয়েছ, এ কথা ভাবতেও পারি না।"

"নিধু মামা যদি আমার টাকা নিয়ে না দেন, আমি কি করব! বাধ্য হ'য়ে আমাকে আদালতে যেতে হয়েছে।"

"যখন তোমার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল, যখন আমবাগানে আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম তখন তুমি কি এসব কথা ভাবতেও পারতে?"

"তখন আমি নির্বোধ বালক ছিলাম। এখন আমার বুদ্ধি হয়েছে।"

"এখন তুমি বদলে গেছ। যাকে আমি চেয়েছিলাম সে আর নেই। তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। যে শপথ আমরা গোপনে ছেলেবেলায় নিয়েছিলাম, তা ভেঙে দিতে এসেছি।"

"অমি কি মুক্তি চেয়েছি কখনও?"

"না, কথায় সে কথা বলনি কখনও।"

"তবে?"

"কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। তুমি অন্য জগতের লোক, যে আবহাওয়ায় তুমি এখন ঘোরাফেরা কর তা বড়লোকদের আবহাওয়া, সেখানে আমার মতো মেয়ে বেমানান। তোমার সঙ্গে আগে যদি আমার আলাপ না থাকত তাহলে তুমি কি এখন আমার ত্রিসীমানায় আসতে? আসতে না। তুমি এখন আমার নাগালের বাইরে। আমিও আর তোমার নাগালের মধ্যে নেই।"

দত্তর মনে হ'ল ও যা বলছে তা ঠিকই, কিন্তু তবু মুখে সে কথা স্বীকার করতে বাধল তার।

"সত্যিই কি আমরা দূরে সরে' গেছি?"

"এর উল্টোটা ভাবতে পারলে আমার চেয়ে বেশী সুখী আর কে হ'ত! কিন্তু যা সত্যি নয়, তা ভাবব কি করে'। সত্যিই তুমি দূরে সরে' গেছ। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি। শেষে দেখলাম আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত নয়। তুমিও তো আজকাল আমাদের বাড়ি আর যাও না, আগে যেমন যেতে। আমার বাবা তোমাকে পণ দিতে পারবেন না, কিছুই দিতে পারবেন না, অথচ তোমার মতো ছেলের বাজার দর আজকাল যে কত তা তো সবাই জানে। হয়তো সেই জন্যেই তুমি আমার দিকে ফিরে চাইছ না, কারণ তোমার জীবনে এখন টাকাই ধ্যানজ্ঞান। আমাকে বিয়ে করলে হয়তো তোমার অনুতাপই হবে কিছু পাও নি বলে'। আমি সে অনুতাপের কারণ হ'তে চাই না। আমি চললাম।"

"শোন, শোন"—দত্ত বলে' উঠল।

মেয়েটি তখন একটু থেমে বলল, "বুঝতে পারছি, আমাদের সেই ছেলেবেলার কথা মনে করে হয়তো তোমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ কষ্ট সামান্য ক্ষণের জন্যে। কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যাবে সব। একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে লোকে যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তুমিও তেমনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, ভগবান তোমাকে সে পথে সুখী করুন।"

মেয়েটি চলে গেল।

দত্ত তখন ভূতের দিকে চেয়ে বলল, "আমি আর দেখতে চাই না। আর আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।"

"আর একটা ছবি দেখাব"—দৃঢ়কণ্ঠে বলে' উঠল ভূত।

"না, না, আমি আর দেখতে চাই না। আর আমাকে কিছু দেখাবেন না।"

এর পর ভূত যা করল তা অপ্রত্যাশিত। তার হাত দুটো পিছমোড়া করে' ধরে' ফেলল শক্ত করে'।

ফুটে উঠল আর একটা ছায়াছবি।

…একটি ঘর। খুব বড়ও নয়, তেমন সুন্দরও নয়। কিন্তু সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ

যেন। বারান্দায় একটি সুশ্রী মেয়ে বসে' তরকারি কুটছিল। যে মেয়েটির সঙ্গে একটু আগে কথাবার্তা হ'ল ঠিক সে-ই যেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল যখন প্রৌঢ়া একটি মহিলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে এবং এসে আসন পেতে বসল তার মেয়ের সামনে। পাশের ঘরে দারুণ হুল্লোড় হচ্ছিল। অনেকগুলো ছেলের হুল্লোড়। দত্ত জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে, যেন উন্মত্ত হ'য়ে লাফালাফি করছে ঘরে। মনে হচ্ছিল একশ'টা ছেলে জুটেছে ওখানে। কিন্তু আসলে প্রত্যেক ছেলেটি একাই একশ'। এত চীৎকার হচ্ছিল, কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করছিল না তা। বরং মা ও মেয়ে বারান্দায় বসে' মুখ টিপে টিপে হাসছিল। মনে হচ্ছিল তারা যেন এটা উপভোগই করছে। শেষে মেয়েটিও আর কুটনো কুটতে পারল না, উঠে গিয়ে যোগ দিলে ওদের হুড়োমুড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে তার ঘাড়ে পিঠে পড়ে' অস্থির করে' তুললে তাকে। তার খোঁপা খুলে গেল, কাপড় বিস্রস্ত হ'য়ে পড়ল। মনে মনে ভাবতে লাগল, আহা আমি যদি ওদের দলে যোগ দিতে পারতাম। ওরা সবাই কানামাছি খেলছিল! দত্তর মনে হ'ল—ছি, ছি ছেলেগুলো মেয়েটিকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে' দিলে। আমি থাকলে ওরকম অসভ্যতা করতাম না। আমি ওকে আদর করতাম, ওকে চুমু খেতাম, ওর আনত চোখের দৃষ্টিতে অবগাহন করে' কৃতার্থ হতাম, ওর উপর এমন অত্যাচার করতাম না। ওই অসভ্য ছেলেগুলো কি করছে!

এমন সময় দুয়ারের কড়া নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দল বেঁধে ছুটল সবাই সেদিকে, বিস্রস্তবাসা মেয়েটিও ছুটল খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে। কপাট খুলেই দেখল তাদের বাবা এসেছে। হাতে একটি বাণ্ডিল, বগলে আর একটি। পিছনে একটা ঝাঁকা মুটে। পুজোর কাপড়-চোপড়, খেলনা আর জিনিসপত্র এসেছে। ওঃ, কি হুল্লোড় হৈ-হৈ পড়ে' গেল যে এর পর। বাবা যা যা এনেছিলেন—প্যাকেট, বাণ্ডিল, কৌটো,—সব কাড়াকাড়ি করে' নিয়ে নিলে তারা। আর সবাই মিলে বাবাকে সে কি আদর! তাঁরও কাপড় জামা বিস্রস্ত হ'য়ে গেল, চাদরটা খুলে প'ড়ে গেল মাটিতে। "আঃ, ছাড়, ছাড়, কি যে করিস তোরা"—বার বার বলতে লাগলেন তিনি। কিন্তু তারা তখন এত উত্তেজিত, এত আনন্দিত হয়েছে যে তাঁর কোন কথা কানেই গেল না। সকলেরই দন্ত বিকশিত, চোখ জ্বলছে হাঁপাচ্ছে সবাই।

তারপর প্রত্যেকটি প্যাকেট যখন খোলা হ'তে লাগল তখন উত্তেজনা সীমা ছাড়িয়ে গেল। ননতুর জুতো, কানুর জুতো, বিলুর পুতুল, শ্যামের বাঁশী, হাবুলের কামিজ, উমার ফ্রক, মীরার ফ্রক, সকলের কাপড়, মেয়েদের রঙীন শাড়ি, দু'বাক্স সাবান, লজেন্স্, চকোলেট, দমদেওয়া টিনের মোটরকার, রবারের দশটা বেলুন। এর মধ্যে আর একটা কাণ্ড ঘটল, প্ল্যাসটিকের ছোট্ট খরগোশটাকে বিলু মুখে পুরে চিবিয়ে দিয়েছে! হৈ চৈ পড়ে' গেল। খরগোশের একটা কান কোথা গেল। গিলে ফেলেছে না কি! খোঁজ খোঁজ খোঁজ! বিলুকে দুবার হাঁ করিয়ে তার মুখে আঙুল দিয়ে দেখল হাবুল। তারপর হঠাৎ পাওয়া গেল খরগোশের কানটা, ভেঙে পড়েছিল মেঝেতে। নিশ্চিন্ত হ'ল সবাই।

বিলু দমদেওয়া মোটরটা তুলেও মুখে দিতে যাচ্ছিল, মীরা ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে। কান্নার রোল তুললে বিলু। বড় মেয়েটি বিলুকে কোলে নিয়ে বাইরে চলে' গেল। একটু পরেই হৈ-হৈ-টা থেমে গেল। সবাই নিজের নিজের খেলনা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। প্রত্যেকের মুখের ভিতর একটা ক'রে লজেন্স্।

দত্ত লক্ষ্য করল পাশের ঘরে বাবা মা আর তাঁদের বড় মেয়েটি রয়েছে। বাবা দুটো বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স খুলে দেখাচ্ছেন। বড় মেয়ের জন্যে এনেছেন তিনি জরির কাজ করা নীলাম্বরী শাড়ি, তার সঙ্গে মাথায় দেবার জন্য জরির ফিতেও। আর মায়ের জন্য লালপেড়ে গরদ। মা মেয়ে দুজনের মুখই আনন্দে উদ্ভাসিত।

"তোমার জন্যে কিছু আন নি ?"—জিজ্ঞাসা করলেন মা।

"আমার জন্যে একটা নতুন মিলের ধুতি কিনেছি। বিজয়ার দিন সেটা পরব। আছে ওই প্যাকেটটার মধ্যে।"

দত্ত মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখের দৃষ্টি যেন ফেরে না। ও মেয়ে তারই হ'তে পারত, তার জীবনের অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারত, সৃষ্টি করতে পারত ওয়েশিস তার জীবনের মরুভূমিতে।

বাবা তখন হেসে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "বেলা, তোমার ছেলেবেলার এক বন্ধুকে আজ দেখলাম।"

"কে বন্ধু—"

"আন্দাজ কর—"

"আমি কি করে' আন্দাজ করব !" তারপর হেসে বললেন, "পীতাম্বর দত্ত নয় তো ?"

"হ্যাঁ, পীতাম্বর দত্তই। আমি আজ তার আপিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপিস খোলা রয়েছে। একটু আশ্চর্য হলাম, তার পার্টনার ঘোষ শুনলাম শুষছে, এখন তখন অবস্থা। অথচ উনি দোকান খুলে বসে' আছেন। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম। একা বসে আছেন ভদ্রলোক। দেখে কষ্ট হ'ল। পৃথিবীতে ওঁর কেউ নেই বোধ হয়।"

দত্ত তখন ভূতের দিকে চেয়ে বলল, "এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে। এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।"

"এসব ছায়া"—ভূত বলল—"সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এখন ওদের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু একদিন ছিল, যা দেখছ ঠিক তেমনি ছিল, এখন ওরা ছায়া।"

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে। এসব আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।"

দত্ত ভূতের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল। ভূত নির্বিকার হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত ছেড়ে দিয়েছে, তবু দত্ত নড়তে পারছে না। তার মুখ একটা মুখ নয়, একজনের মুখ নয়, নানা মুখের টুকরো জুড়ে জুড়ে কি যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস—!

"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে, দয়া করুন।"

দত্ত চীৎকার করতে লাগল। পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভূতের মাথার মাঝখান থেকে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত আলোটা আরও যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, আরও উপরে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন আকাশ ছোঁবে এখুনি। তারপর সহসা সে বগল থেকে টুপিটা মাথায় পরে' ফেলল। আলো নিবে গেল। মনে হ'ল টুপিটা যেন তার সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু পায়ের কাছে আলো দেখা যাচ্ছে তবু, মাটির উপর আলোর ঝরনা ঝরছে যেন।

দত্তর মনে হ'ল সে যেন খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে : ঘুমে চোখ দুটো ভেঙে আসছে। তারপর সে হঠাৎ অনুভব করল, সে তো তার নিজের শোবার ঘরেই রয়েছে। তারপরই সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল। অঘোরে ঘুমুতে লাগল।

তিন

দত্ত প্রচণ্ডভাবে নাক ডাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার নাক-ডাকা থেমে গেল, সে চট্ করে' উঠে-বসল বিছানায়। তারপর চেষ্টা করল তার এলোমেলো চিন্তাগুলোকে ঠিক করে' নেবার, এমন সময় টং করে' একটা বাজল। দত্তর মনে হ'ল, ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙেছে তো, ঘোষ যে দ্বিতীয় ভূতটি পাঠাবে বলেছিল এই তো তার আসার সময়। শীত করতে লাগল। তারপর মনে হ'ল, কোন্ জানলাটা দিয়ে এ ভূতটা আসবে? তিনটে জানলাতেই পরদা লাগানো রয়েছে। হঠাৎ কোন্‌টা সরিয়ে দেবে এসে? না, তা করতে দেওয়া হবে না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যে ঘাবড়ে দেবে, সেটি চলবে না। সে উঠে গিয়ে তিনটি পরদাই নিজের হাতে সরিয়ে দিলে। তারপর বিছানায় গিয়ে উপুড় হ'য়ে শুল জানলার দিকে মুখ করে'। দেখা যাক কি করে। সামনাসামনি মোকাবিলা করতে হবে। হঠাৎ এসে যে হকচকিয়ে দেবে সেটি হচ্ছে না।

বাহাদুরি করা অনেক লোকেরই স্বভাব। 'কি করবে আমার? দেখ লেক্কে। ওরকম অনেক মিঞাকেই দেখেছি, আমার পাল্লায় পড়লে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। সেদিন একটা গুণ্ডার মাথায় এইসা এক চাঁটি দিলাম যে সে অজ্ঞান হ'য়ে ঘুরে পড়ে' গেল।' এই ধরনের বাহাদুরি অনেকে করে। চলতি বাংলায় একে 'তড়পানো' বলে। দত্ত ঠিক এই ধরনের লোক নয় যদিও, মনে মনে সে আস্ফালনও করছিল না তেমন, কিন্তু এটা সত্যি কথা সে ওৎ পেতে বসেছিল, মানে প্রস্তুত হ'য়ে বসেছিল ভূতটার জন্যে। একটা শিশুই আসুক বা গণ্ডারই আসুক, সে ঘাবড়াবে না। সব কিছুর জন্যে মনে মনে তৈরী হ'য়ে বসেছিল সে।

সে সব-কিছুর জন্যে তৈরী হয়ে বসেছিল বটে, কিন্তু কিচ্ছুই হবে না, এর জন্যে তৈরি

ছিল না। সুতরাং একটা বাজবার পর জানলায় যখন কোনও মূর্তি দেখা গেল না তখন ঘাবড়ে গেল সে খুব। কাঁপতে লাগল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনরো মিনিট কেটে গেল, কিছু হ'ল না, কেউ এল না। বিছানায় শুয়েই রইল সে, তারপর একটা টকটকে লাল আলো সে দেখতে পেল তার বিছানার উপরই। কোন মূর্তি নয়, আলো। টকটকে লাল আলো। কি সর্বনাশ, এ যে ভূতের চেয়েও ভয়ংকর। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল দত্ত। আলো? লাল আলো? এর মানে কি? এ কি করবে শেষ পর্যন্ত! কোথাও আগুন ধরে' গেল নাকি। আপনা-আপনি অনেক সময় অনেক জিনিস জ্বলে' ওঠে। সেই রকম কিছু হ'ল নাকি। দত্তের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে হাসবেন না। বিপদে পড়লে অনেকেই ওরকম বেসামাল হ'য়ে এলোমেলো চিন্তা করে। এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল এ রকম উপদেশ আওড়ানোও হাস্যকর। কারণ যে লোকটা বিপদে পড়েছে, সে-ই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে কি করতে হবে। আলোটা লক্ষ্য করতে লাগল দত্ত। কোথা থেকে আসছে এটা! আরও ভালো করে' লক্ষ্য করে' দেখল পাশের ঘর থেকে আসছে, হ্যাঁ ঠিক পাশের ঘর থেকেই। সন্দেহ নেই, পাশের ঘর থেকেই আসছে। তাহলে? মনস্থির করে' দত্ত বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেবে পড়ল। আস্তে আস্তে চটি জুতোয় পা গলিয়ে এগিয়ে গেল পাশের ঘরের দিকে।

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই আর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ভারী গলায় বলে' উঠল—পীতাম্বর দত্ত, ভিতরে এস।

সঙ্গে সঙ্গে দত্ত কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল।

ঘরটি তারই ঘর। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হ'ল ঘরটার আশ্চর্য রকম পরিবর্তন ঘটেছে যেন। চেনা যাচ্ছে না। ঘরের দেওয়াল ছাদ সব সবুজ পাতা দিয়ে সাজানো। ঘর নয়, যেন কুঞ্জ। চারদিক থেকে এক আশ্চর্য অপরূপ সৌন্দর্য উথলে পড়ছে। গোছা গোছা কাশ ফুল, শিউলির মালা, কলকে ফুলের মালা, বেল ফুলের মালা—দুলছে দেওয়াল থেকে। আলোয় ঝলমল করছে সব। ঘরের একধারে আলপনা-দেওয়া চমৎকার বেদী একটি। তার উপর দুর্গা প্রতিমা। কি সুন্দর সে প্রতিমা, ভাষায় তার বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রতিমার সামনে থরে থরে নৈবেদ্য। কত রকম ফল, কত মিষ্টান্ন, স্তূপীকৃত কত ভাত, প্রকাণ্ড হাঁড়ি-ভরা খিচুড়ি, থালায় থালায় তরকারি, কড়া-ভরা পরমান্ন—কত শ্বেতপাথরের থালা বাটি গেলাস। ঘটের উপর নারকেল বসানো। ধূপ জ্বলছে, প্রকাণ্ড পিলসুজে প্রদীপ জ্বলছে। ধপধপে বড় শাঁখটি রয়েছে একধারে। তার পাশে ঘণ্টা। ঝাঁঝরও রয়েছে আর একধারে। অবাক হ'য়ে গেল দত্ত। একি কাণ্ড। এ কোথায় এলাম! এ কি আমারই ঘর! একধারে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মতো লোক, মুখে প্রসন্ন হাসি, হাতে প্রকাণ্ড একটা ঘিয়ের প্রদীপ।

"এস পীতাম্বর দত্ত। ভিতরে এস। আমার সঙ্গে আলাপ কর।"

দত্ত ভয়ে ভয়ে ঢুকে দৈত্যের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চরিত্রের সমস্ত প্যাঁচ খুলে গেল যেন। কিন্তু সে দৈত্যের চোখের দিকে চাইতে পারল না, যদিও দৈত্যের স্বচ্ছ প্রসন্ন দৃষ্টিতে ভয়ংকর কিছু ছিল না।

"আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমি বর্তমান পূজার ভূত। মুখ নীচু করে' থেকো না। চাও আমার দিকে।"

দত্তর কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা হ'ল। শ্রদ্ধাভরে সে চোখ তুলে চাইলে। ভূত এক অদ্ভুত রঙের পোশাক পরে' আছে। ঘন সবুজ রঙের আলখাল্লা একটা, সাদা পাড়-বসানো। ঠিক যেন বাউলের মতো ঢিলে-ঢালা পোশাক। বুকটা কিন্তু ঢাকে নি। প্রশস্ত ছাতিটা যেন নীরবে ঘোষণা করছে, আমাকে কেউ ঢাকতে পারবে না। পা দুটোও ঢাকা পড়ে নি। খালি পা। মাথায় টুপি ছিল না, ছিল সবুজ ধানের শীষ দিয়ে তৈরি একটি চমৎকার মুকুট। তার কালো কুঞ্চিত লম্বা কেশ বাবরির মতো লুটিয়ে পড়েছিল কাঁধের উপর স্বচ্ছন্দে। সবই তার স্বচ্ছন্দ। মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টি, প্রসারিত করতল, আনন্দিত কণ্ঠস্বর, সহজ ব্যবহার—কোথাও কোন কুণ্ঠা নেই। কোমরে জড়ানো ছিল একটা ফুলের মালা।

"আমার মতো কাউকে দেখনি আগে নিশ্চয়।"

ভূত হেসে প্রশ্ন করল।

"না।"

"আমার পরিবারের ছোটদের সঙ্গেও মেশো নি বোধ হয়। ঠিক ছোট নয়, আসলে বড়, মানে যারা সম্প্রতি কিছুদিন আগে জন্মেছে।"

"না, বোধহয় মিশি নি। মনে পড়ছে না। আপনার কতগুলি ভাই আছে?"

"প্রায় হাজার দুই হবে।"

"এ বাজারে এত পরিবার! সামলানো শক্ত"—মৃদুকণ্ঠে বলে দত্ত।

ভূত উঠে দাঁড়াল।

দত্ত তখন সবিনয়ে বলল, "আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চান, চলুন। আপনার আগে যিনি এসেছিলেন তিনি জোর করে' আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শিখেছি। এখন আপনি যদি আমাকে কিছু দেখাতে চান, আমি রাজি আছি।"

"আমার এই আলখাল্লাটা ছুঁয়ে থাক।"

দত্ত এগিয়ে গিয়ে মুঠো করে' ধরল সেটা।

সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করল সব। সবুজ লতাপাতা, ফুল, ফুলের মালা, নৈবেদ্যের সারি, প্রতিমা পূজার উপচার মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সব। ঘরটাও মিলিয়ে গেল, রাত্রিটাও। তারা সপ্তমীর ভোরে একটা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ভৈরবী সুরে সানাই বাজছে দূরে। আগমনীর গান। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে সবাই। অনেক ঘরের সামনেই ঘট, তার

উপর নব-পত্রিকা। দরজার দু'পাশে কলাগাছ। দেবদারু পাতা আর রঙীন কাগজের মালাও দুলছে কোথাও কোথাও। নানারকম পাখী ডাকছে। বিশেষ করে' কোকিল আর হলদে পাখী। উৎসব পড়ে' গেছে চড়াই পাখীদের। তারা কোথাও বসছে দল বেঁধে, চটপট করে' দানা খুঁটে খেয়ে নিচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে তারপর দল বেঁধে। একপাল পায়রা একটা বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছে, ব্যস্ত হ'য়ে খাবার খাচ্ছে তারা। বাড়ির গৃহিণী একটা ডালা থেকে খাবার ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কি প্রসন্ন ভাব তাঁর মুখে! আকাশ নির্মেঘ, একটা ঘন-নীল আনন্দের সমুদ্র যেন নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ হ'য়ে মাথার উপর। মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে। শরতের স্নিগ্ধ হাওয়া। শাঁখ বেজে উঠল একটা বাড়ি থেকে। একে একে বাড়ির কপাট খুলতে লাগল। ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সব বেরুতে লাগল একে একে। সবারই মুখে আনন্দের জ্যোতি, অনেকেরই গায়ে নূতন পোশাক, অনেক ছেলের রঙীন বেলুন। দোকানীরা দোকান খুলতে লাগল তারপর। দোকানগুলো যেন নূতন সাজে সেজেছে, দোকানীরাও। সন্দেশের দোকানে কি অপূর্ব শোভা! সন্দেশগুলোও সব নূতন সাজ পরেছে। কেউ লাল, কেউ সবুজ, কারো গায়ে রাংতা দেওয়া। থাকে থাকে সাজানো রয়েছে সব। এ ছাড়া রাস্তার উপরেই একধারে বসে' গেছে ছোট ছোট খেলনার পসারীরা। তাদের দোকানে ছোট ছোট বাঁশের বাঁশি, টিনের বাঁশি, রবারের নানারকম পুতুল, ছোট ছোট পিস্তল। তাদের পাশেই চিনির মঠ বিক্রি করতে বসে' গেছে বুড়ো একটি লোক। রঙীন মঠ, সাদা মঠ। গোলাপ-ছড়িও আছে তার কাছে। তার পাশে একটি কুমোর-বউ। তার কাছে রয়েছে নানারকম মাটির খেলনা। ছোট ছোট ঘোড়া, গরু (গরুগুলো ছাগলের মতো দেখাচ্ছে), মাথায়-টুকরি লাল-নীল রঙের মেয়ে, সারি সারি গণেশ, হাতী, বালগোপাল, লাঠি-ঘাড়ে পাগড়ি-মাথায় পুলিস, কত কি। খুব বড় একটা মনিহারী দোকান খুলেছে ওদিকের কোণটায়। বনবন করে' পাখা ঘুরছে তাতে, রেডিও বাজছে। ফরসা লম্বা ফণী পালিত বসে' আছেন। দোকানের মালিক তিনি। কুচকুচে গোঁফ ইয়া পাকানো। বড় বড় চোখ দুটি কিন্তু হাসছে। মূর্তিমান আনন্দের মতো বসে' আছেন তিনি হাসিমুখে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ভিড় করছে তাঁর দোকানের সামনে—মোটরের দাম কত, ওই হাঁসটা কি প্যাঁকপ্যাঁক করবে, ওটা কি ব্যাঙো, ওই শিশির ভেতর পদ্মফুলটার দাম কত—অসংখ্য রকম প্রশ্ন করছে ছেলেমেয়ের দল। তিনি হাসিমুখে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন আর প্রত্যেককে দিচ্ছেন একটি লজেন্‌স্। পুজোর ক'দিন তিনি লজেন্‌স্ বিতরণ করেন। কুকুরও জুটেছে অনেকগুলো। তারাও যেন পুজোর আনন্দে মেতেছে। মাঝে মাঝে খুব কলরব করে' উঠছে, সকলের মনে হচ্ছে ঝগড়া করছে বুঝি। কিন্তু আসলে ওটা ঝগড়া নয়, আনন্দ। চারিদিকেই আনন্দের সাড়া পড়ে' গেছে। একটা নীলকণ্ঠ পাখীর ডাকে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে চারদিক। হঠাৎ একসঙ্গে ঢাক বেজে উঠল অনেকগুলো। কাছেই বারোয়ারিতলা, মায়ের পুজো আরম্ভ হ'য়ে গেল বোধহয়। ছুটল সবাই সেদিকে। পিল পিল করে' ছুটল।

বারোয়ারিতলার সামনে বিস্তৃত মাঠে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। স্টেজও বাঁধা হয়েছে একটা। আজ রাত্রে সেখানে 'কর্ণার্জুন' অভিনয় হচ্ছে। কর্ণ সাজবে পাড়ার বিখ্যাত অভিনেতা। সেই সামিয়ানার তলায় কাঠের বেঞ্চি আর টিনের চেয়ারও সাজানো রয়েছে। অনেক লোক বসে' আছেন। আর তাঁদের সামনে ঢুলীরা বাজনা বাজাচ্ছে। বড় বড় ঢাকের উপর পালক, ঢুলীদের চেহারা কুচকুচে কালো, মাথায় বাবরি চুল, একজনের গলায় রূপোর মাদুলি একটা। নেচে নেচে কী বাজনাই বাজাচ্ছে তারা! চতুর্দিক সরগরম হ'য়ে উঠেছে। বাজনার তালে তালে কাঁসিও বাজছে একখানা। বাজনা নয়, যেন যুদ্ধ। শব্দের যুদ্ধ। গুড় গুড় গুড়, গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম, যেন কামান আওয়াজ হচ্ছে। দত্ত হঠাৎ লক্ষ্য করল যে ভূত তার আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা পিচকিরির মতো জিনিস বার করে' চারদিকে আতরের মতো কি একটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ঢাকের বাজনা থেমে গেল। শাঁখ বাজল আবার। চণ্ডীপাঠের উদাত্ত ধ্বনি শোনা গেল। ঘণ্টা বাজতে লাগল পুরোহিত মহাশয়ের হাতে। ধূপ ধুনোর গন্ধে, ফুলের গন্ধে, ভোগের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হ'য়ে উঠল।

দত্ত জিগ্যেস করল—"আপনি যা ছড়াচ্ছেন তাতে কি গন্ধ আছে কোনও? আতর না কি!"

"না, আতর নয়। তবু গন্ধ আছে ওতে। আমার গন্ধ।"

"আপনার গন্ধ? কি রকম?"

"আমি যা ছড়াচ্ছি তাতে আজকের সব কিছু মধুময় হ'য়ে যাবে। সব মন্ত্র, সব নতুন কাপড়, সব ফুল, সব হাসি, সব খাবার নূতন একটা গন্ধে ভরপুর হ'য়ে উঠবে। বিশেষ যে সব খাবার গরীবদের দেওয়া হচ্ছে, তা আরও মধুময়—আরও সুরভিত হ'য়ে উঠবে!"

"গরীবদের সম্বন্ধে এ পক্ষপাত কেন।"

"ওদের প্রয়োজন যে অনেক বেশী।"

"আপনাকে একটা কথা বলব?"

"কি, বল।"

"এখানে গরীবদের লংগরখানায় রোজ খেতে দেওয়া হয়। আজ সেটা বন্ধ। গরীবরা আজ সেখানে খেতেই পাবে না।"

"কেন?"

"কর্মচারীরা সব পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেছে। অর্থাৎ আপনার নামেই এটা হয়েছে। উচিত হয়েছে কি?"

"পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা আমার নামের সুযোগ নিয়ে অনেক অন্যায় করে। পুজোর নামে অনেক বীভৎস জিনিস হয় তা জানি। নিজেদের স্বার্থপরতা, নিজেদের অহংকার, নিজেদের নীচতা, নিজেদের ঝগড়া, নিজেদের হিংসা সমস্ত আরোপ

করে আমার উপর। তারা আমাকে জানে না, আমার যারা প্রিয় তাদেরও জানে না। দোষটা আমাকে দিও না, তাদের দাও।"

"বেশ।"

আবার তারা চলতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, অদৃশ্য হ'য়ে চলছিল তারা। আরও দূরের দিকে চলতে লাগল তারা, শহরতলির দিকে। দত্ত ভূতটির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করল। যদিও সে বৃহৎকায় কিন্তু যে-কোনও অবস্থায় সে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিচ্ছিল। একটা বড় 'হল'-এ বা একটা খুব নীচু ছাঁচতলায় কোথাও বেমানান হচ্ছিল না সে।

তাই এই ক্ষমতা দেখাবার জন্যেই হোক, কিংবা তার মহৎ উদার প্রাণখোলা স্বভাবের জন্যই হোক, সে গরীবদের পাড়ার দিকে যেতে লাগল। ক্রমশঃ সে দত্তর কেরানী যদুবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হ'ল। দত্তকেও যেতে হ'ল তার সঙ্গে সঙ্গে তার আলখাল্লা ধরে' ধরে'। যদুবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে ভূত তার পিচকিরি বার করে' আতর ছড়াতে লাগল। দত্তর মনে হ'ল, যদু মাত্র আশি টাকা মাইনে পায়। তার বাডির সামনে ভূত এত আতর খরচ করছে! কি কাণ্ড! ভূত তার খোলার ঘরটাকে আতরে নাইয়ে দিলে একেবারে। তারপর তারা ঢুকল তার ঘরে।

যদুর স্ত্রী খাবার দিচ্ছিল সকলকে। আধঘোমটা দেওয়া, নাকে একটি নাকছাবি, পরনের কাপডটা নতুন, কিন্তু খুব খেলো। পাড়টাতেই একটু জাঁকজমক। কস্তা লাল পাড তাকে সাহায্য করছিল তার দ্বিতীয় মেয়ে অনিমা। তার পরনের কাপডটা যদিও ডুরে, কিন্তু সেটাও খুব বেশী দামী নয়। যদুর বড় ছেলে পলটু খুব ঢলঢলে জামা পরে' আছে। যদু এই জামাটা বছর দশেক আগে কিনেছিল, সিল্কের পাঞ্জাবি একটা। কিন্তু সেটা পরে নি, রেখে দিয়েছিল পলটু বড় হ'য়ে পরবে বলে'। এবার পুজোয় পলটুকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তবু পলটুর গায়ে ঢলঢল করছে। হাতাটা এত বেশী বড যে বেচারা জুত করে' পায়েস খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু তবু তার দুঃখ নেই, সে যে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি পেয়েছে এই আনন্দেই সে বিভোর। খাওয়া শেষ ক'রে কখন সে পুজোবাড়িতে গিয়ে সবাইকে পাঞ্জাবিটা দেখাবে এই কথাই সর্বক্ষণ ভাবছে। এমন সময় লক্ষ্মী আর রামু ছুটতে ছুটতে ঢুকল বাইরে থেকে।

"মা, মা, বিশু ময়রা আমাদের জন্যে পান্তুয়া ভাজছে। দেখে এলাম। গন্ধ থেকেই বুঝেছি আমাদের জন্য ভাজছে।"

পলটু নিবিষ্টমনে চেটে চেটে পায়েসটা খাচ্ছিল পাঞ্জাবির হাতা বাঁচিয়ে।

যদুর মা বললেন, "কিন্তু তোমার বাবার কি কাণ্ড। সেই যে গেছেন ফেরবার নাম নেই। তিনুও তাঁর সঙ্গে। আর সদি পোড়ারমুখিরও দেখা নেই এখনও আজ।"

"এই যে সদি পোড়ারমুখি—"একটি হাসিখুশী অল্পবয়সী ঠিকে-ঝি কপাট ঠেলে ঢুকল।

"এই যে সদি পোড়ারমুখি এসেছে"—চীৎকার করে' উঠল রামু আর লক্ষ্মী, আর দু'হাত তুলে নাচতে লাগল তাকে ঘিরে ঘিরে—"সদি জানিস? বিশু ময়রা আমাদের জন্যে পান্তুয়া ভাজছে, কি চমৎকার গন্ধ ছেড়েছে।"

"আজকের দিনে এত দেরি করে' আসে কেউ"—যদুর বউ সদির দিকে ফিরে বললেন—"নে, ও ঘরে গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে আয়।"

"কাল রাত্রে আমার অনেক কাজ ছিল বউদি। নিমাইবাবুর বাড়িতে পুজো তো, কাজ সারতে সারতে রাত দুপুর হ'য়ে গেল।"

"যাক এসেছ, বেঁচেছি। নাও এখন তাড়াতাড়ি, কাপড়টা ছেড়ে ফেল। তোর জন্যে নতুন কাপড় রেখেছি একখানা। গত বছরে আমিই কিনেছিলাম পরব বলে, আমার আর পরা হয় নি। তুই-ই পর।"

"বাবা আসছে, বাবা আসছে"—চেঁচিয়ে উঠল রামু আর লক্ষ্মী (তারা যেন সব সময় সর্বত্র বিরাজমান!)—"সদি লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়! শিগ্‌গির ও ঘরে যা—"

সদি মুচকি হেসে চলে' গেল।

যদুবাবু ঢুকলেন তিনুকে কাঁধে করে'। গলায় প্রকাণ্ড একটা কমফর্টার জড়ানো, ঠাণ্ডা লেগেছে ভদ্রলোকের জলে ভিজে। তাঁর কাপড় জামা যদিও ধোপদুরস্ত কিন্তু পুরোনো, মাঝে মাঝে সেলাই আর তালি থেকে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কাঁধে তিনু। বেচারা তিনু। তার হাতে একটি ক্রাচ, পা দুটি splint দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা। বেচারা হাঁটতে পারে না।

"সদি কই?"—জিজ্ঞেস করলেন যদুবাবু।

হাসি গোপন করে' যদুবাবুর স্ত্রী বললেন, "সে আসবে না।"

"আসবে না, বল কি!"

যদুবাবু একটু দমে' গেলেন যেন। তিনি তিনুকে কাঁধে করে' ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকদূর যেতে হয়েছিল, কারণ বারোয়ারিতলা তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় দু' মাইল। কিন্তু কিছু দমেন নি তিনি, ক্লান্তও হন নি, তিনুর সঙ্গে নানারকম আবোল-তাবোল গল্প করতে করতে মনের আনন্দে সারাটা রাস্তা এসেছিলেন। কিন্তু বাড়িতে এসে একি দুঃসংবাদ। আজ পুজোর দিনে সদি আসে নি। ভারি বিমর্ষ হ'য়ে গেলেন।

সদি দরজার আড়াল থেকে সব দেখছিল। যদুবাবুর মুখটা দেখে ভারি কষ্ট হ'তে লাগল তার। ঠাট্টা করেও পুজোর দিনে কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না কি। সে হাসিমুখে বেরিয়ে এসে প্রণাম করলে যদুবাবুকে।

"আরে এই যে—"

যদুবাবু হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন।

"ওরা ঠাট্টা করছিল—যা দুষ্টু সব।"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল সদি। লক্ষ্মী আর রামু তিনুকে যদুবাবুর কাঁধ থেকে নামিয়ে নিয়ে

গেল পাশের ঘরে। সেখান থেকে বিশু ময়রার দোকানটা দেখা যায় জানলা দিয়ে। কেমন পান্তুয়া ভাজা হচ্ছে তাই দেখতে নিয়ে গেল তাকে।

যদুবাবুর স্ত্রী জিগ্যেস করলেন, "তিনু কোনও দুষ্টুমি করে নি তো ?"

যদুবাবু হাসিমুখে বেশ বাগিয়ে বসেছিলেন কোণের চেয়ারটায়।

"না, কিচ্ছু না। তোমার ওই ছেলে যদি বাঁচে মস্ত বড় কবি হবে একজন। আসতে আসতে কি বলছিল জান ? বলছিল, মা দুগ্‌গা তো খুব ভালো, না ? তিনি তো কত লোকের কত ভালো করেন। আমিও তাঁকে প্রণাম করে' আজ বলেছি—মা, আমাকে ভালো করে' দাও। বাবা আমাকে আর কত কাঁধে করে' করে' নিয়ে বেড়াবে ! শুনেছ ছেলের কথা। সমস্ত রাস্তাটা এই সব বলতে বলতে এসেছে !"

বলতে বলতে যদুবাবুর গলাটা কেঁপে গেল। তারপর বললেন, "বলতে নেই, ওজনেও ও একটু ভারী হয়েছে। অনেকদিন তো ওকে কাঁধে করি নি।"

একথা বলতে গিয়ে গলা আরও কেঁপে গেল।

ঘরের ভিতর তিনুর 'ক্রাচে'র খটখট শব্দ হচ্ছিল। ক্রাচের উপর ভর করেই পাশের ঘর থেকে হেঁটে বেরিয়ে এল সে। লক্ষ্মী আর রামুও এল সঙ্গে সঙ্গে। রামুর হাতে ছোট্ট টুল। টুলটা পেতে দিতে তিনু তার উপর বসল। তিনুর জন্যে একটু আলাদা খাবারের ব্যবস্থা ডাক্তারবাবু করেছিলেন। রোজ সকালে চকোলেট দিয়ে এক পেয়ালা দুধ। যদুবাবু সেটা ধরে' রইলেন তিনুর মুখে। তিনু ঢক-ঢক করে' খেতে লাগল।

"বিশুর দোকান থেকে তোমরা গরম সিঙাড়া নিয়ে এস। পান্তুয়া হ'তে এখনও দেরি আছে। এখন ভেজে রসে দিচ্ছে. ওবেলা ঠিক হবে। এবেলা সিঙাড়া খাও সব।"

হুড়মুড় করে' বেরিয়ে গেল রামু আর লক্ষ্মী আর আরও দুটি ছোট ছোট ছেলে। একটু পরে প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা নিয়ে ফিরল তারা। চোখে মুখে হাসি উপচে পড়ছে সকলের।

সিঙাড়ার গন্ধে ভরে' উঠল চতুর্দিক। তখনি লক্ষ্মী আর রামু সিঙাড়া খেতে যাচ্ছিল কিন্তু যদুবাবুর স্ত্রী বললেন, "না, আগে গিয়ে ঠাকুরঘরে মাকে প্রণাম করে' এস সবাই।" সবাই ঢুকল ঠাকুরঘরে। সেখানে নানারকম ঠাকুরদের ছবি তো আছেই, ঠাকুমা ঠাকুর্দার ফটোও আছে। সবাই সেখানে প্রণাম করে' এল। তিনু তার টুলে বসে' বসেই প্রণাম করতে লাগল তাঁদের উদ্দেশে। যদুবাবু তাকে আর টুল থেকে নামতে দিলেন না।

তারপর সিঙাড়ার ঠোঙা খুলে সিঙাড়াগুলো ঢালা হ'ল একটা থালায়। উঃ, সে কি আনন্দ ! উদ্ভাসিত মুখে সবাই ঘিরে দাঁড়াল মাকে। সিঙাড়া যেন একটা অদ্ভুত আশ্চর্য অভূতপূর্ব খাবার। বছরে ক'দিনই বা বেচারারা সিঙাড়া খেতে পায়। মা সকলের হাতে একটা করে' দিলেন। বাকি রইল দুখানা। তার একটা দেওয়া হ'ল সদিকে। সদির বয়স উনিশ কুড়ি বছর। সে-ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একমুখ হেসে খেতে লাগল সিঙাড়া। বাকি সিঙাড়াটা যদুবাবুর স্ত্রী যদুবাবুর হাতে দিলেন। কিন্তু তিনি সবটা খেলেন না, আধখানা রেখে দিলেন স্ত্রীর জন্য।

যদুবাবু বললেন, "কম পড়ে' গেল, না? আর একটা করে' হ'লে ভালো হ'ত। আচ্ছা, নিয়ে আয় আর এক টাকার।"

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল লক্ষ্মী, রামু আর তার সঙ্গে বাকি সকলে।

তিনু বললে—"সিঙাড়াটা খুব ভালো হয়েছে বাবা!"

"বিশু ভালোই করে বরাবর। আজ পুজোর দিন বলে' আরও ভালো করেছে। চমৎকার হয়েছে পুরটা।"

সিঙাড়া এসে পড়ল আবার।

যদুবাবুর স্ত্রী বললেন, "ওগুলো বড্ড গরম। একটু ঠাণ্ডা হোক। আগে হালুয়া খেয়ে নাও।"

যদুবাবু হেসে বললেন, "তুমি যে রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করেছ দেখছি। আমি এখন খাব না ওসব, ব্লাডপ্রেসারটা বেড়ে যাবে।"

"সিঙাড়া খেলে বুঝি ব্লাডপ্রেসার বাড়ে না!"

যদুবাবু হাসলেন কেবল, কিছু বললেন না।

ছেলেমেয়েরা আগেই পায়েস খেয়েছিল। যদুবাবু আর তিনুর জন্যে দুটি বাটিতে পায়েস রাখা ছিল। সেই দুটি বার করে' নিয়ে এলেন যদুবাবুর স্ত্রী।

যদুবাবু বললেন, "আমি ভাতের সঙ্গে খাব এখন। আমারটা রেখে দাও।"

একটা চামচে দিয়ে তিনুকে পায়েসটা তিনি খাইয়ে দিতে লাগলেন।

যদুবাবুর স্ত্রী হাঁক দিলেন—'সদি, হালুয়ার কড়াইটা নিয়ে আয় রান্নাঘর থেকে।"

লক্ষ্মী আর রামুও ছুটে চলে' গেল রান্নাঘরের দিকে। কড়াটা সদি যদি একা আনতে না পারে! ছোট্ট কড়া, অনায়াসেই নিয়ে এল সদি। লক্ষ্মী আর রামু আবার তার পিছু-পিছু ফিরে এল। বড়লোকের বাড়ি হ'লে প্রত্যেককে ডিশে করে' হালুয়া দেওয়া হ'ত কিন্তু অত ডিশ কোথা পাবেন যদুবাবুর স্ত্রী। প্রত্যেককে হাতে হাতেই দিলেন ডেলা পাকিয়ে। তিনুর পায়েস খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। যদুবাবু তাকে জল খাইয়ে মুখটা মুছিয়ে দিলেন।

তিনু একমুখ হেসে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, "চমৎকার হয়েছে পায়েস মা। আমার জন্মদিনে যে পায়েস হয়েছিল তার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে আজ।"

"সেবার মোহন গয়লা দুধই ভাল দেয় নি।"

তারপর তিনুকে হালুয়া খাওয়াতে লাগলেন যদুবাবু। বাকি সকলেও হালুয়া খেয়ে আনন্দে অধীর। শুধু হালুয়া নয়, হালুয়ার ভিতর কিসমিসও আছে! লক্ষ্মী আর রামু হালুয়া খেতে খেতে নাচ শুরু করে' দিলে।

সদি হালুয়াটা আড়ালে রেখে দিয়েছিল। তার ছেলেটার জন্যে নিয়ে যাবে বলে'। যদুবাবুর স্ত্রীর সেটা চোখ এড়ায় নি। হেসে বললেন, "ওটা তোকে দিয়েছি, তুই খা। তোর ছেলের জন্য দেব'খন আলাদা করে'। পায়েসও দেব। একখানা রুটি আছে সেটাও নিয়ে যাস।"

লজ্জিত মুখে সদি হালুয়া খেতে লাগল। খেতে খেতে বলল, "তুমি আজ ঘিয়ের মট্‌কিটি শেষ করেছ মনে হচ্ছে। ঘি চপচপ করছে একেবারে। হাতে কত ঘি লেগেছে!"

"পূজোর দিন ভালো করে' খাবি না? আজ কি আর ঘিয়ের কথা ভাবলে চলে!"

যদুবাবু বললেন, "আজই আবার ঘি এসে যাচ্ছে। কসবা থেকে সোনা মামা আসছেন আজ সন্ধের সময়। তাঁকে লিখে দিয়েছি ঘি আনতে। খুব ভালো ঘি কসবায়। পাঁচ সের আনতে বলে দিয়েছি।"

"পাঁচ সের!"—আঁতকে উঠলেন যদুবাবুর স্ত্রী—"অত টাকা পাবে কোথায়।"

"একেবারে না পারি, দুবারে না হয় তিনবারে দেব।"

খাওয়া-দাওয়ার পর রামু বলল—'বাবা, আমরা এবার বারোয়ারিতলায় যাই? 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে যিনি ভীম সাজবেন তিনি নাকি খুব ভালো গাইয়ে। গান শোনাচ্ছেন সকলকে। যাই?"

"যাও। তবে সাবধানে যেও। রাস্তায় মোটরের খুব ভিড়।"

"আমাকে চারটে পয়সা দেবে বাবা? গুলি কিনব।"

যদুবাবু পকেট থেকে 'মানিব্যাগ' বার করে' হাত ঢুকিয়ে দেখলেন।

"আমার কাছে নেই, হ্যাঁগা, তোমার কাছে আছে?"

যদুবাবুর স্ত্রী বললেন—"আছে। ভেবেছিলাম নুন আনতে দেব। তা পরে আনালেই হবে। রান্নাঘরের তাকে আনি আছে একটা, নিয়ে যা—"

রামু লাফিয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে 'আনি'টা নিয়ে এল। তারপর হৈ হৈ করে' বেরিয়ে গেল সবাই। তিনুর মুখটা বিমর্ষ হ'য়ে গেল। যদিও সে একটু আগে বাবার কাঁধে চড়ে' ঠাকুর দেখে এসেছে কিন্তু, সকলের সঙ্গে হৈ হৈ করে' যাওয়ার আনন্দ আলাদা। সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত বেচারা। বোধহয় চিরজন্মের মতো বঞ্চিত। যদুবাবু তাকে সান্ত্বনা দিলেন, "তোমাকে বিকেলে আবার ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাব। লজেন্‌স্‌ও কিনে দেব সেই সময়।"

তিনুর মুখ একটু প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। বাবার হাতে হাতটি দিয়ে চুপ করে' বসে' রইল সে।

দত্ত ভূতের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল—"আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। তিনু কি বাঁচবে?"

"না, বাঁচবে না। আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওই টুলটিতে আর কেউ বসছে না। ওই ক্রাচ্‌ দুটি কোণে ঠেসানো আছে। তিনু নেই।"

"না, না, ও কথা বলবেন না। বলুন ও বেঁচে যাবে।"

"আমি যা দেখছি তা যদি সত্য হয় তাহলে ও বাঁচবে না। ও যদি না বাঁচে তাহলে ক্ষতিই বা কি! বাড়তি লোকসংখ্যা কমে' যাবে। ভালোই তো হবে তাতে।"

দত্ত মাথা নীচু করে' রইল। তার নিজের কথাগুলোই ফিরে এল তার কাছে। খুব

অনুশোচনা হ'তে লাগল। ভূত বলল, "দেখ দত্ত, একটা কথা শুনে রাখ। মনে প্রাণে যদি পাথর না হ'য়ে গিয়ে থাক, কিছু মনুষ্যত্ব যদি এখনও বেঁচে থাকে তাহলে ওই সব বাজে কথা বোলো না আর। বাড়তি লোকসংখ্যা কমাবার তুমি কে? কার মরা উচিত আর কার বাঁচা উচিত তা কি তুমি ঠিক করতে পার? হ'তে পারে হয়তো ভগবানের চোখে ওই তিনুর চেয়ে তুমি ঢের বেশী খারাপ, যদি কারো আগে মরতে হয়, তোমারই মরা উচিত। একটা পোকা কি করে' ঠিক করবে অন্য পোকাগুলোর বাঁচা উচিত কিনা!"

বকুনি খেয়ে দত্তর মাথা আরও নীচু হ'য়ে গেল। একটা শিহরণও বয়ে' গেল সারা দেহে। কিন্তু নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে সে আবার মুখ তুলে চাইলে।

যদুবাবু বলছেন, "পীতাম্বরবাবুর নামেও একটা পুজো দিও আজ। হাজার হোক, তিনি আমাদের অন্নদাতা। তাঁর মঙ্গল হলেই আমাদের মঙ্গল!"

"পুজো দেব তাঁর নামে!"—ফোঁস করে' উঠলেন যদুবাবুর স্ত্রী—"সুযোগ পেলে তাঁর শ্রাদ্ধ করতাম, পিণ্ডি চটকাতাম।"

"ছি, ছি, কি বলছ তুমি, আজ পুজোর দিন!"

"আজ পুজোর দিন তা মানছি। আজ কারও অমঙ্গল চিন্তা করতে নেই তা ঠিক। কিন্তু ওই রকম অভদ্র, কৃপণ, চামার, ছোটলোকের নামে পুজো দেব তা বলে'! ও যে কি রকম লোক তা তোমার অন্ততঃ অবিদিত নেই।"

"আজ পুজোর দিন, রমা। আজ ওসব বলতে নেই। যখন বারোয়ারিতলায় যাবে দিও একটা পুজো ওঁর নামে।"

"বেশ, বলছ যখন দেব। ভগবান ওঁকে সুখী করুন, ওঁর মঙ্গল করুন"—তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, "আর একটা কথাও বলব মাকে তাহলে।"

"কি—"

সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন যদুবাবু।

"মাকে বলব, মা ওঁর চোখে একটু চামড়া দাও, আর একটু সুমতি দাও।"

মুখে আঁচল দিয়ে নিজের রসিকতায় খুব হাসতে লাগলেন।

"রেগে থেকো না দত্ত মশায়ের উপর। একটা কথা ভুলে যেও না, উনি আমার অন্নদাতা। এ বয়সে যদি তাড়িয়ে দেন চাকরি পাব না কোথাও। সব আফিসেই আজকাল বি. এ., এম. এ.-র ভিড়। আমার বিদ্যে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত—"

তারপর যদুবাবু থেমে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন। তিনি যে অর্থাভাবে লেখাপড়া করতে পারেন নি, এই কথাটাই মনে হ'ল বোধহয় তাঁর। পল্টুকেও তিনি বেশীদূর পড়াতে পারবেন না। আজকাল পড়াশোনার খরচ এত বেশী যে তাঁর মতো লোকের সাধ্যে কুলোয় না। পল্টুর একটা চাকরির কথা তিনি বলে' রেখেছেন মণিবাবুকে। মণিবাবু তাঁর দোকানে একজন বিশ্বাসী লোক রাখতে চান। একটা নেপালী ছোঁড়া রেখেছিলেন, সে চুরি করে' পালিয়েছে। মণিবাবুর কাটা-

কাপড়ের প্রকাণ্ড দোকান। তিনি এখন পলটুকে মাসে ত্রিশ টাকার বেশী দিতে পারবেন না বলেছেন। যদুবাবু খুব রহস্যময়ভাবে কথাটা ভাঙলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে।

"পলটুর ভাগ্যটা ভালো। মণিবাবু যে এককথায় রাজি হ'য়ে যাবেন তা ভাবি নি।"

যদুবাবুর স্ত্রী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন যদুবাবুর দিকে।

"কেন, কি হয়েছে।"

"পলটুর চাকরি ঠিক করেছি একটা। আসছে মাস থেকে মণিবাবুর দোকানে যাবে ও।"

"তাই নাকি! কত মাইনে।"

"এখন ত্রিশ টাকা করে' দেবেন। ফি বছরে পাঁচ টাকা করে' বাড়বে। দোলে পুজোয় জামা কাপড় পাবে। ঢুকিয়ে দি, কি বল?"

"দাও।"

যদুবাবুর স্ত্রীর কণ্ঠে কিন্তু তেমন আনন্দের সুর ফুটল না। তাঁর আশা ছিল লেখা-পড়া শিখে ছেলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে। বাঁড়ুয্যেবাড়ির ছেলেটি বিলেত যাচ্ছে, বোসেদের বাড়ির ছেলে মুন্সেফ হয়েছে। যদুবাবুর স্ত্রীরও আশা ছিল। কিন্তু সব আশা কি পূর্ণ হয়?

সদি উঠোনে বাসন ধুচ্ছিল।

সে বলল, "ঢুকিয়ে দাও বাবু। মাইনে ভালোই দিচ্ছে। দিনকাল যা পড়েছে তাতে ভালো চাকরি পাওয়াই যায় না। আমি এ্যাদ্দিন ওদের বাড়ি কাজ করছি, খেটে খেটে হাড়মাস কালি হ'য়ে গেল, মাইনে দেয় মাত্র পঁচিশ টাকা। ত্রিশ টাকা মাইনে দিচ্ছে, ভালোই দিচ্ছে।"

কড়াইটা জোরে জোরে ঘষতে লাগল।

গরীব পরিবার এরা। দারিদ্র্যের ছাপ সর্বত্র। ভালো পোশাক, ভালো খাবার, দামী আসবাবপত্র কিচ্ছু নেই। অর্থাভাবেই ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওরা সুখী, ওদের চোখে-মুখে আনন্দের আলো ঝলমল করছে। কারও ওপর ওদের নালিশ নেই যেন। ভাগ্যকে ওরা মেনে নিয়েছে।

ভূত তার পিচকিরি থেকে যাবার আগে আবার খানিকটা আতর ছিটিয়ে দিলে চারিদিকে। সব যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল তারা।

রাস্তায় কী ভিড়! লোকে বলছে বটে সকলের ঘরেই অভাব, দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, কিন্তু রাস্তার দিকে চাইলে তা তো মনে হয় না। রঙের স্রোত বয়ে' যাচ্ছে যেন। কত রঙের আর কত রকমের পোশাক পরেছে সবাই। দত্ত লক্ষ্য করল যত গরীবই হোক আজকের দিনে সবাই একটু ছিমছাম, সবাই একটু সেজেছে। ছেলেমেয়েদেরও সাজিয়েছে। হ'তে পারে শস্তা জামা-কাপড়ে, কিন্তু তাতে আনন্দের কোনও বিঘ্ন হয়

নি। লাল নীল হলদে নানারকম ছিটের জামা পরানো শিশুর দল, মায়ের কোলে চেপে চলেছে, ঠাকুর দেখতে। তাদের মুখে কি হাসি, কি অপরূপ সৌন্দর্য! একজায়গায় কতকগুলি রঙীন রিবন-বাঁধা মেয়ে ভিড় করেছে এক চানাচুরওলার সামনে, আর এক জায়গায় ছেলের দল। তারা ভিড় করেছে মনিহারীর দোকানে। কারও লজেন্‌স্ চাই, কারও গুলি, কারও খেলনা। একধারে দাঁড়িয়ে আছে রবারের বেলুনওলা, নানা রঙের ছোট বড় বেলুন ফুলিয়ে। তাকে ঘিরেও একদল ছেলেমেয়ে। তারা বেলুন কিনছে আর ফাটাচ্ছে। হয়রান হ'য়ে উঠেছে তাদের বাপ মায়েরা! কত কিনে দেবে!

রাস্তার ভিড় দেখে দত্তর মনে হ'ল সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তারা যদি কারো বাড়ি যায়, বাড়ি ফাঁকা দেখবে। রাস্তাটাকেই বাড়ি করে' নিয়েছে সবাই। রাস্তার উপরই দল পাকিয়ে গল্প করছে সবাই গোল হ'য়ে। রাস্তা নয়, যেন বৈঠকখানা। ভূতের দিকে চেয়ে দত্ত অবাক হ'য়ে গেল। সে যেন একটা মূর্তিমান আনন্দ। চওড়া বুক থেকে সরে' গেছে আলখাল্লাটা, মুখ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে প্রসন্নতার আলো। মহানন্দে দু'হাত দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার অদৃশ্য আতর-ভরা পিচকিরি, কেউ জানতে পারছে না, কিন্তু একটা অপূর্ব সৌরভ আর মাধুরী ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। চানাচুরওলা আর বেলুনওলাটাকে তো ভূত আতরে নাইয়ে দিলে! ভূত যেন চলছে না, ডানা মেলে উড়ছে। দত্তও উড়তে লাগল।

একটু পরে তারা যেখানে এসে হাজির হ'ল সেটা একটা অতি নোংরা জায়গা। গলির গলি তস্য গলি। ভাঙা একটা কল থেকে ক্রমাগত জল পড়ে' যাচ্ছে। চারিদিকে পচা ড্রেন ভটভট করছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। খোলার ঘর চারিদিকে আশেপাশে। ঘেয়ো কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা শীর্ণ কালো বেড়াল একটা চালের উপর থেকে উৎসুক হ'য়ে দেখতে লাগল তাদের।

"এ কোথায় এলাম আমরা।"

"এটা একটা বস্তি। যারা তোমাদের সংসার চালায়, সেই শ্রমিকরা এখানে থাকে। এরা কিন্তু আমাকে চেনে। ওই দেখ।"

দত্ত দেখতে পেল একটা খোলার ঘর থেকে প্রাণ-খোলা হাসি ভেসে আসছে। আরও কাছে গিয়ে দেখা গেল একদল লোক গোল হ'য়ে বসে' কি যেন খেলছে। কাছে গিয়ে দেখলে গুলি খেলা চলছে। বুড়ো ঠাকুরদা আর নাতি বাজি রেখে গুলি খেলছে। ঠাকুরদার বয়স আশির কাছাকাছি, আর নাতির বয়স দশ বছরের বেশী নয়। নাতি নাকি গুলি খেলায় চ্যাম্পিয়ন, ঠাকুরদা বলেছে তাকে হারিয়ে দেবে। সে-ও ছেলেবেলায় চ্যাম্পিয়ন ছিল। ভিড়ের মধ্যে দু'তিনজন গলা মিলিয়ে গাইছে— চল্, চল্ রে নওজোয়ান। একটা আনন্দময় উত্তেজনার পরিবেশে থমথম করছে চারিদিক।

ভূত এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। দত্তর দিকে চেয়ে বলল—"আমার জামাটা ভাল করে' চেপে ধর।" তারপর উড়ে চলল। কোথায় যাচ্ছে? গঙ্গার দিকে নাকি! হ্যাঁ, গঙ্গার ধারেই এসে দাঁড়াল তারা। মাঝিদের মধ্যে। সারি সারি নৌকো বাঁধা রয়েছে। প্রত্যেক নৌকোটি সাজানো। কেউ ফুলের মালা জড়িয়ে দিয়েছে মাস্তুলের উপর, কেউ কাগজের রঙীন শিকল, কারও বা হালের চারধারে সবুজ লতার গোছা। রংও দিয়েছে অনেক নৌকোয়। গঙ্গার ধারে একটা খড়ের চালা তুলে সেখানে পূজোও হচ্ছে। ছোট্ট প্রতিমাটি। তার সামনে বসে' গেছে একদল ঢোলক আর খঞ্জনি নিয়ে। গান ধরেছে সমস্বরে—দুর্গা মায়ী, জয় জয়। দুর্গা প্রতিমার সামনে পেঁড়া, বাতাসা, বালুশাই আর নানারকম ফলমূলের স্তূপ। একদল উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে ভিড় করে' দাঁড়িয়ে আছে। এই সামান্য আয়োজনকে কেন্দ্র করেই কি আনন্দ জমে' উঠেছে। মনে হচ্ছে স্বয়ং গঙ্গাও যেন অংশ নিয়েছেন এতে। তাঁর তরঙ্গ-হিল্লোল আনন্দ-হিল্লোলের মতো মনে হচ্ছে।

এই সব দেখতে দেখতে দত্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিল। তার মনে পড়ল ছেলেবেলায় এই ঘাটেই তারা ঠাকুর বিসর্জন দিতে আসত। দূরে মহাবীরস্থানে মহাবীরের পতাকাটা উড়ছে পতপত করে'।

তারা যে উড়ে চলেছিল এ খেয়াল ছিল না দত্তর। হঠাৎ সে চমকে উঠল একটা হাসি শুনে। একি, এ যে তার ভাগনা প্রমোদের হাসি! দত্ত হঠাৎ দেখতে পেল তারা একটা চমৎকার সাজানো ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভূত হাসিমুখে চেয়ে আছে তার ভাগনার দিকে—! হ্যাঁ, তার ভাগনাই তো।

"হা-হা"—হাসছিল প্রমোদ—"হা, হা, হা, হা"। প্রমোদের চেয়ে বেশী প্রাণ-খোলা হাসি হাসতে পারে এরকম লোকের সঙ্গে যদি আপনার জানা-শোনা থাকে তাহলে আমিও তার সঙ্গে জানাশোনা করতে চাই।

খারাপ অসুখ যেমন ছোঁয়াচে হয়, প্রাণ-খোলা হাসি এবং পবিত্র প্রসন্নতাও তেমনি ছোঁয়াচে হয়। ভগবানের এটা অদ্ভুত নিয়ম, তিনি খারাপ জিনিসকেই কেবল ছোঁয়াচে করেন নি। হাসিও ছোঁয়াচে।

বুকের দু'পাশ চেপে ধরে' মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছিল প্রমোদ। যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ ঘিরে। একদল বন্ধুও বসেছিল, তারাও হাসছিল সবাই।

একধারে প্রমোদের মা বসে' ছোট ছোট ডিশে খাবার সাজাচ্ছিলেন। যদিও তিনি রাঁধুনী, কিন্তু পুজোর ক'দিন ছুটি নিয়েছেন। ছেলেকে আর ছেলের বন্ধুদের রেঁধে খাওয়াবেন। চমৎকার রাঁধেন তিনি। একটু দূরে আধঘোমটা দিয়ে রঙীন কাপড় পরে' একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দত্ত বুঝতে পারলে ওইটি প্রমোদের বউ, সেই টুনি, যার কথা বলছিল আজ।

"হা-হা-হা-হা। মামা বলছিল পুজো বাজে, 'জনা' বাজে, সব বাজে। আসল কেবল

টাকা। কি রকম মুখ গোমড়া করে' আপিসে বসে' ছিলেন যে, ঠিক যেন প্যাঁচা কোটরে ব'সে আছে কুইনিন খেয়ে। হা, হা, হা—"

টুনির মুখেও একটা নীরব মুচকি হাসি ফুটে উঠল। প্রমোদের মা বললেন, "ছি, মামাকে নিয়ে অমন ঠাট্টা করতে নেই। সত্যি ও ওরকম ছিল না কখনও, খুব আমুদে ছিল ছেলেবেলায়। আজকাল কেমন যেন বদলে গেছে।"

দত্ত টুনিকে লক্ষ্য করছিল, চমৎকার মেয়েটি তো! খুব ফরসা নয়, শ্যামবর্ণ। কিন্তু কি সুন্দর চোখ দুটি। কপালের উপর কানের উপর কোঁকড়ানো চুলগুলি যেন হাওয়ায় দুলছে। হাসলে গালে টোল পড়ে। চিবুকেও। আর কি দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। ঘোমটার আড়াল থেকে কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে চাইছে এক-একবার প্রমোদের দিকে।

প্রমোদ বলল, "মামা এখনও বেশ মজার লোক। বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন। সত্যি, কি যে হয়েছে। মামা যদি থিয়েটার করতে রাজী হতেন—ওঁকে কাত্যায়নের পার্ট চমৎকার মানাত। কিন্তু কি যে হয়েছে ওঁর, পুজোর দিনেও আপিস খোলা রেখেছেন, যদুবাবুকে পর্যন্ত ছুটি দেন নি।"

"অনেক পয়সা করেছে শুনছি"—প্রমোদের মা মৃদুকণ্ঠে বললেন।

"তা করেছেন। কিন্তু লাভটা কি হয়েছে! টাকা তো ওঁর ব্যাঙ্কে আর বাক্সে বন্ধ। উনি নিজে তো কষ্ট করে' আছেন। গায়ে সেই ময়লা জামা, পায়ে সেই ছেঁড়া জুতো। হোটেলে খান—হেঁটে হেঁটে বাড়ি যান। টাকা থেকে লাভ কি! ওঁর নিজেরও লাভ নেই, আমাদেরও নেই, কারণ আমাদের যে উনি ওঁর টাকা দিয়ে যাবেন তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না! হা-হা-হা—"

একটি বড়সড় গোছের মেয়ে সেজেগুজে বসেছিল একধারে। প্রমোদের শালী বোধ হয়। মুখের আদল দেখে দত্তর তাই মনে হ'ল। সে নাক সিঁটকে বলল, "জঘন্য লোক! সইতে পারি না ও ধরনের লোককে।"

"আমি কিন্তু পারি"—বলে' উঠল প্রমোদ—"সইতে না পারবার কি আছে? কৃপণ হ'য়ে উনি কার কি অনিষ্ট করেছেন, এক নিজের অনিষ্ট ছাড়া? নিজেরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছেন উনি। ওঁকে আজ নিমন্ত্রণ করলাম—মুখ খিঁচিয়ে বললেন, যাব না—এতে কার কি ক্ষতি হ'ল! অবশ্য আমাদের বাড়িতে যা খাওয়া হবে—পাঁঠার উরগুনি ঝোল—তা না খেলে সত্যিই যে একটা বিশেষ ক্ষতি হবে তা-ও আমি মনে করি না। হা-হা-হা।"

প্রতিবাদ করলেন প্রমোদের মা—"পাঁঠার ঝোল উরগুনি হবে কেন। খালি পেঁয়াজই দেওয়া হয়নি। আদা, দই, গোলমরিচ, গরমমসলা, হিংয়ের ফোড়ন সব রকমই দিয়েছে বউমা। এসে দেখে যেত আমার বউমা কেমন রাঁধে। তাছাড়া শুধুই কি মাংস আছে? আলুর দম, মাছের কালিয়া, মুড়ি-ঘণ্ট, ভাজা দুরকম, সরু আলো চালের ভাত, দই, মিষ্টি, পায়েস—কিছু কম করেছি নাকি আমরা!"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

সমস্বরে বলে' উঠল প্রমোদের বন্ধুরা।

"তুমি তো বউমার প্রশংসায় গদগদ হবেই, কিন্তু আসল খবরটি আমি জানি। ও কেবল খুনতি নেড়েছে, আসল রান্না রেঁধেছ তুমি! কি বলিস রে তপেশ, মাকে চিনি না? একলা বউয়ের হাতে ছেড়ে দিলে—অ্যাঁ, কি বলিস?"

তপেশ প্রমোদের শালীটির দিকে বার বার চাইছিল। তার মনের ইচ্ছেটা—কিন্তু সেটা আর খুলে বলবার প্রয়োজন কি—সেটা স্পষ্টই হ'য়ে উঠেছিল তার চোখে মুখে। সে নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের মতো আইবুড়ো কার্তিকের মতের আর কি মূল্য আছে বল্। তবে তোব বউ মাংসটা একাই রেঁধেছে শুনছি—ওটা খেয়েই বোঝা যাবে তোর ভবিষ্যৎ কি রকম।"

ও ঘর থেকে টুনি ঘোমটার ফাঁকে একটু মুচকি হেসে সরে' গেল।

হা-হা করে' হেসে উঠল প্রমোদ। সবাই হাসতে লাগল।

প্রমোদ বলল, "খাওয়ার কথা ছেড়ে দাও। খাওয়াটাই বড কথা নয়, মামাকে সেজন্য নেমন্তন্ন করি নি, পয়সা ফেলতে পারলে হোটেলেও ভালো খাওয়া পাওয়া যায়। মামাকে ডেকেছিলুম যে অনেকদিন আসেন নি, এলে সবাই মিলে বেশ একটা হুল্লোড করা যেত। এলে তাঁর মনটাও হালকা হ'ত। তিনি অন্ধকার আপিসে একটা ময়লা কোট পরে' যেভাবে বসে' আছেন দেখলাম তাতে মনে হ'ল যে তিনি বহুকাল আনন্দের মুখ দেখেন নি। দেখে দুঃখ হ'ল। কিন্তু আমি ছাড়ব না। তিনি আমাকে গালই দিন আর যা-ই করুন আমি সুযোগ পেলেই আবার তাঁকে নেমন্তন্ন করব। প্রতি বছর পুজোর সময় তো করবই, দেখি তিনি কেমন না এসে পারেন। যখনই ফুরসত পাব যাব, গিয়ে বলব, মামা কেমন আছেন? চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি। সিনেমা দেখে আসি চলুন। এই ঘুপসি ঘরটা থেকে বেরুলে সত্যিই আপনি আরাম পাবেন। চলুন দেখি। ট্যাক্সি ডাকব একটা? মামা দূর দূর করে' তাড়িয়ে দেবেন জানি। তবু আমি যাব। মামার মেজাজটা একটু ভালো করা দরকার। আর কিছু না হোক, বেচারা যদুবাবুর উপর যদি একটু সদয় হন তাহলে বেঁচে যায় লোকটা। মেজাজ ভালো হলেই বদলে যাবেন উনি। মন-রূপ ঘোড়ার মেজাজই হচ্ছে সোয়ার, সোয়ার যদি ভালো হয় তাহলেই বাস্—মামা জব্দ! হা-হা-হা—" আবার একবার হাসির ধুম পড়ে' গেল।

টুনি ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে এক কেত্‌লি গরম জল নিয়ে ঢুকল। মা টি-পট আর চা নিয়ে বসেছিলেন। নিজের হাতে চা তৈরি করে' দেবেন সকলকে। আর কারো তৈরি চা হাজার ভালো হলেও, তাঁর পছন্দ হয় না।

চা-পর্ব শেষ হ'য়ে যাবার পর প্রমোদ বলল, "এবার একটু গান-বাজনা করা যাক।"

হারমোনিয়ম বেরুল, বাঁয়া-তবলাও বেরুল একজোড়া। দুটোই ছিল তক্তাপোশের তলায়। সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে মেঝেতে শতরঞ্চির উপর বসল সবাই। প্রমোদই গান ধরে' দিলে সবচেয়ে প্রথমে—শরতে আজ কোন অতিথি এল মনের দ্বারে। আনন্দ

গান গাবে হৃদয় আনন্দ গান গাবে। একটু মেয়েলী ধাঁচের হলেও প্রমোদের গলাটি সুন্দর। তার গান শেষ হ'লে তপেশকে গাইতে অনুরোধ করতে লাগল সবাই। তপেশ নাকি অতুলপ্রসাদের গানে নাম-করা। তপেশ কিছুতেই গাইবে না। প্রমোদের শালীর সামনে সে কেমন যেন 'নার্ভাস্' হ'য়ে পড়েছিল। অনেক অনুরোধের পর সে হারমোনিয়মের সামনে বসল এবং হারমোনিয়মটা ঘুরিয়ে প্রমোদের শালীর দিকে পিঠ করে' অনেকবার কেসে গান ধরল, "সাথী ওগো সাথী সেই পথে যাব সাথে"। মিষ্টি গলা, তার উপর আবেগ-কম্পিত, খুব জমে' উঠল। গলার এবং রগের শিরও তার ফুলে উঠল ক্রমশঃ। গান শেষ হ'লে সে রুমাল বার করে' ঘাড় মুখ মুছতে লাগল। এরপর প্রমোদের মা অনুরোধ করলেন প্রমোদের শালীকে—"তুমি তো বেশ ভাল গান কর শুনেছি। আজ পূজোর দিন গান শোনাও না একটা।"

শালী লজ্জায় লাল হ'য়ে বলল—"আমার টন্‌সিলে বড় ব্যথা, ভাল গাইতে পারি না আজকাল।"

"আস্তে আস্তে গাও"—প্রমোদের মা বললেন।

প্রমোদ হঠাৎ পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে' সেটা গলায় দিয়ে দু'হাত জোড় করে' বলল, "গলবস্ত্র হ'য়ে বলছি, দয়া কর।"

আবার হাসির রোল পড়ে' গেল একটা।

নিরুপায় শালীকে গান ধরতে হ'ল শেষে। সে-ও বারকয়েক কাসল, তারপর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে শুরু করল, "আমার শেষ পারানির কড়ি, কণ্ঠে নিলাম গান"।

তপেশ আর বসে' থাকতে পারল না, উঠে বারান্দায় চলে' গেল সে। খুব ঘামছিল ছোকরা।

শালীর গান শেষ হ'লে মা বললেন, "প্রমোদ, তুই সেই আগমনী গানটা কর। এস মা আনন্দময়ী।"

প্রমোদ খুব দরদ দিয়ে গাইল গানটা।

দত্তর চোখে জল এসে পড়ল। যখন সে বোর্ডিংয়ে থাকত, তখন সবাই এই গানটা গাইত। খুব সাধারণ সহজ সুর শিখতে কষ্ট হ'ত না কারও। ছেলেবেলায় সকলের সঙ্গে দত্তও গেয়েছে গানটা। গানটা শুনে তার সমস্ত অতীত যেন ফিরে এল তার কাছে। তার মন বিগলিত হ'য়ে গেল। সে যা হ'তে পারত তা হয় নি ব'লে দুঃখ হ'তে লাগল তার। অনুশোচনায় মন ভরে' গেল।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে জুটল।

"প্রমোদদা আমরা কানামাছি খেলব। তুমি খেলবে?"

"নিশ্চয়। অফ কোর্স।"

প্রমোদ হারমোনিয়ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল উঠোনে। হুড়োমুড়ি করে' শুরু হ'য়ে গেল কানামাছি খেলা। তপেশ এবং প্রমোদের শালীকেও যোগ দিতে হ'ল। প্রমোদ কিছুতেই ছাড়লে না। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল কিন্তু। তপেশের চোখ খুব

কসকসিয়ে বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সে ঠিক গিয়ে প্রমোদের শালীকে ধ'রে ফেলতে লাগল প্রত্যেকবার। মনে হ'ল তার কপালে একটা অদৃশ্য তৃতীয় নয়ন গজিয়েছে যেন। সে প্রত্যেকবার এমন ঝাপটে ধরছিল তাকে যে শোভনতাও বজায় থাকছিল না। মেয়েটি লুকিয়ে আড়ালে থাকবারই চেষ্টা করছিল, একবার তো সে তুলসীতলার পিছনে ঘোঁজটায় গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সেখানে গিয়েও ঠিক তাকে ধরে ফেলল তপেশ। আশ্চর্য কাণ্ড! আর আশ্চর্য প্রমোদ! কোথায় সে রাগ করবে, না, এমন হা-হা করে' হাসতে লাগল যে সমস্ত ব্যাপারটা হালকা হ'য়ে গেল। প্রমোদের মা-ও বেরিয়ে এসে হাসতে লাগলেন। তপেশ যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছিল। খুব একটা পুরু কাপড় দিয়ে তার চোখ বাঁধা হ'ল একবার, চোখের নীচে, নাকের পাশে তুলো গুঁজে দেওয়া হ'ল, তপেশ যখন হাত বাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুরছিল তখন অন্য দু'একজনও তার সামনে এল, কিন্তু তপেশ তাকে এড়িয়ে গেল, ঠিক গিয়ে ধরে ফেললে মালতীকে (প্রমোদের শালী) এবারও। সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শিউলি গাছের ওপাশে একেবারে। কিন্তু এবারও নিস্তার পেল না সে।

প্রমোদ অস্ফুট কণ্ঠে বলল—"এ যে লোহা-চুম্বকের কাণ্ড দেখছি।"

প্রমোদের মা বললেন—"এবার তপেশ কানামাছি হবে না। মেনি হবে।"

তপেশের আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে তিনি হেসে বললেন, "তুই বাড়ি গিয়ে চান করে' আয়। কাপড়টা যে কাদা মাখামাখি হ'য়ে গেল। চান করে' আয়, এখানেই খাবি মনে আছে তো?"

"আছে।"

তপেশ চলে' গেল।

টুনি কানামাছি খেলায় যায় নি। সে তার সমবয়সী কয়েকজনকে নিয়ে পাশের ঘরে বসে' word making word taking খেলছিল। ভূত আর দত্ত ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল অদৃশ্যভাবে। দত্ত এককালে ও খেলায় খুব দক্ষ ছিল। সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগল টুনিও কম দক্ষ নয়। চমৎকার খেলে। তার সমবয়সী অনেকগুলি ছেলেমেয়ে বসেছিল, সবাইকে সে হারিয়ে দিচ্ছিল। দত্তও যোগ দিয়েছিল সে খেলায়, মেতে উঠেছিল, চেঁচাচ্ছিল, যদিও সে বুঝতে পারছিল না যে তার স্বর একটুও শোনা যাচ্ছে না। পাশের ঘরে একদল বসেছিল তাস নিয়ে। পেটাপিটি খেলা চলছিল। সেখানেও দত্ত উঁকি মেরে দেখলে। পূজোর আনন্দকে যতই গালাগালি করুক, কিন্তু সে যদি সেই মুহূর্তে সুযোগ পেত, ভূত যদি তাকে কোন মন্ত্রবলে ওদের সমবয়সী করে' দিতে পারত তাহলে এক্ষুণি গিয়ে ও যোগ দিত ওদের দলে। তার মেজাজ যে বদলে যাচ্ছে এটা ভূত বুঝতে পারছিল, আর বুঝতে পেরে খুশীও হচ্ছিল খুব।

ভূত বলল, "চল, এবারে যাওয়া যাক।"

"না, না, আর একটু থাকি। ভাল লাগছে!"

হঠাৎ প্রমোদ হুড়মুড় করে' ঘরে ঢুকল।

"আর 'কানামাছি' নয়, এবার নতুন করে খেলা শুরু হবে—'হাঁ-না-বাজি' !"

খেলাটা নতুন ধরনের। প্রমোদ মনে মনে একটা নাম ঠিক ক'রে রাখবে। আর সবাইকে বলতে হবে কি নাম সে ঠিক করেছে। ঠিক হ'লে বলবে 'হাঁ', আর ভুল হ'লে বলবে 'না'। যে ঠিক বলতে পারবে সে পাবে একটি বাতাসা। অবশ্য সবাই তাকে প্রশ্ন করতে পারে নানারকম। যে লোকটার নাম প্রমোদ ভেবেছে সে কালো না ফরসা, লম্বা না বেঁটে, তার বয়স কত, বাড়ি কোথায়, কি করে, কি রকম লোক ইত্যাদি। নানারকম প্রশ্নের উত্তরে প্রমোদ বলল— সে এমন একজন লোকের কথা ভাবছে যার স্বভাব অনেকটা পশুর মতো, যদিও মানুষ কিন্তু কথায় কথায় গুঁতোতে আসে, ঘোঁৎঘোঁৎ করে, গজগজ করে, গর্জনও করে, অথচ শহরেও বাস করে, রাস্তায় হাঁটে, আপিসও করে, আপিস একটু বেশী করে' করে, একবার ঢুকলে বেরুতে চায় না। লোকে ভালুক নাচায়, বাঁদর নাচায়, বাঘ সিংহকে নিয়ে খেলা দেখায়, কিন্তু এর প্রতি কেউ যে কেন নজর দেয় নি এতদিন, সেইটেই আশ্চর্য। লোকটা বাঁদরের মতো ? না, ভালুকের মতো ? একজন জিগ্যেস করলে। হা-হা করে' হেসে উঠল প্রমোদ। বললে, দুয়ের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে। ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, খেঁকি কুকুর এদের সঙ্গেও মিল আছে কিছু কিছু লোকটার। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'তে লাগল প্রমোদ এবং প্রতি প্রশ্নেই হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। নানারকম নাম বলতে লাগল সবাই। প্রমোদ মাথা নেড়ে নেড়ে বলল – একটাও মিলছে না। তারপর হঠাৎ প্রমোদের শালী মালতী লাফিয়ে বলে' উঠল—"আমি ধরেছি, জামাইবাবু, বলব ?"

"বল—"

"তুমি তোমার মামা পীতাম্বরবাবুর কথা ভাবছ, না ?"

প্রমোদকে সত্যি কথাটা বলতেই হ'ল। খুব হাসির হুল্লোড় পড়ে' গেল। অনেকে বলতে লাগল—পীতাম্বরবাবুর ছাগলের সঙ্গে মিল নেই।

প্রমোদ বলল—"আছে। ছাগলে যাতে মুখ দেয় তা আর গজায় না। মামাও ঠিক তাই, প্রমাণ যদুবাবু ! ও লোকটাকে মুড়িয়ে খেয়েছে মামা, আর একটিও নতুন পাতা ছাড়তে পারছে না বেচারা !"

আবার একচোট হাসি।

প্রমোদ বলল, "মামা না এসেও কিন্তু প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগালেন আমাদের। বল সকলে, জয় মামার জয়, জয় মামার জয়।"

সকলে সমস্বরে বলে' উঠল—"জয় মামার জয়।"

ধমক দিয়ে উঠলেন প্রমোদের মা—"মামাকে নিয়ে ওকি ইয়ার্কি। বল বরং মা দুর্গা মামাকে দীর্ঘজীবী কর, সুখী কর।"

দুর্গার একটি ছবি টাঙানো ছিল ঘরে। তার সামনে সবাই হাতজোড় করে' বলল, "মা দুর্গা মামাকে দীর্ঘজীবী কর, সুখী কর।"

দত্তর হৃদয় সত্যিই বিগলিত হ'য়ে গিয়েছিল। তার ইচ্ছে করছিল প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে, প্রত্যেকের থুতনি নেড়ে আদর করতে।

কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না। ভূত তাড়া দিতে লাগল। আবার বেরিয়ে পড়ল তারা।

অনেক দেখল তারা, অনেক দূরে দূরে ঘুরে বেড়াল, অনেক বাড়িতে গেল। সর্বত্রই আনন্দ। এমন কি হাঁসপাতালে গিয়েও দেখল সেখানেও আনন্দের স্রোত বইছে। আনন্দময়ীর আগমনে সারা দেশ জুড়ে আনন্দ করছে সবাই। বিদেশে যারা আছে তারা বাড়ির কথা ভাবছে, যাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে তারাও ভাবছে সুখের দিন আসবে, খুব গরীব যারা তাদেরও আশা হচ্ছে সুদিন আসবে। সর্বত্র আশার আলো, সুখের স্বপ্ন। রাস্তার ভিখারীরা, জেলের কয়েদীরা, হাঁসপাতালের রোগীরা কেউ নিরানন্দ নয়। ভূত তাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরল, অনেক বাড়িতে তার পিচকিরি দিয়ে আতর ছেটাল। দত্ত অনেক রকম দেখল, অনেক কিছু শিখল।

চারিদিকে অন্ধকার। মনে হ'ল রাত হয়েছে, গভীর রাত, কিন্তু সন্দেহ হ'তে লাগল সত্যিই কি রাত হয়েছে? একটু আগেই তো দিনের আলো ছিল। আর একটা জিনিস দেখেও দত্ত আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছিল। দত্তর যদিও কোন পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু ভূত যেন ক্রমশঃ বুড়ো হ'য়ে আসছিল। এ পরিবর্তন দত্ত অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিল কিন্তু কিছু বলে নি। একটা থিয়েটার থেকে বেরিয়ে দত্ত চমকে গেল, ভূতের মাথার চুল সব সাদা হ'য়ে গেছে।

"আপনাদের পরমায়ু কি খুব কম?"—দত্ত জিগ্যেসই করে' ফেলল শেষকালে।

"হ্যাঁ, এই পৃথিবীতে আমাদের পরমায়ু খুব কম। আজ রাত্রেই শেষ হ'য়ে যাবে।"

"আজ রাত্রেই!"

"আজ রাত দুপুরে। ওই শোন, সময় হ'য়ে এল।"

দত্ত শুনতে পেল একটা ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজছে। টং করে' শব্দ হ'ল একটা। একটু আগে এগারোটা বেজেছিল। হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়তে দত্ত খুব হকচকিয়ে গেল। ভূতের আলখাল্লার নীচের দিক থেকে চারটে পায়ের মতো কি যেন বেরিয়ে আছে!

দত্ত বলল, "কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগ্যেস করব? ওগুলো কি বেরিয়ে আছে? ওগুলো কি আপনারই শরীরের অংশ?"

"না, আমার শরীরের নয়। এই দেখ।"

আলখাল্লার ভিতর থেকে ভূত দুটি শিশু বার করল। কি চেহারা তাদের! রুগ্ন, শীর্ণ, ভয়ংকর। তারা দুজনেই হাঁটু গেড়ে ভূতের সামনে বসে' তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে রইল।

"দেখ, দেখ, ওদের দিকে ভালো করে' চেয়ে দেখ!"

একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ফ্যাকাশে গায়ের রং, মুখে জরার চিহ্ন, গায়ে শতচ্ছিন্ন জামা, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ, মানুষের মুখ নয় যেন জানোয়ারের মুখ, অসহায়, ভূতের পা আঁকড়ে পড়ে' আছে।

স্বাস্থ্য থাকলে যে মুখে যে হাতে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফুটত, সে মুখ সে হাত জরাজীর্ণ, যেন পুড়ে কুঁচকে কুঁচকে গেছে মাংসগুলো. কেউ যেন সেগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে বিধ্বস্ত করে' দিয়েছে। যে মুখে দেবশিশুর মাধুরী ফুটত, সে মুখে শয়তানের ছাপ। একটা পশু যেন ভেংচি কাটছে। বিরাট পৃথিবীতে, বিশাল মানবসমাজে এর চেয়ে বেশী ভয়ংকর আর কোনও দৃশ্য নেই বোধহয়।

দত্ত দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটি কথা সরল না। ভূতের ছেলেমেয়ে না কি এরা! দত্ত ভেবেছিল ভদ্রতার খাতিরেও অন্ততঃ দু'চারটে ভালো কথা বলবে সে এদের সম্বন্ধে। কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না, কথা আটকে গেল তার মুখে। এ রকম সে আগে দেখে নি।

"এরা আপনার ছেলে মেয়ে ?"

"আমার নয়, মানুষের। এরা আর্তভাবে এসে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেটির নাম 'অজ্ঞতা' আর মেয়েটির নাম 'অভাব'। এদের সম্বন্ধে সতর্ক করে' দিচ্ছি তোমায়। বিশেষ করে' এই ছেলেটির সম্বন্ধে। আমি দেখতে পাচ্ছি ওই ছেলেটির কপালে 'প্রলয়' লেখা রয়েছে। যদি সে লেখা মুছে না যায় মানব-সমাজ ধ্বংস হ'য়ে যাবে। অস্বীকার করতে পার এ কথা ?"—ভূত শহরের দিকে হস্ত প্রসারিত করে' বলতে লাগল—"যারা অস্বীকার করতে চায়, তাদের চোখ ফুটিয়ে দিও। তোমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যেই ও কথা স্বীকার করতে হবে। আর স্বীকার যদি না করতে চাও তাহলে মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুত থাক।"

"এদের কি কোন আশ্রয় নেই ?"

"আছে বইকি ! তোমাদের অনাথ আশ্রম, তোমাদের লঙ্গরখানা, তোমাদের জেল !"

টং টং করে' বারোটা বাজল।

দত্ত চারিদিকে চেয়ে দেখল, ভূতকে দেখতে পেল না। সেই ছেলে মেয়ে দুটোকেও না। সব অন্তর্ধান করেছে। তারপর সে দেখতে পেল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আপাদ-মস্তক ঢাকা কি একটা যেন আসছে। ঘোষের কথা মনে পড়ল দত্তর। বুঝতে পারল তৃতীয় ভূত আসছে।

চার

হ্যাঁ, ভূতই। ধীরে ধীরে, গম্ভীরভাবে, নীরবে সে আসতে লাগল। যখন কাছে এল তখন দত্ত হাঁটু গেড়ে বসে' পড়ল তার সামনে। তার মনে হ'ল ভূতের আসবার ধরনটাই যেন ভয়ংকর, একটা ভীষণ রহস্যের পরিবেশও যেন এগিয়ে আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। একটা কালো বোরখার মতো পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা। মাথা, মুখ, বুক, শরীরের কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটা হাত সামনের দিকে প্রসারিত রয়েছে। এই প্রসারিত হাতটার জন্যেই সে চারিদিকের অন্ধকারের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে পারে নি। ওই হাতটা না থাকলে তাকে অন্ধকারের ভিতর চেনা কঠিন হ'ত।

সে যখন আরও কাছে এল তখন দত্ত অনুভব করল যে ভূতটি বেশ লম্বা এবং ভারিক্কি। কি একটা রহস্য যেন ঘন হ'য়ে আছে তার চারদিকে। বেশ ভয় হ'ল দত্তর। নড়েও না, কথাও বলে না।

দত্তই তখন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, "আপনিই কি ভবিষ্যৎ পূজার ভূত ?"

ভূত তবুও কোনও কথা বলল না, তার প্রসারিত হাতটা কেবল সামনের দিকেই প্রসারিত হ'য়ে রইল, যেন সামনে যা আছে তাই সে দেখাচ্ছে।

"যে সব ঘটনা এখনও ঘটে নি, কিন্তু ভবিষ্যতে যা ঘটবে তারই ছবি কি আপনি আমাকে দেখাতে এসেছেন ? তাই, না ?"

বোরখার উপর দিকটা একটু নড়ল এক মুহূর্তের জন্য। দত্তর মনে হ'ল, ভূত যেন মাথা নেড়ে সমর্থন করলে তার কথাটা। এই ইঙ্গিতটুকু ছাড়া আর কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

ভূতের সাহচর্যে দত্ত যদিও অভ্যস্ত হয়েছিল খানিকটা তবু এই লম্বা নীরব মূর্তিটা দেখে ভয় করতে লাগল তার। পা কাঁপতে লাগল। কি করবে এ, কে জানে! ভূতকে অনুসরণ করতে গিয়ে সে পারল না, পা খুব বেশী কাঁপতে লাগল। তার অবস্থা বুঝে দাঁড়িয়ে গেল ভূত, তাকে সামলে নেবার সময় দিলে একটু।

কিন্তু এতে আরও উলটো ফল হ'ল। একটা অজানা অনিশ্চিত ভয়ে অস্থির হ'য়ে পড়ল দত্ত। তার মনে হ'তে লাগল ওই বোরখার আড়ালে দুটো ভৌতিক চোখ তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে, আর সে চোখ দুটো চরম বিস্ফারিত করেও বুঝতে পারছে না, কি রকম সে চোখের দৃষ্টি। যা দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকারের একটা স্তূপের ভিতর থেকে একখানা প্রসারিত হাত।

দত্ত বলল, "ভবিষ্যতের ভূত, আপনাকে দেখে আমি বড্ড ভয় পেয়েছি। অন্য দুটি ভূত দেখে আমার এত ভয় হয় নি। আমি বুঝতে পারছি আপনি আমার ভালোর জন্যেই এসেছেন, এটাও আমি ঠিক করেছি যে এবার থেকে আমি আমার জীবনের ধারা

বদলে ফেলব, আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানেই আমি যাব, যা বলবেন তাই আমি করব। আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না ?"

ভূত কোন কথা বলল না। তার হাতটা কেবল সামনের দিকে প্রসারিত হ'য়ে রইল।

"চলুন তাহলে"—দত্ত বলল—"চলুন। যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানেই আমি যাব। রাত ফুরিয়ে আসছে, সময় বেশী নেই। আমি জানি, বুঝতে পারছি (আপনি) যা দেখাবেন তা আমি আমার জীবনে আর দেখতে পাব না। চলুন, কোথায় যাবেন।"

ভূত যেমন ভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবেই আবার চলতে লাগল।

নীরব, রহস্যময়।

তারা যে শহরে এসে ঢুকল তা মনে হ'ল না। শহরই যেন তাদের চারিপাশে গজিয়ে উঠল সহসা। চারিদিকেই শহর। সামনেই ব্যাঙ্ক। ধনী ব্যবসায়ীরা চারদিকে ঘুরছে, সব ব্যস্ত, টাকার ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছোট ছোট দল বেঁধে কি সব পরামর্শ করছে সবাই, ঘড়ি দেখছে, সকলেরই কোটের উপর ঘড়ির মোটা মোটা সোনার চেন, চেন থেকে নানারকম মেডেলের মতো ঝুলছে—এলাহি ব্যাপার! এরা সবাই দত্তর পরিচিত, অনেকবার দেখাশোনা হয়েছে।

ভূত একটা ছোট দলের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের দিকে হাতটা প্রসারিত হ'য়ে আছে দেখে দত্তও কাছে গেল তাদের।

একজন খুব মোটা লোক (তার চিবুকের নীচেও চর্বি থলথল করছে) বলল, "না, আমি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। শুধু জানি লোকটা মারা গেছে।"

"কবে মারা গেল।"

"গত রাত্রে বোধ হয়।"

"হয়েছিল কি"—তৃতীয় আর একজন প্রকাণ্ড একটা নস্যির কৌটো থেকে নস্যি নিতে নিতে বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম ব্যাটা কখনও মরবে না।"

"কিন্তু মরেছে। সবই দয়াময়ের ইচ্ছে"—আর একটা লোক হাই তুলে টুসকি দিতে দিতে বলল।

"ওর টাকাটার কি গতি হ'ল ?"—আর একটা লোক প্রশ্ন করল। লোকটার নাকের ঠিক ডগায় বিরাট একটা আঁচিল—"প্রাণ ধরে' কাউকে দিয়ে যায় নি নিশ্চয়।"

"তা শুনি নি"—মোটা লোকটি বলল—"সম্ভবতঃ ওর ব্যবসাতেই দিয়ে গেছে। আমাকে দেয় নি, এইটুকু আমি জানি কেবল।"

হো হো করে' হেসে উঠল সবাই।

"শ্মশানে ওর সঙ্গে গেছল ক'জন ? খুব সম্ভব চারজন ভাড়াটে লোকের কাঁধে গেছেন। সদ্ভাব ছিল না তো কারো সঙ্গে!"

নাকে-আঁচিল ভদ্রলোক বললেন, "আমি যেতে পারতাম, যদি খাওয়াদাওয়ার

ব্যবস্থা থাকত। অন্ততঃ এক বোতল মাল টাল না থাকলে কি যাওয়া যায় ওসব ব্যাপারে! যা কিপটে ছিল লোকটা, কিছুই হয়তো ব্যবস্থা করে' যায় নি। নিজের লোকও কেউ নেই!"

"খবর পেলে আমি যেতাম"—মোটা লোকটি বলল—"কারণ মনে হয় আমিই ওঁর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। রাস্তায় দেখা হ'লে আমারই সঙ্গে দু'একটা কথা বলতেন। আচ্ছা চলি।"

সবাই সরে' পড়ল নানা দিকে। গিয়ে মিশল আবার নতুন দলে। দত্ত কান পেতে রইল, এদের কথা থেকে যদি কিছু হদিস পাওয়া যায়।

এরাও প্রত্যেকেই দত্তর পরিচিত। প্রত্যেকে বড় ব্যবসায়ী, ব্যবসার জগতে সুপরিচিত। এদের সান্নিধ্য এবং সম্মান লাভ করবার চেষ্টা দত্ত বরাবরই করেছে। বলা বাহুল্য, ব্যবসার খাতিরেই কেবল। প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন করবার লোক দত্ত কোন দিনই ছিল না।

"কেমন আছেন?"—একজন বলল।

'আপনি?" উত্তর এল।

"চলে যাচ্ছে। গর্ত তো ভরে' গেল! মৃত্যুকালে কেউ কাছে ছিল না। এক ফোঁটা জলও দেয় নি কেউ।"

"তাঁর যা প্রাপ্য তা পেয়েছেন। আপনি আজ আসবেন আমার বাসায়? ভাল সিদ্ধি আনিয়েছি এবার কাশী থেকে। ঘোঁটবার জন্যে ভাল বেলকাঠের বড় বাটি আর ঘুঁটনিও আনিয়েছি। আমার দারোয়ান শিউকমল খুব ভাল সিদ্ধি বানায়। আসবেন—"

"যাব, নিশ্চয়ই যাব।"

বাস, এর বেশী আর কোনও কথা হ'ল না। যে যার রাস্তায় চলে' গেল।

দত্ত প্রথমটা একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেল। ভূত এই তুচ্ছ কথাবার্তা শোনবার জন্যে দাঁড়াল কেন! তারপর তার মনে হ'ল নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। কি উদ্দেশ্য? একজনের মরার কথা হচ্ছিল। নিশ্চয়ই ঘোষের মৃত্যুর কথা ওরা বলছিল না। ঘোষ তো অনেক আগেই মারা গেছে। তার মৃত্যু তো অতীতের কথা। এ ভূতটি ভবিষ্যতের ঘটনা দেখাচ্ছে। গর্ত তো ভরে' গেল! মানে? গর্ত কে! তার চেনা-শোনা কেউ তো নেই। যাই হোক কথাগুলো প্রণিধান করতে লাগল সে। এ-ও তার মনে হ'ল এই ভূত যখন ভবিষ্যতের ছবি দেখাচ্ছে তখন তারও ছায়া দেখাবে। তার আশা হ'ল তার ভবিষ্যতের আচরণ থেকে সে বুঝতে পারবে এ জীবনে সে কি হারিয়েছে। তা বুঝলে সংশোধনও করে' নিতে পারবে নিজেকে।

সে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কই নিজের ছায়ামূর্তি তো চোখে পড়ল না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকত সেখানে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সে যটার সময় রোজ আপিসে আসত ঘড়িতে ঠিক সেই তটাই বেজেছে, কিন্তু সে কোথাও নেই, চারিদিকে অসংখ্য লোকের ভিড়, কিন্তু সে নেই। একটু আশ্চর্য হয়ে গেল সে। তার পরিবর্তিত ভবিষ্যৎ জীবন দেখবে আশা করেছিল, কিন্তু কই, কিছুই তো নেই। তারপর তার মনে হ'ল তার পরিবর্তিত জীবন হয়তো অন্য রকম হয়েছে (তাই সে আশাও করেছিল) সেইজন্যেই চিনতে পারছে না।

ভূত নীরবে এবং গম্ভীর হ'য়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল হস্ত প্রসারিত করে'। দত্তর মনে হ'ল যে ভূতের অদৃষ্ট চক্ষুর দৃষ্টি যেন তার উপরই নিবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। দত্ত চিন্তা করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সব গুলিয়ে গেল। শিউরে উঠল সে, কেমন যেন শীত করতে লাগল।

এর পর বড়বাজার ছেড়ে তারা অন্যদিকে চলল। ক্রমশঃ তারা শহরের এক প্রান্তে প্রায় নির্জন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছল যা পীতাম্বরের চেনা-চেনা মনে হ'তে লাগল। রাস্তাটা খুব খারাপ, যে দু'চারটে লোক দেখা যাচ্ছে তারাও প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ, মাতাল, কেউ টলছে, কেউ শিস দিচ্ছে, কদর্য চেহারা সব—জায়গাটা সত্যিই খুব ভয়াবহ। নানা দিকে গলি গেছে নানা আকারের, গলি নয় যেন নালী, বিশ্রী গন্ধ। বমি, বিষ্ঠা ছড়ানো রাস্তার পাশে পাশে, কাগজ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো—কত কি! এ জায়গায় খুন রাহাজানি হওয়াও বিচিত্র নয়। অনেকরকম চোরা-কারবার হয় এখানে।

এইখানে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল তারা। দোকান না বলে' তাকে গুহা বা গহ্বর বলাই উচিত। কপাটের সামনে নীচু একটা মরচে-পড়া করোগেটেড্ টিনের চালা। আর তার নীচে নানারকম লোহালক্কড, বোতল বাক্স, ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ। দোকানদারটার চেহারাও শয়তানের মতো, দোকানের ভিতর একটা শ্বাপদ জন্তুর মতো বহুবিধ মরচে-পড়া লোহালক্কড়ের মাঝখানে ওৎ পেতে বসে' আছে আর বিড়ি খাচ্ছে। দাঁত নেই, চোপসা মুখ, পাঁচ-ছ'দিনের না কামানো পাকা গোঁফ দাড়ি ভরতি। ফক্ ফক্ করে' ক্রমাগত বিড়ি খেয়ে যাচ্ছে। চারধারে মরচে-ধরা পেরেক, কব্জা, শিকল, রেতি, কাটারি, ছুরি-ছোরা, তার মাঝখানে ওই লোকটা। দত্ত একে চিনতে পারল, চোরাই মালের কেনা-বেচা করে। পিছনে আলনায় জামা কাপড়ও ঝুলছে নানা মাপের, নানা চেহারার। লোকটার বয়স বোধহয় সত্তরের কাছাকাছি, চোখ দুটো সর্বদা ঘুরছে এদিকে ওদিকে, ওঠা-নামা করছে চিবুকটা। শিকার খুঁজছে যেন।

দত্ত আর ভূত এই লোকটার সামনাসামনি এসে দাঁড়াতেই একটা মেয়েও ঢুকল পিঠে একটা বাণ্ডিল নিয়ে। সে ঢুকতে না ঢুকতেই আর একজন এল, তার পিঠেও একটা বাণ্ডিল। তার পিছু পিছু মিশকালো একটা লোকও ঢুকল এসে। লোকটা এদের দেখে যেন হকচকিয়ে গেল, এরাও আশ্চর্য হ'য়ে গেল তাকে দেখে। পরস্পর সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হো হো করে' হেসে উঠল।

প্রথম স্ত্রীলোকটি তখন দোকানদারকে সম্বোধন করে' বলল, "জিতুবাবু, আমি ঝি,

আমি আগে, তারপর ধোপানী, তারপর শ্মশানের চণ্ডাল। কি কাণ্ড, আমরা তিনজনেই একসঙ্গে এসে গেছি।"

ঝি গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল।

দেখা গেল জিতুবাবু রসিক লোক।

কর্কশ গলায় খ্যাক খ্যাক করে' হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, এমন ত্র্যহস্পর্শ বড় একটা দেখা যায় না। ভিতরে এসো, কি মাল এনেছ দেখাও দিকি একে একে। তোমরা তো পুরোনো খদ্দের, তোমাদের তো সব চেনা। ঝি তুমি আগে এস। থাম কপাটটা বন্ধ করে' দি আগে। আঃ—কব্‌জাটার কি যে ক্যাঁচ্ করে' শব্দ হয়। এ দোকানে এইটেই বোধহয় সব চেয়ে মরচে-পড়া কব্‌জা। হা-হা-হা। এস, ভেতরে এস।"

ভিতরের দিকে একটা ছেঁড়া শতরঞ্জি পাতা ছিল, সেইটে বুড়ো হাত দিয়ে ঝেড়ে দিলে একটু।

"এস, কি এনেছ দেখি।"

ঝি তার উপর বসে' পুঁটলিটি খুললে।

"কিছু অন্যায় করেছি? সবাই নিজের চরকায় তেল দেয়। বুড়োও দিত!"

"ঠিক বলেছ। ওর মতো কঞ্জুস লোক আমি তো আর দেখি নি। বাবা, মানুষ ছিল না, যেন একটা ইস্কুরুপ!"—ধোপানী বলল।

"ঠিক বলেছ। দেখো আমার কথা আবার বলে' বেড়িও না যেন। যদি বল আমিও তোমার নামে ঢাক পেটাব! আমার নাম ক্ষেন্ত ঝি!"

"না, না, সে কি, আমি তেমন মেয়ে নই। কান দিয়ে চোখ দিয়ে ভিতরে যা ঢুকবে তা মুখ দিয়ে কখনও বেরুবে না। একেবারে কুলুপ!"

"সে তো যমের বাড়ি গেছে। তার এসব জিনিস এখন থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি। ভোগ করবার তো কেউ নেই। আমাদেরই দুটো পয়সা হোক। কি বল!"

"তা তো বটেই"—হেসে উত্তর দিলে ধোপানী।

"সে যদি এগুলো কাউকে দিতে চাইত অনায়াসে দিতে পারত। তার ভাগনাকে খবর দিলেই আসত সে। কিন্তু কাউকে খবর দেয় নি। একা ঘরে খাবি খেতে খেতে মরেছে। শেষ সময়ে মুখে এক ফোঁটা জলও পড়ে নি। অমন কঠিন অসুখের সময়ও আত্মীয়স্বজনদের কথা মনে পড়ে নি। আশ্চর্য লোক বাবা! একটি আধলা হাত দিয়ে গলত না! উঃ।"

"ভগবান তেমনি বিচারও করেছেন! ঠিক শাস্তি হয়েছে"—সায় দিল ধোপানী।

"আরও বেশী শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, এ তো কিছুই হয় নি। আমি যদি আগে খবর পেতুম, তাহলে আরও অনেক কিছু নিতে পারতুম। দেখুন তো জিতুবাবু, যা পেয়েছি তার দাম কত হবে। ঠকিও না যেন বাবু। পষ্টাপষ্টি বলে' দাও কি দেবে। গরীব মানুষ আমি, অতদূর থেকে ঘাড়ে করে' বয়ে' এনেছি। আমি এদের ভয়ও করি

না, আমারি দলের লোক এরাও, কেউ আগে চুরি করেছে, কেউ পরে। পাপ আমাদের কারুরই হয় নি। কি বল? এখন খুলুন দেখি পুঁটুলিটা—।”

“আমার বেশী জিনিস নেই, আমারটাই আগে দেখে ছেড়ে দিন আমাকে।”

শ্মশানের চণ্ডালটা এগিয়ে এসে তার মাল দেখাতে লাগল। সত্যিই বেশী কিছু ছিল না তার, গোটাকতক পিতলের বোতাম, আর কমদামী ফাউণ্টেন পেন একটা।

জিতুবাবু বলল—“আট আনা দিতে পারি।”

“না, না, আরও কিছু দিন। আট আনা বড্ড কম হচ্ছে।”

“আমাকে মেরে কেটে কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে’ ফেললেও আর একটি ছিদামও আমি দেব না।”

একটি আটআনি নিয়ে শ্মশানের চণ্ডালটা চলে’ গেল। মড়ার গায়ের কোট থেকে ওগুলো খুলে নিয়েছিল সে। ভাবল আটআনায় খানিকটা তাড়ি তো হবে!

ধোপানী বলল—“এইবার আমারটা দেখুন। বেশী কিছু নেই আমার। গোটাদুই বিছানার চাদর, দুটো তোয়ালে, দুটো রুমাল আর জিনের ছেঁড়া ছেঁড়া প্যাণ্ট দুটো।

জিতু একটা কাগজে হিসেব করে’ বলল, “মেয়েদের আমি একটু বেশী দাম দি। এটা আমার দুর্বলতা। এর জন্যে আমার লোকসানও হয়, কিন্তু আমি কেয়ার করি না। তোমার দাম হ’ল চার টাকা ছ’ আনা। অন্য দোকানে গেলে তোমাকে তিন টাকার বেশী দিত না। প্রত্যেকটাই পুরোনো মাল।”

“বড্ড কম হচ্ছে জিতুবাবু।”

“বেশ আরও দু’ আনা দিচ্ছি। পুরোপুরি সাড়ে চার টাকাই নাও। আর কিন্তু কথাটি বোলো না।”

সাড়ে চার টাকা নিয়ে চলে’ গেল ধোপানী। যাবার সময় একটু মুচকি হাসি হেসে গেল।

“জিতুবাবু, আমার পুঁটুলিটা এবার খোল।”

ঝি অধীর হ’য়ে উঠেছিল। পুঁটুলিতে অনেক গেরো, খুলতে একটু দেরি হ’ল। খোলবার পর দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা ময়লা নেটের মশারি।

“কি এটা?”—জিতু বিস্মিত হ’য়ে গেল “মশারি নাকি?”

“হ্যাঁ, মশারি”—হেসে লুটিয়ে পড়ল ঝি।

“এই মশারি টাঙিয়ে মুখপোড়া শুত। কিনে এস্তক সাবান দেয় নি, ধোপার বাড়ি দেয় নি। ময়লায় রংই বদলে গেছে। ধপধপে সাদা রং ছিল।”

“ও জীবন্ত থাকতে থাকতেই তুমি ওর মশারিটা খুলে নিয়েছিলে না কি?”

“তাই নিয়েছি। মড়ার ছোঁয়া নয়। যখন দেখলুম আর বাঁচবে না, খাবি খাচ্ছে, তখনি টপ টপ করে’ খুলে নিলুম।”

“বাঃ, বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে তো তুমি! হবে, উন্নতি হবে তোমার।”

"আমি বাগে পেলে কোন জিনিস ছাড়ি না। তবে এ-ও বলছি, অন্য লোক হ'লে তার মৃত্যুকালে তার চোখের সামনে আমি পট পট করে' মশারি টেনে নাবাতুম না। কম জ্বালিয়েছে আমাকে! পূজোর সময়ও একটি পয়সা উপুড়-হস্ত করলে না গা! ও মানুষ ছিল না, পিশাচ ছিল, পয়সা-পিশাচ! এইবার এই কম্বলগুলো দেখুন।"

"ওরই কম্বল না কি?"

"আবার কার! মরবার একটু আগেই গা থেকে খুলে নিয়েছি। বিছানার তলাতেও একটা ছিল, সেটাও টেনে বার করে' নিয়েছি মরবার আগেই। মড়ার ছোঁয়া লাগতে দিই নি একটি জিনিসে। আমি তেমন কাঁচা মেয়ে নই। আর এই কামিজটা দেখ, এটাও খুলে নিয়েছি গা থেকে মরবার আগে। একেবারে আনকোরা নতুন পপ্‌লিনের কামিজ। খুলে না নিলে নষ্ট হ'ত।"

"নষ্ট হ'ত মানে?'

"এইটে পরিয়েই শ্মশানে নিয়ে যেত। নিয়ে নিত ডোমেরা।"

"ও—।"

"এই মোজা দুটোও দেখ। ভাল গরম মোজা। এ দুটোও ঠিক সময়ে খুলে নিয়েছিলাম। আর এই কম্‌ফর্টারটাও—। এটা বেশ গরম।"

"বুড়ো মরবার আগে শীতে হিহি করতে করতে মরেছে না কি!"

"যম তখন ওর টুঁটি টিপে ধরেছে। হিহি তো করবেই!"

দত্ত ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে এই সব কথাবার্তা শুনছিল। এই লোলুপ লোকগুলোকে দেখে তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছিল বার বার। যদিও এরা ঘৃণা করবারও অযোগ্য তবু অপরিসীম ঘৃণায় ভরে' উঠেছিল দত্তর সমস্ত হৃদয়। এরা কি মানুষ, না প্রেত।

জিতুবাবু টাকা দিতেই আনন্দে বিগলিত হ'য়ে পড়ল ঝি-টা।

"হা-হা-হা"—হেসে লুটিয়ে পড়ল ঝি-টা—"এতদিনে মিনসের জিনিসগুলোর সদগতি হ'ল। কাউকে কি হাতে তুলে দিয়েছে কোনও জিনিস কখনও। সবাইকে খ্যাক খ্যাক করে' তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সারাটা জীবন। আমাদেরই ভাগ্যে ছিল—অন্য কেউ পাবে কেন।"

আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

দত্তর আপাদমস্তক বার বার শিউরে উঠল।

"ভূত! বুঝতে পেরেছি, সব বুঝতে পেরেছি। যে হতভাগ্য লোকটা মারা গেছে সে হয়তো আমিই। আমার জীবনের ইতিহাসও এই। ভগবান! এ কি দেখালে!"

ভয়ে পিছিয়ে এল দত্ত।

দৃশ্য আবার বদলাল। দত্ত দেখলে একটা বিছানার সামনে সে দাঁড়িয়েছে। শয্যাহীন, মশারিহীন একটা বিছানা। বিছানার উপর ছেঁড়া-কাঁথায় ঢাকা কি যেন একটা রয়েছে। সেটা যে কি তা নীরব ভাষায় সে-ই বলছিল।

ঘরটা খুব অন্ধকার, এত অন্ধকার যে ভাল করে' কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবু দত্ত

চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, কৌতূহল হচ্ছিল তার, কার ঘর এটা। ভোরের আলোর মতো একটা মৃদু আলো এসে পড়েছিল বিছানাটার উপর। সেই বিছানার উপর লুন্ঠিত, বঞ্চিত, পরিত্যক্ত মৃতদেহটা পড়ে' ছিল। মনে হ'ল কেউ এর জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি।

দত্ত ভূতের দিকে চেয়ে দেখল। ভূত ঢাকা-দেওয়া মড়াটার মাথার দিকে হস্ত প্রসারিত করে' রয়েছে। যেন নীরব ভাষায় বলছে—ঢাকাটা তুলে দেখ! মুখটা ঢাকা ছিল, কিন্তু ঢাকাটা এমনভাবে ছিল যে সহজেই তুলে দেখা যায়। দুটো আঙুলের সাহায্যে কাঁথার একটা কোণ একটু তুললেই খুলে যায় ঢাকাটা। দত্তর ইচ্ছেও হচ্ছিল, কিন্তু সাহসে কুলুচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হ'য়ে আসছে।

মৃত্যু, এইসব ক্ষেত্রেই তুমি তোমার প্রতাপ দেখাতে পার। তুমি যে কত ভীষণ তা এই ধরনের শোচনীয় মরণেই বোঝা যায়। কিন্তু যাদের লোকে ভালবাসে, সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, তাদের তুমি কিছু করতে পার কি? পার না। তাদের হাত হয়তো অনড় হ'য়ে গেছে তাদের হৃদয়-স্পন্দন হয়তো থেমে গেছে কিন্তু ওই হাত একদিন মুক্তহস্ত ছিল, ওই হৃদয় একদিন মহৎ হৃদয় ছিল, ওই দেহে যে বাস করত সে ছিল সাহসী, স্নেহময়, প্রাণবন্ত মানুষ। তোমার হিমস্পর্শ তাদের ম্লান করতে পারে না। তুমি এদের যতই আঘাত কর না কেন, প্রত্যেক আঘাত থেকে মহিমার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হবে। মৃত্যু, তারা অমর।

দত্তকে এসব কথা কেউ বলে নি, কিন্তু ওই বিছানাটার দিকে চেয়ে আপনা-আপনি তার এই সব মনে হ'ল। দত্তর মনে হ'ল কোনও মন্ত্রবলে এ লোকটা যদি এখন বেঁচে ওঠে তাহলে কি ওর লক্ষ্য হবে? টাকা, ব্যবসা, কি করে' অপরকে শোষণ করা যায়, সেই চিন্তা! ওঃ, উচিত পরিণতিই হয়েছে লোকটার।

একলা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে লোকটা। এমন একজনও কেউ নেই যে বলে—লোকটা ভালো ছিল, আমার উপকার করেছিল, আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেছিল। কাছে পিঠে কেউ নেই। সবাই ছেড়ে চলে' গেছে! বাইরে একটা বিড়ালের বীভৎস ম্যাও ম্যাও শোনা যাচ্ছে। কপাট আঁচড়াচ্ছে বিড়ালটা। আশেপাশে ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। ওরা কি করছে এখানে? এই মড়ার ঘরে! দত্ত আর ভাবতে পারলে না।

"ভূত"—আকুল কণ্ঠে বলে' উঠল দত্ত—"এ ভয়ংকর স্থান। এখানে যে শিক্ষা আমি পেলাম তা কখনও ভুলব না। দয়া করে' আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে।"

ভূতের ঘাড়টা একটু ফিরল তার দিকে। মনে হ'ল তার কথা শুনছে।

"কারও মৃত্যুতে এই শহরে যদি কোনও লোকের হৃদয়ে শোকের ছায়া পড়ে' থাকে, সেইখানে আমাকে নিয়ে চলুন। আপনার ইচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি চাইছেন যে কাঁথার ঢাকা খুলে আমি দেখি ও লোকটা কে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি পারছি না। আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে!"

ভূতের সর্বাঙ্গ যে বোরখাটা দিয়ে ঢাকা ছিল, সেটা ডানার মতো বিস্তৃত হ'য়ে

গেল। তারপর সেটাকে সে যখন গুটিয়ে নিলে তখন দত্ত দেখলে তারা অন্য জায়গায় এসে গেছে।

সকাল বেলা। একটি ঘরে একটি মা তার ছেলেদের নিয়ে বসে' আছে। মনে হচ্ছে সে যেন আকুলভাবে কার আগমনের প্রতীক্ষা করছে। কারণ সে স্থির হ'য়ে বসে' থাকতে পারছিল না, কখনও উঠছিল, কখনও বসছিল, কখনও জানলার গরাদে ধরে' বাইরের রাস্তার দিকে চাইছিল। ঘড়ি দেখছিল কখনও। তার ছেঁড়া কাপড়টা সেলাই করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না, মন বসছিল না। ছেলেমেয়েরা হুড়োমুড়ি করছিল বলে' বিরক্তও হচ্ছিল।

অবশেষে দুয়ারের কড়া নড়ল। সে তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিতেই তার স্বামী এসে ঢুকল। স্বামীটি যদিও বয়সে নবীন, কিন্তু চেহারা দেখলে মনে হয় বুড়ো। চিন্তা আর হতাশার ভারে অকালবৃদ্ধ। মনে হ'ল সে যেন একটা আনন্দ চাপতে চেষ্টা করছে, আনন্দ হচ্ছে বলে' সে যেন লজ্জিত।

তার জন্যে টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। সে সেই টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসল। তার স্ত্রী জিগ্যেস করল কি খবর, কিন্তু লোকটি কেমন যেন বিব্রত বোধ করছিল, কিছু জবাব দিতে পারল না সহসা।

"ভাল খবর, না মন্দ খবর"—স্ত্রী জিগ্যেস করল আবার একটু দ্বিধাভরে।

"মন্দ।"

"মন্দ? আমাদের তাহলে সর্বনাশ হ'য়ে গেল? পথে দাঁড়াতে হবে।"

"না, কিরণ, আশা আছে এখনও একটু।"

"দত্তবাবু যদি দয়া করেন, তাহলেই আশা আছে। আশার অবশ্য শেষ নেই, কিন্তু এ অসম্ভব কি সম্ভব হবে?"

"দয়া করা বা না-করা এখন তাঁর ক্ষমতায় নেই। তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! সে কি!"

মেয়েটির মুখ দেখে তাকে নিষ্ঠুর বা কঠোর বলে' মনে হয় না, কিন্তু তবু এই খবরটা পেয়ে তার সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে' উঠল, দু'হাত জোড় করে' সেটা সে প্রকাশও করে' ফেলল, "যাক্ বাঁচা গেছে!"

বলেই কিন্তু লজ্জিত হ'য়ে পড়ল।

"মারা গেছে, আহা।"

স্বামীটি বলল, "কাল রাত্রে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে' এক সপ্তাহের সময় চাইতে গিয়েছিলাম, তখন সেই ঝি মাগীটা বলেছিল বাবুর বড্ড অসুখ, এখন দেখা হবে না। আমার মনে হয়েছিল এটা দেখা না-করবার ছুতো। কিন্তু এখন দেখছি সে মিছে কথা বলে নি। দত্ত তখন মরছিল।"

"তাহলে আমাদের ধারের এখন কি হবে? কে মালিক হবে ওর সম্পত্তির?"

"তা জানি না। কিন্তু যে-ই হোক, আমাদের আর ভয় নেই। ততদিনে টাকাটা যোগাড় করে' রাখব। আর না-ই যদি রাখতে পারি তাহলে আশা করা যায় যে-ই উত্তরাধিকারী হোক ওর মতো চামার হবে না। ওরকম 'চিজ্' ভগবান একটিই সৃষ্টি করেছিলেন। যাক্ বাবা, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল আপাততঃ।"

হ্যাঁ, নিশ্চিন্তই হয়েছিল তারা। ছেলেমেয়েগুলো যদিও তাদের আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে নি, কিন্তু মা বাবার বিষণ্ণ মুখ দেখে তারাও কেমন যেন বিমর্ষ হয়েছিল মনে মনে। মা বাবার মুখের প্রসন্নভাব ফিরে আসাতে তারাও খুশী হ'ল।

তার মৃত্যুতে যে অনুভূতি জেগেছিল তার একটিমাত্র নমুনাই ভূত তাকে দেখাল। তার মৃত্যু হওয়াতে এরা নিশ্চিন্ত হয়েছে! এদের জীবন থেকে সর্বনাশের ছায়া সরে' গেছে।

"এ মৃত্যুতে কি কারও মনে এতটুকু দুঃখ হয় নি? যা দেখলাম এর বিভীষিকাই আমার মনে চিরকাল আঁকা থাকবে?"

ভূত তখন তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল অন্য রাস্তা দিয়ে। এ রাস্তা দত্তর পরিচিত। দত্ত এদিক ওদিক চাইতে লাগল, যদি সে নিজেকে কোথাও দেখতে পায়। কিন্তু কোথাও সে নেই। তারা অবশেষে যদুবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আগে সে একবার এখানে এসেছিল। যদুবাবুর পরিবারবর্গকে আনন্দে উল্লসিত দেখে গেছে।

এখন কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই। চতুর্দিক শান্ত। যদুবাবুর ছেলেমেয়েরা এককোণে চুপ করে' বসে' আছে প্রস্তর-মূর্তিবৎ। সবাই পলটুর দিকে চেয়ে ছিল। পলটু বই পড়ছিল একটা। মেয়েরা সেলাই করছিল। কিন্তু সবাই শান্ত, ভারি শান্ত।

যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দীঘির ধারগুলায়—

এ কথাগুলো কোথায় শুনেছে দত্ত? রেডিওতে? ছেলেটি বোধহয় পড়ছে বই থেকে। তারা ঘরে ঢুকতেই থেমে গেল। থেমে গেল কেন?

যদুর বউ সেলাইটা রেখে দিয়ে চোখে হাত দিলেন, "রংটা চোখে বড্ড লাগছে। চোখ ব্যথা করছে!"

রংটা? তিনু কই?

যদুর বউ দু' হাতে চোখ ঢেকে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হ'ল যেন কাঁদছেন। একটু পরে চোখ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, "ওঁর আসবার সময় হ'য়ে এল না।"

"বাবার আসবার সময় হ'য়ে গেছে"—পলটু বইটা বন্ধ করে' বলল।

"বাবা আজকাল বড্ড আস্তে আস্তে হাঁটছেন। রোজই তাঁর ফিরতে দেরি হয়।"

আবার তারা চুপ করে' গেল।

তারপর যদুর স্ত্রী একটু হাসবার চেষ্টা করে' বললেন, "কিন্তু ওই একই লোক তিনুকে কাঁধে নিয়ে কি জোরে জোরেই না হাঁটত একদিন।"

"ঠিকই বলেছ মা"—পলটু বলল—"তিনুকে কাঁধে করে' বাবা হনহন করে' হাঁটতে পারত। বাবা এখন আর জোরে হাঁটতে পারে না।"

যদুর স্ত্রী বললেন, "কিন্তু তিনু কত হালকা ছিল। আর কি যে উনি ভালবাসতেন ছেলেটাকে। ওকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে কোনদিনই কষ্ট হয় নি ওঁর। কিচ্ছু কষ্ট হয় নি। ওই উনি বোধহয় এলেন।"

তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিতেই যদুবাবু এসে ঢুকলেন। গলায় কম্‌ফর্টার ঠিক আছে। টেবিলের উপর তাঁর খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। সেইখানেই গিয়ে বসলেন। পাশেই তোলা-উনুনে চায়ের জল ফুটছিল, যদুবাবুর স্ত্রী উঠে চা করতে লাগলেন। তাঁর দুই ছোট ছেলে কচি আর ক্ষেপু তাঁর কোলে চড়ে' দুটি হাঁটু অধিকার করল এবং তাঁর গলা জড়িয়ে দুজনেই তাঁর গালে গাল দিয়ে বসে' রইল চুপ করে, যেন তারা নীরব ভাষায় বলতে লাগল,—বাবা দুঃখ কোরো না, দুঃখ কোরো না। কষ্ট পেয়ো না।

যদুবাবু চোখেমুখে বেশ একটা হাসিখুশির ভাব ফোটাবার চেষ্টা করছিলেন।

"তোমার এত দেরি হ'ল কেন বাবা"—পলটু জিগ্যেস করল।

"আজকাল রোজই তোমার দেরি হচ্ছে সত্যি। হেঁটে আসতে কষ্ট হয় না কি আজকাল।"

যদুবাবু কয়েক মুহূর্ত কিছু বললেন না। তারপর সত্যি কথাটা বলেই ফেললেন, "আমি ফিরবার সময় নিমতলাটা একবার ঘুরে আসি। তিনুকে সেখানে রেখে এসেছি।"

যদুবাবুর স্ত্রী চোখে আঁচল দিলেন।

যদুবাবু উঠে পাশের ঘরে চলে' গেলেন। পাশের ঘরে তিনু থাকত। তার ছোট বিছানাটি একধারে রয়েছে, খেলনাও রয়েছে সাজানো। মনে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগেও যেন তিনু এখানে ছিল। যদুবাবু তিনুর খাটের উপর বসে' পড়লেন। তাঁর নীচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে' বসে' থেকে শান্ত হ'য়ে আবার ফিরে গেলেন খাবার ঘরে। তিনুর মা তখনও কাঁদছিলেন। পলটুও কাঁদছিল।

"তোমরা কেঁদ না। তিনু গেছে, বেশ গেছে। বেঁচে থাকলেই কষ্ট পেত। যে অসুখ ওর হয়েছিল তা তো আর সারত না। পঙ্গু হ'য়ে বেঁচে থাকা কি কম কষ্ট! ও পুণ্যবান ছেলে, ও এত কষ্ট পাবে কেন।"

চুপ করে' গেলেন যদুবাবু। যদুবাবুর স্ত্রী চোখ মুছে বললেন, "পুণ্যবানই ছিল। ছিদাম জ্যোতিষী বলেছিল, ওর দেবগণ, দেব অংশে জন্ম। ও আমাদের মতো গরীবের ঘরে কষ্ট করে' থাকবে কেন।"

যদুবাবু তখন অন্য কথা পাড়লেন।

"আজ প্রমোদবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। দত্ত মশায়ের ভাগ্‌না গো! কি ভালো ছেলে! আমাকে বললেন, যদুবাবু আপনাকে কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। কি হয়েছে বলুন তো। বললুম তাঁকে। শুনে আঁতকে উঠলেন যেন—

'তাই না কি! তিনু মারা গেছে! আপনার স্ত্রী সতীলক্ষ্মী, ভগবান তাঁকে এত কষ্ট দিলেন!' এ কথা কি করে' জানলেন তিনি!"

"কি কথা!"

"তুমি যে সতীলক্ষ্মী প্রমোদবাবু জানলেন কি করে।"

পলটু একটু মুচকি হেসে বলল, "মাকে তো পাড়ার সবাই সতীলক্ষ্মী বলে। চাটুজ্যে দাদুও কাল বলছিলেন, অমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে দেখা যায় না।"

"ঠিকই বলেছেন, চাটুজ্যে কাকা। প্রমোদবাবু আরও বললেন, 'এই আমার কার্ডটা রাখুন। এতে আমার ঠিকানা আছে। আমার বাসায় আসবেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, নিশ্চয় করব। আসবেন সময় করে' একদিন।' অবশ্য প্রমোদ-বাবু বিশেষ যে কিছু করতে পারবেন তা মনে হয় না, কিন্তু তিনি যে উপকার করতে চেয়েছেন দুটো মিষ্টি কথা বলেছেন, এই-ই যথেষ্ট। মনে হ'ল উনি যেন তিনুকে চিনতেন।"

"হ্যাঁ, ভদ্রলোক—" যদুবাবুর স্ত্রী বললেন।

"আলাপ হ'লে দেখবে সত্যিই ভদ্রলোক। অমায়িক, উদার, হাসিখুশী। এক কথায় চমৎকার। বড় বংশের ছেলে তো। কিছুই আশ্চর্য নয়, পলটুর হয়তো একটা ভালো চাকরিও জুটিয়ে দিতে পারেন। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ তো!"

"পলটু শুনছিস?"—যদুবাবুর স্ত্রী হেসে ছেলের দিকে চাইলেন।

পলটুর বোন বলল—"দাদার ভালো চাকরি হ'লে বিয়ে হবে। বউ আসবে। তখন হয়তো এ বাসায় আর কুলুবে না, দাদা অন্য বাসা করবে—"

"যা, যা, ফাজিল, চুপ কর"—ধমকে উঠল পলটু।

"ধমকাচ্ছিস কেন। যখন বিয়ে করবি তখন এ বাসায় কি কুলুবে? তবে বাবা, একটা কথা। তোরা যে যেখানেই থাকিস, যেমন ভাবেই থাকিস, তিনুকে তোরা যেন ভুলিস না। কত কষ্ট পেয়ে গেছে, কিন্তু টুঁ শব্দটি করে নি। ওকে তোরা ভুলিস না।"

পলটু বলল, "তা কি ভুলতে পারি কখনও? তুমি ওসব কথা ভাবছ কেন!"

যদুবাবুর স্ত্রীর চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল।

দত্ত ভূতকে সম্বোধন করে' বলল—"মনে হচ্ছে আপনি এবার চলে যাবেন। কেন মনে হচ্ছে তা বলতে পারব না। যাবার আগে কিন্তু একটা কথা বলে' যান আমাকে, আমার ঘরে কাঁথা-ঢাকা যে মড়াটা ছিল সে কে?"

ভূত কোনও উত্তর দিল না, আবার চলতে লাগল। ঠিক কোন্ দিক দিয়ে তারা যাচ্ছিল তা না বুঝতে পারলেও, দত্ত বুঝতে পারছিল যে তারা আবার বড়বাজারে এসেছে। আবার বণিকদের ভিড়। কিন্তু সে নিজেকে কোথাও দেখতে পেলে না। তার মনে হ'ল এই তো তার আপিস। ভূত থামছিল না, কিন্তু দত্তর অনুরোধে থামল।

"এইখানেই ওই ঘরটায় আমার আপিস ছিল। বহুদিন থেকে ওটা আমার আপিস। ওখানে একবার উঁকি মেরে দেখব ভবিষ্যতে আমি কি হব?"

ভূত থামল, কিন্তু তার হাত প্রসারিত হ'য়ে রইল অন্যদিকে।

"আপনি ওদিকে দেখাচ্ছেন কেন? আমার আপিস তো এই দিকে।"

ভূতের হাত তেমনি প্রসারিত হয়েই রইল।

দত্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের আপিসের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। আপিস আছে, কিন্তু তার আপিস নয়! আগেকার টেবিল চেয়ার আলমারি কিছু নেই, চেয়ারে অন্য লোক বসে' আছে, সে নয়।

ভূতের দিকে চেয়ে দেখল, ভূত অন্যদিকে হস্ত প্রসারিত করে' রয়েছে। আবার চলতে লাগল তারা। কোন্ দিকে যাচ্ছে প্রথমটা দত্ত বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল নিমতলা ঘাটে এসেছে। সামনেই একটা চিতা জ্বলছে। তিন চারজন লোক বসে' গল্প করছে।

প্রথম ব্যক্তি বলছে—"এ মড়াটা বেগ দেবে মনে হচ্ছে। কাঠগুলো ভালো ধরে নি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, "ধরবে একটু পরে। পীতাম্বর দত্ত যেমন বেগ দিয়েছিল, এ ততটা দেবে না। পীতাম্বর দত্তকে পোড়াতে নাজেহাল হ'তে হয়েছিল। দু'দিনের বাসি মড়া, পেট ফুলে ঢোল। কর্পোরেশন থেকে আমার উপর হুকুম হ'ল, পুড়িয়ে এস ওকে! চারজন ডোম নিয়ে গেলুম। কোনরকমে শ্মশানে এনে ফেললুম বটে, কিন্তু নামল মুষলধারে বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক ঠায় বসে' থাকতে হ'ল। তারপর চিতায় চড়ালাম, কিন্তু ভিজে কাঠ ধরতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সবটা পুড়লই না, টেনে ফেলে দিলাম, আধ-পোড়া অবস্থায়! কি করব, শীতে হিহি করতে করতে কি আর বসে' থাকা যায়? দু' ছিলিম গাঁজা খেয়েও শীত যায় না।"

"পীতাম্বর দত্ত কে?"—তৃতীয় লোকটি জিগ্যেস করল।

"ছিল এক ব্যাটা সুদখোর কঞ্জুস হারামজাদা। সকালে কেউ নাম নিত না। আত্মীয়স্বজন সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের জ্বালিয়ে গেল। আমরা কর্পোরেশনের চাকর, আমাদের তো 'না' করবার উপায় নেই। পাড়ার একটি লোক সঙ্গে আসতে চাইলে না। দাও, বিড়িটা—"

দত্ত নির্বাক হ'য়ে রইল। তারপর ভূতকে প্রশ্ন করল, "ওরা কি আমার কথা বলছে? ঘরে যে মড়াটা দেখলুম সেটা কি আমারই মড়া? যা দেখলুম তা কি হবেই, না হ'তে পারে—"

ভূত কোনও উত্তর দিল না, চিতার দিকে হস্ত প্রসারিত করে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

দত্তর কাঁপুনি এল হঠাৎ। ঠকঠক করে' কাঁপতে লাগল সে। তারপর ভূতের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে' বলতে লাগল, "বিশ্বাস করুন, আমি বদলে গেছি। আপনাদের সঙ্গে

দেখা না হ'লে আমি হয়তো ওই রকম পশুই থাকতাম। কিন্তু আপনারা আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। আমি কয়লা ছিলাম, আপনাদের কৃপায় হীরে হ'য়ে গেছি। দয়া করে' বলুন, আমার ভালো হবার আশা আছে তো?"

ভূতের অকম্পিত প্রসারিত হাতটা এবার যেন একটু কাঁপল।

দত্ত বলতে লাগল, "আমি শপথ করছি, এবার থেকে আমি প্রতি বছর মায়ের পূজো করব। সেই পূজোয় ডাকব সবাইকে। আমাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি দেখিয়ে যে শিক্ষা আপনারা দিলেন তার মর্যাদা আমি রাখব। আপনাদের আশীর্বাদে আবার মানুষের মতো মানুষ হব। আপনারা তো সব পারেন, আমার অতীতটাকে মুছে দিন না, লোকে যেমন রবার দিয়ে ভুল লেখাকে মুছে দেয়। দেবেন? দিন না—"

দত্ত ভূতের প্রসারিত হাতটা ব্যাকুলভাবে জাপটে ধরল। ভূত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আরো জোরে চেপে ধরল দত্ত। ভূত শেষে এক ঝটকায় সেটা ছাড়িয়ে নিলে। তারপর এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। ভূত ক্রমশঃ সরু হ'য়ে গেল। দত্ত সবিস্ময়ে দেখল সে মশারি টাঙাবার ফ্রেমে রূপান্তরিত হ'য়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, তারই তো মশারির ফ্রেম। বিছানাটাও তার, ঘরটাও। সানায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাহলে পূজো শেষ হয়নি! এখনও সময় আছে!

দত্ত তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেবে পড়ল।—"না, আর দেরি নয়! এবারই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ঘোষ, ভাই ঘোষ, কি উপকারই তুমি করেছ আমার।"

সে নিজের মুখে হাত বুলিয়ে দেখল চোখের জলে সব ভিজে গেছে। তারপর চেয়ে দেখল, না, মশারি তো ঠিক আছে, কেউ ছিঁড়ে নেয় নি। সব ঠিক আছে। চেয়ার, টেবিল, তার জামা, ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে। ভবিষ্যতের ভূত আমাকে তাহলে যা দেখালে তা হয় নি। সে হ'তেও দেবে না।

একটা অপূর্ব আলোয় যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তার মুখটা। তাড়াতাড়ি সে নিজের জামা কাপডগুলো ঠিক করতে লাগল। পাট করে' ঝেড়ে গোছাতে লাগল, কিন্তু গোছাতে গিয়ে আরও যেন অগোছাল হ'য়ে গেল সব।

"কি করব আমি এখন!"—দিশেহারা হ'য়ে পড়ল যেন দত্ত—"কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না। পালকের মতো হালকা হ'য়ে গেছি! কি কাণ্ড! মনে হচ্ছে আমি যেন দেবদূত! আমি যেন স্কুলের ছেলে! বারোয়ারিতলায় ঢাক বাজছে। বাঃ, কি চমৎকার বাজাচ্ছে! জিগ্‌ জিগনা, জিগ্‌ জিগিনা গুম্ গুম্, জিগ্ জিগ্ জিগি্‌ন জিগি্‌ন গুম্ গুম্—"

বালকের মতো লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল দত্ত বাইরের ঘরে। হাঁপাচ্ছিল সে!

"ওই তো সেই দরজা! ওই দরজা দিয়েই ঘোষ এসেছিল। ওই যে ওইখানে ওই

কোণে বর্তমান পুজোর ভূত বসেছিল। ওই যে ওই জানলা দিয়ে আমি আরও সব ভূতদের দেখেছিলাম। আশ্চর্য, সব কি স্বপ্ন? এতো সুন্দর, এতো অসম্ভব স্বপ্ন? না, না, সব সত্যি, ওরা এসেছিল, ওরা আমাকে ঘষে' মেজে বদলে দিয়ে গেছে! হা-হা-হা! কি মজা! আমি বদলে গেছি—"

উদ্বাহু হ'য়ে লাফাতে লাগল দত্ত। তার হাসির আওয়াজে অপূর্ব একটা তারুণ্যের সুর বাজল। কিন্তু হাঁপিয়ে পড়ল বেচারা। এই বয়সে কি অত লাফালাফি সহ্য হয়!

"এখনও পুজো শেষ হয় নি? অনেকক্ষণ যে ভূতেদের সঙ্গে ঘুরেছি। আজ কোন তারিখ? ক'টা বেজেছে? কিছুই জানি না। আমি যেন ছোট ছেলে হ'য়ে গেছি। ছোট ছেলেই থাকব। হা-হা-হা! বোকাই থাকব আমি। বুদ্ধিমান হ'তে চাই না। কি মজা, কি মজা!"

হঠাৎ বাড়ির খুব কাছেই পূজোর বাজনা বেজে উঠল খুব জোরে। জিগ্, জিগা জিন্, গিজিন্ গিজিন্—ডুম্ ডুম্ ডুম!

দত্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলাটা খুলে ফেলল। বাঃ আকাশ তো পরিষ্কার। রোদে ঝলমল করছে চারিদিক। বৃষ্টি টৃষ্টি কিচ্ছু নেই। পূজোর কলরবে পরিপূর্ণ রাস্তাঘাট। নতুন জামা কাপড় পরে' ঘুরছে ছেলেমেয়ের দল। সোনালী আভা যেন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। একটা ছেলেকে দেখে জানলা থেকে ঝুঁকে দত্ত চীৎকার করে' জিগ্যেস করল—"আজ কোন্ তারিখ—"

"কি?"

ছেলেটি একটু আশ্চর্য হ'য়ে উপর দিকে চাইল।

"আজ কোন্ তারিখ খোকা?"

"তারিখ? তারিখ জানি না। আজ সপ্তমী।"

"আজই সপ্তমী?"

"হ্যাঁ। আজই। আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি।"

"বাঃ বাঃ। আচ্ছা একটা কথা বলতে পার?"

"কি—"

"বড় রাস্তায় যে মিষ্টির দোকানটা আছে তার সব মিষ্টি কি বিক্রি হ'য়ে গেছে? বড় বড় ক্ষীরেলা, পানতুয়া, রসগোল্লা—করছিল কাল।"

ছেলেটা অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

লোকটা পাগল না কি!

"একটু দাঁড়াও—।"

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল দত্ত। সিঁড়ি দিয়ে নেবে হাজির হ'ল রাস্তায়।

"খোকা, আমার একটা কাজ করবে? ওই মিষ্টির দোকানে গিয়ে বলে' এস, সব মিষ্টি আমি কিনব। সব মিষ্টি আমার বাড়িতে নিয়ে আসতে বল।"

"স—ব মিষ্টি ?"

"সব। তুমি সঙ্গে করে' নিয়ে এস তাদের এখানে। তোমাকেও দেব।"

ছেলেটা আর একবার সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল দত্তর মুখের দিকে। পাগল নয় তো ? দত্ত বুঝতে পারলে তার সপ্রশ্ন দৃষ্টির অর্থ।

"না, না, আমি পাগল নই। আচ্ছা, এই নাও।"

পকেট থেকে মনি-ব্যাগ বার করে' একটা দশটাকার নোট দিলে তাকে।

"এইটে দোকানদারকে দিয়ে বল পীতাম্বর দত্তর বাড়িতে সব মিষ্টি পৌঁছে দিন। বাকি দামটা মিষ্টি এলে পাবেন। আর এই নাও তুমি এক টাকা। পূজোর সময় কিছু কিনে নিও।"

খোকা এতটা প্রত্যাশা করে নি। একছুটে চলে' গেল সে।

"যতুর বাড়িতে সব পাঠিয়ে দেব। কে পাঠিয়েছে তা সে বুঝতেও পারবে না। বেশ মজা হবে।"

তারপর তার মনে হ'ল এখানে মিষ্টিগুলো আনিয়ে কি হবে! তার চেয়ে দোকানে গিয়ে যতুর বাড়ির ঠিকানাটা লিখে দেওয়াই তো ভালো।

দত্ত মিষ্টির দোকানের দিকে গেল। ছেলেটা আগেই পেঁছেছিল সেখানে। সে ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারছিল না তাকে। দোকানদার বুঝতেই চাইছিল না যে কিপ্‌টে পীতাম্বর দত্ত সব মিষ্টি কিনবে।

দত্ত গিয়ে তাকে বলল—"ওহে ক্যালারাম, শোন। তোমার দোকানের সব মিষ্টিগুলো আমার চাই। কি রকম দাম পড়বে বল তো—"

"সব নেবেন ?"

"সব। এই খোকাকে আগে একটা করে' দাও সব রকম মিষ্টি। আর বাকিটা এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। একটা কাগজ দাও—"

দত্ত কাগজে যতুবাবুর ঠিকানাটা লিখে দিলে।

"এ তো অনেক দূর। এতো মিষ্টি সেখানে নিয়ে যেতে হলে তো একটা ট্রাক চাই।"

"ট্রাকই ভাড়া করে' ফেল একটা। কত ভাড়া নেবে ?"

"টাকা পনরো তো বটেই।"

"বেশ। আর তোমার মিষ্টির দাম কত।"

হিসেব করে' ক্যালারাম বলল—"পঁচাশি টাকা বারো আনা হয়। তা আপনি পঁচাশিই দিন!"

"বেশ, তোমার পঁচাশি আর ট্রাকের পনরো। পুরোপুরি একশ' টাকাই দিয়ে দিচ্ছি। এই নাও। এই খোকাকে আগে এক ঠোঙা খাবার দাও—"

"আমার দোকানসুদ্ধ আপনি কিনে নিলেন। আমি যে বেকার হ'য়ে গেলাম!"

"বেকার হবে কেন, ফুর্তি করে' পুজো দেখ গে।"

দামটাম সব চুকিয়ে দিয়ে দত্ত বাড়ির দিকে ফিরল। যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফিরল। কি আনন্দ যে হচ্ছিল তার তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

বাড়ি ফিরে এসে কামাতে বসল। উত্তেজনায় হাত কাঁপতে লাগল, কেটে গেল দু'এক জায়গায়। দত্তর ভ্রূক্ষেপ নেই।

কামিয়ে, ফরসা জামা কাপড় বার করলে ট্রাঙ্ক খুলে। বহুকাল আগেকার একটা ফরেসডাঙার ভালো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল। তাই বার করে' পরল।

তাই পরে' আর এক গোছা নোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। পুজোয় চুটিয়ে আনন্দ করতে হবে। রাস্তায় দলে দলে লোক চলেছে। সবারই মুখে হাসি, সবারই মুখে প্রসন্নতা। সবারই গায়ে নতুন জামা-কাপড়। দত্ত সকলের মুখের দিকে চাইতে চাইতে চলতে লাগল। তারও মুখে স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসির আভা। অনেকেই তাকে নমস্কার করল। সে-ও প্রতি-নমস্কার জানালে।

একটা অন্ধ ভিখারী রাস্তার ধারে বসে' খঞ্জনি বাজিয়ে গান করছিল—দত্ত তাকে একটা টাকা দিয়ে দিলে।

কিছুদূর গিয়েই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, যিনি ছোট ছোট গরীব ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তার আপিসে চাঁদা চাইতে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে দত্তর বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল যেন। কিন্তু পিছপা হবার লোক সে নয়। এগিয়ে গিয়ে হেসে নমস্কার করলে।

"পুজো বেশ জমেছে মনে হচ্ছে। কাল আপনি কত যোগাড় করতে পারলেন ?"

"কই আর বেশী হ'ল। আপনিই তো পীতাম্বর দত্ত।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অধমের ওই নাম। আপনি কাল নিশ্চয় আমার উপর চটেছিলেন, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। শুনুন, কথাটা কানে কানে বলব, লোকে যেন না জানতে পারে।"

ভদ্রলোকের কানে কানে কথাটা বলতেই চমকে উঠলেন ভদ্রলোক—"সে কি ! অত দেবেন ? অথচ কাল—।"

"কাল মেজাজটা ভালো ছিল না।"

"আপনি এত টাকা দেবেন তা যে স্বপ্নাতীত ছিল—।"

"না, না, ওসব বলবেন না। আর আমার নামটা যেন না প্রকাশ পায়। আপিসে আসবেন পুজোর পর, গল্প করা যাবে। আসবেন তো ?"

"নিশ্চয় আসব।"

"আচ্ছা, নমস্কার। চলি তাহলে।"

তারপর গেলেন বারোয়ারিতলায়। করজোড়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দুর্গা

প্রতিমার সামনে। দুর্গার একটা নূতন মূর্তি দেখলেন আজ। তিনি জগজ্জননী। মহিষাসুর মূর্তিমান পাপ বলেই তাকে দমন করছেন। পুণ্যময়ী মঙ্গলময়ী মা কি এত পাপ সহ্য করতে পারেন? তারপর দত্ত দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াল। কত ছেলেকে কত খেলনা কত লজেন্‌স্ কত সন্দেশ যে কিনে কিনে দিতে লাগল। যে কটা ভিখারী ছিল প্রত্যেককে একটা করে' টাকা দিল। তার মনে হ'তে লাগল সারাজীবন কষ্ট করে' যে লক্ষ লক্ষ টাকা সে রোজগার করেছে তা যেন এতদিনে সার্থক হ'ল। তারপর সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল দুর্গাকে। মনে মনে বলতে লাগল—অনেক পাপ করেছি মা, আর করব না, এবার আমাকে ক্ষমা কর।

তার সারা দেহ মন যেন পবিত্র হ'য়ে গেল।

বারোয়ারির মুরুব্বী একজন যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে দত্ত বলল—"আপনাদের বারোয়ারি ফাণ্ডে আমি একশ' টাকা চাঁদা দিতে চাই। আপনাকেই দেব কি?"

"দিন। রসিদ কিন্তু এখন দিতে পারব না। রসিদ বই বাড়িতে আছে।"

"বেশ, পরেই দেবেন।"

একশ' টাকার আর একটা নোট বার করে' দিলে দত্ত। তারপর পুজোর প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। তাই খেয়ে কাটিয়ে দিল দুপুরটা।

সন্ধ্যাবেলা দত্ত প্রমোদের বাড়ি গেল। বাড়িটার সামনে খানিকক্ষণ পায়চারি করল। কড়া নাড়তে সাহস হচ্ছিল না প্রথমে। শেষটা মরিয়া হ'য়ে এগিয়ে গিয়ে নাড়তে লাগল কড়াটা।

একটি ঝি বেরিয়ে এল।

"প্রমোদ বাড়ি আছে?"

"আছেন। ওপরে আছেন তিনি। খবর দেব?"

"আমিই যাচ্ছি। আমি তার মামা—"

ঝি-টি বলল—"ওঁরা খেতে বসেছেন—"

"তা হোক—"

উপরে দরজা ফাঁক করে' মুণ্ডটি ঢুকিয়ে দত্ত দেখল খাওয়ার জিনিস সব টেবিলে সাজানো হচ্ছে। প্রমোদের বউ বাটিতে বাটিতে মাংস তুলছে।

"প্রমোদ—"

টুনি চমকে উঠল। তার হাতের হাতা থেকে ঝোল খানিকটা পড়ে' গেল মাটিতে।

"আরে একি! মামা যে।"

সহাস্যমুখে উঠে দাঁড়াল প্রমোদ।

"হ্যাঁ, মামাই। নিমন্ত্রণ করে' এসেছিলে, খেতে এসেছি। ঢুকব?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

দত্ত ঢুকেই জাপটে ধরল প্রমোদকে। তারপর যা করলে তা স্বপ্নাতীত। চুমু খেলে তাকে।

"আরে, আরে, কি করছ মামা, ছাড় ছাড়।"

সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল বেশ। একটু পরেই তপেশ এল, প্রমোদের সেই বড-সড় শালীটিও এল। আরও জমে' গেল। টুনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠল দত্ত। পকেট থেকে আরও একশ' টাকা বার ক'রে বলল, "প্রমোদ, বৌমার একটা ভালো শাড়ি কিনে দিও। আজই দিও—"

খুব হৈ হৈ করে' মহানন্দে খাওয়াদাওয়া শেষ হ'ল। অনেকক্ষণ গল্প করে' একহাত তাস খেলে প্রায় রাত ন'টা নাগাদ দত্ত বাড়ি ফিরল।

তার পরদিন খুব সকাল সকাল আপিস গেল সে। ন'টা বাজবার অনেক আগে। যদুবাবু নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আসতে পারবেন না। হাতে-নাতে ধরতে হবে সেটা।

পৌনে ন'টায় গিয়ে দত্ত আপিস খুলল। একটু পরেই ন'টা বাজল, যদুবাবুর দেখা নেই। সওয়া ন'টা বেজে গেল। তবু যদুবাবুর দেখা নেই। ন'টা বেজে আঠারো মিনিটে এলেন যদুবাবু।

ভয়ে ভয়ে কপাট ঠেলে ঢুকলেন।

"কি হে", দত্ত চেঁচিয়ে উঠল—"এত লেট করে' এলে যে!"

"একটু দেরি হ'য়ে গেল আজ। সত্যিই দেরি হ'য়ে গেছে।"

"দেরি তো হয়েই গেছে, বুঝেছি, কিন্তু কারণটা কি?"

"কাল পাড়ায় যাত্রা হচ্ছিল। সেটা শেষ হ'তে প্রায় রাত দুটো বেজে গেল। সকালেই শ্যামানন্দবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করে' পূজোর জামা-কাপড় কিনেছিলাম। টাকাটা তাঁকে আজ ফেরত দেবার কথা ছিল।"

"টাকা পেলে কোথায়?"

"আবার ধার করলুম। মাইনে পেলে শোধ করব!"

দত্ত ছদ্ম গাম্ভীর্যে কটমট করে' চেয়ে রইল যদুবাবুর দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "না, এরকম চলবে না। এ চাল আমি সহ্য করতে পারব না। আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি। যা পেতে তার ডবল পাবে এ মাস থেকে।"

তারপর হা-হা-হা করে' হেসে উঠল দত্ত।

যদুবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। পাগল হ'য়ে গেল নাকি লোকটা! তার একবার মনে হ'ল পুলিশ ডাকবে কিনা।

দত্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলতে লাগল—"শোন যদু, এতকাল তোমার উপর অনেক দুর্ব্যবহার করেছি। আমাকে ক্ষমা কোরো। আজ মহাষ্টমী, আজ থেকে আমি আমার ভুল সংশোধন করলাম। তোমার মাইনে তো ডবল করে' দিলামই, তোমার পরিবারের ভারও আমি নেব। কোথায় কোথায় তোমার ধার আছে, কি কি কষ্ট আছে. সব আমাকে খুলে বল, সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে এবার থেকে। আর রাত্রে তোমার বাড়িতে খাব আমি। আপিস বন্ধ করে' দাও। গোটা কুড়ি টাকা দিচ্ছি, মাছ মাংস কিনে নিয়ে

বাড়ি চলে' যাও। খেতে খেতে আজ তোমার সব কথা শুনব। কিন্তু ভেব না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

দত্ত যদুবাবুকে যা বলেছিল, তা তো করেই ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী করেছিল। তিনু মারা যায় নি। তিনুর সব ভার নিয়েছিল দত্ত। বড় বিলেতফেরত একজন ডাক্তারের উপর তার চিকিৎসার ভার দিয়েছিল। তার চিকিৎসায় ক্রমশঃ ভালো হচ্ছিল তিনু। ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভালো হ'য়ে যাবে। দত্ত আর যদুবাবুর মনিব রইল না, ক্রমশঃ বন্ধু হ'য়ে গেল। তার সংসারের সমস্ত সুখদুঃখের অংশীদার হ'য়ে গেল সে ক্রমশঃ। প্রায় রাত্রে ওর বাড়িতেই যেত। দত্তর চরিত্র এমন বদলে গেল যে সকলে অবাক। অনেকে চিন্তা করে' বলতে আরম্ভ করেছিল—ও আবার নিজমূর্তি ধরবে। কয়লার কালো রং কখনও ঘোচে না। দত্ত কিছু বলত না, মুচকি মুচকি হাসত কেবল। হীরে যে কয়লারই আর একটা রূপ তা তো সকলে জানে না। দত্ত এ-ও জানত যে পৃথিবীতে এমন কোন ভালো ঘটনা ঘটে নি যা দেখে লোকে প্রথম প্রথম ঠাট্টা করে নি। এমন কোন ভালো লোক জন্মে নি যাকে প্রথম জীবনে উপহাসাস্পদ না হ'তে হয়েছে। দত্ত কারো ঠাট্টা বা উপহাস গ্রাহ্য করত না, প্রতিবাদও করত না, মুচকি হাসতে হাসতে শুনে যেত কেবল।

ভূতেরা তাকে আর দেখা দেয় নি। কিন্তু একরাত্রেই তাকে তারা যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল তাই যথেষ্ট হয়েছিল তার পক্ষে।

এর পর থেকে যে জীবন সে যাপন করেছিল তা আদর্শ ভদ্রলোকের জীবন। সবাই তাকে একদিন ঘৃণা করত, কিন্তু শেষে সবাই তাকে ভালোবেসেছিল। এর চেয়ে বেশী আর কিছু সে চায়ও নি।

গল্পগ্রন্থ

ম নি হা রী

উৎসর্গ

প্রথিতযশা কবি ও গল্পকার

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

স্নেহাস্পদেষু

যেমন আছে থাক

হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা সাবানের বাক্সে নানারঙের 'রিবন' রয়েছে। পাশেই আর একটা কৌটো, ঢাকনাটা প্লাস্টিকের, তার ভিতর নানারকম পুঁতি। শেলফের উপরেই তিনটে মোটা মোটা খাতা, এক্সারসাইজ বুক। খুলে দেখলাম প্রত্যেকটি ছবিতে ভরা। একটাতে ওয়াল্ট্ ডিস্নের আঁকা ট লাইফ অ্যাড্ভেন্চারস্। আর একটাতে প্রজাপতি আর পাখীর রঙীন ছবি। কয়েকটা কুকুরেরও। সুন্দর সুন্দর ছবি সব। তৃতীয়টাতে ডাকটিকিট।···ক্যালেণ্ডার ঝুলছে এপাশে ওপাশে। একটাতে ক্রন্দনোন্মুখ একটি নাদুসনুদুস ছোট ছেলের ছবি, আর একটাতে তাজমহলের। বাঁ দিকের শেলফে নিপুণভাবে গোছানো বইয়ের সারি। অধিকাংশই কলেজের বই, কিন্তু 'সঞ্চয়িতা' এবং 'গীতবিতান'ও আছে। শেলফের পাশেই নীল টেবিলটা আর তার উপরে তার শৌখীন টেবিল ল্যাম্পটা। সেকালে মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তায় যে ধরনের আলো দিত, ল্যাম্পটা দেখতে সেইরকম। দেওয়ালে আর একটি ল্যাম্প। তার কাগজের শেডে চমৎকার ফুল-কাটা, অনেকটা রঙীন আলপনার মতো। বিছানার ধারে ধব্ধবে শাদা বেড্ সুইচটি ঝুলছে। শৌখীন বেডকভার ঢাকা ছোট্ট বিছানাটি পাতাই রয়েছে। এর পাশেই একটা ছোট শেল্ফ। তাতে ছোট্ট টাইমপিস্টি রয়েছে, বন্ধ হয়ে রয়েছে, দম দেওয়া হয় নি বলে। ঘড়ি ছাড়া টুকিটাকি আরও কত জিনিস। অদ্ভুত আকৃতির বেঁটে সুন্দর একটা আতরের শিশি। তাছাড়া মাথার কাঁটা, চুলের ফিতে, ছোট-ছোট-ঝিনুক-দিয়ে-তৈরি ফুলের মতো একটা পেপারওয়েট। আর একটা পেপারওয়েট ডিম্বাকৃতি, কাঁচের, গাঢ় বাদামী রঙের। ওদিকের আলমারিতে পুতুলের সমারোহ। কেষ্টনগরের লক্ষ্মী-সরস্বতী-মহাদেব। বৈদিক ধাঁচের দাঁড়ানো সরস্বতীও রয়েছে একটি। তাছাড়া ব্রোঞ্জের মতো দেখতে আর একটি কলসীকাঁখে তন্বী তরুণী। শান্তিনিকেতনের পুতুল কৃষক-দম্পতি। স্ত্রীর মাথায় ঝুড়ি, পুরুষের কাঁধে শিশুপুত্র। তার এপাশে একটি বক্, আর এক-পাশে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি, তার পিছনে একটা শৌখীন ট্রে। ট্রের মাথার কাছে একটা টিক্‌টিকি, আর একটা আরশোলা। দেখলে জীবন্ত মনে হয়, কিন্তু মাটির। বুদ্ধ-গয়া, শিব-লিঙ্গ, ধূপদানী, ফোটো-ফ্রেম, ভুঁড়ি-বার-করা ন্যাড়ামাথা বিকশিত-দন্ত একটা লোক, কাঠের তৈরি ড্রাগন, তারপরই প্যাঁচা একটা। ঠিক তার উপরে তিনটি আহিরিণী গোয়ালিনীর অপূর্ব মৃন্ময় মূর্তি, মাথায় দুধের কেঁড়ে নিয়ে হাত দুলিয়ে চলেছে সদর্পে। ফুলদানীই কত। পাথরের, মাটির, কাঁচের, পিতলের, চীনে মাটির। তার পাশেই রেঙ্গুন থেকে আনা ল্যাকারের জিনিস, ফুলদানী, কৌটো, চায়ের ট্রে। তার ওধারে চীনে-ধাঁচের বুদ্ধ মূর্তি। গয়ার পাথরের বুদ্ধ মূর্তিও রয়েছে পাশে। তার পাশেই একটা 'কাপ্', আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর শ্রীশ্রীমায়ের ফোটোও রয়েছে। তাঁদের সামনে রঙীন ছোট ছোট থালায় কন্যাকুমারী

থেকে আনা পাথরের চাল, আর নুড়ি রয়েছে নানারকম। নানারঙের ঝিনুক এবং সামুদ্রিক শামুকের খোলাও। কোণে মোড়া রয়েছে কাগজের রঙীন পাখাটি। আরও কত জিনিস—ছোট ছোট কাপ, ছোট ছোট পাখী, মাটির ফল, কাঠের নেপালী ফুলদানী। তার পিছনে গণেশ।...

ভুটান আর জাম্বু—কুকুর দুটো—মুখ শুকিয়ে বসে আছে থাবার উপর মুখ রেখে। কোথা গেল!

সদ্য-বিবাহিতা কন্যা সব ফেলে রেখে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। এখানকার একটি জিনিসেও আর দরকার নেই তার। নূতন জায়গায় নূতন জিনিস নিয়ে নূতন সংসার পেতেছে।

চারিদিকেই তার স্মৃতিচিহ্ন। দেখে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু ওগুলো যেখানে যেমন আছে থাক। দেখে কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু এই কষ্টটাই মিষ্টি। এই মাধুর্যের সম্বলই তো এখন একমাত্র সম্বল।

মন

এবার আমার বাড়িতে দেওয়ালি খুব জমে নি। চাকরদের সাহায্যে কিছু প্রদীপ জ্বালিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েরা কেউ নেই—আলোগুলো যেন জ্বলেও জ্বলছিল না। আমার দাইয়ের নাতি বিজয় আর নাতনী সালিয়ার জন্যে কয়েক প্যাকেট ফুলঝুরি কিনেছিলাম। তাদের হাস্যকলরবে দীপালি-উৎসব সার্থক হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য। ফুলঝুরি ফুরিয়ে গেল, তারাও ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর আমি গৃহিণীকে নিয়ে মোটরে করে বেরুলাম শহরের দেওয়ালি দেখবার জন্য। বাড়িতে একা একা ভাল লাগছিল না। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু বুঝতে পারলাম ভুল করেছি। এসব উৎসব পায়ে হেঁটে দেখতে হয়, মোটরে চড়ে নয়। আমাদের যখন সামর্থ্য ছিল তখন তাই দেখতাম। এখন আর পারি না। এতদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতেই দেওয়ালি করেছি, বাইরে বেরুবার দরকার হয় নি। এখন এতদিন পরে বেরিয়ে দেখছি জনতার স্রোতে গা ঢেলে দেবার সামর্থ্যই নেই। মন খারাপ হয়ে গেল। বড় বড় বাড়ি আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়েছে, আকাশে হাউই ছুটছে, নানা রঙের আতসবাজি হচ্ছে, কাছে দূরে পটকা ফুটছে, বৈদ্যুতিক আলোর নানারকম রঙীন কৌশলে আমাদের নোংরা শহরটাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। কিন্তু মন খুশী হয়ে উঠল না, আগে যেমন হত। একটা অর্থনৈতিক তত্ত্ব মনে উদিত হয়ে সমস্ত উৎসবকে যেন ম্লান করে দিতে লাগল। মনে হল লোকে খেতে পাচ্ছে না, বানে চারিদিক ডুবে গেছে, এ সময়ে অনর্থক আলো জ্বালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার মানে হয় কোনও। আমার মোটরটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে

পড়েছিল। সামনে পিছনে দু পাশে লোকের ভিড়ে তারাও এগুতে পারছিল না। নজরে পড়ল একটি গরীব মায়ের কোলে একটি ছেলে অবাক হয়ে বিস্ফারিত নয়নে বাজি পোড়ানো দেখছে। তার সমস্ত মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। হঠাৎ ছেলেটি আমার দিকে ফিরে চেয়ে হাসল। যেন সে-ও আমাকে তার আনন্দের অংশীদার হতে আহ্বান করছে।

"আসবি আমার কাছে ?"

হাত বাড়াতেই সে মায়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে আমার কাছে এল। মোটরের জানলা দিয়েই তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে কোলে বসিয়ে নিলাম। কি আনন্দ তার। কিছু পুতুল আর মিষ্টিও কিনে দিলাম তাকে। সেই ভিড়ের মধ্যে সহসা একটা স্বর্গলোক সৃষ্টি হল যেন। আমার বয়স অনেক কমে গেল। কবিতা গুনগুনিয়ে উঠল মনে।

ওগো চেনা কেমন করে
এমন মিষ্টি হেসে
আত্মীয়তা করলে দাবি
সহজ ভাবে এসে।

লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়ে যে মন একটু আগে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সেই মনই আবার নতুন কথা বলতে লাগল—অপচয় না হলে উৎসব হয় না। যেসব ছেলেমেয়েরা দেশের ভবিষ্যৎ তারা যখন আনন্দ পেয়েছে তখন এ তো সার্থক খরচ।

কুমারসম্ভব

ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একদিন আসিয়া আলাপ করিলেন। আমার লেখার সুখ্যাতি করিলেন এবং আরও এমন সব কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করিলাম। কথা বলিতে বলিতে মুখটি মাঝে মাঝে সুচোলো করিয়া ফেলেন। একটু পরেই আলাপে ব্যাঘাত হইল, দুই-চারিজন রোগী আসিয়া পড়িল। তখন তিনি বলিলেন, "আপনার বাড়িটা কোথায় ? সন্ধ্যার পর সেইখানেই যাব। এখন এই ভিড়ের মধ্যে কথা কওয়া যাবে না।"

তাঁহাকে বাড়ির ঠিকানা বলিয়া দিলাম। সন্ধ্যার পর তিনি যখন আমার বাড়িতে গেলেন, তখন আমি 'কুমারসম্ভব' পড়িতেছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

"আসুন, আসুন। কালিদাস পড়ছি। বসুন—"

তিনি মুখটি সুচোলো করিয়া সামনের চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

"কালিদাসের উপমা সত্যিই অপূর্ব। শুনবেন একটু ?"

পড়িতে লাগিলাম :

"প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপস্ত্রীমার্গয়েব
ত্রিদিবস্য মার্গঃ
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী,
তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥"

দেখিলাম তিনি মুখ সূচোলো করিয়া জানলার বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। কালিদাসের উপমায় কিছুমাত্র মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। ভাবিলাম, সংস্কৃত ভাষা বোধহয় তেমন জানা নাই, তাই রসটা ভালো উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"শুনুন, দীপঃ, মানে প্রদীপ, প্রভামহত্যা শিখয়া মানে সমুজ্জ্বল শিখা দ্বারা ইব যেমন শোভা পায়, ত্রিদিবস্য মার্গঃ, মানে স্বর্গের পথ, ত্রিমার্গয়া ইব, মানে গঙ্গার দ্বারা যেমন শোভা পায়, মনীষী মানে পণ্ডিতগণ, সংস্কারবতী মানে বিশুদ্ধ, গিরা ইব মানে বাক্য দ্বারা যেমন শোভিত হন, সঃ, মানে হিমালয়, তয়া মানে পার্বতী দ্বারা সেইরূপ পূত, মানে পবিত্র, বিভূতিশ্চ এবং অলঙ্কৃতও হয়েছিলেন। টানা মানে হল তাহলে—অত্যুজ্জ্বল শিখা দ্বারা যেমন প্রদীপ, ত্রিপথবাহিনী সুরধুনীর দ্বারা যেমন স্বর্গপথ এবং সংস্কার বিশুদ্ধ বাক্য দ্বারা যেমন মনীষিগণ পূত ও বিভূষিত হন, এই কন্যকার দ্বারা গিরিরাজও তদ্রূপ পবিত্র ও বিভূষিত হয়েছিলেন—"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখ তেমনি সূচোলোই আছে, অধিকন্তু ভ্রূযুগলে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিয়াছে।

"কুমারসম্ভব ভালো লাগছে না ?"

"ও পড়ে আর কি করব। আমি কুমারসম্ভবের চূড়ান্ত করেছি। আর ভালো লাগে না।"

"কি রকম ! অনেকবার পড়েছেন বুঝি ?"

"আরে মশাই, কালিদাস তো মাত্র একটি কুমারসম্ভব করেছেন। আমি করেছি এগারোটি। এগারোটি ছেলে আমার। গৃহিণী দ্বাদশ গর্ভভার বহন করছেন, জানি না, এবার কুমার না কুমারী কে আসছেন !"

কালিদাসকে হার মানিতে হইল।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "ও, তাই নাকি ! বাঃ !"

হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর বদলাইয়া গেল, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "বড়ই বিপদে পড়েছি মশাই। দুবেলা খোরাক জোটাতে পারি না। শুনেছি, আপনি সদাশয় লোক, যদি কিছু অর্থসাহায্য করতে পারেন বড়ই উপকৃত হব।"

মুখ সূচোলো করিয়া আমার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

সর্বন গোয়ালা

সর্বন গোয়ালা ভালোমানুষ লোক এবং আমার অত্যন্ত অনুগত। আমার প্রতি তাহার বিশ্বাস এত প্রবল যে, আমি যদি বলি যে নদীর জল জল নয়, উহা ভগবানের বিগলিত স্নেহ, সে তৎক্ষণাৎ তাহা বিশ্বাস করিবে। একদিন সন্ধ্যায় সর্বনের সহিত মাঠ হইতে ফিরিতেছিলাম। আমার যে বিঘা দশেক জমি আছে তাহা সর্বই চাষ করে। বৎসরান্তে আমাকে কিছু ফসল আনিয়া দেয়। ফসল কেমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ সর্বন বলিয়া উঠিল, কি সুন্দর! ডাক্তারবাবু, আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন। কি চমৎকার রং ফুটে উঠেছে। দেখিলাম ভাদ্রের আকাশে মহাসমারোহে সূর্যাস্ত হইতেছে। বলিলাম, হবে না? ভাদ্র মাসে স্বয়ং বিশ্বকর্মা যে সরস্বতীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজে তুলি দিয়ে সকাল সন্ধে মেঘে রং দেন। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সর্বন বলিল, ও, তাই নাকি! তাই এত কাণ্ড! সর্বন আমার কথা বিশ্বাস করিল। এ বিশ্বাসের মূলে কি আছে জানেন? এক খোরাক স্যান্টোনাইন। একবার সর্বনের পেটে খুব ব্যথা হয়, আমি তাহার মল পরীক্ষা করিয়া তাহাকে বলি তোমার পেটে বড় বড় কৃমি আছে, এই ওষুধটা খাও, ঠিক হইয়া যাইবে। তাহার পরদিন সর্বন গোয়ালা উদ্ভাসিত মুখে আসিয়া বলিল, প্রায় একশত কেঁচোর মতো কৃমি বাহির হইয়া গিয়াছে, পেটের ব্যথাও আর নাই।

সেদিন ডিসপেন্সারিতে আসিয়া দেখি, সর্বন সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া বিমর্ষ মুখে বসিয়া আছে। চক্ষু দুইটা লাল। সমস্ত মুখখানা যেন ঝামরাইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

"কি হয়েছে সর্বন?"

নাড়ী দেখিলাম, বেশ জ্বর আছে। সর্দিও খুব। মনে হইল ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

"কাঁদছ কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে, ভাল হয়ে যাবে।"

তখন সে তাহার পা দুইটি বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। দুটি পা-ই ক্ষত-বিক্ষত।

"কি করে হল এসব?"

"আমার শুকুমণি হারিয়ে গেছে ডাক্তারবাবু।"

"তোমার মেয়ে?"

"আজ্ঞে না। আমার গাই। দুজনেরই এক নাম। দুজনেই শুক্রবারে হয়েছিল কিনা।"

"পায়ের দশা এমন হল কি করে!"

"শুকুমণিকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম যে। বনে-বাদাড়ে, হাটে-মাঠে, খোঁয়াড়ে-কশাই খানায় কোথায় না খুঁজেছি। তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুকুমণি আমার হারিয়ে গেল ডাক্তারবাবু—"

সর্বন গোয়ালা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিলাম, "কেঁদো না। তোমার অসুখটা তো আগে সারুক।"

কিছু আগেই একটা ভালো ব্রডস্পেকট্রাম অ্যান্টিবাইয়োটিক ওষুধের নমুনা বিনামূল্যে পাইয়াছিলাম। সর্বনকে সেইটাই ইন্‌জেকশন দিয়া দিলাম।

পরদিন সর্বন গোয়ালা হাসিমুখে আসিয়া যাহা বলিল তাহাতে আমিও অবাক হইয়া গেলাম।

"ডাক্তারবাবু, কি আশ্চর্য ইন্‌জেকশন আপনার! আমার অসুখ তো সেরে গেছেই. আমার শুকুমণিও ফিরে এসেছে। ভোরে উঠে দেখি, গোয়ালে জাবনা খাচ্ছে!"

চাচী

আজকাল সহৃদয় মানুষের বড় অভাব। সকলেই আমরা নিজেদের অতিসঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর পশুর মতো বাস করিতেছি। হৃদ্যতা বজায় রাখিবার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। প্রথম উপকরণ অবশ্য মন। দিলদরিয়া মন চাই। কিন্তু অভাবের তাড়নায়, পরশ্রীকাতরতার উত্তাপে, স্বার্থকলুষিত রাজনীতির বিষে আমাদের দিলদরিয়া মন মরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় উপকরণ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য; অতিথিকে, বন্ধুকে, আত্মীয়স্বজনকে নানাভাবে আপ্যায়িত করিবার সামর্থ্য কই? এখন আমরা নিজেরাই খাইতে পাই না, নিজেরাই পরিতে পাই না। দিলদরিয়া হইতে হইলে তৃতীয় উপকরণ, স্থান। ছোট্ট ফ্ল্যাটে বাস করিয়া দিলদরিয়া হওয়া যায় না। ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষুদ্র খোপে বেশী দিন বাস করিলে মনটাও ছোট হইয়া যায়। এই সব কারণেই আজকাল বোধহয় সহৃদয় ব্যক্তির দেখা বড় একটা পাই না। সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটি অচেনা ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমার আত্মীয় তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোমাকে ভাই রাত্রে থাকতে বলতাম, কিন্তু দেখছই তো দুটি মাত্র ঘর। খেতেও বলতে পারলাম না—আমাদের রাত্রে রান্নাই হয় না, আমরা পাঁউরুটি খেয়ে থাকি।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "তাতে কি। আমি কোনও হোটেলে গিয়ে উঠছি। কাল যদি থাকি বিকেলে আসব।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

আমার আত্মীয়ের স্ত্রী বলিলেন, "আমরা কষ্ট করে বিছানা খাট সরিয়ে ওঁকে থাকতে বলতে পারতাম। স্টোভে খানকয়েক লুচি আর ডিমের ডালনা করে দেওয়াও অসম্ভব হত না, কিন্তু লোকটা মুসলমান, তাই আর প্রবৃত্তি হল না।"

ভদ্রমহিলা পাকিস্তানের মেয়ে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল কি করে?"

"ইসমাইলের বাবা ওঁর বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। তাই উনি যখনই কলকাতায়

আসেন একবার দেখা করে যান। কিন্তু যখনই আসেন আমার কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে, মনে হয় গেলে বাঁচি!"

আমার আত্মীয় হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা ভুলো না; ওর দৌলতেই আমার চাকরি। ইসমাইল চেষ্টা না করলে এ চাকরি পেতাম না।"

"তা হোক, ওরা আমাদের যে ক্ষতি করেছে তারপর আর ওদের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের ত্রিসীমানায় থাকতে চাই না।"

ভদ্রমহিলার চক্ষু দুইটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলাম মাউণ্টব্যাটেন ইহাই চাহিয়াছিলেন এবং আমাদের নেতাদের সহযোগিতায় তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চাচীর কথা মনে পড়িল।

আমার বাবা ছিলেন মনিহারী গ্রামের ডাক্তার। শুধু মনিহারীতেই নয়, আশপাশের অনেকগুলি গ্রামে তাঁহার বেশ পসার ছিল। চাচীর সঙ্গে আমাদের কবে যে পরিচয় হইয়াছিল তাহা মনে নাই। শুনিয়াছি আমাদের জন্মের পূর্বে তিনি একবার আমাদের বাড়িতে আসিয়া মাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহার স্বামী রহমতুল্লা সাহেব বাবাকে 'বড় ভাই' পদে বরণ করিয়া বাবার হাতে একটি রঙীন রাখী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে বাল্যকাল হইতেই চাচীর দেওয়া নানা উপহার পাইয়াছি। আমার খুব ছেলেবেলায় তিনি আমাকে একটি জরির টুপি দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের হাতের সেলাই করা প্রকাণ্ড একটি 'সুজনি' আমাদের বিছানায় পাতা থাকিত মনে পড়িতেছে। দোলের সময় আমাকে তিনি একটি লাল রঙের ছাতা লাল রেশমের পাঞ্জাবি ও পায়জামা উপহার দিয়াছিলেন। যখনই যেখানে যাইতেন আমার জন্য কিছু না কিছু আনিতেন। চাচী যে মুসলমান তাহা অনেকদিন জানিতামই না। ধারণা ছিল তিনি আমাদেরই কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বৈরিয়া গ্রামে বাস করেন। চমৎকার বাংলা বলিতেন। সেইজন্য আরও বুঝিতে পারিতাম না যে তিনি পর। তাঁহার ছেলে-মেয়ে ছিল না। ডাক্তারি, কবিরাজী, হেকিমি চিকিৎসায় তাঁহার বন্ধ্যাত্ব মোচন হয় নাই, তাই তিনি নানা তীর্থে নানা পীরের দরগায় গিয়া সন্তান কামনা করিতেন। ভারতবর্ষের নানা তীর্থে তো গিয়াছিলেনই, মক্কা-মদিনাও গিয়াছিলেন। যেখানেই যাইতেন আমার জন্য কিছু না কিছু আনিতেন। তাঁহার দুইটি উপহারের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। একটি ছোট্ট রূপার কৌটা, ঠিক আঙুরের মতো দেখিতে। তাহার ভিতর ভালো আতর-মাখানো তুলা ছিল। দ্বিতীয় জিনিসটি 'কৌনি'র চাল। 'কৌনি' বলিয়া একরকম ক্ষুদ্রকায় শস্য এদেশে হয়। খুব ছোট-দানার চাল হয় তাহা হইতে। সেই চালের পায়েস অতি উপাদেয়।

চাচী আমাদের বাড়িতে যখন আসিতেন তখন দূর হইতেই তাহা বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার গরুর গাড়ির গরু দুইটির গলায় অনেক ঘণ্টা ছিল, গরু দুইটির চেহারাও ছিল চমৎকার। অমন ধপধপে সাদা বলিষ্ঠ প্রশান্ত-মূর্তি গরু বড় একটা চোখে পড়ে না। ছোট ছোট কালো শিং দুইটি যেন কষ্টিপাথরের। মুখের ভাব এত শান্ত,

এত ভদ্র, যেন মনে হইত দুইটি অভিজাত বংশের সুসন্তান। চাচী তাহাদের কপালে পানের আকারে দুইটি কাঁসার টিকলি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের আরও সুন্দর দেখাইত। তাহাদের চোখের দৃষ্টি হইতে যে সৌম্য স্নিগ্ধ শান্ত ভদ্রতা বিকীর্ণ হইত তাহা তথাকথিত সভ্য মানুষের দৃষ্টিতেও বড় একটা দেখা যায় না। চাচীর গাড়িটি ছিল আরও সুন্দর। গাড়ির অমন টপ্পর (ছই) এ অঞ্চলে অন্তত আমি আর দেখি নাই। সেটি ছিল একটি চতুষ্কোণ ঘরের মতো। বাঁশের ও রঙীন দড়ির কারুকার্যে মনোরম। তাহাতে জানলা ছিল। আয়না ছিল। তাহার ভিতর কয়েকটি ছবিও টাঙানো থাকিত। এই গাড়ি আসার শব্দ শুনিলেই আমরা উল্লসিত হইয়া উঠিতাম। মা গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন। তবু চাচী আসিয়া যখন বিছানায় বা চেয়ারে বসিতেন মা কোনও আপত্তি করিতেন না। চাচী চলিয়া গেলে তিনি চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া সব আবার শুদ্ধ করিয়া লইতেন। চাচীর অকৃত্রিম স্নেহ মায়ের গোঁড়ামিকে জয় করিয়া ফেলিয়াছিল। চাচী যখনই আসিতেন আমাদের জন্য খাবার করিয়া আনিতেন। চিঁড়েভাজা, মুড়ির মোয়া, নানারকম সন্দেশ, হালুয়া এইসবই সাধারণতঃ আনিতেন তিনি। মা নিজে যদিও খাইতেন না, কিন্তু আমাদের খাইতে দিতে তিনি কখনও আপত্তি করেন নাই। অবশ্য খাইতে দিবার পূর্বে খাবারগুলিতে গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া লইতেন।

একবার মা মুশকিলে পড়িয়াছিলেন। সেবার আমার উপনয়ন হইয়াছে। তখনও আমার মাথা ন্যাড়া, সাড়ম্বরে ত্রিসন্ধ্যা করি এবং খাওয়ার সময় কথা বলি না। চাচী তাঁহার গরুর গাড়ি লইয়া আসিয়া উপস্থিত। মাকে বলিলেন, আমি আমার ছেলেকে নিজের বাড়ি লইয়া যাইব। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি। মা প্রমাদ গণিলেন। চাচীর সহিত এমন একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করা শক্ত। অথচ মাথা-ন্যাড়া একটা সদ্য-ব্রহ্মচারীকে মুসলমানের বাড়ি গিয়া অন্ন-গ্রহণ করিবার অনুমতিই বা দেন কি করিয়া! মা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাবা বলিলেন, ওখানে তোমাদের রান্না খাবার খাওয়া অবশ্য চলিবে না। এক বছর আমাদের নিয়মে থাকিতে হয়। তবে এমনি গিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারে। চাচী বলিলেন, ছেলে আমাদের বাড়ি যাইবে আর না খাইয়া ফিরিয়া আসিবে তা কি সম্ভব? ওখানে যাইতে হইবে, কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, উহার জাত আমি মারিব না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, শরৎ দাদাকেও আমাদের সঙ্গে দিন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া পাহারাদার হইয়া আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনারাও যদি যাইতে চান, আর একটা গাড়ি পাঠাইয়া দিতেছি।

শেষ পর্যন্ত যাইতে হইল। মামাবাবু অশ্বারোহণে গাড়ির পিছু পিছু গেলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা কল্পনাতীত ছিল। চাচীর বাড়ির প্রকাণ্ড হাতা। দেখিলাম, চাচী সেই হাতার এক প্রান্তে দুইটি বেশ বড় বড় খড়ের ঘর করাইয়াছেন। তাহার একটিতে নূতন খাট, নূতন বিছানা এবং এমন কি নূতন একটি চেয়ার পর্যন্ত

সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অন্য ঘরটিতে রান্না হইতেছে। মৈথিল ঠাকুর রান্না করিতেছে। ভাল ঘিয়ের লুচি, আলুর দম, পটল ভাজা, বুটের ডাল, সন্দেশ, পায়েস—সবই সেই ঠাকুর করিতেছে। তাহার দুইজন সহকারীও মৈথিল ব্রাহ্মণ। তাহা ছাড়া যে দুইটি চাকর রহিয়াছে, তাহারা গোয়ালা। আমাদের আশেপাশে মুসলমানের ছায়া পর্যন্ত নাই। আমাদের খাইবার জন্য চাচী বাসনপত্র আনাইয়াছেন স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার গৌরবাবুর বাড়ি হইতে। রূপার বাসন।

আমাদের খাইবার সময় চাচী একটি মোড়া আনিয়া একটু দূরে উপবেশন করিলেন এবং মামাবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দিদিকে বলিয়া দিবেন তাঁহার ছেলের জাত আমি মারি নাই।

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তিনি আমাকে একটি গেরুয়া রঙের রেশমের পাঞ্জাবি কাপড় এবং চাদর দিলেন।

চাচীর কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার মনিহারী গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলাম, আত্মীয়ের স্ত্রীর কথায় আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিলাম।

"আপনি চা খাবেন কি ? যদি খান তো স্টোভ জেলে জল চড়িয়ে দি।"

"না, এত রাত্রে আর চা খাব না।"

উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। আজকাল বেশীক্ষণ কোথাও বসা যায় না।

শ্রীনাথ পণ্ডিত

মনিহারী স্কুলের নূতন শিক্ষক আসিয়াছিলেন শ্রীনাথবাবু। অনেকদিন আগেকার কথা। তখন মনিহারী স্কুল হাই স্কুল হয় নাই, মাইনর স্কুল ছিল। মাইনর স্কুলেরও সমৃদ্ধি ছিল না কোনও। মাটির দেওয়াল খড়ের চাল। এটাও হইয়াছিল পণ্ডিত দুর্গা ওঝার বদান্যতায়। পণ্ডিত দুর্গা ওঝা পণ্ডিত ছিলেন না, মহাপণ্ডিত ছিলেন, অর্থাৎ তাহার অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু কৃতী পুরুষ ছিলেন তিনি। সামান্য রেলওয়ে পয়েণ্টস্‌ম্যান রূপে কর্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার, সে চাকরি অবশ্য বেশী দিন তিনি করেন নাই। চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসা ধরিয়াছিলেন। গোলাদারি ব্যবসা। কর্মজীবন যখন তাহার শেষ হইল তখন দেখা গেল তিনি হাজার বিঘা জমি, ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ টাকা এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসা রাখিয়া গিয়াছেন। মনিহারী গ্রামের ডাক্তারের ছোট ভাই চারু-বাবুকে খুব ভক্তি করিতেন দুর্গা ওঝা। চারুবাবু সত্যই ভক্তি করিবার মতো লোক। অত্যন্ত স্নেহশীল এবং পরোপকার করিবার জন্য ব্যস্ত। গ্রামের মধ্যে তিনিই ছিলেন বোধহয় একমাত্র লোক যিনি সেকালের এফ-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। বহু লোকের ইংরেজি চিঠিপত্র তিনি পড়িয়া দিতেন এবং উত্তরও লিখিয়া দিতেন। দুর্গা ওঝা রেলের কুলি কনট্রাক্ট লইয়া ছিলেন। সুতরাং অনেক ইংরেজি চিঠি আসিত তাঁহার কাছে।

চারুবাবুই সব চিঠি পড়িয়া জবাব দিতেন। চারুবাবুকে এই সব কারণে খুব শ্রদ্ধা করিতেন দুর্গা ওঝা। চারুবাবুর রস-বোধ ছিল, তিনিই নিরক্ষর দুর্গা ওঝাকে পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছিলেন। মনিহারীর অপার প্রাইমারি স্কুলকে যখন মাইনার স্কুল করিবার চেষ্টা হইতেছিল তখন কর্তৃপক্ষ বলিলেন মাইনার স্কুলের নিজস্ব বাড়ি হইলে তাহারা মাইনার স্কুল করিবার অনুমতি দিবেন। অপার প্রাইমারি স্কুলটি বসিত গ্রামের দুর্গা-স্থানে। সেখানে মাইনার স্কুল হওয়া অসম্ভব। স্কুল গৃহের জন্য চাঁদার খাতা খোলা হইল। কিন্তু মাস তিনেক চেষ্টার পরও কোনও সন্তোষজনক ফল দেখা গেল না। পাশাপাশি দশখানি গ্রাম হইতে মাত্র পঞ্চাশ টাকার প্রতিশ্রুতি মিলিল। চারুবাবু দুর্গা ওঝাকে বলিলেন, এখানে যদি মাইনার স্কুল হত আমিই হয়তো হেডমাস্টার হতে পারতাম। দুর্গা ওঝা বলিলেন, স্কুল হলে আপনি থাকবেন ? বেশ আমিই স্কুল করিয়ে দেং। যদিও মাটির দেওয়াল এবং খড়ের চাল তবু ওঝাজির প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ হইয়াছিল শুনিয়াছি।

এই স্কুলে শ্রীনাথবাবু শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। হেড পণ্ডিত। বেতন কাগজে কলমে মাসিক কুড়ি টাকা। কিন্তু তাঁহাকে দেওয়া হইত ষোল টাকা। এই সর্তেই তিনি চাকুরি লইয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট টাকা দিতেন না, ছাত্র-সংখ্যাও বেশী ছিল না। অনেকে স্বত প্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিয়মিত দিতেন না। যাঁহার মাসে মাত্র চার আনা করিয়া দিবার কথা, দেখা যাইত তাঁহারও কাছে দশ বারো টাকা বাকী পড়িয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই শিক্ষকদের বেতন কমাইতে হইয়াছিল। চারুবাবু বহুকাল বিনা বেতনেই কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথবাবুর বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার কোন গ্রামে। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ। অদ্ভুত চেহারা ছিল ভদ্রলোকের। সর্বাঙ্গের চামড়া কেমন যেন ঢিলা, একেবারেই আট-সাঁট নয়। কপালে বহু রেখা। ভুরুর চামড়া ঝুলিয়া প্রায় চোখের উপর পড়িয়াছে। গালের চামড়াও ঝোলা-ঝোলা। কান দুইটা অস্বাভাবিক লম্বা। তাহাকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া মনে হইত না, মনে হইত কোনও জন্তু বুঝি। হাসিলে মুখটা আরও কদর্য হইয়া উঠিত, রাগিলে আরও ভীষণ। তাহার ঢিলা চামড়া দেখিয়া সন্দেহ হইত এক-কালে তিনি সম্ভবত বেশ মোটাসোটা ছিলেন। কোনও কারণে চামড়ার নীচের চর্বি লোপ পাওয়াতে চেহারাটা এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

তাহার পড়াইবার ধরনটা ছিল একটু নূতন ধরনের। বাংলা পড়াইতেন। বাংলায় 'রচনা' একটা প্রধান বিষয়। ক্লাশে একটা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "কানাই, গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধে রচনা লিখতে বললে কি কি লিখবে বল।"

কানাই যথাসাধ্য বলিয়া গেল। কোন্ কোন্ মাসকে গ্রীষ্মকাল বলে, আকাশের কোথায় সূর্য থাকিলে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়, গ্রীষ্মকালের কি কি অসুবিধা, কোন্ দেশে গ্রীষ্মকাল কত দিন থাকে—এই সব।

"তুমি তো আসল কথাই বলছ না। গ্রীষ্মকালের উপকারিতা কি ?"

কানাই মাথা চুলকাইয়া বলিল, "গ্রীষ্মকালে স্কুলের ছুটি হয়।"

শ্রীনাথ পণ্ডিতের মুখ আরও কদর্য হইয়া গেল। তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

"তা হয় বটে, কিন্তু তাতে তো তোমাদেরই খালি সুবিধা হয়, আর কারও তো হয় না। যাতে সকলের উপকার হয় সেইটেই উপকারিতার মধ্যে ধরতে হবে। গ্রীষ্মকালে আর কি উপকারিতা আছে বল।"

একটি ছেলে বলিল, "গ্রীষ্মকালে নদীর জল, পুকুরের জল, সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। তার থেকে মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়।"

শ্রীনাথ পণ্ডিত ধমকাইয়া উঠিলেন।

"তোমার খুব দূরদৃষ্টি আছে দেখছি। বস। আসল কথাটা কেউ বলছ না কেন?"

ঘনশ্যাম মাথা চুলকাইয়া বলিল, "গ্রীষ্মকালে আম হয়।"

কথাটা শ্রীনাথ পণ্ডিত যেন লুফিয়া লইলেন।

"হ্যাঁ। এইবার আসল কথাটি বল। গ্রীষ্মকালে আম হয় কত রকম কত সুন্দর। বোম্বাই আম, ল্যাংড়া আম, কিষণভোগ, ভরত ভোগ, ক্ষীরস পাতি। কামড়ে খাও, চুষে খাও, শুধু খাও, দুধ দিয়ে খাও, ক্ষীর দিয়ে খাও—"

শ্রীনাথ পণ্ডিত বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। চেয়ারের উপর বসিয়া দুলিতেন।

"গ্রীষ্মকালে আর কি ফল হয়—"

"লিচু—"

"হ্যাঁ—লিচু, লিচু। ইয়া বড় বড় রসে ভরা লিচু। যেমন রং তেমনি খেতে—"

শ্রীনাথ পণ্ডিতের চোখ বুজিয়া যাইত। মনে হইত সত্যই বুঝি তিনি একটা লিচু মুখে পুরিয়াছেন।

"কোথাকার লিচু সবচেয়ে ভালো বলতো—"

কেহই বলিতে পারিত না।

"মজঃফরপুরের। মজঃফরপুরের লিচুর তুলনা নেই। যেমন স্বাদ তেমনি গন্ধ। সাইজ বড়, ছোট্ট আঁটি। তোমাদের পীর-বাবার পাহাড়ের সামনে যে জাম গাছ তার জাম খেয়েচ কখনও?"

একাধিক বালক উত্তর দিল, "খেয়েছি—"

"কি রকম খেতে?"

"ভালো—

"ভালো বললে কিছুই বলা হয় না। বল—তোফা। ইয়া বড় বড় গুবরে পোকার মতো চেহারা, শাঁসে ভরতি।"

এইভাবে শ্রীনাথ পণ্ডিত বিভিন্ন ঋতুর 'উপকারিতা' পড়াইতেন। বর্ষাকালের উপকারিতা কি? আম কাঁটাল বিশেষ করিয়া সিপিয়া ও শুকুল আম। শরৎকালের উপকারিতা তাল, বড় বড় তাল। তাহার পরই পূজা। পূজায় কত প্রকার সুখাদ্য খাইবার

সুযোগ আসে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতেন। শরৎকালে ইলিশ মাছেরও প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষ করিয়া ভাদ্র মাসে। এই প্রসঙ্গে পদ্মার ইলিশের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন তিনি। হেমন্তকালের উপকারিতা কি? অনেকেই জানিত না। শ্রীনাথ বলিয়া দিতেন, কমলালেবু। বড় বড় কমলালেবু বাজারে আসে তখন। শীতকালে? মাছ। বড় বড় রুই, কাতলা, মৃগেল মাছে বাজার ভরিয়া যায়। চিংড়িও অনেক। গলদা চিংড়ির বর্ণনা গদ্‌গদ ভাষায় করিতেন। বসন্তকালে? সজিনা ডাঁটা, আর কচি আমের সমারোহ। চচ্চড়ি আর কচি আমের ঝোল কত খাইবে খাও না।

ভূগোলও পড়াইতেন তিনি। কোন স্থান কিসের জন্য বিখ্যাত তাহা পড়াইতে হইত। কিন্তু তাঁহার বিবরণ পুস্তকের বিবরণের সহিত মিলিত না। বহরমপুর কিসের জন্য বিখ্যাত? সিল্কের জন্য নয়, ভালো পানতোয়ার জন্য। বর্ধমান? মহারাজার জন্য নয়, সীতাভোগ, মিহিদানার জন্য। মালদহের মটকার জন্য তাহাকে মনে করিয়া রাখিবার দরকার নাই। মটকা আরও অনেক জায়গায় হয়। মালদহ প্রণম্য আমের জন্য এবং খাজার জন্য। শান্তিপুরকে মনে রাখিতে হইবে শাড়ির জন্য নয়, সর-ভাজার জন্য। দেওঘরকে প্যাঁড়ার জন্য, বৈদ্যনাথের জন্য নয়। আমাদের দেশে শিব প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে গিজগিজ করিতেছে। এই জন্যই কাশীর আসল মাহাত্ম্য তাহার বেগুনে, পেয়ারায় এবং ল্যাংড়া আমে, বিশ্বনাথে নয়। ভাগলপুরের তসরের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু ভাগলপুরের বালুসাই আর জরদালু আমের তুলনা মেলে কি? কে বলিল লক্ষ্মৌ শহর জরির কাজের জন্য বিখ্যাত? লক্ষ্মৌ শহরের গৌরব তাহার খরমুজ, তরমুজ এবং দশেরি আম। মন্দারে মধুসূদন আছেন বটে। কিন্তু মন্দারের জল যে একবার খাইয়াছে সে কি মন্দারকে ভুলিবে কখনও? শ্রীনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টিকোণ বাস্তব-ধর্মী ছিল স্বীকার করিতেই হইবে। ধার্মিকও ছিলেন তিনি। শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম-সাধনং এই মন্ত্রেই বিশ্বাস করিতেন। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোনও ধর্মই পালন করা যায় না, আর শরীর সুস্থ রাখিবার প্রধান উপকরণ খাদ্য, সুখাদ্য। একবার মনিহারীর হাটের উপর এক সন্ন্যাসী আসিয়া বক্তৃতা দিতে ছিলেন। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা সন্ন্যাসীটির, কোটরগত চক্ষু, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। বক্তৃতায় তিনি বলিতেছিলেন—ব্রহ্মচর্যই আসল। ব্রহ্মচর্য না করিলে শরীর টিকিবে না। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীনাথ পণ্ডিত উঠিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহা জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক বাণী। কিন্তু আমি একটি সাধারণ ছোট কথা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। ব্রহ্মচর্যই করুন, অথবা লাম্পট্যই করুন, পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হইবে। না খাইলে শরীর টিকিবে না।"

শ্রীনাথ পণ্ডিত নিজে কিন্তু ভালো খাইতে পাইতেন না। স্কুলের ষোল টাকা বেতন পাইবামাত্র তাহা বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল খগেন মোক্তারের বাড়িতে। বিনিময়ে সকাল-সন্ধ্যা তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া তাঁহাদের জমিদারি সেরেস্তায় কাগজপত্র তাঁহাকে লিখিতে হইত। সেখানে খাওয়া বিশেষ সুবিধার ছিল

না। ডাল ভাত এবং একটা ভাজা এবং ক্বচিৎ কখনও একটা শাকসব্জীর তরকারি। তাঁহারা অবশ্য রোজই 'দহি' দিতেন। কিন্তু তাহাতে এত ধোঁয়া-গন্ধ যে শ্রীনাথ পণ্ডিত তাহা খাইতে পারিতেন না।

একদিন অবশ্য তিনি ভাল খাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নবাবগঞ্জের জমিদার ফুদ্‌দি সিংয়ের বাড়িতে, তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে। বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন তিনি। কলিকাতা শহর হইতে রাঁধুনী এবং ময়রা আসিয়াছিল।

মনিহারী গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং স্কুলের মাস্টার পণ্ডিতরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীনাথ পণ্ডিত সকলের সহিত মহা-উৎসাহে গেলেন সেখানে। হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন, নবাবগঞ্জ মনিহারী হইতে মাত্র দুই মাইল। কিন্তু ফিরিলেন তিনি চারিজন লোকের স্কন্ধে! আহারের পরই তাঁহার ভেদবমি শুরু হয়। তাঁহার খাওয়ার বহর দেখিয়া সকলের নাকি তাক লাগিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাঁহার জিনিসপত্রাদি লইতে আসিয়াছিল। তাঁহার মুখে জানা গেল শ্রীনাথ পণ্ডিত এককালে বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেল করিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হন। বাধ্য হইয়া তাই এই চাকুরিটি লইয়াছিলেন।

পুচ্ছা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন বোধহয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। মনিহারী গ্রামে এখন যাঁহারা বাস করিতেছেন তখন তাঁহারা কেহ ছিলেন না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কোনও ইতিহাস নাই। অত্যাচারিত নিপীড়িত লোকেরা লুপ্ত হইয়া যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কিন্তু একেবারে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় একথাও নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। মানুষের স্মৃতিতে ক্বচিৎ কখনও বাঁচিয়া থাকে তাহারা। মুখে মুখে তাহাদের কাহিনী অমর হয়। অনেক সময় সত্য রূপকথায় পরিণত হয়। কে জানে তেপান্তরের মাঠের গল্প, ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নময় মোহ নিদ্রা, সোনার কাঠি রূপার কাঠির কাহিনী, রাক্ষস-খোক্কস—রাজপুত্রের গল্প এসব সত্য ইতিহাসেরই রূপান্তর কি না।

আমি এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম আমাদের গাড়োয়ান পুচ্ছার মুখে। তাহার আকৃতি দেখিলে তাহার কথা কেহ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিবে না। কুচকুচে কালো চেহারা। রোগা, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া থাকে। গাড়ির গরু দুইটার সহিত ঝুঁকিয়া কথা বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত দেহটার ঝোঁকই সামনের দিকে হইয়া গিয়াছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল কদম-ছাঁট। নাপিত পাইলে একেবারে মুড়াইয়া কাটিয়া ফেলে। লোচন-নাপিত ছাড়া আর কাহারও নিকট সে চুল কাটাইত না।

কুৎসিত চেহারা লোচনেরও। গলায় প্রকাণ্ড গল-গণ্ড, একটা চোখ ছোট, আর একটা বড়। বেশ বড়, মনে হইত এখনই বুঝি ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু তাহার একটি প্রধান গুণ ছিল। জীবন্ত খবরের কাগজ ছিল সে। আশপাশের সমস্ত গ্রামের নিখুঁত সত্য খবর তাহার কাছে মিলিত। তাহার নিকট মাথাটি পাতিয়া দিয়া পুচ্ছা চোখ বুজিয়া চুল কাটাইত এবং গল্প শুনিত। লোচনের বাক্য বেদবাক্য ছিল তাহার কাছে। পুচ্ছার চেহারার আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহার দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে সামান্য সামান্য পিঁচুটি জমিয়া থাকিত। মনে হইত দুইটি মুক্তার পুঁতি কে লাগাইয়া দিয়াছে যেন। একদিন পুচ্ছাকে বলিয়াছিলাম, পিঁচুটি মুছিয়া ফেল। পুচ্ছা রাজী হইল না, বলিল, লোচন মুছিতে মানা করিয়াছে। বলিয়াছে, চোখের বাহিরের কোণে ওইরকম পিঁচুটি জমিলে চোখের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা হইয়া যায়। পুচ্ছা বা লোচন আফিং, গাঁজা বা কোকেন খায় না। স্বভাবতই তাহারা কল্পনা-প্রবণ। তাহারা যে একেবারেই নেশা করে না, তাহাও নয়। খৈনি খায়। পুচ্ছা বেশী কল্পনা-প্রবণ। সে যদি লিখিতে পড়িতে জানিত, কিংবা ছন্দ মিলাইতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কবি-খ্যাতি জুটিত তাহার ভাগ্যে। কিন্তু তাহার বিরাট কল্পনা সত্ত্বেও সে গাড়োয়ানই রহিয়া গেল। তাহার পিঠ-ভরা দাদ ছিল। কাঁধ হইতে কোমর পর্যন্ত। গাড়ি হাঁকাইতে হাঁকাইতে সে কাঁধ দুইটা নাড়াইত মাঝে মাঝে। তাহার পর হঠাৎ গাড়ি থামাইয়া বলিত—ভাগ্, ভাগ্ আব্। পালা, পালা এবার। বলিয়া হাতের লাঠিটি দিয়া পিঠ চুলকাইতে থাকিত। প্রথম প্রথম আমি বুঝিতে পারিতাম না, ব্যাপারটা কি। দাদের সহিত কথা কহিতেছে কেন? একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম তাহার দৃষ্টিভঙ্গী কবিজনোচিত। পিঠের দাদকে সে দাদ বলিয়াই মনে করে না। তাহার বদ্ধ ধারণা, তাহার পিঠে লাল পরী এবং নীল পরী আসিয়া নাচে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে বলিয়া পিঠে গোল গোল দাগ। ডাক্তাররা যাহাকে রিং-ওয়ার্মের রিং বলিয়া মনে করেন, পুচ্ছার মতে তাহা পরীর পায়ের দাগ। তাহাদের পায়ে নাকি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নখ আছে, সেইজন্যই তাহারা যখন নাচে তখন সমস্ত পিঠটা চুলকাইয়া ওঠে। নৃত্য উদ্দাম হইলে পুচ্ছা আর সহ্য করিতে পারে না, বলিয়া ওঠে, 'ভাগ্, ভাগ্ আব্' এবং লাঠি দিয়া পিঠ চুলকাইতে থাকে।

যে গল্পটি বলিতে যাইতেছি, এই পুচ্ছার মুখেই সেটি শুনিয়াছিলাম। খুব সম্ভবত ইহা ইতিহাসসম্মত সত্য নয়, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পুচ্ছার কোনও সন্দেহ নাই। সে যাহা বলিয়াছিল তাহার মতে তাহা খাঁটি সত্য।

অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রে গরুর গাড়ি করিয়া ফাঁসিয়া-তলার মাঠে যাইতেছিলাম। সেখানে আমাদের কিছু জমি ছিল এবং সে জমিতে মকাই বোনা হইয়াছিল। মকাই শুধু মানুষের খাদ্য নয়, শৃগালেরও খাদ্য। কচি মকাই খাইতে তাহারাও ভালবাসে। অন্তত, পুচ্ছা তাই বলে। মকাই-ক্ষেতে রাত্রে পাহারা দিবার জন্য পুচ্ছা রোজ গরুর গাড়ি চড়িয়া যাইত। একদিন আমিও তাহার সঙ্গী হইলাম।

'ফাঁসিয়া-তলা' এবং তাহার কাছে 'কাটাহা' এই দুইটি স্থানই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পূর্ণিয়ার নবাব শওকত্ জঙ্গের সহিত সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধ হইয়াছিল ওই 'কাটাহা' প্রাঙ্গণে। কাটাকাটি হইয়াছিল বলিয়া স্থানটার নাম 'কাটাহা'। কাটাহাতে একটি প্রাচীন তালগাছ ছিল, তাহার গায়ে গোলা-গুলির দাগও দেখা যাইত। এই যুদ্ধে শওকত্ জঙ্গ পরাজিত হইয়াছিলেন। পূর্ণিয়া জেলার মণি এখানে হারিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামটার নামও মনিহারী হইয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি। ফাঁসিয়া-তলায় যে অশ্বত্থগাছটি আছে সেই গাছেই শওকত্ জঙ্গের বন্দী সৈন্যদের ফাঁসি দিয়াছিলেন সিরাজদ্দৌল্লার সেনাপতি মোহনলাল। এই কারণেই স্থানটা ফাঁসিয়া-তলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ-সব ঐতিহাসিক কাণ্ড-কারখানা অনেকদিন হইল চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু পুচ্ছার মতে চুকিয়া যায় নাই। সে মেঘ-চাপা জ্যোৎস্না রাত্রে ওই অশ্বত্থগাছের ডাল হইতে মড়া ঝুলিতে দেখিয়াছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছে। যাহারা বলে ওগুলো বাদুড় তাহারা বাদুড় চেনে না। শুধু ঝোলে না, মাঝে মাঝে আর্তনাদও করে। যাহারা মনে করে উহা শৃগালদের সম্মিলিত কলরব তাহাদেরও বুদ্ধির উপর পুচ্ছার তাদৃশ আস্থা নাই।

অন্ধকারে মাঠের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতেছিল। সামনে পিছনেই বিরাট দুইদিকে মাঠ। মাঠে পড়িতেই পুচ্ছা আমাকে কথা বলিতে মানা করিয়া দিল। এই বিরাট মাঠটা সে নিঃশব্দে পার হইতে চায়। এই মাঠ দেখিয়া হঠাৎ আমার 'চামা' মাঠের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেখানে নাকি একটা প্রেতিনী মাথায় আগুনের মালসা লইয়া উদ্দাম নৃত্য করে। পুচ্ছা বলিয়াছিল একদিন আমাকে সেখানে লইয়া যাইবে। ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুচ্ছা, আমাকে চামা-মাঠে কবে নিয়ে যাবে ?"

পুচ্ছাও নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিলে, "যেদিন কাঠ আনতে টালে যাব সেইদিন নিয়ে যাব, যদি মাইজি তোমাকে যেতে দেন—"

"মাকে তুমি বোলো না। আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে চলে যাবো—।"

সহসা পুচ্ছা চাপা কণ্ঠে তর্জন করিয়া উঠিল, "চুপ !"

চুপ করিয়া গেলাম।

তাহার পর পুচ্ছা আমার কানের কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল, "সামনে দেখো। সেই যোগলালের ঘরটা দেখা যাচ্ছে—।"

সামনে চাহিয়া দেখিলাম পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার। আর কিছুই চোখে পড়িল না।

"কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো।"

"ভাল করে দেখ। চোখ দুটো বড় বড় করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকো, দেখতে পাবে।"

বিস্ফারিত নয়নে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে দেখিতে পাইলাম, এক জায়গায় অন্ধকারটা একটু গাঢ়তর। ওইটেই কি যোগলালের ঘর? পুচ্ছাকে ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। পুচ্ছাও ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "হঁ্যা। একটি কথা বোলো না। চুপ করে থাকো।"

পুচ্ছা গাড়িটাকে অনেক দূর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া গেল। বুঝিলাম, যোগলালের ঘরের কাছে সে যাইতে রাজী নয়। সেই জায়গাটা যখন পার হইয়া গেলাম তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "যোগলাল কে?"

পুচ্ছা খানিকক্ষণ কোনও উত্তরই দিলে না। মনে হইল, সে তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছে। আমি আবার প্রশ্ন করিলাম। তখন সে যাহা বলিল তাহা রূপ-কথা। অন্তত, আপনারা তাহাই মনে করিবেন।

বহুকাল আগে এই মাঠে যোগলাল বলিয়া একটি গরীব লোক বাস করিত। লোকটি গরীব, কিন্তু অনেক রকম তন্ত্র-মন্ত্র জানা ছিল তাহার। দেখিতে সুদর্শন ছিল না। কালো রং, মুখটা কুমীরের মুখের মতো। ছোট ছোট চোখ। গা-ময় লোম। কিন্তু তাহার বউটি ছিল পরমা সুন্দরী। লোকে বলিত মন্ত্রবলে সে বউকে উড়াইয়া আনিয়াছে এবং তন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গেল ছত্তর সিং। পুরা নাম ছত্রপতি সিংহ। সে ছিল এ অঞ্চলের জমিদার। যথেচ্ছাচারী জমিদার। শুধু জমিদারই ছিল না সে, সুদখোর মহাজনও ছিল। জমিজমা বন্ধক রাখিয়া চড়া সুদে টাকা ধার দিত। সুতরাং এ অঞ্চলের অনেক লোকই কেনা গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল তাহার। সকলকেই প্রায় মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিল। যোগলাল তন্ত্র-মন্ত্র লইয়া থাকিত, রোজগার করিত না। বলিত, পয়সার পিছনে ছুটিলে তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা বিঘ্নিত হয়। ফলে, কিছুদিন পরে তাহাকেও ছত্তর সিংয়ের কবলে পড়িতে হইল। কারণ, অন্ন-বস্ত্রের জন্য তাহাকে টাকা কর্জ করিতে হইত। ছত্তর সিং অবশেষে তাহার বাড়িটিও গ্রাস করিল। ঋণের পরিমাণ নাকি পাঁচশত টাকার কাছাকাছি হইয়াছিল। কিন্তু সে আর একটি প্রস্তাবও করিল যোগলালের কাছে। বলিয়া পাঠাইল, সে যদি তাহার রূপসা পত্নী সুখিয়াকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ঋণের একটি পয়সাও আর দিতে হইবে না। শুধু তাহাই নয়, তাহার বাকি জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের ভারও ছত্তর সিং লইবে।

যোগলাল বলিল, সুখিয়া যদি স্বেচ্ছায় যাইতে চায় যাক্ আমার আপত্তি নাই। সুখিয়া কিন্তু গেল না। তখন ছত্তর সিং একদিন লোকজন পাঠাইল সুখিয়াকে জোর করিয়া আনিবার জন্য। লোক-লস্কর সিপাহী শান্ত্রী আসিয়া তাহার বাড়ি ঘেরাও করিল। কিন্তু সুখিয়া ও যোগলালের নাগাল তাহারা পাইল না। তাহারা দুইজনেই ঘরে খিল দিয়া বসিয়াছিল। মন্ত্রের জোরে ঘরের খিল এমন ভাবে আঁটিয়া বসিয়াছিল যে, অনেক ধাক্কাধাক্কি অনেক গুঁতাগুঁতিতেও খুলিল না। তখন তাহারা যাহা করিল তাহা ভয়ঙ্কর। ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। সকলের ধারণা হইল, সুখিয়া ও যোগলাল পুড়িয়া মরিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিল, একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে বুঝি। কিন্তু তাহা যে হয় নাই ইহার প্রমাণ দুই বৎসর পরে পাওয়া গেল। ছত্তর সিং খুব ঘটা করিয়া যোগলালের ভিটার উপর বাড়ি বানাইয়াছিল একটি।

বাড়ি নয়, অট্টালিকা। আগাগোড়া পাকা, কাচের বড় বড় জানালা। সেই বাড়িতে সে গৃহপ্রবেশ করিল এক বাঈজি লইয়া। সেইদিন রাত্রেই লোমহর্ষক কাণ্ডটি ঘটিল। ছত্তর সিং বাঈজিকে লইয়া ঘরে খিল লাগাইয়া শুইয়া আছে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, ছাতের উপর দুইটা লাল রঙের সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, এ কি—ঘরের দেওয়ালেও বেড়াইতেছে! সাপ নয়, আগুনের শিখা! লক্‌লক্ করিয়া লক্ষ লক্ষ শিখা সারা বাড়িময় ঘুরিতেছে। কাচের জানালাগুলো লালে লাল হইয়া গেল। ছত্তর সিং বাঈজিকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। ঘরের কপাট খুলিল না। যোগলালের মন্ত্রবলে কপাট আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। পরদিন সকালে দেখা গেল অট্টালিকা নাই, ভস্মস্তূপ পড়িয়া আছে। তাহার পরই প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। ভস্মস্তূপও উড়িয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে পুচ্ছার পিতামহ একদিন দেখিতে পাইল অন্ধকারের মধ্যে যোগলালের ঘর আবার মূর্ত হইয়াছে। অন্ধকারেই উহা দেখা যায় এবং যাহার চোখ আছে সেই দেখিতে পায়।

আমি পুচ্ছাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করি নাই। দুইজনেই নীরবে গাড়িতে বসিয়াছিলাম। গাড়ির চাকা দুইটা হইতে আর্তনাদের মতো শব্দ উঠিতেছিল মাঝে মাঝে।

পুচ্ছার মৃত্যুর পর আমরা পুচ্ছার ভাগনা মাদারিকে বাহাল করিয়াছিলাম। তাহার মুখেও একদিন ছত্তর সিংয়ের গল্প শুনিয়াছি। দিবালোকে একদিন কাটাহার মাঠ দিয়া যাইতেছিলাম। মাদারি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল, এই মাঠে এককালে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা থাকিতেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার পূর্বপুরুষ?"

"না, ঠিক আমার নয়, আমার মামার পরদাদার (প্রপিতামহের) বাড়ি ছিল এখানে।"

"কার, পুচ্ছার?"

"জি। ছত্তর সিং জমিদার তাদের পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিল!"

গল্পটা মনে পড়িল তখন।

বলিলাম, "ছত্তর সিংও এখানে একটা বাড়ি বানিয়েছিল নাকি? সে বাড়িও আপনা-আপনি পুড়ে যায়?"

মাদারি বিস্মিত হইল।

বলিল, "না, সে সব তো কিছু হয়নি।"

তৃতীয় পুরুষ

কথাগুলি শুনিয়া মহেন্দ্র কিছু বলিল না। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ঈষৎ বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি, ঈষৎ ব্যয়িত আনন যাহা প্রকাশ করিল তাহাই যথেষ্ট। মহেন্দ্র মিতবাক ব্যক্তি, সহজে কথা বলে না।

তাহার পিতা যোগেন্দ্র (যোগীন) তিনদিনের ছুটি লইয়া ঘোঘা গিয়াছিল, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছে। 'বহু' (বউ) আসে নাই। শুধু তাহাই নয়, মহেন্দ্রের শালা বিগুণ ভাব-ভঙ্গীতে যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে আর আসিবেও না। সংবাদটা শুধু নিদারুণ নয়, ভয়াবহ। মহেন্দ্র তাহার একমাত্র পুত্র। শেষে কি তাহাকে নির্বংশ হইতে হইবে? মহীনের যদি একটা পুত্র (কিংবা কন্যাও) থাকিত তাহা হইলে পরিস্থিতি অন্যরূপ হইত। সেটাকে আটকাইয়া রাখিলে 'বহু' এমন ভাবে বাপের বাড়ি বসিয়া থাকিতে পারিত না। নাড়ীর টানেই তাহাকে আসিতে হইত। দুই দুইবার তাহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াওছিল, কিন্তু দুইবারই অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য ডাক্তারবাবু তাহার রক্ত পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। রক্তে দোষ আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইতেছিল, এমন সময় 'বহু' একদিন পলাইয়া গেল। তাহার পর হইতে আর আসিতেছে না। যোগীন একবার ভাগিনেয়কে আর একবার তাহার এক দূর-সম্পর্কের দাদাকে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এবার সে নিজে গেল, তাহাতেও কিছু হইল না। মহেন্দ্রর শালারা একরকম স্পষ্টই বলিয়া দিল বোনকে তাহারা পাঠাইবে না। যোগীন যদি থানা-পুলিস বা পঞ্চায়েত করিতে চায় করুক। তাহাদের যাহা বক্তব্য তাহা তাহারা সেখানেই বলিবে। কথাটা যদি খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে বলিত তাহা হইলে যোগীন সেখানে অন্নগ্রহণই করিত না। অভুক্ত চলিয়া আসিত। কিন্তু কথাটা তাহারা যখন ভাঙিল তখন যোগীন ভর-পেট খাইয়া ফেলিয়াছে। প্রচুর দই, চিঁড়া, আম এবং কলা। যোগীন আত্মসম্মানী লোক। যাহারা তাহাকে এমনভাবে অপমান করিল তাহাদের দেওয়া দই চিঁড়া আম কলা সে হজম করিবে? কখনই না। 'হরগিজ নেহি'। সে গলায় আঙুল দিয়া সমস্ত বমি করিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহাদের উঠানেই। তাহার ক্ষীণ আশা ছিল এই নাটকীয় কাণ্ডের পর তাহারা হয়তো মিটমাট করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সেদিক দিয়া তাহারা গেলই না। ঘোঘার বাজারের কাছাকাছি আসিতেই পুরাতন বন্ধু মিঠাই-লালের সহিত দেখা হইল। মিঠু ঘোঘাতেই একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়াছে আজকাল। মিঠু আসল কথাটা প্রকাশ করিল। সে বলিল, উহার (মহীনের) শালাদের বদ্ধধারণা যে দুব্‌রীর (মহীনের স্ত্রী) যে দুই-দুইবার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য মহীনই দায়ী। দুব্‌রীর রক্তে যে দোষ

পাওয়া গিয়াছে তাহাও মহীনের জন্য। মহীনের দুষ্ট রক্তই দুব্‌রির রক্তকে কলুষিত করিয়াছে। এই জন্যই সে পলাইয়া আসিয়াছে এবং এই জন্যই ছবিলাল (মহীনের আর এক শালা) দুব্‌রিকে আর পাঠাইতে চাহিতেছে না। ঘোষা হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন মহীনের রক্তও পরীক্ষা করা উচিত। খবরটা শুনিয়া যোগীনের চক্ষু চড়ক গাছ হইয়া গিয়াছে। মহীনের রক্ত খারাপ ? ইহা তো অসম্ভব ! মনিহারী গ্রামে কে না জানে যে যোগীনের বংশ নিষ্কলঙ্ক ? তাহাদের চরিত্র খারাপ হইলে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তাহারা কি তিনপুরুষ কাজ করিতে পারিত ? যোগীনের বাবা জগন্নাথ ডাক্তারবাবুর প্রিয় ভৃত্য ছিল। জগন্নাথ পূর্বে ঘোড়া 'লাদিত' অর্থাৎ একটা বেটো ঘোড়ার পিঠে নানারকম জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। একবার জগন্নাথ বর্ষার জলে আপাদমস্তক ভিজিয়া জ্বরে পড়ে। জ্বর শেষে নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইল। যমে-মানুষে লড়াই করিয়া ডাক্তারবাবু জগন্নাথকে বাঁচান। ইহার পর ডাক্তারবাবু জগন্নাথকে আর ঘোড়া লাদিতে দেন নাই। বলিয়াছিলেন, তুমি আমার বাড়িতেই থাক। তোমার ঘোড়াটাও আমার হাতায় চরিয়া বেড়াক। তুমি যতটুকু কাজ করিতে পার কর, আর যদি না পার বসিয়া থাক। ডাক্তারবাবু ঘোড়াটার জন্য তাহাকে বারোটা টাকা দিয়াছিলেন। সে যুগে এই দামই যথেষ্ট ছিল। জগন্নাথ ঘোড়াটারই তদারক করিত। তাহার সামনের পা দুইটি ছাঁদিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং সে ফড়িংয়ের মতো লাফাইয়া লাফাইয়া চরিয়া বেড়াইত। জগন্নাথ ডাক্তারবাবুর ডিসপেন্স:রির বারান্দায় বসিয়া বসিয়া কানে দেশলাইকাঠি ঢুকাইয়া ধীরে ধীরে সেটি ঘুরাইত এবং মাঝে মাঝে ঘোড়াটির দিকেও চাহিয়া দেখিত। ঘোড়া ফুল-বাগানের বেড়ার ধারে গেলে, কিংবা হাতার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলে জগন্নাথ দেশলাই-কাঠিটি কান হইতে বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত এবং গাছের একটা শুকনো ডাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিত — হেট্‌ হেট্‌ হেঁই হেঁই ।" ইহাতেই কাজ হইত। ঘোড়াটা বুঝিত যে সে স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আবার স্বস্থানে আসিয়া চরিতে আরম্ভ করিত। এইভাবে শুইয়া বসিয়া জগন্নাথের দিন কাটিতেছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে কোনও কাজের ভারও দেন নাই। কিন্তু তিনি লোক চিনিতেন এবং ইহা জানিতেন যে মানুষ বরাবর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিছুদিন পরে দেখা গেল জগন্নাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাগান পরিষ্কারে মন দিয়াছে। বাগান লইয়া কিন্তু তাহাকে বেশীদিন থাকিতে হইল না। ডাক্তারবাবুর শিশু-পুত্র বল্টুবাবুর সহিত তাহার ভাব হইয়া গেল।

বল্টুবাবু একদিন ঘোড়াটি দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, "ঘো। কাল ঘো ?"

জগন্নাথ হাসিমুখে উত্তর দিল, "খোকাবাবুর—"

"আমাল ঘো ?"

"হ্যাঁ, তোমারই।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বল্টুবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কাল ঘো ?"

"তোমার।"

"আমাল ঘো ?"

"হ্যাঁ, তোমারই তো।"

"আমাল ? আমাল ঘো !"

কথাটা যেন বল্টুবাবুর বিশ্বাসই হয় না।

"চড়বে ? এস, চড়িয়ে দিই।"

জগন্নাথ সত্য সত্যই বল্টুকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দিল। সেইদিন হইতেই শুরু হইল জগন্নাথের নূতন কাজ। সে প্রত্যহ বল্টুবাবুকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া হাতার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাক্তারবাবুকে বলিয়া একটি রঙীন 'জিন' এবং রঙীন লাগামেরও ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। ইহার পর জগন্নাথ বল্টুবাবুর খাস চাকর হইয়া গেল। রাত্রে বল্টুবাবু জগন্নাথের কাছেই শুইত। ঘুমাইয়া পড়িবার পর গভীর রাত্রে জগন্নাথ তাহাকে বাড়ির ভিতর দিয়া আসিত।

বহুবার-শ্রুত এই ঘটনা যোগীনের মনে পড়িয়া গেল। এ সব ঘটিয়াছিল প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে। তখন যোগীনের জন্মও হয় নাই। কিন্তু গল্পটা সে এতবার শুনিয়াছে যে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের চোখে যেন দেখিয়াছে সব। সে যখন বল্টুবাবুকে দেখিয়াছে তখন তাহার বয়স ত্রিশের উপর। কিন্তু কল্পনায় সে শিশু বল্টুবাবুকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।

আর একটা গল্প যোগীনের মনে পড়িয়া গেল। জগন্নাথেরই গল্প। জগন্নাথ যে কত বড় দৃঢ়-চরিত্র কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিল তাহারই কাহিনী। একবার সে দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছিল। বাহিরে বৈঠকখানায় কয়েকজন ভদ্রলোক অতিথি আসিয়াছিলেন। ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার পথে একটা পোড়ো চালা ছিল। সেই চালার বাতায় বোলতার চাক ছিল একটা। হঠাৎ সেখান হইতে কয়েকটা বোলতা উড়িয়া আসিয়া জগন্নাথের গালে, কপালে, চিবুকে কামড়াইয়া ধরিল। অন্য লোক হইলে চায়ের পেয়ালা দুইটা ফেলিয়া দিত। কিন্তু জগন্নাথ কিছুই করিল না। চায়ের পেয়ালা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার পর বাহিরে আসিয়া মুখ হইতে বোলতাগুলোকে হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ ফুলিয়া তাহার যে চেহারা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। সাতদিন কোনও কাজ করিতে পারে নাই। চোখ দুইটা একেবারে বুজিয়া গিয়াছিল। জ্বরও হইয়াছিল খুব।

একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই যোগীনের এত কথা মনে হইতেছিল। এরকম লোকের বংশে যাহার জন্ম তাহার কি চরিত্র খারাপ হইতে পারে ? মহীনের রক্তেও দোষ আছে এ কথা তাহারা বলিল কি করিয়া ? তাহাদের স্পর্ধা তো কম নয়। ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে।

কিন্তু এখন আসল যে প্রশ্নটির সমাধান অবিলম্বে প্রয়োজন সেটি হইতেছে—করা

যায় কি ! এই জটিল জালকে ছাড়ানো যায় কি করিয়া ! যোগীনের জীবনের সমস্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান এতদিন যে ব্যক্তিটি করিয়াছে তাহার নিকট যাওয়া ছাড়া উপায় কি ! মণিবাবুর কাছেই যাইতে হইবে।

মণিবাবু বল্টুবাবুর পুত্র এবং যোগীনের মনিব। আইনত ইহাই তাহাদের সম্পর্ক। আসলে কিন্তু যোগীন মণিবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সেই আসলে মালিক। পারিবারিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারে যোগীন মণিবাবুর দক্ষিণ হস্ত। কারণ আছে। মণির যখন জন্ম হয় তখন যোগীনের বয়স দশ এগারো বৎসর। জগন্নাথের একমাত্র পুত্র সে, সুতরাং মাতৃ-অঙ্ক ছাড়িয়াই সে ডাক্তারবাবুর আঙিনায় আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার পর তাহার কাজও জুটিয়া গেল। মণিবাবুকে সে দেখাশোনা করিতে লাগিল। তাহার কাজ হইল মণিবাবুকে কোলে লইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ানো। সেই মণিবাবু এখন বড় হইয়াছে বিষয়ের মালিক হইয়াছে, তাহার বউ আসিয়াছে। একটি খোকাও হইয়াছে। সবটাই যেন যোগীনের কৃতিত্ব। সুতরাং যোগীন মণিবাবুর ঠিক চাকর নয়। যোগীন বাড়ির লোক। তাহার যাবতীয় খরচ মণিই বহন করে। তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন মারা গেল, তখন শ্রাদ্ধের সমস্ত খরচ মণিই দিয়াছিল। বছর দুই পরে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে মাইজির (মণির মায়ের) জেদে। বিবাহের সমস্ত খরচ মণির। মহীনের মাকে মাইজী পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সোনার হার পরাইয়া দিয়াছিলেন তাহার গলায়। মহীনও এই বাড়ির উঠানে খেলাধূলা করিয়া মানুষ হইয়াছে। যোগীনের ইচ্ছা ছিল সে যেমন মণিকে কোলে করিয়া বড় করিয়াছে, মহীনও তেমনি মণির খোকা বাবুনকে বড় করুক। কিন্তু মণিই তাহাতে আপত্তি করিল। সে বলিল আজকাল যুগ বদলাইয়াছে, হাওয়া বদলাইয়াছে, মহীনকে লেখা পড়া শিখিতে হইবে। তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ফল যাহা হইয়াছে তাহা যোগীনের অন্তত মনোমত নয়। একটি বাবু তৈয়ারি হইয়াছে। গোঁফ কামায়। দিনরাত মচর মচর করিয়া পান চিবাইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া সিগারেটও খায় সম্ভবত। চুলের বেশ বাহার। ফুলেল তেল মাখে। প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট পরিয়া বেড়ায়। তা ছাড়া দেহে-মনে পৌরুষ বলিয়া কিছু নাই। কথা বলিতে পারে না। বকিলে ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে অবশ্য এবং মণিবাবুর সুপারিশে স্কুলের একটা মাস্টারিও জুটিয়াছে কিন্তু যোগীন এ সবে সন্তুষ্ট নয়। নিজের বউকে যে দাবাইয়া রাখিতে পারে না সে কি একটা মানুষ ? স্নান করিতে রোজ একঘণ্টা লাগে, সাবান ঘসিতেছে তো ঘষিতেছেই। টর্চ রিস্টওয়াচ এসেন্স রুমাল এই সব লইয়াই আছে।

যোগীন গোপনে একজন উকিলের পরামর্শ লইল, মহীনের আবার বিবাহ দেওয়া যায় কি না। উকিল বলিলেন, আজকাল আইন বড় কড়া। প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করা চলে না। ডিভোর্স করাও সহজ নহে। যোগীন জানিতে চাহিল ডিভোর্স না করিয়াই যদি বিবাহ দেওয়া যায়, কি হইবে ? উকিল গম্ভীরভাবে বলিলেন, আইনত সাজা হওয়ার কথা। তাহা যদি নাও হয়, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সব

সন্তানাদি হইবে তাহারা জারজ বলিয়া গণ্য হইবে। বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে না। যোগীন অবাক!

মহীনের বন্ধু শ্যামলাল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, বউ আসছে না কেন? ছেড়ে দিলে নাকি তোকে!" মহীন কোন উত্তর দেয় না। ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসে কেবল। তাহার চোখ দুইটা কেবল একটু বড় বড় হইয়া যায়। চোখেই যেন রাগ প্রকাশ পায় তার। মুখে কিন্তু কিছু বলে না।

২

অবশেষে মণিকে সব খুলিয়া বলিতে হইল।

মণি গম্ভীর লোক, সব শুনিল, কোন মন্তব্য করিল না। কিন্তু সে চুপ করিয়া বসিয়াও রহিল না। মহীনকে লইয়া ভাগলপুরে চলিয়া গেল। সেখানে এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে তাহার রক্ত দিয়া আসিল পরীক্ষা করিবার জন্য। মহীনের নিকট ভিতরের আসল খবরটিও জানিয়া লইল। তাহার পর গেল ঘোঘা।

৩

কোথা দিয়া কি হইল তাহা যোগীন বুঝিতে পারিল না। সে সবিস্ময়ে দেখিল মণি 'বহু'কে লইয়া আসিয়াছে এবং 'বহু'র সঙ্গে আসিয়াছে একটি 'রেডিও'। 'রেডিও'র জন্যই নাকি 'বহু' পলাইয়াছিল। ঘোঘায় তাহাদের বাড়িতে রেডিও আছে যোগীনের মনে পড়িল। নগদ সাড়ে চারশত টাকা ব্যয় করিয়া মণি 'রেডিও'টি 'বহু'কে উপহার দিয়াছে।

৪

দিন তিনেক পরে শ্যামলাল মহীনকে বলিল, "যাক, তোর বউ এসে পড়ল তাহলে। কি হয়েছিলো বলতো?" মহীন হিন্দীতে যাহা উত্তর দিল, তাহা অদ্ভুত। বলিল, "হাম্‌রা বিল্লী, হাম্‌কো বোলে গা মেঁও?" ইহার অর্থ শ্যামলাল ঠিক বুঝিতে পারিল না। আমরাও পারি নাই।

৫

আরও দিন চারেক পরে ভাগলপুরের ডাক্তারেরও চিঠি আসিল। মহীনের রক্তেও দোষ আছে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিল মণি।

যোগীন তো অবাক।

রামু ঠাকুর

মনিহারীঘাটের প্রায় ক্রোশখানেক পশ্চিমে খেয়াঘাট। মনিহারী ঘাট হইতে যে জাহাজ ছাড়ে তাহা একেবারে সক্রিগলির ঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। যাহাদের সক্রিগলি যাওয়া দরকার, কিংবা সক্রিগলিতে ট্রেন ধরিয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন তাঁহারাই সাধারণত জাহাজে যান। সক্রিগলিতে ঘাট-ট্রেন ধরিয়া সাহেবগঞ্জ জংশনে যাওয়া যায় এবং সেখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র। জাহাজ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মনিহারীতে একটি খেয়াঘাট আছে গ্রামবাসীদের দৈনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। এ পারের অনেকের জমি গঙ্গার ঠিক ওপারে আছে, তাহারা প্রত্যহ সেখানে কাজ করিতে যায়। অনেকে আবার চর পার হইয়া পায়ে হাঁটিয়া সোজা-পথে সাহেবগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হয় বাজার করিবার জন্য। ইহাতে তাহাদের ভাড়া কম লাগে, সময়েরও সংক্ষেপ হয়। ভোরে বাহির হইলে সন্ধ্যা নাগাদ তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারে। মালপত্র বহিয়া আনিবার জন্য অনেকে সঙ্গে ঘোড়াও লইয়া যায়। সুতরাং জাহাজে যাওয়া অপেক্ষা নৌকায় যাওয়াই অনেকের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। খেয়াঘাটের এপারেও বালির চর, ওপারেও তাই। বালির চরের উপরই পায়ে-হাঁটা পথ হইয়া গিয়াছে একটা। গঙ্গার জল যখন বাড়ে তখন সে পথ লুপ্ত হইয়া যায়, নূতন পথ সৃষ্ট হয় আবার।

ওপারে খেয়াঘাটে এই পথের ধারেই রামু ঠাকুরের দোকান। তাহার গলায় একগাছা ময়লা পৈতা আছে, সুতরাং মনে হয় সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয়ও দেয় সে। কিন্তু সে বাঙ্গালী, কি বিহারী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দুইটি ভাষাই অনর্গল বলিতে পারে। যখন বাংলা বলে তখন তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন 'ঠেট্' হিন্দীতে, বা 'ছেকাছেনি' ভাষায় সে কথা কহিয়া ওঠে তখন তাহাকে বিহারী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা শক্ত। রামু ঠাকুরের ঠিক পরিচয় কেহ জানে না। কাহাকেও নিজের কথা সে বলে নাই, বলিতে চায় না। তাহার একমাত্র পরিচয়, সে 'রামু ঠাকুর'। গঙ্গার ওই ধূধূ চরে নিজের ছোট দোকান ঘরটিতে সে একা বাস করে। বাহিরের জগতের সহিত তাহার দুই বার মাত্র দেখা হয়। যখন খেয়া পারাপার করে তখন। অনেক যাত্রী তাহার দোকানে তখন যায়। রামু ঠাকুরের দোকানটি খাবারেরই দোকান। সাধারণ খাবারই রাখে সে। চিঁড়া, মুড়ি, রামদানার লাড্ডু, ছাতু, গুড়, নুন, লঙ্কা। গুড়ে ঈষৎ বৈচিত্র্য আছে, ঝোলা গুড় আর ঢেলা গুড়।

দইও মাঝে মাঝে রাখে। দিয়া হইতে লছমনিয়া গোয়ালিনী মধ্যে মধ্যে আসিয়া দই দিয়া যায়। ক্রোশ দুই দূরে চরের মধ্যে তাহাদের বাথান আছে। প্রায় শতখানেক মহিষ আছে সেখানে। লছমনিয়ার বাবা শিউগোবিন গোয়ালা সেই বাথানের মালিক। সেখানে যে দই হয় তাহার অধিকাংশই চলিয়া যায় সাহেবগঞ্জের বাজারে। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত হইলে লছমনিয়া তাহা রামু ঠাকুরকে দিয়া যায়। নগদ দাম চায় না, বলে, 'বেচি

কে দিহ'—অর্থাৎ বেচে দাম দিও। লছমনিয়া আসে হঠাৎ এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো! কবে আসিবে কিছুই ঠিক থাকে না, হঠাৎ একদিন আসিয়া পড়ে। বড় ভালো লাগে রামু ঠাকুরের। যেদিন সে আসে রামু ঠাকুর অনেক আগে বুঝিতে পারে। দূর চরের দিগন্তে তাহার লাল শাড়িপরা মূর্তিটি দেখা যায়। আরও কাছে যখন আসে তখন দেখা যায় মাথায় ঝুড়িটি। ঝুড়িতে শুধু দুধের কেঁড়ে এবং দইয়ের মালসাই থাকে না, তাহার কাপড়-জামাও থাকে। তেলও থাকে এক শিশি, নারিয়েল তেল, নারিকেলের তেল। বাম হাতে মাথার ঝুড়িটি ধরিয়া ডান হাত দুলাইতে দুলাইতে আসে। আর একটু কাছে আসিলে তাহার হাতের 'মেঠিয়াও' (বালা) দেখা যায়। আসল রূপার, রোদ লাগিয়া চকচক করে। মেঠিয়ার ইতিহাস রামু ঠাকুর শুনিয়াছে। তাহার স্বামী বিক্রম তাহাকে লুকাইয়া কিনিয়া দিয়াছিল নগদ পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দিন লুকানো থাকে নাই, থাকা সম্ভবও নয়,—ইহা লইয়া তাহার শাশের (শাশুড়ী) কি রাগ, ভৈসুরের (ভাসুরের) কি বকাবকি। লছমনিয়ার শুধু 'মেঠিয়া'ই নাই, পৈঁছি, হাঁসুলি, নাকছাবি, মলও আছে। এ সব সে অবশ্য পাইয়াছিল বিবাহের সময়। যখন আসে তখন বক্-বক্ করিয়া অনেক গল্প করে লছমনিয়া। অধিকাংশ গল্পই শ্বশুর বাড়ির গল্প। তাহার এখনও 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হয় নাই। শ্বশুর বাড়ির লোক বার বার খবর পাঠাইতেছে, কিন্তু বাবুজি এখন তাহাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইতে চাহিতেছে না। লছমনিয়ার আশঙ্কা শেষে এই লইয়া একটা মারপিট না হয়। শ্বশুর, ভৈসুর দুইজনেই দাঙ্গাবাজ লোক। ক্ষেতের সীমানা লইয়া গাঙ্গোতাদের সহিত হরদম লাঠিবাজি চলিতেছে। লছমনিয়া প্রথমেই আসিয়া হাঁক দেয়—'চাচা, ল, উতারো'—কাকা, নাও, নামাও এটা। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি আসিয়া মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া দেয়। তাহার পর শাড়ির আঁচল দিয়া মাথার ঘামটা মুছিয়া ফেলে সে। মুছিয়া বসিয়া পড়ে প্রায় হাঁটু অবধি শাড়িটা তুলিয়া। বেশ বাহারে শাড়ি পরিয়াই প্রতিবার আসে। লাল রংই বেশী পছন্দ, লালের উপর হলুদ রঙের ফুলকাটা ছাপা শাড়ি। বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে, মাথার কাপড় খসিয়া পড়ে, গঙ্গার হাওয়ায় কানের পাশের হাল্কা চুলগুলি উড়িতে থাকে। রামু ঠাকুর তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া মালসা সুদ্ধ দইটা ওজন করিতে বসে। যাহা ওজন হয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে তাহা। কিন্তু লছমনিয়া শুনিয়াও শোনে না, গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফাইয়া ওঠে—যেন কি একটা দরকারী কথা মনে পড়িয়া যায়। টুকরি হইতে শাড়ি, গামছা, জামা এবং তেলের শিশি বাহির করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া রামু ঠাকুরের দিকে চাহিয়া হাসে একবার, তারপর দূরের ঝাউ-ঝোপের দিকে চলিয়া যায়। ওখানে স্নানের ঘাট আছে একটা—এবং সবচেয়ে সুবিধা কয়েকটা ঝাউয়ের ঝোপ ঘাটটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। ফেরে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। কাচা কাপড়-জামা মাথায় করিয়া লইয়া আসে। লছমনিয়া সব জিনিসই মাথায় করিয়া লইতে ভালবাসে। আসিয়াই দোকানের সামনে বসিয়া হুকুম

করে—'দ', খানা দ। রামু ঠাকুর চারটি রামদানার লাড্ডু বাহির করিয়া আনে একটা শালপাতার ঠোঙ্গায়। তাহার পর কাঁসার একটি ছোট ঘটিতে জল আনিয়া রাখে। লছমনিয়া কোনও কথা বলে না, নিবিষ্ট চিত্তে খায়। যখন খায় তখন রামু ঠাকুর একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার গালে কানের পাশে ছোট একটি নীল শিরা আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। গৌর বর্ণের পটভূমিকায় সুন্দর দেখায়। ওই নীল শিরাটি লছমনিয়ার মুখের বৈশিষ্ট্য। খুব কম মেয়ের মুখে দেখা যায়। রামদানার লাড্ডু চারটি শেষ করিয়া সে আলগোছে খানিকটা জল খাইয়া ফেলে। তাহার পর খানিকটা জল লইয়া 'কুল্লা' (কুলকুচু) করে। ফের আবার খানিকটা জল আলগোছে খায়। এটাও লছমনিয়ার বৈশিষ্ট্য। জল খাইতে খাইতে মাঝখানে একবার 'কুল্লা' করিয়া লয়। সব শেষ করিয়া লছমনিয়া বলে,—'চলি অব'—এবার চলি। টুকরি মাথায় লইয়া চলিয়া যায়। সোজা চলিয়া যায়, একবার পিছু ফিরিয়া তাকায়ও না। যতক্ষণ দেখা যায় রামু ঠাকুর দেখে। ভাবে, আবার কবে আসিবে কে জানে। বাথানে দই বেশী না হইলে তো আর আমাকে মনে পড়িবে না। রামু ঠাকুরের নিঃসঙ্গ জীবনে লছমনিয়া একটা প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু একমাত্র নয়। অন্য আকর্ষণও আছে কয়েকটি, কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, তাহার দোকানে খাবারও খায় না। একটি সাপ গঙ্গা সাঁতরাইয়া ওপার হইতে এপারে আসে। মধ্যে মধ্যে এপারের চরেও তাহাকে দেখা যায়, বালির ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। সম্ভবত শিকারের সন্ধানে আসে। দিয়ার চরে ছোট ছোট পাখী অনেক। সাপটা যখন এপারে আসে রামু ঠাকুর কখনও তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে নাই। অনুসরণ করিয়াছে কি করে দেখিবার জন্য। কিন্তু একদিনও দেখিতে পায় নাই। সাপ কিছু দূর গিয়াই মরীচিকার মতো বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় আকর্ষণ প্রকাণ্ড একটা ঘড়িয়াল। চারদিক যখন নির্জন নিস্তব্ধ হইয়া যায় তখন ঘড়িয়ালটা তাহার নাকের অগ্রভাগটুকু জলের উপর বাহির করিয়া ভাসিতে থাকে। তাহার পর প্রায় তাহার সমস্ত দেহটাই ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে জলের উপর। প্রখর রৌদ্রালোকে গঙ্গার তরঙ্গে ধীরে ধীরে দোল খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে ডুবিয়া যায়। ঘড়িয়ালের আবির্ভাব ও তিরোভাব রামু ঠাকুরের প্রাত্যহিক জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলিয়া পড়িলেই রামু ঠাকুর গঙ্গার দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দৈবাৎ কোনদিন ঘড়িয়ালটার দেখা না পাইলে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার তৃতীয় আকর্ষণ কতকগুলো পাখী। দুই জাতের দুই রকম মাছরাঙ্গা পাখী রোজ আসে। একটার গায়ে অনেক রকম রং—নীলেরই প্রাধান্য বেশী। আর একটা সাদার উপরে কালোর মিহি কাজ। দুইটাই চমৎকার। ঝাউগাছের উপর বসিয়া থাকে গঙ্গার উপর একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া। তাহার পর ঝপ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সাদায়-কালোয় পাখীটা উড়িয়া উড়িয়াও বেড়ায়। মাঝ গঙ্গার উপর শূন্যে মাঝে মাঝে স্থির হইয়া থামিয়া যায়। পাখা দুটি তখন নাড়িতে থাকে কেবল, তাহার পর সহসা

জলে ঝাঁপাইয়া আবার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। কখনও মাছ পায় কখনও পায় না। কিন্তু ক্লান্তি নাই। রামু ঠাকুর নিজের দোকানের কাছে গঙ্গার জলে দুই-তিনটা ছোট ছোট ডাল, একটা শুকনো বাঁশ পুঁতিয়া দিয়াছিল, যদি উহারা তাহার উপর আসিয়া বসে। কিন্তু একদিনও বসে নাই। তাহার কাছে কেহ বসিতে চায় না। গাছের ডালগুলো আর বাঁশটাও মা গঙ্গা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। মাছরাঙ্গারাই যদি না বসিল ও আবর্জনা থাকা না থাকা সমান। মাছরাঙ্গা ছাড়া আর এক রকম পাখী গঙ্গার উপরে ওড়ে। সর্বদা উড়িয়া বেড়ায়। এপার-ওপার করে না, গঙ্গার স্রোত ধরিয়া ওড়ে। একবার এদিকে যায় আবার ওদিকে। মাছরাঙ্গার মতো কোথাও কখনও স্থির হইয়া উঁচু জায়গায় বসে না। বসে দূরে চড়ায় বালির উপর। অনেক সময় দল বাঁধিয়া। রামু ঠাকুর একবার তাহাদের কাছে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কাছাকাছি গেলেই উড়িয়া যায় এবং ক্রমাগত উড়িতে থাকে। সহজ সাবলীল কি সুন্দর ওড়ার ভঙ্গী। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দেখিতেও সুন্দর, সারা দেহটা ঈষৎ ধূসর সাদা, মাথার উপরে কালো টুপির মতো, ঠোঁট হলদে রঙের। পা দুইটি লাল। ল্যাজটা ফিঙে পাখীর ল্যাজের মতো দ্বিধাবিভক্ত। লোকে বলে গাংচিল। কিন্তু চিলের মতো দেখিতে নয়। এই চরে রামু ঠাকুরকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয় আর একদল পাখী। কয়েকটা কাক, শালিক, ফিঙে আর নীলকণ্ঠ। এরা সব ওপার হইতে আসে আর সারাদিন বালির চরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। রামু ঠাকুর কাক আর শালিকগুলোর সহিত ভাব করিয়াছে। মুড়ি ছড়াইয়া দিলে উহারা আসে, কিন্তু ফিঙে আর নীলকণ্ঠ আসে না।

প্রতিদিন দুইবার খেয়া-পারাপার হয়, তখন নির্জন চর খানিকক্ষণের জন্য মুখরিত চঞ্চল হইয়া ওঠে, তাহার পর সব চুপচাপ। যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই মুখচেনা আছে, কিন্তু প্রায় কাহারও সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা নাই। যাত্রীদের নিকট যে লোকটি পারানি আদায় করে, সেই লোকটিই মাঝি। যাত্রীদের সহিত সে-ও যাতায়াত করে। এপারে তাহার নিজের বাড়ি, ওপারে শ্বশুর বাড়ি। ইহারা কেহ কেহ রামু ঠাকুরের দোকানে খায়। ইহার বেশী আর সম্পর্ক নাই।

খেয়া-পর্ব শেষ হইয়া গেলে রামু ঠাকুর কিছুক্ষণ দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর সে যাহা করে তাহা অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয় সে। তাহার পর গঙ্গা হইতে তুলিয়া তুলিয়া সর্বাঙ্গে গঙ্গামাটি মাখে, বিশেষ করিয়া দুই উরুর উপর ঘষিয়া ঘষিয়া মাখে। তাহার পর আসিয়া রোদে বসিয়া থাকে, আর সূর্য প্রণাম করে। গায়ের সমস্ত মাটি যখন শুকাইয়া যায় তখন গঙ্গায় নামিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করে। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। ইহার জন্যই সে নির্জন চরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

তাহার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ একদিন একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল। চর ভাঙিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া হাজির হইল তাহার দোকানের সামনে।

তাহার কপালে প্রকাণ্ড সিন্দুরবিন্দু, হস্তে ত্রিশূল। রামু ঠাকুর একটু ভড়কাইয়া গেল। সন্ন্যাসী হিন্দীতে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা সেগুলির বাংলা করিয়া দিলাম।

"ওরে, নৌকো কখন ছাড়বে?"

"সন্ধ্যের পর।"

"সমস্ত দিন এখানে বসে থাকতে হবে?"

"তা ছাড়া উপায় কি—"

"আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে?"

"আছে—"

"তুই তো দেখছি ভক্ত লোক। সন্ন্যাসীকে ভালো করে খাওয়া তাহলে—"

"কি খাবেন বলুন—"

"ভাল করে ময়ান দিয়ে লুচি কর। মুখরোচক করে আলুর দমও কর খানিকটা। তারপর হয় হালুয়া, না হয় গোটাকতক রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করা যাবে।"

"আমি ওসব দিতে পারব না।"

"তাহলে সরু চিঁড়ে, ভাল দই, কিছু কলা আর গোটাকয়েক প্যাঁড়া দে। ওতেই চালিয়ে নেব কোন রকমে—"

"তা-ও নেই ঠাকুর। আমার দোকান খুব ছোট।"

"কি আছে তোর দোকানে?"

"কিছু শুকনো মুড়ি আছে। গুড়ও দিতে পারি একটু—"

"নেই গুড়-মুড়ি নেহি খায়েঙ্গে।"

ক্রোধ-ভরে সাধু চলিয়া গেল। চর ভাঙিয়া দূরের ঝাউ-বনের ওপারে অন্তর্ধান করিল। ক্ষুধার্ত সাধু এভাবে রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাওয়াতে রামু ঠাকুর মনে মনে ভয় পাইল একটু। কিন্তু উপায়ই বা কি। সাধু যাহা চাহিতেছে তাহা যে তাহার নিকট নাই। রামুর স্নানাহার হইয়া গিয়াছিল, সাধু না আসিলে একটু ঘুমাইয়া লইত, কিন্তু সাধু আসাতে ঘুমের আমেজ কাটিয়া গেল। গঙ্গার দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিল সে একাকী। ঘড়িয়ালের নাকটা ধীরে ধীরে দেখা গেল। দুইটি গাংচিল স্বচ্ছন্দ লীলায় গঙ্গার উপর উড়িতেছিল, স্রোতের জল ছুঁইয়া ছুঁইয়া চলিতেছে যেন। ঘড়িয়ালটার কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দুই জনেই একটু উপরে উড়িয়া গেল। রামু ঠাকুরের মনে পড়িল তাহার মেয়েকে। রুণু এখন কত বড় হইয়াছে? লছমনিয়ার মতোই হইবে। তাহাকে এখনও মনে রাখিয়াছে কি? কে জানে। গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া চরের বালিও উড়িতে শুরু করিল। একটু পরেই চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া যাইবে। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল সে।

"এ-দোকানদার, এ-দোকানদার, উঠো—"

রামু ঠাকুর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর।

"দেও, খানে দেও—"

"আমার কাছে তো বাবা, মুড়ি ছাড়া কিছু নেই—"

"ভুখ লাগলে সে সাধু মুড়ি ভি খায়। দেও—"

গঙ্গাজলে ভিজাইয়া ঢেলা গুড়-সহযোগে সাধু প্রচুর মুড়ি খাইল। বস্তুত রামু ঠাকুরের দোকানের যত মুড়ি সব সে খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল—"তেরা উপর খুব প্রসন্ন হুয়া। এক পঞ্চমুখী শংখ তে কা দেঙ্গে। কন্যাকুমারী সে লায়া হ্যায়। দাম লাগে কা পাঁচ রূপেয়া। মগর শ রূপেয়া খরচ করে নে সে ভি ইহ নেহি মিলে গা। হুঁ—"

গেরুয়া ঝোলা হইতে বাদামী রঙের শাঁখ বাহির করিল একটি। শাঁখটির সর্বাঙ্গে গাঁট-গাঁট। ইহা ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য রামু ঠাকুরের চোখে পড়িল না।

"সাধুবাবা, পাঁচ টাকা তো আমি দিতে পারব না। অত টাকা আমার নেই, আমি গরীব মানুষ।"

"কেতনা দে সকে গা—"

"আট আনার বেশী পারব না।"

"আচ্ছা লে লে। তু ভক্ত হ্যায়। লে লে—"

"এ শাঁখের উপকারিতা কি সাধুবাবা?"

"ঘর মে রহ্‌নে সে মঙ্গল হোগা। বিমারি হোনে সে বিমারি ছুট যায়ে গা—"

"অসুখও সেরে যাবে?"

"জরুর—"

একটু পরেই খেয়া-ঘাটের মাঝি আসিল। অন্যান্য কয়েকটি যাত্রী, কয়েকটি ছাগল এবং দুইটি মালবাহী ঘোড়াও জুটিল। তাহাদের সহিত সন্ন্যাসী ঠাকুর নৌকায় চড়িয়া ওপারে চলিয়া গেলেন। রামু ঠাকুর একা পশ্চিম দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার মেঘে তখনও রং লাগিয়া আছে, শুকতারাটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে রামু ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া যাহা করিতে লাগিল তাহা অদ্ভুত। পঞ্চমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর ঘষিতে লাগিল। দুই উরুতেই সাদা সাদা গোল গোল দাগে ভরতি। চিমটি কাটিলে লাগে না। কুষ্ঠ হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আসিতে দিও না। তোমার মেয়েকে কোলে করিও না। এ রোগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই সহজে আক্রান্ত হয়। অনেকদিন ঔষধ খাইয়াছিল, কিছু হয় নাই। একজন সাধু উপদেশ দিয়াছিলেন প্রত্যহ গায়ে গঙ্গামাটি মাখিয়া সূর্য পূজা করিবে, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিবে। নিষ্ঠাভরে যদি করিতে

পার, সারিয়া যাইবে কুষ্ঠ। দশ বৎসর পূর্বে রামু ঠাকুর বাড়ি হইতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন চরের খেয়াঘাটে বাসা বাঁধিয়াছে। সাধুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কই? উপকার হইয়াছে কি?

পঞ্চমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর প্রাণপণে ঘষিতে লাগিল। ছড়িয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল, তবু ছাড়িল না। ঘষিতেই লাগিল।

হাঁস

সুরেনের বয়স বছর কুড়ি। ভালো ছেলে। ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে ভালো ভাবে বি-এ পাস করেছে। সুন্দর, বলিষ্ঠ গঠন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় সেকালের ক্ষত্রিয় যেন একালে এসে জন্মেছে। নির্ভীক মুখের ভাব, উৎসুক চোখের দৃষ্টি, সমস্ত চেহারায় পবিত্রতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার জীবনের একমাত্র সাধ সে মিলিটারিতে যাবে। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। স্বদেশের স্বাধীনতার মান রক্ষা করবে সে তার ক্ষাত্রবীর্য দিয়ে। সেইভাবে তৈরি করেছে নিজের দেহকে, মনকে। সকালে উঠেই ডাম্বেল মুগুর ভাঁজে, বিকেলে খেলাধূলা করে। পড়ে সেই সব বই—যাতে বীরত্বের কথা আছে। আইভানহো, কেনিল্‌ওয়ার্থ, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, আনন্দমঠ এই ধরনের বই পড়তে ভাল লাগে খুব।

সুরেনের বাবা একজন বড় অধ্যাপক। তিনি বলেছিলেন সুরেন ভালো ভাবে বি-এ পাস করলে তাকে বন্দুক কিনে দেবেন একটা। বন্দুক রাখতে হলে পাস চাই। পাসের ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছিলেন একজন বড় পুলিস অফিসার মিস্টার ঘোষাল, সুরেনের পিতৃবন্ধু। হাতে বন্দুক না থাকলে কি সৈনিক হওয়া যায়?

সুরেন অবশ্য এর-তার বন্দুক নিয়ে হাতটা আগেই ঠিক করেছিল। হাতের লক্ষ্য ভালোই হয়েছিল তার। কিন্তু পরের বন্দুক তো সর্বদা পাওয়া যায় না। নিজের সুবিধামতও পাওয়া যায় না। তাই অনভ্যাসের জন্য হাতের লক্ষ্য মাঝে মাঝে বেঠিক হয়ে পড়ে। সে আশায় আশায় ছিল কবে নিজের বন্দুকটি পাবে। বন্দুক পাবে বলেই সে ভালো করে পড়াশোনাও করেছিল। কারণ সে জানত বাবার কথার নড়চড় হয় না। সে যদি অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করতে পারে, বাবা নিশ্চয়ই তাকে বন্দুক কিনে দেবেন।

তারপর সে মিলিটারিতে ঢোকবার জন্যে দরখাস্ত করে দেবে। তখন আশা করি মিলিটারি স্কুল থেকেই সে প্র্যাকটিস করবার জন্যে বন্দুক পাবে একটা। কিন্তু তবু নিজের আলাদা বন্দুক থাকায় আলাদা গৌরব।

বাবা তাঁর কথা রাখলেন। কিনে দিলেন তাকে একটা বন্দুক। রাইফেল নয়, সাধারণ বন্দুক। রাইফেল রাখবার অনুমতি কর্তৃপক্ষ দিলেন না।

॥ দুই ॥

বন্দুক যেদিন পেল সে, সেদিন তার আনন্দের আর সীমা রইল না। ঘুমই হল না রাত্রে। বন্দুকের প্রথম শিকার কি হবে! তার ইচ্ছা বাঘ, ভালুক বা ওই জাতীয় কোন হিংস্র জানোয়ার শিকার করা। কিন্তু সে সব তো কলকাতার আশেপাশে পাওয়া যাবে না। তারা যে সব জঙ্গলে থাকে, সে সব জঙ্গলে বাবা-মা, বিশেষ করে মা যেতে দেবেন কি? মা তাকে সর্বদা আটকে আটকে আগলে আগলে বেড়ান এটা সে পছন্দ করে না। হয়তো মায়ের জন্যেই শেষ পর্যন্ত তার মিলিটারিতে যাওয়া হবে না।

পরদিন সকালেই বন্ধু সমর এসে হাজির।

"তুই বন্দুক কিনেছিস শুনলুম?"

"হ্যাঁ।"

"চল তাহলে বাদাতে যাওয়া যাক। ওখানে খুব হাঁস পড়ছে আজকাল।"

"হাঁস?"

"হ্যাঁ রে, খুব বড় বড় হাঁস। গীজ—"

"গীজ কি রকম হাঁস?"

"বেশ বড় সাদা হাঁস, মাথায় কালো দাগ আছে।"

"বেশ—চল—"

বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুই বন্ধু।

বাদা প্রকাণ্ড জায়গা। অনেক ঘুরতে হল তাদের। বড় হাঁসের কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না। ছোট ছোট পাখি অনেক, তাদের সুন্দর চেহারা, অদ্ভুত রং। তাদের মারতে ইচ্ছে হল না। ছোট ছোট হাঁস ছিল এক জায়গায়। অনেকগুলো ছিল। "ওই-গুলোকেই মার"—সমর ফিস ফিস করে বললে। ফিস ফিস করে বলার উদ্দেশ্য তারা খুব কাছেই ছিল। জোরে কথা বললে হয়তো উড়ে যেত। সুরেন কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, মনে মনে কিসের প্রতীক্ষা করছিল যেন সে। সে যেন ভাবছিল—স্পষ্ট করে যদিও কিছুই ভাবছিল না—কিন্তু আভাসে তার মনে হচ্ছিল অসম্ভব বোধ হয় সম্ভব হবে, সাদা হাঁস পাওয়া যাবে। অকারণ একটা গুলি করে এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিতে তার কেমন যেন ইচ্ছে হল না। তার যেন মনে হল বন্দুক গর্জন করে উঠলেই সব যেন পণ্ড হয়ে যাবে। বলল, "না, ওগুলোকে মারব না। চল আরও ঘোরা যাক। ওই দিকটায় চল যাই—"

ডানায় অদ্ভুত শব্দ করে উড়ে গেল ছোট হাঁসের দল। সুরেনের মনে হল সাদা হাঁসকে খবর দিতে গেল বুঝি তারা।

আরও অনেক ঘুরতে হল। তারপর সন্ধ্যার একটু আগে অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা।

সাদা হাঁস পাওয়া গেল। কিন্তু কি অদ্ভুত, সুরেনের যেন মনে হল নীল সরোবরের মাঝখানে বসে আছে হাঁসটা। বাদার ঝোপ-জঙ্গল যেন কিছু নেই। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যেন মন্ত্রবলে। নীল সরোবর মূর্ত হয়েছে একটি আর তার মাঝখানে বসে আছে সাদা হাঁস। ধবধবে সাদা। তুষারশুভ্র।

সাধারণত হাঁসেরা দল বেঁধে থাকে। এ কিন্তু একা রয়েছে। আর একটা জিনিসও একটু অন্য রকম মনে হল। নীল সরোবরের মাঝখানে এ বেশ নিশ্চিন্তভাবে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে পিঠের পালক পরিষ্কার করছে। একটুও ভয় ডর নেই। বেশ সপ্রতিভভাবে নির্ভয়ে বসে আছে। সুরেন খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। এমন হাঁস সে আগে দেখে নি। মাথার কাছে কালো দাগ নেই তো। সব সাদা। তারপর হঠাৎ হাঁসটা সুরেনকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সুরেনের হাতে বন্দুক দেখে সে যেন বুঝতে পারল সুরেন তাকে মারতে এসেছে। বুক চিতিয়ে এগিয়ে এল আরও খানিকটা। অন্য হাঁস হলে পালাত। কিন্তু এ এগিয়ে আসছে! সুরেনের আত্মসম্মান আহত হল যেন হাঁসের এই স্পর্ধায়। স্পর্ধা ছাড়া আর কি! তার হাতে বন্দুক দেখেও এগিয়ে আসছে! ···দড়াম করে ফায়ার করে দিলে সে। হাঁসটা উড়ল না, নড়ল না, স্থির হয়ে বসে রইল। কিন্তু মরলও না। সুরেন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তার সাদা বুক থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তবু মরে নি। সে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল যখন হাঁসটা ভেসে ভেসে তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে একেবারে ডাঙার কাছে চলে এল। সমর ফিস ফিস করে বলল—ধরে ফেল্, ধরে ফেল্। এই কথা শুনে হাঁসটা জল ছেড়ে ডাঙায় উঠল এবং সুরেনের পায়ের কাছে এসে মুখ তুলে দাঁড়াল। ভাবটা, ধরবে? ধর না।

হাঁসটাকে ধরেই নিয়ে গেল তারা। পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল। খুব ভারী। সুরেন প্রথমে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার হাত ভেরে গেল। এ-হাত ও-হাত করে কিছুতে আর বইতে পারে না। সমরও বইল খানিকক্ষণ। কিন্তু তারও ওই অবস্থা। বেশীক্ষণ বইতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে পড়েছিল তারা। ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

বাড়িতে হাঁসটাকে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিল সুরেন। তাকে কাটতে মায়া হচ্ছিল তার। সমর কিন্তু নাছোড়। সে হাত পা নেড়ে সুরেনকে বোঝাতে লাগল।

"না কেটে করবি কি তুই? পুষবি? ও হাঁস কি পোষ মানবে? খাবেও না কিছু। না খেয়ে খেয়ে মরে যাবে শেষে একদিন। তার চেয়ে এখুনি সাবড়ে দেওয়া যাক। রেয়ার হাঁস। এর রোস্ট যা হবে তা চমৎকার।"

"কাটবে কে? আমি পারব না।"

"তোর কাটবার দরকার কি। আমাদের বাবুর্চী ঝকড়ু মিঞা এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ। তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি—"

তার পরদিন ঝক্সু মিঞা এল ছুরি নিয়ে। হাঁসের ঘর তালাবন্ধ ছিল। ঝক্সু এসে তালা খুলল। সুরেন চলে গেল দোতলায়। অমন সুন্দর হাঁসটাকে ঝক্সু ছিন্নভিন্ন করবে এ মর্মান্তিক দৃশ্য সে দেখতে পারবে না।

একটু পরে ঝক্সুর গলা শোনা গেল।

"বাবু, বাবু, হাঁস কোন্ ঘরে আছে? এই ঘরে তো কিচ্ছু নেই—"

সুরেন নেমে এল।

"এই ঘরেই তো ছিল—"

"কই—"

সুরেন অবাক্ হয়ে গেল। হাঁস অন্তর্ধান করেছে।

একটু পরে সুরেন আরও আশ্চর্য হয়ে গেল। তার ঘরে সরস্বতীর যে ছবিখানা টাঙানো ছিল সে ছবিতেও হাঁস নেই। হাঁসের জায়গাটা খালি।

॥ তিন ॥

সেই দিনই রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখল সুরেন। সেই হাঁসটা যেন তার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর সুরেনের খুব কাছে এসে বলল, "কই আমাকে মারতে পারলে? আমাকে মারা যায় না। আমি যে মা সরস্বতীর বাহন। মায়ের সমস্ত ভার যে আমিই বহন করি। আমি ভাষা—"

"আমার ছবিতেও তুমি ছিলে?"

"ছিলাম বইকি!"

"আর ফিরে আসবে না আমার ছবিতে?"

"আসব বইকি। তোমাকে ছেড়ে আমি কতক্ষণ থাকতে পারি? আমি যে তোমার ভাষা। তোমাকে একটু ভয় দেখাচ্ছিলুম খালি—"

পরদিন সকালে উঠে সুরেন দেখল হাঁস তার ছবিতে ফিরে এসেছে।

॥ চার ॥

এর দিনকতক পরে শিলচরের নিদারুণ খবরটা কাগজে বেরুল। মিলিটারির গুলিতে এগারোজন ভাষা-সত্যাগ্রহী প্রাণ দিয়েছে। ভাষা-সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালিয়েছে মিলিটারি? যাদের কাজ সত্য-শিব-সুন্দরকে রক্ষা করা?

সে ঠিক করে ফেলল এ মিলিটারিতে আর সে যাবে না। যদি দেশে কোনও দিন এমন মিলিটারি হয় যারা কেবল অন্যায়ের অসত্যের বিরুদ্ধে লড়বে তখন সে যাবে। এখন নয়।

সে এম-এ ক্লাশে ভরতি হয়ে গেল।

কুতুবমিনার

আমার নূতন বৈবাহিক মহাশয়ের পল্লীনিবাস গোপালবাটিতে আসিয়া আমাদের মনিহারীর বাড়ির কথা মনে পড়িতেছে। কেন জানি না বিশেষ করিয়া কুতুবুদ্দিনকেই আজ মনে পড়িল। বহুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। সে বিখ্যাত লোকও নয়, তবু তাহারই স্মরণে আজ কিছু লিখিলাম।

কুতুব আমাদের বাড়ির চাকর ঠিক ছিল না, কিন্তু প্রায়ই আমাদের বাড়িতে কাজ করিতে আসিত। ঘরামির কাজই প্রায় করিত। আমাদের বাড়ি খড়ের চালের। সেই চা'ল মেরামত করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার ডাক পড়িত। অন্য সময়ও তাহার কাজ ছিল। আমাদের চাষের জমি যখন কোপানো হইত তখনও ডাক পড়িত কুতুবের। কোড়নের কাজ করিতে সে অদ্বিতীয় ছিল। দুপুর রোদে কোদাল হাতে সে ক্রমাগত মাটি কোপাইতে পারিত। মাঝে মাঝে কোদালের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া 'কোম্মর'টা' 'সিধা' করিয়া লইত, তাহার পর আবার কোপাইতে শুরু করিত।

বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা ছিল তাহার। কুচকুচে কালো রঙ, মুখে মনু-মহেশ দাড়ি। আমার সহিত তাহার বিশেষ ভাব ছিল। কারণ আমার বাহন ছিল সে। মাঝে মাঝে সে আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া বেড়াইয়া আনিত। আমি তাহার কাঁধে বসিয়া তাহার মাথাটি ধরিয়া থাকিতাম, আমার পা দুইটি তাহার বুকের উপর দুলিত। গ্রামের বাহিরে গিয়া সে কখনও ঘোড়ার অনুকরণে ছুটিত, ঘোড়ার ডাকও ডাকিত। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করিতে করিতে একছুটে সে বারুইদের আমবাগানটা পার হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে তাহার শখ হইত জমিদারদের হাতীর নকলে গজেন্দ্রগমনে চলিতে হইবে। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া ঠিক হাতীরই নকল করিত সে। নিজে মাহুতও হইত। মাহুতের বোলও বাহির হইত তাহার মুখ হইতে। 'ধেৎ' 'বিরি' 'আগৎ' প্রভৃতি হস্তি-বোধ্য ভাষা বলিতে বলিতে গজেন্দ্রগমনে বনজঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িত সে।

একটা বদনাম ছিল তাহার। সকলে বলিত সে নাকি চোর। সিঁধেল চোরদের দলে সে নাকি চ্যাম্পিয়ন ছিল একজন।

ছিল কি না জানি না, এসব ব্যাপারে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন। এ সম্বন্ধে দুইটি ঘটনা জানি তাহাই বলিতেছি।

একবার আমাদের ঘর ছাওয়া হইতেছে, প্রায় জন কুড়ি ঘরামি কাজ করিতেছে, তাহার মধ্যে কুতুবও আছে। হঠাৎ মা আবিষ্কার করিলেন তাঁহার গলার সোনার হারটা পাওয়া যাইতেছে না। তিনি স্নানের ঘরে হার খুলিয়া স্নান করিয়াছিলেন, তাহার পর হারটা আনেন নাই। যখন মনে পড়িল গিয়া দেখেন স্নানের ঘরে হার নাই।

চতুর্দিকে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল ঘরামিদের মধ্যেই কেহ লইয়াছে। কুতুবের উপরই অনেকের বেশী সন্দেহ হইতে লাগিল।

এমন সময় হাজির হইল রামপীরিত্ সিপাহী। স্থানীয় জমিদারের বিশ্বস্ত রক্ষক, দোর্দণ্ড প্রতাপ। যাহা খুশি তাহা করিতে পারে, তাহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রামপীরিত্ বাবাকে খুব ভক্তি করিত, মাকেও। মাইজির হার চুরি গিয়াছে? তাহার নাকের নীচের গোঁফে একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। বাবাকে সে আশ্বাস দিল—বন্‌কা গিদড় ভাগে গা কি ধর! বনের শিয়াল কোথা পালাইবে। সমস্ত ঘরামিগুলিকে সে উঠানে একত্রিত করিল—তাহার পর সংক্ষেপে বলিল—মাইজির হার চুরি গিয়াছে। তোমরা লইয়াছ কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু হারটি তোমাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে। যদি না পার তাহা হইলে তোমাদের শরীরের একটি হাড়ও আস্ত রাখিব না। এই দেখ। সে তাহার তৈলপক্ক গ্যাঁট্টা গোঁট্টা বাঁশের লাঠিটি তুলিয়া দেখাইল।

কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফল হইল না। দশদিন কাটিয়া গেল, হার পাওয়া গেল না।

ইহার পর মায়ের সহিত কুতুবের একদিন দেখা হইল। মা তাহাকে বলিলেন, "বাবা, আমার শাশুড়ীর দেওয়া হারটা কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম, ওইটে দিয়ে তিনি বিয়ের সময় আমার মুখ দেখেছিলেন, কি করে যে হারিয়ে গেল!"

কুতুব তখন কিছু বলিল না। কিন্তু তার পরদিন মায়ের হারটি আনিয়া দিল। বলিল, ওই ঝোপটার ভিতর পড়িয়াছিল। সায়দ্ কোই কৌয়া তৌয়া গিরায়া হোগা। হয়তো কাকে-টাকে ফেলে দিয়েছিল!

ইহার পরদিন যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত। দেখা গেল কুতুবুদ্দিন অজ্ঞান হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। সর্বাঙ্গে কালসিটে দাগ। কে বা কাহারা যেন উহাকে প্রচুর প্রহার করিয়াছে।

ইহার পর আমাদের বাড়িতে আর একবার চুরি হইয়াছিল। এবার সিঁধ কাটিয়া চুরি। চোরেরা অনেক বাক্স তোরঙ্গ বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমরা অনেক মূল্যবান কাপড় জামা গহনা হারাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু একেবারে সর্বনাশ হইয়াছিল আমার।

পূজার সময় মামা আমাকে যে দম-দেওয়া রংচঙে টিনের মোটরটি কিনিয়া দিয়াছিলেন সেটিও একটি বাক্সের মধ্যে ছিল। চুরির দিন সাতেক পরে কুতুবের সহিত দেখা হইল। তাহাকে বলিলাম, কুতুব জানো, আমার সেই মোটরটা চুরি হয়ে গেছে।

বলিতে বলিতে আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কুতুব তখন কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার পরদিন সে আমাকে মোটরটি আনিয়া দিল। বলিল, কই, মোটর তো চুরি হয় নি। ওই ঝোপের ধারে পড়েছিল। সায়দ্ কোই কৌয়া তৌয়া গিরায়া হোগা।

এ ব্যাপার কিন্তু এখানেই মিটিল না। ওই মোটরের 'ক্লু' ধরিয়া পুলিস অবশেষে সমস্ত দলটাকেই ধরিয়া ফেলিল। পুলিসের হাতে নাকি প্রচুর মার খাইয়াছিল কুতুব।

কিন্তু ব্যাপার এখানেও শেষ হয় নাই। দিনকয়েক পরে যে সংবাদ জানা গেল

তাহা নিদারুণ। কুতুবকে কে যেন খুন করিয়া গিয়াছে। রাত্রে সে মাঠে শুইয়াছিল, কে যেন তাহার গলাটা কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। চোরের দল ঘর-ভেদী বিভীষণকে বাঁচাইয়া রাখা নিরাপদ মনে করে নাই।

গোপালবাটির শান্ত শ্যামল পরিবেশে বসিয়া বহুকাল পরে কুতুবের স্মৃতিকে ঘিরিয়া আমার মনের মধ্যে যে মিনার আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেও যদি কুতুবমিনার আখ্যা দিই তাহা হইলে কি ঐতিহাসিকেরা আপত্তি করিবেন?

বৈকুণ্ঠ বাগল

বৈকুণ্ঠ বাগল বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়। অন্তত বছর পাঁচেক বড় তো বটে। আমার বড়দাদার তিনি সহপাঠী ছিলেন। দেখিলে কিন্তু মনে হয় আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি অনেক ছোট। আমার দাঁত পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, এমন কি ভুরুও আর কালো নাই। কিন্তু বাগলদার একটি দাঁত পড়ে নাই, চুল দাড়ি ভুরু মিশকালো। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমি সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া নানা ঘাটের জল খাইয়াছি, এখনও খাইতেছি, বিপর্যস্ত হইয়া যখনই বাগলদার কাছে গিয়াছি তিনি সাহায্য করিয়াছেন। আমার জীবন-কাহিনী অনেকটা বহু-বিচিত্র ছিটের মতো। একটু তফাত আছে, ছিটের প্যাটার্ন একটা কাপড়ে এক রকমই থাকে। কিন্তু আমার জীবনে ছিটের প্যাটার্ন একরকম নয়। মনে হয় নানারকম ছিট জুড়িয়া জুড়িয়া আমার জীবনের কাহিনী-কন্থা আমার ভাগ্যদেবতা সকৌতুকে প্রস্তুত করিয়াছেন। কত রকম চাকরি আর ব্যবসা যে করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমার কথা থাক, বাগলদার কথাই বলি। বাগলদা আমাকে স্নেহ করিতেন। আমি সব সময় তাঁহার স্নেহের মর্যাদা রাখি নাই, একাধিকবার টাকা ধার লইয়া ফেরত দিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু বাগলদার স্নেহ তাহাতে নিষ্প্রভ হয় নাই।

বাগলদা সেকেলে মানুষ। বিলাসিতার ধার ধারেন না। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই। থান কাপড় পরেন। বাড়িতে খড়ম আর বাহিরে চটিজুতা ছাড়া অন্য কোন পাদুকা পছন্দই করেন না, মুখে মিশমিশে কালো গোঁফদাড়ির জঙ্গল।

আমি যখন জুতার দোকান করিয়াছিলাম তখন বাগলদাকে চটিজুতা তো দিয়াছিলামই, একজোড়া চকোলেট রঙের গোঁফওলা পাম্‌শুও গছাইয়াছিলাম। পাম্‌শুর কথা বলিতে বাগলদা বলিলেন, "জানিসই তো আমি ও-সব পরি না।"

"পরুন না একজোড়া, দেখি—"

জোর করিয়া পরাইয়া দিলাম, পায়ে ঠিক ফিট করিয়া গেল।

"এ নিয়ে আমি কি করব—অন্য খদ্দের পাচ্ছিস না?"

"না। গোঁফওলা পাম্‌শু আজকাল পছন্দ করে না কেউ। কুড়ি টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছিলাম তখন, ওর গোঁফটার কথা ভাবি নি—"

"তবে দে—"

বাগলদা পাম্‌শুজোড়া লইয়া গেলেন। কিন্তু এক দিনও সেটা পরেন নাই। মাস দুই পরে তাঁহার বাড়ি গিয়া দেখি তাকের উপর জুতা-জোড়া সযত্নে রাখা আছে। বাগলদার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই তিনি বলিলেন, "ও দুটো আমার ভারী কাজে লেগেছে।"

"কি কাজে ?"

"ও দুটোর ভিতর টুকিটাকি জিনিস রাখি। ছুঁচসুতো, ছুরি, ছোট কাঁচি, নস্যির ডিবে, দেশলাই,—চমৎকার কাজে লেগেছে আমার।"

ইহার কিছুদিন পরে একটা সেফ্‌টি রেজর কোম্পানীর এজেন্ট হইয়াছিলাম। বাগলদার সহিত দেখা হইলে বলিলাম, "বাগলদা, এবার আর আপনাকে আমার খদ্দের করতে পারব না—"

"কেন, কি করিস আজকাল ?"

"সেফটি রেজার বিক্রি করি।"

"কই, কেমন দেখি ?"

প্ল্যাস্টিকের চমৎকার বাক্সে চকচকে সেফ্‌টি রেজারটি দেখাইলাম।

"দাম কত ?"

"সাড়ে সাত টাকা।"

"আচ্ছা, দিয়ে যা একটা।"

বাগলদা সেটাকে পেপার-ওয়েট হিসাবে ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন।

ইহার পর আমি 'রেডিও'র এজেন্ট পদে বাহাল হই। একটা রেডিও বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ কিছু কমিশন থাকিত। বাগলদার কাছে গেলাম।

"বাগলদা, একটা রেডিও কিনুন না।"

"রেডিও নিয়ে কি করব ? তোমার বউদি তো বদ্ধ কালা। আমি নিজের লেখা-পড়া আর পুজোটুজো নিয়ে থাকি। ছেলেমেয়েরা কেউ এখানে থাকে না। কে রেডিও শুনবে ?"

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমি দালাল, তবু একবার চেষ্টা করিলাম।

"আপনারা যদি কেউ না কেনেন, তাহলে এ ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। অকুল পাথারে ভাসছি দাদা, পরশু দিন আবার একটা মেয়ে হয়েছে।"

"কত দাম ?"

"বেশী নয়, পাঁচ শ' পঁচাত্তর টাকা আর সেলস ট্যাক্স।"

বাগলদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, দিয়ে যাস একটা।"

রেডিও দিবার মাসখানেক পরে বাগলদার সহিত দেখা হইয়াছিল।

"কি দাদা, কেমন চলছে রেডিও?"

"ওটাতে ভারী উপকার হয়েছে ভাই। ভঁাড়ারঘরে লাগিয়ে দিয়েছি ওটা। চালিয়ে দিলে ইঁদুর আরশোলা সব পালায়। চমৎকার!"

বাগলদার স্মিত মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

হর্ষ ডাক্তার

আমার জন্মভূমি মনিহারী গ্রামে একদা হর্ষ ডাক্তার আসিয়াছিলেন। আমার বাবা মনিহারী হাঁসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। তিনি কয়েকদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করিলে হর্ষবাবু সদর হইতে আসেন বাবার অবর্তমানে হাঁসপাতালের ভার লইবার জন্য। আমি মনে করি তাঁহার পদধূলিস্পর্শে মনিহারী গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। মনিহারীর লোকেরা তাঁহাকে চেনে না। তিনি মাত্র সাতদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। অমন রিলিভিং ডাক্তার কত আসিয়াছেন গিয়াছেন, লোকের মনে কেহ দাগ কাটেন নাই। আমার মনেও হয়তো কাটিতেন না, কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার শেষজীবনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ডাক্তারি পাস করিয়া আমি যেখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিবার জন্য বসি সেখানেই হর্ষবাবুও রিটায়ার করিবার পর প্র্যাকটিস করিতে বসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই আলাপ হইল এবং কথাসূত্রে যখন বাহির হইয়া পড়িল যে আমার বাল্যকালে মনিহারী গ্রামে বাবার জায়গায় তিনি সাতদিনের জন্য কাজ করিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি এমন উচ্ছ্বসিত সাদরে আমাকে আহ্বান করিলেন যে আমি অবাক হইয়া গেলাম। তিনি একেবারে সোজা আমাকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া হাঁক দিলেন, "ওগো শুনছ, মনিহারী হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে এখানে প্র্যাকটিস করতে এসেছে। কি সুন্দর ছেলে দেখ। বস বাবা বস।"

একটি হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিলাম। একটু পরেই তাঁহার গৃহিণী একটি ডিশে দুইটি সন্দেশ ও জল আনিয়া দিলেন। স্ত্রীর মাথায় আধ-ঘোমটা, পরিধানের শাড়িটি আধময়লা।

"চা কর, চা কর, আমাকেও এক কাপ দিও বুঝলে।"

গৃহিণী মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। দেখিলাম ডাক্তারবাবুর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। দুইটি অবিবাহিতা মেয়েও কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যেই একজন আমাদের চা আনিয়া দিল।

"প্রণাম কর। এইটি আমার মেজ মেয়ে। বড়টা একটু কুনো গোছের, সাধ্যপক্ষে কারো সামনে বেরুতে চায় না। শৈলিকে পাঠিয়ে দে।"

"দিদি তরকারি কুটছে।"

মেয়েটি চলিয়া গেলে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম —"কটি ছেলেমেয়ে আপনার?"

"হয়েছিল এগারোটি! তিনটি মারা গেছে। আটটি আছে। এদেরও শরীর ভালো নয়। সব ক্রনিক্ ডিসেন্ট্রি। কি করব বলুন, চিকিৎসার ত্রুটি করি নি, কিন্তু সারতে চায় না। এরা ঠিক ঠিক ওষুধও খায় না। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে যে সব পথ্য দেওয়া উচিত তাও সব সময় জোটাতে পারি নি। সুতরাং সারছে না। সব কটারই হাড় জিরজিরে, গলার কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। কি করব বলুন।"

সন্দেশ দুটি শেষ করিয়া জলটা খাইয়া ফেলিলাম। ঘরের তৈরি গুড়ের সন্দেশ, খুব ভালো লাগিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া হাত-মুখ মুছিতেছি হর্ষবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এখানে একটা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে যাস নি? কি যে তোদের আক্কেল।"

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না না, তোয়ালের দরকার নেই।"

"আপনার দরকার নেই তা জানি, কিন্তু এদের তো একটা খেয়াল থাকা উচিত।"

একটু পরেই ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ে শৈলবালা দুই কাপ চা লইয়া কুণ্ঠিতমুখে প্রবেশ করিল। মেয়েটি সত্যিই রোগা, রং কালো, দেখিতে সুশ্রী নয়। তবে সারা দেহে আসন্ন যৌবনের একটা কমনীয়তা আছে। চা দিয়াই সে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু চায়ে একটা চুমুক দিয়া উৎসুক নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি চুমুক দিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন লাগছে চা-টা?"

"ভালোই তো—"

"মোটেই ভালো নয়, অতি রাবিশ চা। ওই স্যাণ্ডেলের দোকান থেকে কিনেছি। ওজনে কম দেয়, জিনিস অতি খারাপ, দাম বাজারের থেকে বেশী, তবু ওর দোকান থেকেই কিনি, কারণ ও বাঙালী। ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি, কোথাও চাকরি জোটে নি, পরের কাছ থেকে চেয়ে-আনা খবরের কাগজ পড়ে কাঁকড়ার মতো হাত পা নেড়ে রাজা-উজির মারে। অসংখ্য দোষ, তবু ওর দোকান থেকেই কিনি, কারণ ও বাঙালী।"

হর্ষ ডাক্তার ক্রোধভরে ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া চা-টা এমনভাবে খাইতে লাগিলেন যেন ঔষধ খাইতেছেন। তাহার পর বলিলেন, "ওর ঠিক দোষও নেই। বাজারে সব চা-ই খারাপ। আট টাকা পাউণ্ডের নীচে ভালো চা পাওয়া যায় না, কিন্তু তা কেনবার সামর্থ্য নেই।"—তাহার পর বলিলেন, "এক মহা ভুল করেছি সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়িটা কিনে। মনে হল শেষ বয়সে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা হবে। প্র্যাকটিস যদি ঠিক থাকত তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়তো সামলে যেতাম। মেয়ের বিয়ের খরচ, ছেলেদের পড়বার খরচ রোজগারই করে ফেলতাম হয়তো। কিন্তু হঠাৎ চারিদিকেই ডিপ্রেশন এসে গেল। লোকের হাতে পয়সা নেই, ডাক্তার ডাকবে কোথা থেকে। যারা ডাকছে তারা ফি দিতে পারে না, অনেক সময় ওষুধও কিনতে পারে না।"

ডাক্তারবাবুর বড় মেয়েটি একটি ডিশে করিয়া কিছু ভাজা মসলা দিয়া গেল।

তিনি ভাজা মসলা মুখে ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তার উপর এক কাল ব্যাধি শরীরে ঢুকেছে। প্র্যাকটিস করবার সামর্থ্যও কমে আসছে ক্রমশ—"

"কি ব্যাধি ?"

"রেনাল কলিক। যখন হয় তখন কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করি। মরফিন নিতে হয়।"

চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার মেয়েরাই বুঝি বড় ?"

"হ্যাঁ। সংসারের ভার নেবার মতো ছেলে কেউ তৈরি হয় নি এখনও। বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলাম, প্রথমে গোটাকতক মেয়েই হয়ে গেল। তারপর ছেলে। বড়ছেলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে।"

"একটি মেয়েরও বিয়ে দেন নি ?"

"দিতে পারি নি। ওইতো চেহারা দেখলেন। কারো পছন্দ হয় না। একজনের পছন্দ হয়েছে, সে নগদ দশ হাজার টাকা চায়। কোথা পাব বলুন। সুতরাং 'যা হবার হবে' এই সূত্রটুকুই ধরে দার্শনিক হয়ে বসে আছি।"

এইভাবেই হর্ষ ডাক্তারের সহিত সেদিন পরিচয় শুরু হইয়াছিল। তাহার পর পরিচয় ক্রমশ গাঢ়তর হইয়াছে। কলিকের ব্যথা হইলে এখন আমিই গিয়া তাঁহাকে রাত্রে মরফিন ইনজেকশন দিয়া আসি। আমি যদি তাঁহার স্বজাতি হইতাম তাহা হইলে আমিই তাঁহার বড় মেয়ে শৈলিকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ভার কিছু লাঘব করিতাম। অসবর্ণ বিবাহে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু হর্ষবাবুর ছিল। তিনি কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আমাদের স্বজাতি হতে তাহলে তোমার সঙ্গেই শৈলির বিয়েটা অনায়াসে হতে পারত। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি বদ্যি—"

আমি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম, "অসবর্ণ বিবাহ তো আজকাল প্রায়ই হয়।"

"তা জানি। কিন্তু তোমার বাবা মা বেঁচে আছেন, তাঁদের মনে কষ্ট দিতে চাই না। তাছাড়া এসব ব্যাপারে চিরাচরিত পথ ত্যাগ করতে ভয় হয়। যারা ত্যাগ করেছে তারা দেখি প্রায়ই অসুখী। অবশ্য এর থেকে কিছু প্রমাণিত হয় না। যারা অসবর্ণ বিবাহ করে নি তাদের মধ্যেও অনেকে অসুখী। কিন্তু তোমার বাবা মার মনে কষ্ট দিয়ে কিছু করতে চাই না। যে পাত্রটি দশ হাজার টাকা চাইছে, তার এখনও বিয়ে হয় নি। আবার চিঠি লিখেছি তাদের। বাড়িটা বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। আমার এক ধনী রোগী আশ্বাস দিয়েছেন। হয়ে যাবে সব—"

তখন বোধ হয় রাত্রি একটা।

হর্ষবাবুর চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল: "শিগগির চলুন, বাবু কলিকের ব্যথায় ছটফট করছেন।"

তাড়াতাড়ি গেলাম।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমার ব্যাগে মরফিনের একটা নতুন প্যাকেট আছে। তার থেকেই একটা অ্যামপুল (ampule) বার করে নাও।"

ব্যাগ খুলিয়া দেখিলাম নামজাদা এক কোম্পানীর আনকোরা নতুন একটি প্যাকেট রহিয়াছে। তাহা হইতেই একটি অ্যামপুল বাহির করিয়া ডান হাতের উপরের দিকে ডেল্‌টয়েড্‌ মাস্‌লের (deltoid muscle) উপর ইনজেকশনটি দিলাম। দিয়াই চলিয়া আসিলাম। মরফিন দিলেই উনি ঘুমাইয়া পড়েন, আশা করিলাম সেদিনও পড়িবেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আবার তাঁহার চাকর আসিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল।

"বাবুর যন্ত্রণা কমে নি। যেখানে ইনজেকশন দিয়েছেন সেখানটাও খুব ব্যথা করছে। আপনি আর একবার চলুন।"

গেলাম।

হর্ষবাবু বলিলেন, "ওহে, এ যে হিতে বিপরীত হল দেখছি। কলিক কিছু কমে নি, হাতটাও ব্যথা করছে। তুমি এ হাতে আর একটা দিয়ে দাও। ওতে মরফিনের strength বোধ হয় কম আছে।"

এত তাড়াতাড়ি উপর্যুপরি মরফিন দেওয়া অনুচিত। তাই একটু ইতস্তত করিতেছিলাম। কিন্তু হর্ষবাবু ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আরে দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, মরফিন নেওয়া অভ্যাস আছে আমার, কিছু হবে না।"

দিয়া দিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে চাকরটা আবার আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল।

"ব্যথা কিছু কমে নি, আরও বেড়েছে, আপনি শিগগির আসুন।"

গিয়া দেখিলাম ডান হাত বাঁ হাত দুইটাই বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। লালও হইয়াছে বেশ। মরফিন ইনজেকশন আগেও অনেক দিয়াছি, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। মরফিনের পথে না গিয়া এবার অন্য পথে হর্ষবাবুর চিকিৎসা করিলাম। ভগবানের দয়ায় সুফলও ফলিল। দুই হাতের ফোলাটা কিন্তু কমিল না। দুই হাতেই অ্যাবসেসের (abscess) মতো হইয়া মাংস পচিয়া বাহির হইতে লাগিল। হর্ষবাবু প্রায় মাসখানেক শয্যাগত রহিলেন এবং তাঁহার হাত দুইটি একেবারে অকর্মণ্য না হইলেও বেশ দুর্বল হইয়া পড়িল। আমি বেশ লজ্জায় পড়িয়া গেলাম। হর্ষবাবু হয়তো ভাবিতেছেন আমি ইনজেকশন দিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করি নাই তাই এই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছে। হঠাৎ একদিন আমার সন্দেহ হইল, ইনজেকশনের ঔষধের মধ্যেই কোন গোলমাল নাই তো! একটি অ্যামপুল বাহির করিয়া কেমিক্যাল একজামিনের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। উত্তর যাহা আসিল তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। অ্যামপুলে মরফিন নাই, আছে সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid)! অবিলম্বে সেই কোম্পানীর কর্তাকে চিঠি লিখিলাম। কেমিক্যাল একজামিনারের সার্টিফিকেটের নকল এবং তাঁহাদের প্যাকেটের নম্বর পাঠাইয়া দাবী করিলাম—অবিলম্বে যদি খেসারতের ব্যবস্থা না করেন আপনাদের নামে মকর্দমা করিব। কর্তা তারযোগে জানাইলেন, হর্ষবাবুকে লইয়া চলিয়া আসুন। আপনারা যাহা বলিবেন তাহাতেই আমরা রাজি হইব।

হর্ষবাবুকে বলিলাম, "চলুন, শৈলির বিয়ের টাকাটা আদায় করে আনি।"

"হ্যাঁ চল। ভগবান দয়া করেছেন।"

কোম্পানীর কর্তা আমাদের রাজ-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, "আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আপনার যে কষ্ট হয়েছে তার জন্যে আমরা বিশেষ লজ্জিত। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আপনারা খেসারত স্বরূপ যা চাইবেন তা আমরা এখুনি দিয়ে দেব। তবে একটি অনুরোধ আছে, কথাটা যেন জানাজানি না হয়ে যায়।"

আমরা পরামর্শ করিয়াই গিয়াছিলাম। হর্ষবাবু পনেরো হাজার টাকা দাবী করিলেন। ম্যানেজার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন, তাহার পর পনেরো হাজার টাকার একটি চেক লিখিয়া দিলেন।

সবিনয়ে আর একবার বলিলেন, "অনুগ্রহ করে কথাটা গোপন রাখবেন।"

আমরা আপিস হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়াছি, এমন সময় এক নাটকীয় কাণ্ড ঘটিল। 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে এক ছোকরা আমাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল এবং আমরা দাঁড়াইবামাত্রই সে হর্ষবাবুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল, "আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।"

হর্ষবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমি প্যাকার। যে প্যাকেটে মরফিনের বদলে সাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে সে প্যাকেট আমিই প্যাক করেছিলাম। আমার চাকরি গেছে। আমার একঘর ছেলেমেয়ে, বিধবা মা, বিধবা বৌদি, অপোগণ্ড ভাই, ভাগনা—আমার ওই চাকরির উপরই সবার নির্ভর। আমার চাকরি গেলে এতগুলো প্রাণী মারা যাবে। দয়া করুন আমাকে।"

ছোকরা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হর্ষ ডাক্তার বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

আবার আমরা সেই কোম্পানীর আপিসে ফিরিয়া গেলাম। পথে যাইতে যাইতে হর্ষ ডাক্তার চোখ পাকাইয়া বলিলেন—"তুমি কি কাণ্ড করেছ তা জান? আমার দুটো হাতই জখম হয়ে গেছে।"

"আমি কি করব। আমাকে যা প্যাক করতে দিয়েছে, আমি তাই প্যাক করেছি। আমার বিদ্যেই বা কি, বিশ্বাস করুন আমি জেনে কিছু করি নি। যা পেয়েছি তাই প্যাক করেছি।"

আপিসে গিয়া ডাক্তারবাবু ম্যানেজারকে চেকটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "এই গরীবের চাকরিটি খাবেন না। এইটুকুই আমি চাই। আমার যা হবার তা তো হয়েছে, গরীবের অভিশাপ আর কুড়োতে চাই না।"

আপিস হইতে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পথে আমাকে বলিলেন, "থ্যাঙ্ক ইউ—"

"হঠাৎ আমাকে থ্যাঙ্ক ইউ কেন!"

"তুমি আমাকে এই মহত্ত্বটা আস্ফালন করবার সুযোগ দিলে বলে।"

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভিখারীটা

ভিখারীটা একজন বড়লোকের দাওয়ায় বসেছিল। রোদে কাঠ ফাটছিল চতুর্দিকে। পিচের রাস্তাগুলো গরমে নরম হয়ে গিয়েছিল। বেচারা এই রোদে আর হাঁটতে পারছিল না। হেঁটেও লাভ হত না কিছু। এই দুপুরে সকলের বাড়ির কপাট বন্ধ। কে তাকে ভিক্ষা দেবে। হাঁকাহাঁকি করলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে সবাই। ভাত খেয়ে ঘুমের সময় তো এটা, এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয়। সকাল থেকে অনেক হেঁটেছে বেচারা, কিন্তু বেশী কিছু পায় নি সে। আজকাল নয়া পয়সার যুগ নয়া পয়সাই দেয় সবাই। দু'মুঠো ছাতু খেতে গেলেও চার আনা পয়সা চাই। এক নয়া পয়সা ভিক্ষা পেলে পঁচিশটা নয়া পয়সা চাই। পঁচিশ জন সহৃদয় লোকের দেখা পাওয়া কি সহজ আজকাল? এই সবই ভাবছিল বেচারা বসে বসে। লোকটা বুড়ো। অস্থি-চর্মসার চেহারা। পরনের কাপড়টা ময়লা, শতছিন্ন। এত ছোট যে উরুত দুটোও ঢাকে নি ভাল করে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি। ছোট ছোট কোটরগত চোখ। এর সঙ্গে বেমানান কিন্তু তার পায়ের জুতোজোড়া ছেঁড়া বটে, কিন্তু ভাল চামড়ার। তার আভিজাত্যের চিহ্ন এখনও তার সর্বাঙ্গে বর্তমান। একজন ধনী যুবক জুতো জোড়া দান করেছিল তাকে কিছুদিন আগে। দয়াপরবশ হয়ে ততটা নয়—যতটা তার শু র‍্যাক (shoe rack) খালি করবার জন্যে। তার জুতো রাখবার জায়গায় আর স্থান ছিল না। ও জুতো বিক্রিও করা যেত না, তাই দানই করতে হয়েছিল।

ভিখারীটা ঢুলছিল বসে বসে। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল।

"পৌলিশ, পৌলিশ—"

ভিখারী দেখলে একটা রোগা ছেলে জুতো পালিশের সরঞ্জাম ঘাড়ে করে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"পৌলিশ, পৌলিশ—"

চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইতে লাগল। রাস্তায় কেউ নেই। এই রোদে কে জুতো পালিশ করাতে বেরুবে? কি বোকা! হাসল ভিখারীটা।

"এই শোন—"

ছোঁড়াটা এগিয়ে কাছে আসতেই ভিখারীটা যা বলল তা অবিশ্বাস্য।

"আমার এই জুতোটা পালিশ করে দে।"

"তুমি জুতো পালিশ করাবে?"

একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটি-ফুটি করতে লাগল ছোঁড়ার চোখের দৃষ্টিতে।

"হ্যাঁ করাব—"

"চার পয়সা লাগবে।"

"চার পয়সা মানে ছ' নয়া পয়সা তো?"

"দেখি।"

"হ্যাঁ, আছে আমার কাছে। পালিশ করে দাও জুতোটা—নাও, আগেই দিয়ে দিচ্ছি।"

সেদিন সারা সকাল ঘুরে ছ'টি নয়া পয়সাই রোজগার করেছিল সে।

ছোঁড়াটা জুতো পালিশ করতে লাগল।

অর্ধ-নিমীলিত নয়নে স্মিত মুখে ছোঁড়াটার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল ভিখারীটা। কল্পনা করছিল। বছর খানেক আগে তার ছোট ছেলে হুলিয়া পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে নাকি এখন কলকাতার রাস্তায় জুতো পালিশ করে বেড়ায়। হুলিয়ার মুখের সঙ্গে এ ছেলেটার মুখের কোনও সাদৃশ্য নেই। ভিখারীটার কিন্তু মনে হচ্ছিল আছে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে ছেলেটার মুখের দিকে। ছোঁড়াটা মুচকি মুচকি হাসছে। হুলিয়াও ওই রকম হাসত।

নিত্য চৌধুরী

মনিহারীর নিত্য চৌধুরীকে ইদানীং যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহার কৈশোর মূর্তি কল্পনা করিতে পারিবেন না। নিত্য বেঁটে ছিল, কিন্তু বুড়া বয়সে তাহার রং যত কালো হইয়া গিয়াছিল তত কালো সে ছেলেবেলায় ছিল না, রোদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার রং কালো হইয়া যায়। এখন যাঁহারা তাহার মাথায় কদমছাঁট সাদা চুল দেখিয়াছেন তাঁহারা যদি ষাট বৎসর পূর্বে তাহাকে দেখিতেন তাহা হইলে তাহার মাথার অ্যালবার্ট তেড়ি দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। বুড়াবয়সে অনেকে তাহার গলায় তুলসীর মালা দেখিয়াছেন, ইহাও হয়তো অনেকে জানেন যে সে ঘোরতর বৈষ্ণব ছিল, যে বাড়িতে মাছ-মাংসের সংস্রব আছে সে বাড়িতে সে জলস্পর্শ করিত না। কিন্তু ছেলেবেলায় তাহার গলায় তুলসীর মালা থাকিত না, থাকিত একটি রঙীন কম্ফর্টার, আর সে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে আসিয়া মুরগীর ডিম খাইয়া যাইত।

নিত্য চৌধুরীর বাবার সহিত আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য সে আলগা-ধরনের বন্ধুত্ব। সমাজের সর্বত্র প্রচলিত সেই ধরনের বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ের মধ্যে আত্মিক কোন যোগ হয় নাই। হওয়া সম্ভবই ছিল না। বাবা ছিলেন আদর্শবাদী ডাক্তার এবং নিত্য চৌধুরীর বাবা ছিলেন অত্যাচারী জমিদারের কর্মচারী। শোনা যায় দুষ্ট এক প্রজাকে শাসন করিবার জন্য জমিদারের আদেশে তিনি রাত্রে তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগ করেন।

বাড়ির লোক কেহ মরে নাই বটে কিন্তু এক-গোয়াল গরু পুড়িয়া গিয়াছিল। এ ধরনের লোকের সহিত বাবার আন্তরিক বন্ধুত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু তাহাদের সহিত আমাদের পারিবারিক একটা সম্প্রীতি ছিল। বাবা যখন প্রথম মনিহারীতে আসেন তখন নিত্য চৌধুরীর বাবাই তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য কৃতজ্ঞতারও একটা বন্ধন ছিল।

নিত্য আমার সঙ্গে পড়িত। পাঠশালার তারাপদ পণ্ডিত তাহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। এ ব্যাপার আজকালও হয়। বড় অফিসার বা মিনিস্টারের ছেলেমেয়েরাও বিদ্যালয়ে আজকাল বিশেষ একটা অনুগ্রহের পরিবেশে চলা-ফেরা করে। নিত্য ক্লাসে শৌখিন কাপড় জামা পরিয়া জামাইয়ের মতো বসিয়া থাকিত। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে কিছু বলিতেন না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার একটা অভিনয় করিতেন মাত্র। দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই করিতেন কিন্তু তাহার উত্তরের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। নিত্য প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পাস করিয়া যাইত। নিত্যর মা পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়মিতভাবে সিধা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার ধারণা ঘুষ না দিলে কোন-কিছুই এ বাজারে সুসম্পন্ন হয় না। তিনি গ্রামের পোস্ট-মাস্টারকে, ডাক্তারবাবুকে, দারোগাকে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু উপহার পাঠাইতেন। কাহাকেও দুধ, কাহাকেও দধি, কাহাকেও বা মাছ। গ্রামে দুইটি শিবমন্দির ছিল, দুইটিতেই তিনি পূজা পাঠাইতেন। গ্রামে একটি পূজ্য অশ্বত্থগাছ, একটি পূজ্য নিমগাছ এবং একটি পূজ্য বটগাছ ছিল। প্রত্যেক গাছের তলায় সিঁদুরমাখানো বিষ্ণুমূর্তি, গণেশমূর্তি, শিবমূর্তি প্রভৃতি স্তূপীকৃত হইয়া থাকিত। অনেকেই সেখানে গিয়া গঙ্গাজল ঢালিতেন। নিত্যর মায়েরও ইহা একটি দৈনন্দিন কর্ম ছিল। তিনি নররূপী বা প্রস্তররূপী কোনও ক্ষমতাবান ব্যক্তিকেই অবহেলা করিতেন না।

প্রত্যহ সিধা পাওয়া সত্ত্বেও তারাপদ পণ্ডিত কিন্তু নিত্যর সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। মাঝে মাঝে কেবল বলিতেন, তুমি হাতের লেখাটা পাকা কর, আর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চাররকম অঙ্ক ভাল করিয়া শিখিয়া ফেল। ইতিহাস, ভূগোল, আকাশতত্ত্ব এসব তোমার পড়িবার দরকার নাই। ওসব তোমার কাজে লাগিবে না।

নিত্য একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেন পণ্ডিতমশাই ?

তারাপদ পণ্ডিত উত্তর দিয়াছিলেন, তোমার গোঁফের রেখা দেখা গেলেই তুমি জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকিবে এবং পাটোয়ারি হইবে। সুতরাং হাতের লেখা এবং যোগ বিয়োগ গুণ ভাগটা পাকা কর। মাথায় যদি ঢোকে শুভঙ্করীটাও চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, নিত্য চৌধুরী শেষ পর্যন্ত জমিদারি সেরেস্তায় পাটোয়ারির পদেই বাহাল হইয়াছিল। তাহার বেতনের কথা শুনিলে এখন অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না, অনেকে হয়তো হাসিবেন। নিত্য প্রথমে মাসিক আট আনা বেতনে বাহাল হইয়াছিল। তাহার বাবার বেতন ছিল মাত্র পাঁচ টাকা।

কিন্তু তাহারা যে ঠাটে থাকিত তাহা এখন সহস্রমুদ্রাবেতন-ভোগীরা কল্পনাও করিতে পারেন না। তাহাদের হাজার বিঘা জমি ছিল। গোয়ালভরা গরু ছিল। বাথানে অনেক মহিষ থাকিত, বাড়িতে বেশ বড় একটি চন্দনা ছিল, ছাগল যে কত ছিল তাহার গণনা কেহ করিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি নিত্য আমার সহপাঠী ছিল। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই নিত্যর সহিত আমার কতটা যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা বলা হয় না। ছেলেবেলায় নিত্যই আমার প্রধান সঙ্গী ছিল। পাঠশালার ছুটি হইয়া গেলে তাহার সহিতই নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই আকর্ষণের একটা কারণও এখন বুঝিতে পারি। ছেলেবেলা হইতেই নিত্যর খবর সংগ্রহের বাতিক ছিল। সারাজীবন ইহাই তাহার অবসর-বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সারাজীবন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারকম খবর সংগ্রহ করিত। ছেলেবেলায় এই খবরগুলিই আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিত। খবরের টানেই তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

একদিন সে আসিয়া বলিল, "জাহাজঘাটে কয়লা ঠাকুর এসেছেন দেখতে যাবি? চল—"

"কয়লা ঠাকুর আবার কি!"

"সে একজন বড় সন্ন্যাসী। খালি কয়লা খেয়ে থাকে। তাই জাহাজঘাটে-ঘাটে ঘোরে। রাত্রে যখন ধ্যান করে তখন টিকিটা খাড়া হয়ে যায় আর তার ডগা থেকে ধোঁয়া বেরোয়। জাহাজের নল থেকে যেমন বেরোয় তেমনি। এতদিন সক্রিগলি ঘাটে ছিল, কাল এখানে এসেছে। যাবি?"

এমন একটা আশ্চর্য সন্ন্যাসীকে দেখিবার লোভ সংবরণ করা শক্ত। গেলাম জাহাজঘাটে। জাহাজঘাট আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় দুই মাইল। হাঁটিয়াই গেলাম। জাহাজঘাটে চারিদিকেই কয়লা। একটা কয়লার স্তূপের কাছে ক্ষীণকায় মসীকৃষ্ণ একটি লোককে দেখাইয়া নিত্য বলিল—এই কয়লাবাবা। তাহার মাথায় একটি সরু টিকিও আছে দেখিলাম। আমি সভয়ে আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম, কই, টিকি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না তো। নিত্য বলিল, সব সময় বেরোয় না। রাত বারোটার সময় সময় যখন ধ্যান করেন তখন বেরোয়। তখন টিকিটাও খাড়া হয়ে যায়।

জাহাজঘাট হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এজন্য মায়ের কাছে বকুনি এবং বাবার কাছে কানমলা খাইলাম। নিত্যর জন্য এরূপ নির্যাতন আমাকে প্রায়ই সহ্য করিতে হইত।

একদিন নিত্য বলিল, "আলোর সাঁপ দেখেছিস?"

নিত্য অকারণে যেখানে সেখানে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া দিত। সাপকে সাঁপ এবং ইতিহাসকে ইতিঁহাস বলিত।

"আলোর সাপ? না, দেখি নি তো!"

"আমি দেখেছি।"

"কোথায় ?"

"আমাদের বাগানে রাত একটার সময় গেলে তুইও দেখতে পাবি। আকাশ থেকে সে সাঁপ মাটিতে নামে, তারপর আবার আকাশে চলে যায়। ইয়া মোটা সাঁপ।"

বড়ই বিস্মিত হইলাম।

"কিন্তু আমি তো ভাই অত রাত্রে বাড়ি থেকে যেতে পারব না।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। মা তোকে আজ আমাদের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করবে। তারপর রাত্রি দশটার সময় ফাগুয়া তোদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে দেবে যে তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস, সকালে বাড়ি যাবি। আমরা দুজন বাইরে শোব। তারপর ঠিক সময়ে বাগানে চলে যাব।"

তাহাই হইল। গভীর রাত্রে উঠিয়া আমরা আলোর সাপ দেখিতে গেলাম। দেখিলাম বেশ মোটা সাপ। আকাশের এক প্রান্ত হইতে উঠিয়া সমস্ত আকাশটায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল, তাহার পর হঠাৎ মিলাইয়া গেল। স্টীমারের সার্চলাইট পূর্বে কখনও দেখি নাই। অনেকদিন পরে জানিয়াছি নিত্য যাহা দেখাইয়াছিল তাহা স্টীমারের সার্চলাইট। তখন রাত্রি একটার সময় একটা বড় স্টীমার সার্চলাইট ফেলিয়া দূরের গঙ্গা দিয়া যাইত।

এই ধরনের চমকপ্রদ খবরের টানে নিত্যর সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। অনেকবার সে আমাকে ঠকাইয়াছে। একবার বলিল, কাজিগ্রামে একজনের বাড়িতে ভালো বিলাতী কুকুরের বাচ্ছা হইয়াছে। গেলেই একটা বাচ্ছা পাওয়া যাইবে। গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটা নেড়ী কুত্তির পিছু পিছু একপাল বাচ্ছা ঘুরিতেছে। বাড়ির মালিককে বলিবামাত্র সে সানন্দে গোটা দুই বাচ্ছা আমাকে গছাইয়া দিল। বাড়িতে আসিয়া বাবার নিকট মার খাইলাম। মা বাচ্ছা দুইটাকে অবিলম্বে দূর করিয়া দিলেন।

আর একটা খবরের কথাও মনে পড়িতেছে। নিত্য একদিন আসিয়া বলিল, আমাদের বাড়িতে একদল বেদে এসেছিল। তাদের কাছে একটা অদ্ভুত খবর শুনলাম। ছাগলের দু'কানে যদি দুটো চটিজুতো পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আর নড়ে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কিছুদিন আগে বাবা বেশ ভালো একজোড়া চটি কিনিয়াছিলেন। বাসনা হইল ওই চটি দিয়া একদিন নিত্যর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। পরের রবিবারেই সুযোগ মিলিয়া গেল। বাবা দুপুরে আহারাদির পর ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহার চটি দুইটি সহজেই সরাইতে পারিলাম। দুপুরবেলা আমাদের বাগানে অনেক ছাগল আসিত। গেট বন্ধ করিয়া একটা বলিষ্ঠ খাসি ধরিয়া ফেলাও অসম্ভব হইল না। নিত্য আর আমি দুইজনে মিলিয়াই সহজে তাহা পারিলাম। নিত্য খাসিটাকে ধরিয়া রহিল, আমি তাহার দুই কানে বাবার নূতন চটিজোড়া পরাইয়া দিলাম। খাসির শিং দুইটা বড় থাকাতে সুবিধা হইল। চটি দুটা পরাইয়া দেওয়া মাত্র খাসিটা কয়েক মুহূর্ত গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ অদ্ভুত

পরিস্থিতিতে সে জীবনে আর কখনও বোধ হয় পড়ে নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল যে আমরা তাহাকে আর ধরিয়া নাই সেই মুহূর্তেই সে ছুট দিল। খাসির ওরকম ছুট আমি অন্তত দেখি নাই। ঘোড়াকে হার মানাইয়া দিল। চটি দুটা মাথায় লইয়াই সে ছুটিতেছিল, আমরাও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলাম। নিত্যর খবর যে নিতান্তই ভুয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বাবার চটিজোড়া তো উদ্ধার করিতে হইবে। বনবাদাড় পার হইয়া মাঠামাঠি খাসিটা ছুটিতে লাগিল। আমরাও ছুটিতে লাগিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, নিত্যর পায়ে একটা বড় কাঁটা ফুটিয়া যাওয়াতে সে বসিয়া পড়িল।

আমি ছুটিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ছুটিবার পর ছাগলটার কান হইতে একপাটি চটি পড়িয়া গেল, দ্বিতীয়টা লইয়া সে একটা অড়হর ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। একপাটি চটি হাতে করিয়াই বাড়ি ফিরিলাম। বাবা তখনও ঘুমাইতেছিলেন, ভাগ্য ভাল ছিল, ধরা পড়িলাম না। বাবা উঠিয়া চটিটি খুঁজিলেন, তাহার পর অনুমান করিলেন বোধ হয় কুকুরে লইয়া গিয়াছে।

নিত্যকে তাহার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এরকম একটা বাজে খবর আনিয়া মিছামিছি আমাকে হয়রান করিল কেন।

"বেদেরা আমাকে বললে যে—"

"যে যা বলবে তুই বিশ্বাস করবি?"

"তুমিও তো বিশ্বাস করলে।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি যদি এসব খবর না আনতাম তুমি কি আমার কাছে আসতে? আমার সঙ্গে ঘুরতে?"

আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া করুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার কাছে কেউ আসে না ভাই। আমি দেওয়ানজির ছেলে বলে বোধ হয় সবাই আমাকে ঘেন্না করে।"

দেখিলাম তাহার চোখে জল টলটল করিতেছে।

গ্রামের পড়া শেষ করিয়া আমি শহরে চলিয়া যাই। মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ি আসিতাম। কখনও অন্যত্র যাইতাম। নিত্যর সহিত অনেকদিন দেখা হয় নাই। একবার হঠাৎ দেখা হইয়া গেল, তখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। শুনিলাম নিত্যর বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়েও হইয়াছে। নিত্য প্রায় রোজই আমার কাছে আসিতে লাগিল। দেখিলাম সে এখনও খবর ফেরি করিতেছে, কিন্তু এবার খবরগুলি অন্যরকম। কিছুদিন আগে নিত্য পাটোয়ারির পদে বাহাল হইয়াছিল, তাই খবরগুলি প্রায়ই জমিজমা সংক্রান্ত। রামকে হয়তো বলিল, শ্যামের বিষয় এবার নীলামে উঠিবে। অনেক খাজনা বাকি পড়িয়াছে। শ্যামকে বলিল, রামের উপর মালিকের ভালো ধারণা নাই, আমাকে বলিয়াছেন, গ্রাম হইতে উহাকে দূর করিয়া দাও। দেখিলাম এই ধরনের

নানারূপ মিথ্যা খবর চালাচালি করিয়া গ্রামে সে বেশ একটা প্রতিপত্তি জাহির করিয়াছে। আমাকে বলিল, তোমাদের রঘুনাথ দিয়াড়ার জমি সেধু মণ্ডল খানিকটা চাপিয়া লইয়াছে। চল গিয়া দেখিয়া আসি। আমি থাকিতে অবশ্য তোমার জমি কেহ দাবাইয়া লইতে পারিবে না। তবু যদি দেখিতে চাও চল। আমি আর গেলাম না।

ইহার পর নিত্যর সহিত যখন দেখা হইয়াছিল তখন আমি প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছি। আসিয়া দেখিলাম নিত্য একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল সব সাদা, খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। একটিও দাঁত নাই, দুই পাটি বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া দেখাইল। তখন দেখিলাম তাহর খবর-সংগ্রহ করিবার বাতিক ঠিক আছে; কিন্তু এবার দেখিলাম খবরের ফর্দ অন্য রকম। সে মৃত্যু সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে। আমার সহিত দেখা হইতেই বলিল, 'তুমি এতদিন পরে এলে, গ্রামের অনেক লোকের আর দেখা পাবে না। অনেকেই পটল তুলেছে। গনোরি, ভিখন সিং, বিজুবাবু, কালী সিং, রাজু পাটোয়ারি, তুরীটোলার বর্ষতিয়া—সব মরে গেছে। ভাদ্দো মুন্সী শুষছে। তার ছেলেরা কাটিহার থেকে বড় ডাক্তার ডেকেছিল, তারা বলে গেছে বাঁচবার কোনও আশা নেই। তুমি কি একবার দেখবে, চল না?'

চিকিৎসার জন্য নহে, ভদ্রতার খাতিরে গেলাম। মৃত্যু-পথযাত্রী ভাদ্দো মুন্সী আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও কথা বলিলেন না। দিন দুই পরে নিত্য আর একটি খবর আনিল। হরিবোল সাহার নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। নিত্যই নাকি তাহার দুই ছেলেকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়াছে। আমি কি তাহাকে দেখিতে যাইব? আমি আর গেলাম না। শরীরটা সেদিন খুব ভাল ছিল না। নিত্য চলিয়া যাইবার একটু পরেই তাহার ভাই আসিল। নানা কথার পর আমাকে আস্তে বলিল, নিত্যর কথায় আমি যেন যেখানে সেখানে ঘুরিয়া না বেড়াই। উহার উদ্দেশ্য কেবল ফপরদালালি আর বাহাদুরি করা। শুনিলাম নিত্যর ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব নাই। তিন ভাই পরস্পরের ঘোর শত্রু। আর একদিন নিত্য আসিয়া বলিল, বেচুবাবু কণ্ট্রাক্টারের এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? নিত্য বলিল, গত এক মাস হইতে বেচুবাবু শয্যা লইয়াছেন, প্রতিমুহূর্তেই সকলে আশঙ্কা করিতেছেন এই বুঝি তিনি গেলেন। কিন্তু তিনি যাইতেছেন না। প্রাণবায়ু কিছুতেই বাহির হইতেছে না। নাড়ী ছাড়িয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। পরশুদিন তাঁহার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল, সকলে ভাবিল এই বোধ হয় শেষ। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমাকে এক গ্লাস জল দাও। তাঁহার ছেলেরা পূর্ব হইতেই কাঠ খাটিয়া প্রভৃতি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বেচুবাবু মরিতেছেন না। অবশেষে কাঁটাক্রোশের প্রবীণ কবিরাজ 'কান্‌হাই' মিশিরকে ডাকা হইয়াছে। তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন আজ রাত্রে নিশ্চয় মরিবে। দেখিলাম বেচুবাবুর ছেলেরা উঠানে বসিয়া কাঠ কাটিতেছে। কিন্তু বেচুবাবু এখনও মরেন নাই। তিনি শুইয়া শুইয়া কাঠ কাটার শব্দ শুনিতেছেন।

সেবার আসিয়া যে কয়দিন ছিলাম নিত্যকে এই ধরনের খবর সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিলাম। অনেক দূর দূর গ্রামের মৃত্যুসংবাদও সে সংগ্রহ করিয়া আনিত।

মাত্র কয়েকদিন হইল এবার মনিহারী আসিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম নিত্য আসিবে, কিন্তু আসিল না। হঠাৎ তাহার ভাই আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে দাদা। আপনি আজকের দিনটা কোনরকমে পার করে দিন। আজ শনিবার অমাবস্যা, আজ যদি নিত্য মরে সমস্ত পাড়াটা খারাপ হয়ে যাবে।"

"কি হয়েছে নিত্যর ?"

"পক্ষাঘাত হয়েছে, গত পনর দিন বিছানায় পড়ে আছে, আজ খুব বাড়াবাড়ি, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে। আজকের দিনটা ওকে বাঁচিয়ে দিন দাদা—"

এখানে আসিয়া অনেকের সহিতই দেখা হইয়াছিল। কেহই তাহার কথা বলে নাই। যে নিত্য কত লোকের অসুখ লইয়া মাথা ঘামাইত, দেখিলাম তাহার জন্য কেহই মাথা ঘামাইতেছে না। তাহার ভাই ঘামাইতেছে, কিন্তু অন্য কারণে।

নিত্যকে দেখিতে গেলাম। সে আমাকে চিনিতে পারিল না। তাহাকে একটা ইনজেকশন দিলাম। যে কারণেই হোক সে শনিবারটা টিকিয়া গেল। মারা গেল রবিবার সকালে।

শ্মশানে তাহার চিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ কানের কাছে কে যেন বলিল—"এ সব খবর যদি না আনতাম, তুমি কি আমার কাছে আসতে ?"

আজবলাল

আজবলাল শর্মার নামটা বিহারী ছাঁদের হইলেও আসলে সে বাঙালী। তাহার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। বিহারী মার্কা নাম রাখিলে চাকুরীর সুবিধা হইবে এই ভাবিয়া মতিলাল পুত্রের ওই নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু এ দূরদর্শিতা শেষ পর্যন্ত সুফল প্রসব করে নাই। কারণ গোড়াতেই গুটি কাঁচিয়া গেল। আজবলাল কৈশোরেই স্থানীয় থিয়েটার পার্টিতে পাণ্ডা হইয়া উঠিল। পড়াশোনা করিত না। গোঁফ গজাইয়া গেল, কিন্তু আজবলাল ক্লাশ ফাইভের উর্ধ্বে উঠিতে পারিল না। সুতরাং ভালো চাকুরির আশা আর রহিল না, টিকিয়া গেল কেবল আজবলাল নামটা।

আজবলালের লেখাপড়া বেশীদূর হয় নাই বটে, কিন্তু সে বেশ কাজের লোক। বলিষ্ঠ গঠন তাগড়া সাঁওতালের মতো চেহারা। খুব খাটিতে পারে। সব রকম কাজ জানে, শুধু থিয়েটারে নয়, গৃহস্থালী কর্মেও সুনিপুণ। রান্নাবাড়া হইতে শুরু করিয়া

সাধারণ গৃহস্থের যাবতীয় কাজ সে একা সামলাইতে সক্ষম। বাজার করে, ঘর ঝাড়ু দেয়, মসলা পেশে, চা করে, সাবান কাচে, সব রকম ফাইফরমাশ খাটে এমন কি দরকার পড়িলে জুতা বুরুশও করিয়া দেয়। অথচ বদন সর্বদাই প্রফুল্ল। সুরথ-পত্নী আকাশ-যাত্রা না করিয়াই আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। বস্তুত এ-যুগে এরূপ সর্বকর্মপারঙ্গম ভৃত্য সত্যই দুর্লভ। সুরথবাবু তাহাকে খুব যত্ন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজবলালের একটি দোষ এবং একটি দুর্বলতা ছিল। যুধিষ্ঠির অথবা বুদ্ধদেব আসিয়া চাকরের কাজ করিবেন ইহা আশা করা অন্যায়। সাধারণ মানুষের দোষ-দুর্বলতা থাকিবেই। আজবলালের দোষ সে নিজেকে প্রভু বা প্রভুপত্নীর সমপর্যায়ের মনে করিত। অসঙ্কোচে তাঁহাদের আলাপের মাঝখানে 'ফোড়ন' দিয়া ফেলিত। হয়তো গানের কথা হইতেছে, আজবলাল বলিয়া বসিল—যাই বলুন আঙুরবালার গানের তুলনা হয় না। রাজনীতি, সাহিত্য, সব ক্ষেত্রেই তাহার নিজস্ব মতামত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই তাহা সে ব্যক্ত করিয়া ফেলিত। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার আদর্শ পুরুষ ফজলুল হক আর সাহিত্যে পাঁচকড়ি দে। বড়দের কথার মাঝখানে ফোড়ন দিত বলিয়া সুরথবাবু মাঝে মাঝে তাহাকে খুব বকিতেন। আজবলাল তাহাতে রাগ করিত না, ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি মুচকি হাসিত। আজবলালের দুর্বলতাটি ছিল মাছ-মাংসের সম্বন্ধে। বিশেষ করিয়া মুর্গির মাংস পাইলে সে বিগলিত হইয়া পড়িত। বাড়িতে যেদিন মুর্গি হইত সেদিন ডবল ভাত খাইত আজবলাল। কিন্তু মুর্গির বাজারে আজকাল আগুন লাগিয়াছে। সে আগুনে মুর্গিরা পুড়িলে ভালো 'রোস্ট' হইত। কিন্তু সে আগুন মুর্গিদের স্পর্শ করে না, পোড়ায় গরীব খাদ্যরসিকদের। তবু সুরথবাবু মাঝে মাঝে মুর্গি কিনিতেন। আজবলাল সেগুলি নিজ হস্তে কাটিয়া কুটিয়া সোল্লাসে রান্না করিত।

সেবার একটা অভাবনীয় সুযোগ ঘটিয়া গেল। উকিল-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত ভার পড়িল সুরথবাবুর উপর। তিনদিনব্যাপী অধিবেশন। ও অঞ্চলের অধিকাংশ উকিলই মুসলমান বলিয়া এবং হিন্দু উকিলরাও সকলেই মুর্গি-ভোজনেচ্ছু অনুমান করিয়া সুরথবাবু প্রচুর মুর্গি কিনিয়া ফেলিলেন। খাসির মাংস এবং পাকা মাছ তো ছিলই, কিন্তু বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল মুর্গির। সুরথবাবু প্রায় মুর্গিমেধ যজ্ঞেরই আয়োজন করিলেন।

আজবলাল আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তাহার উপরই সুরথবাবু রাঁধিবার সমস্ত ভার দিয়া দিলেন।

ইহার পরই কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেল যে বিনা-মেঘেও বজ্রপাত হয়। কোথাও কিছু নাই, আজবলালের নামে এক পোস্টকার্ড আসিয়া উপস্থিত। তাহার বন্ধু লক্ষ্মীকান্ত লিখিতেছে—'গতকাল আমাদের এ অঞ্চলে এক ভীষণ 'বাস্' একসিডেন্ট হইয়া গিয়াছে। তোমার বাবা মতিলালবাবু তাহাতে মারা গিয়াছেন। তুমি পারো তো ছুটি লইয়া পত্রপাঠ চলিয়া এস।'

আজবলাল অগ্নি-গর্ভ দৃষ্টিতে পোস্টকার্ডটির দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরথবাবু কিন্তু তাহাকে ছুটি দিলেন না। বলিলেন, "তোমার উপর নির্ভর করেই এত বড় ব্যাপারের আয়োজন করেছি। এখন তুমি চলে গেলে অকূল পাথারে পড়ব যে শেষ মুহূর্তে। আগে খবর গেলে কলকাতা থেকে রাঁধুনী আনাতাম। কিন্তু এখন তো সময় নেই। এর জন্যে আমাদের ফাণ্ড থেকে তোমাকে দৈনিক দশ টাকা হিসাবে তিন দিনের জন্য ত্রিশ টাকা তো দেবই, আরও কিছু বেশী দেব আমার নিজের পকেট থেকে। তুমি ভালয় ভালয় কাজটি উদ্ধার করে দাও।"

আজবলালকে রাজী হইতে হইল। তাহার দাড়ি ও নখ বাড়িতে লাগিল, লোভ দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, সংযমের বাঁধ কিন্তু সে ভাঙিতে দিল না। হাজার হোক, ব্রাহ্মণের ছেলে, চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিসও তো আছে।

সুরথবাবুর স্ত্রী তাহার জন্য আলাদা হবিষ্যান্ন রন্ধন করিতে লাগিলেন। মটর ডাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ আহার করিয়া বেচারী মাছ-মাংস-মুর্গি রাঁধিয়া সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিল। রান্নার গন্ধে মাঝে মাঝে সে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছিল, এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল গোপনে এক-আধটা মুর্গির ঠ্যাং চুষিয়া দেখিলে ক্ষতি কি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামলাইয়া গেল। হিন্দুধর্মের কঠোর বিধানই জয়ী হইল।

ভোজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আজবলাল কুলিদের দিয়া বাসন মাজাইতেছে, এমন সময় বাহিরে শোনা গেল—"আজু আজু—বাড়ি আছিস—আজু—।"

এ কি! কার কণ্ঠস্বর!

আজবলাল বাহিরে গিয়া দেখিল তাহার পিতা মতিলাল সশরীরে দণ্ডায়মান।

মতিলাল বলিলেন, "শুনলাম লক্ষ্মী তোকে খবর দিয়েছে যে আমি মরে গেছি। একের নম্বর পাজি শালা। ওরা ষোড়শী থিয়েটার করছে, তোকে দিয়ে জীবানন্দের পার্ট করাতে চায়। খবরটা শুনে আমি ছুটতে ছুটতে চলে এলাম।"

আজবলাল স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত মতিলালের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এলেই যদি দুদিন আগে আসতে পারলে না?"

রঙের খেলা

এক

পলাশ, অশোক, কৃষ্ণচূড়া, কোকনদ, জবা, রঙ্গন, ক্রিমসন্ গ্লোরি, টকটকে লাল-ডালিয়া, শোণিত-শোভা চন্দ্রমল্লিকা আর দুপহর চন্দ্রিকা সবাই হঠাৎ ভীড় করে এল লাল দোপাটির সঙ্গে। নবারুণের উজ্জ্বল লাল আলো তাদের উপর পড়ল। লজ্জিত নববধূর আরক্তিম কপোলের আভা আর চেলাঞ্চলের আভাস দুলে উঠল যেন চকিত চমকে। দোলের উৎসব ফাল্গুনের প্রগল্ভতায় সহসা যেন মূর্ত হল। লালে লাল হয়ে গেল মনের আকাশ। ছড়িয়ে পড়ল অজস্র আবীর, কুঙ্কুম, আর সিন্দুরের অসংযত প্রলাপ। আগুন লেগে গেল।

…প্রথম দর্শন।

দুই

এর পর বাজল আশাবরী।

অকুণ্ঠ আশার অসীম প্রত্যাশা। উন্মুখ আগ্রহে লাল রূপান্তরিত হল কমলা রঙে। অগ্নিশিখায় জ্বলতে লাগল কমলা-রঙের কিরণ-কলাপ। শ্রাবণ সন্ধ্যাকাশের বর্ণ-বহুলতায় যে কমলা রঙ অঙ্গাঙ্গি হয়ে থাকে লালের সঙ্গে, যা উড়ে উড়ে বেড়ায় ক্বচিৎ-পথ-ভুলে-আসা চঞ্চল প্রজাপতির ক্ষণভঙ্গুর লঘু ডানায় ভর করে, ল্যাসিয়া গোলাপের অর্ধস্ফুট কুঁড়িতে যার স্বপ্ন,—সেই রং। আশার আশাবরীতে বাজতে লাগল সেই রঙের আকৃতি। মনে হল যেন কমলা রঙের কুয়াশা নামছে চারদিকে। নওরং পাখীদের ঝাঁক এসেছে কি? তাদের কমলা রঙের বুক যেন দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে কমলা রঙের ঝরনা ঝরছে। বেজে চলেছে আশাবরী। লাল কমলা রঙে হারিয়ে গেছে।

আবার সে এসেছিল।

দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে।

তিন

সোনালী আলোর বান ডেকেছে।

শরতের রোদের সঙ্গ বিগলিত স্বর্ণের এ কি অপূর্ব শোভা। গলাগলি করে হাসছে কলকে ফুলের দল। ওদের অঙ্গের এ কনক-দ্যুতি তো আগে চোখে পড়ে নি। ও কি, ওরা এসেছে? হলদে গোলাপ ওফেলিয়া আর লন্‌সডেল? কি হাসি ওদের মুখে। মনে হচ্ছে গোলাপ নয় যেন, মানুষ। কি আনন্দ, কি আনন্দ। স্বর্ণ-পক্ষ প্রজাপতিরা গান ধরেছে কাজল-গৌরীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে। শুধু কাজল-গৌরী নয়, ক্যানারিও এসেছে অসংখ্য। শিস দিচ্ছে তারা। সোনা পাখীর ঝাঁকও নামছে। সোনার মেঘ নামছে যেন। সুরে সুরে ভরে যাচ্ছে দশ দিক। রঙের সোনায়, সুরের সোনায়, গানের সোনায়, প্রাণের সোনায় স্বর্ণময় হয়ে গেল অন্তর-বাহির।

চিঠি এসেছে তার।

সুবাসিত, সরল, অনাড়ম্বর।

পড়ে প্রথমে অবাক হল, তারপরে আনন্দে ভরে উঠল বুক।

চার

সবুজে সবুজ।

কোথা ছিল এত সবুজ এতদিন! ফার্ন-পাতার কারুকার্যময় সবুজের সঙ্গে আরও যে কত সবুজের সমারোহ। তমাল, তাল, কাঁঠাল, বট, ক্যাকটাস্‌, করবী, চাঁপা, শিরীষ, আরও কত—সবার পাতার সবুজ এসে মিশেছে সেই চিরন্তন সবুজে যা বহন করে

জীবন্ত প্রাণের বাণী, যার কণ্ঠে যৌবনের গান, যা অকুতোভয়, যা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর, যা আরও চায়। আরও, আরও, আরও···।

সবুজের কুঞ্জবনে এসেছে টিয়া চন্দনার দল, এসেছে হরবোলা, এসেছে বাঁশপাতি। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আর একখানি চিঠি, এটিও খুলে পড়ল সাগ্রহে।

এটিও সুবাসিত।

পাঁচ

নীল শাড়ি পরা মেয়েটি এল তারপর।

আকাশ-নীল শাড়ি। চোখের তারা দুটিও নীলাভ। খোঁপায় দুলছে নীলাঙ্গিনী অপরাজিতা। কি অদ্ভুত হাসি তার মুখে, চাপা হাসি। হঠাৎ মনে হল, নীলনদের স্রোতে উজান বেয়ে নীল মেঘের বজরা থেকে নামল নাকি ক্লিওপেট্রা সহসা? চোখের দৃষ্টিতে চকমক করছে চাপা হাসির ঝলক।

"নমস্কার—"

"নমস্কার। আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক।"

"চেনবার কথা নয়। নতুন এসেছি আমরা এ পাড়ায়। মাত্র সাত দিন। আপনাদের বাড়ির পাশেই আছি।"

"ও—"

"আচ্ছা, আপনার নামও কি মল্লিকা বসু?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো।"

"আমিও মল্লিকা বসু। আমার দুখানা চিঠি বোধ হয় পিওন ভুল করে আপনাকে দিয়ে গেছে। বিকাশদার চিঠি—"

"ও, হ্যাঁ। আমি ভাবছিলুম কার চিঠি!"

গলাটা কেঁপে গেল একটু।

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে এনে দিল চিঠি দুখানি।

"ধন্যবাদ—"

চিঠি দুটি নিয়ে চলে গেল সে নীলের ঢেউ তুলে।···নীল, নীল, নীল—নীল সাগর থই থই করছে চারিদিকে। বিষের মতো নীল, বেদনার মতো নীল, মূর্ছাহত ঠোঁটের মতো নীল।

হাতটা শুঁকে দেখল।

তখন চিঠির গন্ধ লেগে আছে হাতে।

ছয়

নীল ঘন হচ্ছে, জমছে।

শেষে ঘন-নীল।

ঘন নীল সাগর জমাট হয়ে যেন প্রসারিত হয়ে আছে আদিগন্ত। ঘন নীল, স্তব্ধ ভয়ঙ্কর। ওগুলো কি উড়ছে? সোয়ালো পাখীর ঝাঁক! তাদেরও গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘন নীলের বিদ্যুৎকণা। ক্রমাগত উড়ছে, থামছে না। থামবে না।

তারা মোটরে পাশাপাশি চলে গেল তার বাড়ির সামনে দিয়ে। তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দুজনেই। দুজনেরই মুখে মুচকি হাসি।

সাত

ঘন নীলের পর বেগুনির পালা।

ঘন-নীলের অন্তরে কি তুষানল জ্বলল? তারই তাপে কি ঘন নীল বেগুনি হয়ে গেল? লাল, হলদে, কমলা, সবুজ কোথায় গেল তারা! কোন্ মহাশূন্যে বিলীন হল!

সেদিন তারা দুজনেই এল।

হাতে একখানি রঙীন খাম।

খামের উপর লেখা "শুভ-বিবাহ"।

"আসবেন নিশ্চয়। 'ভায়োলেট ভিলা'তে হবে। বেশী দূর নয়। কাছেই। নমস্কার।"

চলে গেল।

আট

তার পর?

সব কালো।

চিন্তামণি

কি সুন্দর দেখতে। ঠিক যেন বিগলিত মুক্তো। মুক্তোর ভিতর আর একটা ছোট বিন্দু। সেটাও ছোট পুঁতির মতো।

মুক্তো থেকে বেরিয়ে এল একটা হাতের মতো, তারপর নিঃশব্দে সমস্ত দেহটা ঢুকে গেল সেই হাতে। আবার হাত বেরুল, আবার সমস্ত শরীরটা এগিয়ে গেল সেদিকে। তারপর দুটো হাত বেরুল, আঁকড়ে ধরল খাদ্য-কণিকাকে। গ্রাস করে ফেলল তারপর। আবার এগিয়ে চলেছে। এঁকে বেঁকে তেবড়ে তুবড়ে যাচ্ছে শরীরটা।

কিন্তু থামছে না। তাদের নিরন্তর গতি ব্যাহত হচ্ছে না কোথাও। মাঝে মাঝে বাধার পাহাড় আসছে সামনে, কিন্তু বাধা দিতে পারছে না তাকে, শরীরটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঠিক সে এগিয়ে যাচ্ছে। দুরন্ত কর্মী, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। খাবার চাই, খাবার, আরও খাবার। তারপর কিছুক্ষণ পরে থেমে যায় সব। নড়ে না, মনে হয় যেন সমাধিস্থ হয়ে আছে। সৃষ্টির আদিতে ভগবান নাকি বলেছিলেন এক আমি বহু হব। এরা তা বলে কি না জানি না, কিন্তু এদের ওই এক দেহ থেকে বহুর জন্ম হয়। এ ভগবান নয়, অ্যামিবা। বাস স্বর্গলোকে বা মানসলোকে নয়, বিষ্ঠালোকে।…এরা যদি মানুষ হত তাহলে কি রকম হত তাদের সমাজ? এখন এদের যৌন-বোধ নেই, তখন কি থাকত? কি রকম হত এদের রাজনীতি? এদের মধ্যেও কি কবির জন্ম হত? আবির্ভাব হত বৈজ্ঞানিকের? যে বৈজ্ঞানিক আজ আকাশে উড়ে চাঁদের নাগাল পেতে চাইছে, এরাও কি তাই হত? সিনেমা থাকত কি এদের? ব্ল্যাক মার্কেট? খুন? রাহাজানি? কিন্তু এসব করে কি আমরা শান্তি পেয়েছি? শান্তি কোথায়? ডাক্তারি পাশ করে অনাহারে বসে আছি মাইক্রোসকোপের সামনে। কি লাভ হয়েছে? শান্তি কই?…শান্তি কই?…

জীবাণুবিদ ডাক্তার চিন্তামণি ধরকে যখন পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাঁর টেবিলের উপর উল্লিখিত লেখাটি পাওয়া গিয়েছিল।

তিনি পাগলা গারদে সমানে চেঁচাচ্ছেন, "আমি অ্যামিবা হব, অ্যামিবা হব,"—আর ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে অ্যামিবার মতো অঙ্গভঙ্গী করছেন।

ডাক্তার চিন্তামণি ধর সদ্বংশের সুশিক্ষিত সন্তান।

জ্যাঠাইমা

জ্যাঠাইমার কথা মনে পড়ছে।

জ্যাঠাইমার সামনে খেতে বসলে আর রক্ষা ছিল না। কত রকম যে রান্না করতেন! উচ্ছে ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা, এমন কি মাঝে মাঝে লাউয়ের খোসা-ভাজাও। তাছাড়া সড়সড়ি, চচ্চড়ি, ডালনা, ছেঁচকি, সুক্ত। কি সুন্দর সুক্তই যে রাঁধতেন! মাছের ঝোলও। কম মসলা দিয়ে তরকারির অমন স্বাদ আর কেউ বার করতে পারত না। নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

যখন স্কুলে পড়তাম, বোর্ডিংয়ে থাকতাম। রামকুমার ঠাকুরের অখাদ্য রান্না খেয়ে ছটা দিন কাটত। রবিবারটা জ্যাঠাইমার ওখানে মুখ বদলাতে যেতাম।

জ্যাঠাইমা আমার নিজের জ্যাঠাইমা নন। বাবার একজন বন্ধুর দাদার স্ত্রী। বাবা তাঁকে দাদা বলে ডাকতেন, আমরা জ্যাঠাইমা বলতাম। সেই সুবাদে জ্যাঠাইমা।

কিন্তু নিজের জ্যাঠাইমা কি এর চেয়ে বেশী স্নেহময়ী হতেন? মনে হয় না।

সকালে উঠেই চলে যেতাম জ্যাঠাইমার বাড়ি। বাবা বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে

বলে দিয়েছিলেন, সুতরাং তিনি আপত্তি করতেন না। রবিবারটা সমস্ত দিনই জ্যাঠাইমার কাছে থাকতাম।

গিয়েই প্রথমে স্নান করতে হত, সাবান মেখে। "ইশ, সারা গায়ে যে পলি পড়িয়ে রেখেছিস। দে তো ঝগড়ু, ভাল করে ঘষে ঘষে ময়লাগুলো উঠিয়ে দে তো!"

ঝাঁকড়া-গোঁফ-ওয়ালা চাকর ঝগড়ু বিশালকায় লোক। কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং স্নেহপ্রবণ।

"আবো, আবো, খোঁকাবাবু, ইধর আবো। নেই নেই, ওই সে নেই করো—"

বাঘের কবলে পড়লে ছাগ-শিশুর যে অবস্থা হয়, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হত। সাবানের ফ্যানা চোখে মুখে নাকে কানে ঢুকে যেত, চোখ জ্বালা করত। কিন্তু ঝগড়ু না-ছোড়। সম্পূর্ণরূপে সর্বাঙ্গে সাবান না মাখিয়ে সে ছাড়বে না।

স্নান শেষ হলে তারপর মাথা-আঁচড়ানো পর্ব। সেটা জ্যাঠাইমা নিজে করতেন। তাঁর বিশেষ রকম ধারালো একটা সরু-চিরুনি ছিল। বাঁ হাত দিয়ে থুতনিটা চেপে ধরে সজোরে চালিয়ে যেতেন সেটা মাথার জট্‌পাকানো চুলের ভিতর। মনে হত প্রাণ বুঝি এখনই বেরিয়ে যাবে।

"কি করে রেখেছিস মাথাটা? অ্যাঁ? একবারও কি চুলে হাত দিস না!"

আমি একটি কথাই বারম্বার বলতাম, "উঃ, বড্ড লাগছে, ছেড়ে দাও জ্যাঠাইমা, তোমার পায়ে পড়ি—"

"পায়ে পড়তে আর হবে না। এই দেখ, কি জঞ্জাল পুরে রেখেছিলে মাথায়। নাও, মুখটা ওই তোয়ালেতে পুঁছে খাবে চল।"

খাওয়ার একটা মোটামুটি ফর্দ আগেই দিয়েছি। আমি কি কি ভালবাসতাম তা জ্যাঠাইমা জানতেন। মটর ডালের বড়া ভাজা, সেমুইয়ের পায়েস, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, মাছের ফ্রাই—প্রতি সপ্তাহে এর কোনটা না কোনটা হতই। বোর্ডিংয়ে গিয়ে খাওয়ার জন্যে একটা ছোট জারে করে আচার দিয়ে দিতেন। একদিন গিয়ে দেখি লাড়ু করছেন। আমাকে বললেন, কিছু লাড়ু বোর্ডিংয়ে নিয়ে যা। ক্ষিধে পেলে খাবি। আমি বললাম, বোর্ডিংয়ে কি আমি একা খেতে পারি। আমার ঘরে চারজন ছেলে। জ্যাঠাইমা বললেন, তাতে কি হয়েছে, চারজনের মতোই নিয়ে যা। একটা পুঁটুলিতে কুড়িটা লাড়ু বেঁধে দিলেন।

শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, জ্যাঠাইমার সব দিকে নজর থাকত। আমার জামার বোতাম বসিয়ে দিতেন। কাপড় ছিঁড়ে গেলে নিজে হাতে শেলাই করে দিতেন।

অথচ জ্যাঠাইমা নিঃসন্তান ছিলেন না। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল তাঁর। শুধু তাঁর নয়, তাঁর জায়েদেরও। তাছাড়া বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত লেগেই থাকত। সকলেরই সেবা করতেন জ্যাঠাইমা। একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সর্বদাই তাঁর পিছু পিছু ঘুরত। জ্যাঠাইমার একটু আদর, একটু মনোযোগ সকলেরই চাই। আর

সেটুকু তিনি দিতেন সবাইকে। কারও নাকটা মুছিয়ে দিচ্ছেন, কাকেও জামাটা ছাড়িয়ে দিচ্ছেন, কারও গা থেকে বা ঝেড়ে দিচ্ছেন ধুলো।

জ্যাঠাইমা মাঝে মাঝে মনিহারীতে যেতেন আমাদের বাড়ি। কত জিনিস, কত রকম অবিশ্বাস্য জিনিস যে নিয়ে যেতেন, তার ঠিক নেই। নতুন কুলো, ধামা নানা আকারের, একঝুড়ি পাহাড়ী আম, আমসি, আমসত্ব, কলা, নেবু—অর্থাৎ তখন হাতের কাছে যা পেতেন তাই নিয়ে যেতেন। কুলো আর ধামা প্রায়ই নিয়ে যেতেন, ওখানে যে হাট হত সে হাটের কুলো আর ধামার নাম ছিল। জ্যাঠাইমা আর একটা জিনিসও আনতেন—টোপা কুল। আর আতা। পাহাড়ী আতা।

জ্যাঠাইমার সঙ্গে আর একটা স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। কাঁথা। এখন পুরোনো কাপড় অনেকে বিক্রি করে দিয়ে শৌখিন বাসনপত্র কেনেন। জ্যাঠাইমা তা দিতেন না। তিনি পুরোনো কাপড় জমিয়ে জমিয়ে কাঁথা তৈরি করতেন। কাঁথা করে বাড়ির জন্যে তো রাখতেনই, বিতরণও করতেন অনেককে। আমার কাছে তাঁর দেওয়া একটা কাঁথা বহু দিন ছিল।

আমি যেদিন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আসি সেদিন জ্যাঠাইমার বাড়িতে আমার স্পেশাল নেমন্তন্ন হয়েছিল। আমি যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি, এটা যেন তাঁরই বিশেষ কৃতিত্ব। সকালে যখন গেলাম আশা করেছিলাম জ্যাঠাইমার হাসি-মুখ দেখব। গিয়ে কিন্তু দেখলুম, তিনি কাঁদছেন। আমাকে দেখে তাঁর কান্না যেন আরও উথলে উঠল। আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর ভাঙাগলায় বললেন, "কালই তো তুই চলে যাবি। তোকে আর তো দেখতে পাব না বাবা। জ্যাঠাইমাকে মনে থাকবে তো?"

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, থাকবে।

কিন্তু থাকে নি।

দুই

পরবর্তী জীবনে আমাকেও নানা উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। আই. এস্-সি. পড়তে পড়তেই কঠিন অসুখে পড়ি। সেরে উঠতে প্রায় ছ মাস লাগল। তারপরই আমার বাবা মারা গেলেন। আমিই বড় ছেলে, সংসারের ভার আমার ঘাড়ে পড়ল। নিজের পড়া বন্ধ করে প্রাইভেট ট্যুশনি করে সংসার চালাতে লাগলাম। বাবা বড় চাকরি করতেন, তাঁর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা যখন হাতে এল তখন অর্থাভাব খানিকটা ঘুচল। আমি আবার পড়া আরম্ভ করলাম। বি. এস্-সি. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিপদ। প্রেমে পড়ে গেলাম। সাধারণ প্রেম নয়, গভীর পাকা প্রেম। মেয়েটিকে বিয়ে করতে হল। অসবর্ণ বিবাহ। মা বউকে বাড়িতে নিলেন না। আমার পড়ার খরচও বন্ধ হল। এই সময় আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। একটা নামজাদা

মাসিক পত্রিকায় আমার একটা গল্প প্রকাশিত হয়ে গেল এবং তা বহু রসিকজনের প্রশংসা লাভ করল। বায়রনের যেমন হয়েছিল, আমারও তেমনি হল অনেকটা—

I rose one morning and found myself famous :—

এর পর আর কলেজে না গিয়ে মাসিকপত্রের আপিসগুলিতে যাতায়াত শুরু করলাম। পসার জমে গেল, আয়ও হতে লাগল কিছু কিছু। মনে শান্তি ছিল না কিন্তু। আমার যে ছেলেটি হয়েছিল, সেটি পোলিও রোগে আক্রান্ত হল। তাকে নিয়ে বোম্বে গিয়ে থাকতে হল অনেকদিন। তবু বাঁচল না সে। শোকার্ত হয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। আমার স্ত্রী প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেল। দু হাতে মাথার চুল মুঠো করে ধরে যন্ত্রণাহত পশুর মতো চীৎকার করত। ঘুমের ঘোরেও বিড়বিড় করে বলত—মায়ের অভিশাপ, মায়ের অভিশাপ। সে-ও শেষ পর্যন্ত বাঁচল না। এই সব নিয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস লিখে ফেললাম একটা। খ্যাতি আরও বাড়ল। টাকার অভাব রইল না, কিন্তু মনের শান্তি ছিল না একেবারে। দ্বিতীয় বার বিয়ে করলাম। এইসব সাংসারিক ঝঞ্ঝাট তো ছিলই, সাহিত্যিক জীবনের ঝঞ্ঝাটও কম ছিল না। যাঁরা বড় শহরে সাহিত্যিক আবর্তের মধ্যে আছেন তাঁদের অবিদিত নেই যে সে-জীবনের জটিলতাও কিছু কম নয়। রসের বাজারেও 'তেজী মন্দী' আছে, সেখানেও নানারকম চক্রান্ত সর্বদা ওত পেতে থাকে, সেখানেও প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে হানা দিয়ে না বেড়ালে প্রাপ্য টাকা পাওয়া যায় না। সেখানেও স্থানে স্থানে 'চণ্ডীমণ্ডপ' আছে এবং সাহিত্যিক-রাও নিছক পর-নিন্দা পর-চর্চা করে থাকেন সেখানে। এই সাহিত্যিক সমাজেও প্রচ্ছন্ন শত্রুর সংখ্যা কম নয়। যিনি নমস্কার করে হেসে হেসে আপনার সঙ্গে কথা কইছেন, তিনি যে একটু আগেই আপনার শ্রাদ্ধ করছিলেন, তা প্রথম প্রথম বোঝা যায় না। কিন্তু একটু অভিজ্ঞতা হলেই যায়। সাহিত্য-সমাজেও রাজনীতি আছে এবং সে-রাজনীতির দাবা খেলায় স-মনস্ক না থাকলে অনেক সময়ে বিপদে পড়তে হয়।

এই সব নিয়েই ছিলাম।

জ্যাঠাইমার কথা মনে ছিল না।

তিন

প্রায় পঁচিশ বছর পরে।

নবীনগঞ্জ কলেজে এক সাহিত্যিক সভায় সভাপতিত্ব করবার নিমন্ত্রণ পেলাম। নবীনগঞ্জেই আমার স্কুল জীবন কেটেছে, সেইখানেই জ্যাঠাইমা ছিলেন। খবর পেয়েছিলাম জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর কৃতী ছেলেরা জীবনের নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেদের। নবীনগঞ্জ শহরও বদলে গেছে। পিচঢালা রাস্তা, নিওন লাইট, বড় বড় নূতন বাড়ি, সে নবীনগঞ্জকে আর চেনবার উপায় নেই।

যেসব লোকজনকে দেখলাম তাদের মধ্যে পুরোনো চেনামুখ একটাও দেখতে পেলাম

না। ভেবেছিলাম সভা শেষ হলে কোনও পুরোনো লোককে খুঁজে পুরোনো দিনের কথা আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু সভার কর্মসূচী এত দীর্ঘ যে সভা শেষ হতে প্রায় রাত্রি দশটা বেজে গেল। আমার অভিভাষণটাও বেশ লম্বা হয়েছিল।

যাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা একটা হোটেলে করেছেন। আমার ট্রেন রাত বারোটায় ছেড়ে যায়, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে হোটেলের দিকে অগ্রসর হলাম।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত হোটেল। কলেজের প্রিন্সিপাল বললেন, 'এখানে সব রকম খাবারই পাওয়া যাবে। ওরা মেনুটা দিয়ে যাচ্ছে, আপনি কি কি খাবেন দাগ দিয়ে দিন। বিলটা আমরা দিয়ে দেব।' মেনু এল। পোলাও পাঁচ টাকা প্লেট, ভাত দু' টাকা, রুটি প্রত্যেকটি চার আনা, ফাউল কাট্‌লেট্ প্রতিটি দেড় টাকা, মটন কাট্‌লেট প্রতিটি বারো আনা, মাংস এক প্লেট দু' টাকা, মুর্গির মাংস এক প্লেট চার টাকা, নিরামিষ তরকারি প্রতি প্লেট আট আনা। পুডিং এক প্লেট দু' টাকা। আরও নানা-রকম খাবারের ফর্দ ছিল। আমি কয়েকটাতে দাগ দিয়ে দিলাম।

খেতে খেতে একটি ছোকরাকে বললাম, "এই পাড়াতেই বোধ হয় আমার জ্যাঠাই-মার বাড়ি ছিল—সেটা কোথায় বলতে পার ?"

ছোকরা বললে, "আপনার জ্যাঠামশায়ের নাম কি বলুন তো—"

"যোগেন মুকুজ্যে—"

"এইটেই তো তাঁর বাড়ি। তাঁর ছেলেরা বিক্রি করে দিয়েছিল। সে বাড়ি ভেঙে-চুরে এই পাঞ্জাবীরা হোটেল করেছে এখানে—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

জ্যাঠাইমার বাড়ি হোটেল হয়েছে !

এখানে প্রত্যেক খাবারের জন্যে দাম দিতে হয় !

"খাচ্ছেন না যে—"

"না, আর খাব না, পেট ভরে গেছে।"

হারিয়ে গেছে

প্রথমেই চোখ খুলে সে অবাক হয়ে গেল। এ কোথায় এলাম ! মাথার উপর নীল গলির মতো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি ! সামনে সবুজ থামের মতো। রঙীন ওই জিনিসটা কি, উড়ছে,···অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সে। এ কোথায় এলাম !

তারপরই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কোট-প্যাণ্ট-পরা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, ঘন ভ্রূ, তাতেও পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। গোঁফ দাড়ি কামানো। বেশ

বলিষ্ঠ ভারী মুখ। গম্ভীর রাশভারী চেহারা। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতো চেহারা মোটেই নয়। সবাই ভয়ই করে তাঁকে। জেলা-জজ তিনি।

এর কিন্তু মনে হল ও তার খেলার সাথী হবে বোধ হয়। চোখাচোখি হলেই ছুটে আসবে তার কাছে।

জজ সাহেব কিন্তু দেখতেই পেলেন না তাকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ব্রাশ চালাতে লাগলেন। তারপর 'টাই'টা বাঁধতে লাগলেন নানা মুখভঙ্গী করে।

ঝন ঝন ঝন ঝন করে ফোনটা বেজে উঠল।

"হ্যালো, কে—ও মিস্টার বোস, গুডমর্নিং—"

"হ্যাঁ আজ সেই ফাঁসির কেসটার রায় বেরুবে। কি হবে তা আগে থেকে বলতে পারব না। মাপ করবেন।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চাপা কণ্ঠে বললেন, "পাজি কোথাকার।"

সে অবাক হয়ে ভাবছিল—ও বাবা, এ যে বড্ড রাগী দেখছি! আমার সঙ্গে ভাব হলে কিন্তু অত রাগ চলবে না, সে আমি ঠিক করে নেব।

সে আশা করতে লাগল চোখাচোখি হলেই ওর সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে। ও, ওই গম্ভীর জজটা, তখন খেলা করবে তার সঙ্গে। ও কে? ওকে কি দেখেছি কখনও? ভাবতে লাগল সে। তারপর অনেক দিন আগে দেখা স্বপ্নের একটা ছবি জেগে উঠল মনে। একটি বালক পল্লীর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি ছোট ফুল দেখে সবিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ল—কি সুন্দর। এ কি সেই ছেলেটি? হ্যাঁ, সেই ছেলেটিই। সব মনে পড়ে গেল তার।

"হুজুর, মোটর স্টার্ট নেহি লেতা।" চাকরটি সেলাম করে এসে খবর দিলে।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন জজ সাহেব: "ওই নতুন ড্রাইভারটাকে দূর করে দাও। জমীরকে ডেকে আন—"

চাকরটি সেলাম করে চলে গেল। এইবার জজ-সাহেব জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। চোখাচোখি হল।

"নকু, নকু, নকু—"

বজ্র-গর্জনে চেঁচিয়ে উঠলেন জজ-সাহেব।

চাকর নকু এসে দাঁড়াল।

"জানলার কোণে জঙ্গুলে গাছ জন্মেছে, দেখতে পাও না? পরিষ্কার করে দাও এক্ষুনি।"

নকু ফুল সুদ্ধ বুনো গাছটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রথমে মাথাব্যথা থেকে শুরু হল। তারপর পর পর কয়েকটা হাঁচি। হেঁচে মাথাটা পরিষ্কার হল না। রগের কাছে আর দুই ভ্রূর মাঝখানে ব্যথা আরও জমে বসল যেন। অসহায় বোধ করতে লাগলাম। জানি কোনও উপকার হবে না তবু নস্যি নিলাম। আবার হাঁচি। এবার তপতী এল। মনে হল যেন আরাম পেলাম একটু। রোদও ঢুকল একটু জানলা দিয়ে। পড়ল তপতীর শাড়ির লাল পাড়ে আর গালের উপর। মনে হল আমার মনের আকাশও একটু রঙীন হয়ে উঠল যেন।

"আপনি হাঁচছেন কেন বারবার? কি হল?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথাটা বড় ব্যথা করছে।"

নিজের হাত দিয়েই রগ দুটো টিপে ধরলাম।

"আমি টিপে দেব?"

"না থাক, তোমাকে আর কষ্ট দেব না।"

একটু হেসে তপতী বললে—"এতে আর কষ্টের কি আছে। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি খুব ভাল মাথা টিপতে পারি। দাদারও মাথা ধরে মাঝে মাঝে। আমি মাথা টিপে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। নিন, শুয়ে পড়ুন। চোখ বুজে থাকতে হবে। অমন করে চেয়ে আছেন কেন?"

শুয়ে চোখ বুজলাম।

তপতী মাথা টিপতে লাগল।

বিকেলবেলা বেশ জ্বর হল।

তপতীই টেম্পারেচার নিয়ে বললে—"বেশ জ্বর হয়েছে আপনার। প্রায় ১০৩-এর কাছাকাছি। ডাক্তার ডাকবেন? কে আপনার ডাক্তার?"

ডাক্তারের নাম আর ফোন নম্বর বলে দিলাম।

তপতী পাশের ঘরে গিয়ে ফোন করতে লাগল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। তপতীর গলার স্বর যেন কাকাতুয়ার স্বরের মতো। মানসচক্ষে তার মাথার উপর একটা ঝুঁটিও যেন দেখতে পেলাম, ক্ষণে ক্ষণে খুলে যাচ্ছে উত্তেজনাভরে আর তার ভিতর দেখা যাচ্ছে গোলাপী রঙের আভা। অত কি কথা কইছে ডাক্তারের সঙ্গে! আলাপ আছে নাকি! হাসছে মাঝে মাঝে!

"না না, আমি এমনিই বেড়াতে এসেছি। উনি আমার দাদার বন্ধু তো। ওঁর মা? ভালই আছেন। তবে উনি তো চোখে দেখতে পান না, কানেও শুনতে পান না। হ্যাঁ, মায়ের দাই আমি আসবার আগেই ফিরে এসেছে। তা না হলে তো আমি মহা মুশকিলে পড়ে যেতুম। ছটুকু চাকরটা অবশ্য খুব কাজের।" অকারণে আবার একটা কথা মনে হল। বার্ড অব প্যারাডাইসের স্বর কেমন?

তপতী ফিরে এসে বললে—"ডাক্তারবাবু একটু পরেই আসছেন। লোকটিকে বেশ ভালই মনে হল। মায়ের খবর নিচ্ছিলেন। বললেন, এই শীতেই ওর ছানি কেটে দেবেন। আচ্ছা, ওর কি বিয়ে হয়েছে? আমার বন্ধু রুণুর একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাঁর নামও অমৃত সেন।"

"না, এঁর বিয়ে হয় নি।"

পাশ ফিরে শুলাম। রাগের শির ছুটো দপ দপ করতে লাগল। মনে হল সর্বাঙ্গ যেন কে চিবুচ্ছে।

ডাক্তার সেন একটু পরে এলেন।

বললেন, "ফ্লু হয়েছে। একটা মিকচার দিয়ে যাচ্ছি। চার ঘণ্টা অন্তর খাবেন। আর তিন দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। কমপ্লিট রেস্ট।" তারপর তপতীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "আপনিও আপনার রুমালে ইউক্যালিপটাস ছড়িয়ে নিন। শুঁকবেন মাঝে মাঝে, রোগটা ভারি ছোঁয়াচে।"

মনে হল ডাক্তার সেন একটু যেন বেশী ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে চাইলেন তপতীর দিকে।

ভাই সমর,

তপতী দার্জিলিং থেকে তোমাদের ওখানে গেছে। ওকে তোমার কেমন লাগছে? বুঝতেই পারছ কেন একথা লিখছি। বোনটিকে সৎপাত্রে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু সৎপাত্র কোথায়? কথাটা তুমি একটু ভেবে দেখ ভাই। ইতি—

নরেন

চিঠি নয়, স্বপ্ন। এ রকম স্বপ্ন দেখার মানে?

মাথাটা আবার টিপ টিপ করছে।

"ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু।"

মাথা ছুলিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল তপতী।

নিপুণভাবে ওষুধটি শিশি থেকে ঢেলে নিপুণভাবে খাইয়ে রঙীন তোয়ালে দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দিলে।

বড় ছুর্বল বোধ করছি।

সন্ধ্যার পর গলার ভিতরটা যেন কুটকুট করতে লাগল।

"তপতী—"

"কি?"

"না, থাক—"

"কি বলুন না?"

"গলার ভিতরে টর্চ দিয়ে দেখবে? বড্ড কুটকুট করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে—থাক, তোমার ছোঁয়াচ লেগে যাবে।"

"না না, তাতে কি। আমার কিছু হবে না। কিন্তু দেখে আমি কিছু বুঝব কি! আচ্ছা দেখছি—"

টর্চ নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে অনেকক্ষণ দেখল তপতী।

"লাল দেখছি কেবল—"

"লাল ?"

হঠাৎ কেমন যেন একটা প্রেরণা পেলাম।

"মেণ্ডলস্ পিগমেণ্ট গলায় লাগিয়ে দাও তো। ও ঘরের তাকে আছে শিশিটা। ছোট্ট শিশি!"

একটি চমৎকার তুলি বানিয়ে নিয়ে এল তপতী।

"হাঁ করুন। পিছন দিকের লাল জায়গাটায় লাগিয়ে দেব তো ?"

"হ্যাঁ, ভিতরের দিকে। যেখানে খুশি লাগাও—"

নিজেরই মনে হল কথাগুলো অসংলগ্ন হচ্ছে।

সত্যিই বেশ ভাল করে লাগিয়ে দিলে পিগমেণ্টটা।···বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

তার পরদিন সত্যিই নরেনের চিঠি এল।

ভাই সমর,

তপতীকে চিঠি পেয়েই পাঠিয়ে দিও। তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। জামা কাপড় গয়না কেনার সময় তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কোনমতেই যেন ওখানে আর দেরি না করে। ভালবাসা জেনো। মাকে প্রণাম দিও।

—নরেন

পরদিনই জ্বর ছেড়ে গেল।

মাথা গলা বুক সব পরিষ্কার।

কোথাও ব্যথার লেশ নেই।

যাবার সময় তপতী যখন প্রণাম করতে এল—বললাম, "আশীর্বাদ করি সুখী হও।"

চুলুহা

আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের মনিহারীর বাড়িতে চুলুহা নামে এক চাকর ছিল। তাহার প্রবল প্রতাপে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। এমন কি চোরেরা পর্যন্ত। ইহার কথা অন্য কোথাও লিখিয়াছি কিনা মনে নাই। লিখিয়া থাকিলেও ক্ষতি নাই, মহাপুরুষদের জীবনী একাধিক বার লেখা চলে।

চুলুহাকে মহাপুরুষ বলিতেছি কারণ সে শক্তিমান ছিল। একবার একটা চোর আমাদের বাড়িতে ধরা পড়ে। চুলুহা তাহার বাঁ পা ধরিয়া বনবন করিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিল। তাহার পর যখন তাহাকে ফেলিয়া দিল তখন সে রক্তবমি করিতেছে। বাবা ভয় পাইয়া গেলেন।

"এ কি করলি চুলুহা, যদি মরে যায় ?"

"মরে যায়, পুঁতে দেব। কিন্তু ও শালা মরবে না। ও আমার ভাই মুলুক, বাড়ি থেকে পালিয়েছিল অনেক দিন আগে। ওর মোড়া কাল দেখেই চিনেছি ওকে।"

মুলুক মরে নাই। দুই একদিন আমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া আবার সরিয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে আমাদের বাড়িতে আর চোরের উপদ্রব হয় নাই।

লম্বা চওড়া বিশাল চেহারা ছিল চুলুহার। এক সের চালের ভাত খাইত। আধ সের ছাতু জলখাবার। আমাদের চাষের জমিতে চুলুহা কাজ করিত। মাটি কোপাইত, লাঙল দিত, জঙ্গল পরিষ্কার করিত, পাহারা দিত। বাবা খুব ভালবাসিতেন চুলুহাকে। ভালবাসিতেন তাহার সরলতার জন্য।

একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বাহিরে দুইজন ভদ্রলোক অতিথি আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া বাবার সহিত গল্প করিতেছেন। চুলুহা বাড়ির ভিতর ছিল। মা তাহাকে বলিলেন, "দাঁড়া, খাবার দিচ্ছি, বাইরে যে দু'জন বাবু এসেছেন তাঁদের দিয়ে আয়।"

মা দুটি প্লেটে করিয়া হালুয়া দিলেন।

একটু পরেই চুলুহা খালি প্লেট দুটি লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"মাইজি, আবার দিন—"

"আরও চাইছেন ওঁরা ?"

"না, ও দুটো আমি খেয়ে ফেলেছি। বড় লোভ লাগল। লোভ-লাগা জিনিস কি কাউকে দিতে আছে ? পেটের অসুখ করবে যে।"

"তুই কি কুকুর না কি ! যা পাবি সামনে খেয়ে ফেলবি ?"

"হাঁ, আমি কুকুরই তো। বুল ড—গ।"

চোখ বড় বড় করিয়া ব্যায়ত আননে সে বুলডগের অভিনয় করিল। কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে এক ভদ্রলোক ভীষণদর্শন একটা বুলডগ লইয়া আসিয়াছিলেন।

"বেরো মুখ-পোড়া, বেরো তুই—"

চুলুহা কিন্তু নড়িল না।

"আর খাব না। কান মলছি।"

সত্যই সে নিজের কান দুইটা ধরিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চুলুহার আর একটা ছবি মনে পড়িতেছে। সেদিন আমাদের বাগান পরিষ্কার

করানো হইতেছিল। বাগান আমাদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে। একটু পরে দেখিলাম দুইটা প্রকাণ্ড কলাগাছ আমাদের বাড়ির দিকে চলিয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে দেখিলাম তিনটা। আরও কাছে আসিলে দেখা গেল কলাগাছ তিনটার মধ্যে চুলুহা রহিয়াছে। সে একটা কলাগাছ পিঠে দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছে এবং দুইটাকে বুকের উপর জাপটাইয়া ধরিয়া আছে। সেই অবস্থায় সে সোজা বাড়ির সামনে গিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"মাঈজি, থোড় এনেছি—"

মা বাহির হইয়া আসিলেন।

"ওকি, কেটে আনতে পারিস নি? গন্ধমাদন বয়ে এনেছিস! হনুমান কোথাকার!"

চুলুহা মহানন্দে খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

চুলুহা টাইট জিনিস পরিতে ভালবাসিত। হাটে যখন গেঞ্জি কিনিত তখন সবচেয়ে যে গেঞ্জিটা তাহার টাইট হইত সেইটাই কিনিত সে। অনেক সময় গেঞ্জি পরিয়া সে ভাল করিয়া হাত নামাইতে পারিত না। গেঞ্জি বেশীদিন টিকিত না। কিন্তু চুলুহা তাহা গ্রাহ্য করিত না। জুতাও তাই। মহিষের চামড়ার টাইট জুতা কিনিয়া রেড়ির তেলে ভিজাইয়া রাখিত এবং মাঝে মাঝে পা ঢুকাইয়া দেখিত অবাধ্য জুতা শায়েস্তা হইয়াছে কি না।

প্রতিদিন দেখিত আর খিক্ খিক্ করিয়া হাসিত। চুলুহা মাকুন্দ ছিল, তাহার হাসি শিশুর হাসি বলিয়া মনে হইত।

তাহার পর চুলুহা একদিন অন্তর্ধান করিল।

সকলে বলিল সে বেশী রোজগারের আশায় অন্যত্র গিয়াছে। সম্ভবত কোন বড় শহরে বা বন্দরে।

দুই

পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু সুখ হারাইয়াছি। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, চাকর নাই, চাকরি নাই। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শহরের একটা গলিতে একতলা একটা নোংরা বাসায় বাস করি। আমার স্ত্রী একাধারে চাকর-চাকরানী রাঁধুনী ও ধোপানীর কাজ করে। আর আমি আমার ডিসপেনসারিতে প্রত্যহ গিয়া ভ্যারাণ্ডা ভাজি। রোগী কখনও জোটে কখনও জোটে না। এ অবস্থায় সকলের সাধারণত যাহা হয় আমারও তাহাই হইয়াছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহাকে হাত দেখাইতাম, জানিতে চাহিতাম ভাগ্যোদয় কবে হইবে। অনেক সাধু অনেক রকম আশ্বাস দিত, একটাও ফলিত না।

"ব্যোম্ ভোলানাথ, কুছ মিলে বাবা—"

রোগা লম্বা আবক্ষ-গোঁফদাড়ি সমন্বিত জটাজুটধারী এক সাধু আসিয়া হাজির হইল একদিন। গায়ে আলখাল্লা।

"কুছ্ ভিক্ছা মিলে বাবা—"

"হাত দেখে যদি কিছু বলতে পার, দেব কিছু। হাত দেখতে জান?"

"জানি।"

সাধু ভিতরে আসিয়া গম্ভীরভাবে বসিল এবং আমার করতল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর কপাল দেখিল। বাল্যকালে সুবোধ বালক ছিলাম না, কপালে একটা কাটা দাগ ছিল।

"ই দাগ কেইসা হুয়া?"

বলিলাম ছেলেবেলায় আমাদের চুলুহা বলিয়া একটি চাকর ছিল। সে আমাকে দুই হাতে তুলিয়া ছুঁড়িয়া দিত, তাহার পর লুফিয়া লইত। একদিন আমারই দোষে হাত ফসকাইয়া গিয়াছিল, কারণ আমি নিজেই লাফাইয়া নামিব ঠিক করিয়া অন্যদিকে লাফ দিয়াছিলাম। মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাই, কপাল কাটিয়া যায়।

সাধু বলিল, "খুব শুভ লছ্ছন্। আপকা আজই কুছ রূপিয়া মিল যায়েগা।"

তাহার পর সাধু জিজ্ঞেস করিল—আমার বিবাহ হইয়াছে কি না। সন্তানাদি কয়টি।

বলিলাম, "মাত্র এক বছর বিয়ে হয়েছে। ছেলেপিলে হয় নি এখনও।"

সাধু বলিল সে আমার স্ত্রীরও হাত দেখিতে চায়। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি লইয়া গেলাম। বাড়ির বাহিরের বারান্দায় তাহাকে বসাইয়া ভিতরে গেলাম স্ত্রীকে খবর দিতে।

দেখিলাম স্ত্রী তখন গাছ-কোমর বাঁধিয়া মসলা পিষিতেছেন।

সংক্ষেপে বলিলেন, "আমার এখন মরবার সময় নেই। ওসব সাধু-ফাধুদের উপর আমার বিশ্বাসও নেই।"

স্ত্রীর কথায় বিস্মিত হইলাম। ইহারাই ভারতের নারী! সাধুতে বিশ্বাস নাই!

বাহিরে আসিয়া আরও বিস্মিত হইতে হইল। দেখি জটা দাড়ি-গোঁফ আলখাল্লা সব খুলিয়া রাখিয়া টাইট-গেঞ্জি-পরা একটা লোক বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

"আমি চুলুহা। আমাকে চিনতে পারিস নি তো!"

"চুলুহা! কোথায় ছিলি এতদিন!"

"সাধু হয়ে ঘুরছিলাম। অনেক টাকা কামিয়েছি। সব তোকে দেব। ভাল করে একটা ওষুধের দোকান কর। আমি বাকি জীবনটা তোর কাছেই থাকব।"

তাহার পর আমার মুখের দিকে মিটি-মিটি চাহিয়া বলিল, "ভাবছিস, এই রাক্ষসকে খাওয়াবো কি করে? আজকাল খেতে পারি না। একবেলা খাই—চারটি রুটি আর ডাল। নিজের হাতে বানিয়ে নেব।"

বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল।

চুলুহা আমার কাছে বহুদিন ছিল। ঘরের সব কাজ করিত। তাহার দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়া বড় ডিসপেনসারি করিয়া সত্যই আমার অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। কাল সে মারা গিয়াছে। মনে হইতেছে দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম।

জন্মান্তর

অলকাপুরীর আদুরে আর খামখেয়ালী রাজকুমারের মনে সুখ নেই। সে যে কি চায়, কি পেলে যে তার সুখ হবে তা সে নিজেও জানে না। কেবল খুঁতখুঁত করে। ঐশ্বর্যের অভাব নেই, বিলাস অফুরন্ত, কিন্তু তবু তার মনে হয় কি যেন নেই যার অভাবে সবই ফিকে হয়ে গেছে।

কি সে জিনিস ? ধরতে পারে না রাজকুমার।

রোদের আলো-ঝলমল পোশাক দুদিন পরেই খারাপ লাগে, তখন তৈরী হয় জ্যোৎস্নায় তৈরী নূতন পরিচ্ছদ। তা-ও পুরনো হয়ে যায় কয়েকদিন পরে।

তাদের বাগানে পারিজাত ফোটে, ফোটে আরও অসংখ্য রকমের ফুল, গান করে বিচিত্রবর্ণ অনেক পাখি, তাদের অপূর্ব গানে ঝংকৃত হয় ঝরনার আনন্দ। স্বর্গের অপ্সরীরা খেলা করতে আসে রাজকুমারের সঙ্গে। তাদের রূপ, তাদের হাসি, তাদের লীলায়িত নৃত্য-ভঙ্গী চমৎকার। তাদের কেউ যেন প্রজাপতি, কেউ রঙিন ফানুস, কেউ অপরূপ-কান্তি ভ্রমর। দুদিন পরেই কিন্তু রাজকুমার অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কিছু ভালো লাগে না তার। ম্রিয়মাণ হয়ে ভাবে—সবই একঘেয়ে। কতদিন এসব আর ভালো লাগে।

রাজকুমারের পরিচারক সহচর ব্যস্ত হয়ে ওঠে রাজকুমারের মলিন মুখ দেখে। চেষ্টা করে তাকে নূতন পরিবেশে নিয়ে যেতে। নূতন রকম গান, নূতন রকম দৃশ্য, নূতন কিছু করবার চেষ্টা করে সে। কিছুদিন কুমারের মনের প্রসন্নতা ফিরে আসে। কিন্তু তা বরাবর থাকে না। আবার সে যেন কেমন উদাস হয়ে যায়।

একদিন সে নদীর তীরে বসে আকাশের দিকে চেয়েছিল। পাশে সহচর বসে বাঁশিতে বাজাচ্ছিল একটা মন-মাতানো সুর। সুরটা নূতন ধরনের। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে রাজপুত্র শুনছিল সেই সুর। খুব ভাল লাগছিল।

"কোথায় এ সুর শিখলে সহচর ? চমৎকার তো।"

"পার্বতী পাহাড়ে এক কিন্নর আছেন। তিনিই শিখিয়েছেন।"

"চমৎকার !"

বাঁশি থামিয়ে সহচর বললে, "তিনি সাধারণ কিন্নর নন, তিনি সাধক। তাঁর গানে

পাথর গলে জল হয়। তিনি গান গেয়ে পাখিকে ফুলে রূপান্তরিত করেন, ফুলও তাঁর গান শুনে পাখি হয়ে যায়। অদ্ভুত গুণী।"

হঠাৎ রাজকুমার বলে ওঠে, "দেখ দেখ, আকাশে কি কাণ্ড হচ্ছে!"

সহচর চোখ তুলে দেখল আকাশে বিরাট একটা মেঘের প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। সাত মহলা প্রাসাদ। বড় বড় খিলান, গম্বুজ, মিনার, মিনারেট সব আছে তাতে।

রাজকুমার বললে, "আমাদের স্ফটিকের প্রাসাদ এর কাছে তুচ্ছ। আহা আমি যদি ওই রকম মেঘের প্রাসাদে বাস করবার সুযোগ পেতুম!"

মেঘের প্রাসাদ ক্রমশ রূপ বদলাতে লাগল। তার গম্বুজ, মিনার, মিনারেটগুলো যেন বেঁকে বেঁকে যেতে লাগল ক্রমশ। দেখতে দেখতে সেগুলো হয়ে গেল ঠিক হাতির শুঁড়ের মতো। প্রাসাদ গেল মিলিয়ে, মনে হতে লাগল একদল বিরাট বিরাট হাতি যেন জড়াজড়ি করে শুঁড় তুলে আনন্দ করছে। হাতির দলও রইল না। ক্রমশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব। খানিকটা হল প্রকাণ্ড হাঁস, খানিকটা কুমীর, কিছু কিছু অংশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল নীল আকাশে বরফের দ্বীপের মতো। খানিকটা হয়ে গেল পেঁজা-তুলোর বিরাট স্তূপ।

সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল রাজকুমার। তার মন ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল মেঘের সঙ্গে। তারপর সে সহচরের দিকে ফিরে বললে, "ভাই, মানুষ হয়ে সুখ নেই। মেঘ হয়েই সুখ।"

"কেন?"

"মেঘ কেমন বদলাতে পারে। প্রাসাদ থেকে হাতির দল হয়ে যেতে পারে অনায়াসে। তারপর হাঁস, কুমীর—কত কি। আহা, যদি মেঘ হতে পারতুম! নিস্তার পেতাম এই একঘেয়ে জীবন থেকে।"

তারপর হঠাৎ সে উঠে বসল। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সহচরের মুখের দিকে।

"তুমি এখনি বললে না পার্বতী পাহাড়ের সেই কিন্নর গান গেয়ে পাথরকে জল করে দেয়। পাখিকে ফুলে রূপান্তরিত করে। সে কি আমাকে মেঘ করে দিতে পারবে?"

"তা তো জানি না। খামখেয়ালী মানুষ, কি করবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত।"

"চল এক্ষুনি যাই তাঁর কাছে।"

আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল রাজকুমার।

"এখন? তিনি থাকেন পার্বতী পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা গুহার ভিতর। গুহার সামনে খানিকটা জায়গা আছে, সেইখানে এসে বসেন মাঝে মাঝে আর গান করেন। এখন গেলে সেখানে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তোমার বাবা মা ভাববেন না?"

"মা বাবাকে একটা খবর দিয়ে যাই চল। মল্লিনাথকে বলে যাই আমরা শিকারে বেরুচ্ছি, ফিরতে হয়তো একটু দেরি হবে, বাবা মা যেন না ভাবেন।"

মল্লিনাথ বাগানের মালী।

তাই হল। তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে পার্বতী পাহাড়ের উদ্দেশে।

দুই

পার্বতী পাহাড়ে ওঠা সহজ নয়। সোজা খাড়াই ভেঙে উঠতে হয় পাথর আঁকড়ে আঁকড়ে। পায়ে চলার পথ নেই, কারণ পার্বতী পাহাড়ে কেউ ওঠে না। যে কিন্নর ওখানে থাকেন তাঁর ভয়ে কেউ যায় না সেখানে। পাহাড়ের আশে-পাশে কয়েকটা পাহাড়ী ছাগল দেখা যায়। একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় বেশ বলিষ্ঠ বড় ছাগল। জনশ্রুতি ওরা নাকি মানুষ ছিল, কিন্নর ওদের ছাগল করে দিয়েছেন। ওরা আগে ডাকাত ছিল, ছাগল হয়ে ওদের স্বভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন বেশ শান্তশিষ্ট।

কিছুদূর উঠে রাজকুমার আর সহচর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হাত পা আর যেন চলছে না। দুজনে দুটো পাথরের উপর বসে হাঁপাতে লাগল। আশ্চর্য, একটু পরেই দুজনের কাছে দুটো ছাগল এসে দাঁড়াল। বেশ বলিষ্ঠ এবং বড়, প্রায় টাট্টু ঘোড়ার মতো। তারা এসে কাছে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল তাদের দিকে। যদিও কথায় তারা কিছু বলল না, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল, 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? আমাদের পিঠে চড় না। পৌঁছে দেব তোমাদের কিন্নরের কাছে।"

রাজকুমার এবং সহচর চাইল পরস্পরের দিকে। দুজনের মনেই ছাগলদের নীরব আমন্ত্রণ পৌঁছেছে বোঝা গেল। কালবিলম্ব না করে ছাগল দুটোর পিঠে চড়ে বসল দুজনে।

•

পার্বতী পাহাড়ের শিখরের কাছে যখন পৌঁছল তারা, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু তারা সবিস্ময়ে দেখল যে গুহাটার ভিতর কিন্নর থাকেন সেই গুহাটার ভিতর থেকে আলো বেরুচ্ছে। আলো আর গান। গানই অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলেছে যেন। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু গুহার সামনে স্বচ্ছ দিনের আলো। ছাগল দুটো গুহার একটু দূরেই নামিয়ে দিল তাদের। গুহার খুব কাছাকাছি আর গেল না তারা। সম্ভবত যাওয়ার সাহস হল না।

তিন

গুহার সামনে গিয়ে রাজকুমার আর সহচর সেই আলোকিত স্থানটায় চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার-গলানো অদ্ভুত সুর ভেসে আসছে ভিতর থেকে। কখন যে তাদের চোখ বুজে গেছে, কখন যে তারা কৃতাঞ্জলি হয়েছে তা তারা নিজেরাই জানে না।

অনেকক্ষণ পরে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন হল, "কে তোমরা, কি চাও ?"

রাজকুমার চোখ খুলে দেখল সৌম্যকান্তি এক দিব্যপুরুষ গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, পদ্মপলাশ নয়ন থেকে করুণাময় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সমস্ত শরীর থেকে বেরুচ্ছে অপরূপ আলোর জ্যোতি। এই অনবদ্য আবির্ভাবের দিকে চেয়ে রাজকুমার রুদ্ধবাক্ হয়ে গেল।

সহচর বললে, "প্রভু, ইনি অলকাপুরীর রাজকুমার। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও এঁর জীবনে কোন সুখ নেই। তাই ইনি মেঘ হতে চান। এঁর বিশ্বাস সতত পরিবর্তনশীল মেঘরূপে ইনি জীবনের পূর্ণ স্বাদ পাবেন।"

কিন্নর বললেন, "বেশ। মানুষকে মেঘে পরিণত করতে হলে প্রথমে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে হয়। আমি মন্ত্রবলে বাঘকে ডাকছি, সে আগে তোমাদের দেহকে ছিন্নভিন্ন করুক। তারপর আমি তার থেকে মেঘ সৃষ্টি করব।"

এই বলে তিনি শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে এক স্তব আওড়াতে লাগলেন গম্ভীর কণ্ঠে। স্তব থামতে না থামতেই এক বিরাটকায় ভীষণ বাঘ এসে সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে ছুটে পালাল সহচর। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বাঘের মুখে পড়তে হবে তা সে ভাবে নি।

রাজকুমার কিন্তু নড়ল না। স্থির হয়ে বসে রইল সে।

কিন্নর বললেন, "বাঘের মুখে নিজেকে সমর্পণ কর।"

"আমি প্রস্তুত হয়েই আছি, বাঘকে আদেশ দিন সে আমাকে ছিন্নভিন্ন করুক।"

হঠাৎ কিন্নর হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন। বাঘ অন্তর্ধান করল।

তখন তিনি কুমারকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমার সাহস দেখে খুশী হয়েছি। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। তুমি পদ্মাসনে ভাল করে বসে মেঘের চিন্তা কর। আমি গান গাইছি।"

রাজকুমার পদ্মাসনে বসে মেঘের চিন্তা করতে লাগল। কিন্নর যে গান ধরলেন তা অপূর্ব। তা আকাশের গান, হাওয়ার গান, মুক্তির গান, ব্যাপ্তির গান।

রাজকুমার ক্রমশ মেঘে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে চলে গেল। ভাসতে লাগল সেখানে। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রদের আলো গায়ে লাগল। রামধনু মূর্ত হল তাকে ঘিরে। অসীম মুক্তি অনাবিল আনন্দের আভাস পেল রাজকুমার।

ক্রমশ অন্য মেঘেদের সঙ্গে ভাব হল।

স্তর, স্তূপ, পালক, কোদালে-কুড়ুলে, রঙিন, কালো, বরফের মতো সাদা—নানারকম মেঘ ভেসে ভেসে এল তার কাছে। শুনল তার কাহিনী। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

বললে, "মানুষ ছিলে, মেঘ হয়েছ ! এ কি তোমার পাগলামি !"

"আমি আকাশে থাকতে চাই।"

"আকাশে কি বেশী দিন থাকতে পারবে? জল হয়ে ঝরে পড়তে হবে পৃথিবীতে। পৃথিবীর সেই জল সূর্যের তাপে আবার বাষ্প হয়ে যাবে। আবার মেঘ হবে তুমি। এই একঘেয়ে জীবন চলবে চিরকাল।"

শুনে অবাক্ হয়ে গেল রাজকুমার

মানুষের জীবনের মতো মেঘের জীবনও তাহলে একঘেয়ে!

চার

রাজকুমার যেদিন জল হয়ে পৃথিবীতে নামল সেদিন এক অদ্ভুত বর্ষার দিন। ঝর ঝর করে রাজকুমার ঝরে পড়ল এক গরিব কৃষকের আঙিনায়।

সবটা এক জায়গায় পড়ল না।

খানিকটা মাটিতে শুষে গেল, খানিকটা পড়ল একটা ভাঙা হাঁড়িতে, খানিকটা পড়ল পিছনের পুকুরে।

যেখানেই পড়ুক রাজকুমারের মন কিন্তু ঘুরতে লাগল কৃষকের কুটীরকে কেন্দ্র করে। দেখত সকালে উঠে দীনু (কৃষকের নাম) বাসী ভাত খেয়ে লাঙল কাঁধে নিয়ে চলে যেত মাঠে। তার বউ পারুল ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ঘর নিকোত, উঠোন ঝাড়ু দিত, গোয়াল পরিষ্কার করত, ঘুঁটে দিত, ঢেঁকিতে পাড়ও দিত মাঝে মাঝে। তারপর উনুন জেলে রান্না করতে বসত। সর্বদা ব্যস্ত।

আর তার ছেলে কানু, পাঁচ ছ'বছর বয়স, কিন্তু সেও সর্বদা ব্যস্ত। ধুলো কাদা নিয়ে খেলা করছে, কাগজে নেকড়ার ফালি বেঁধে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, একটা নেকড়ার বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে, মায়ের কাছ থেকে মার খাচ্ছে, বকুনি খাচ্ছে—কিন্তু তার আনন্দের সীমা নেই। বাড়ির গাই বুধীর একটা বাচ্চা হয়েছে, তার সঙ্গে বড় ভাব। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে যায়। একদিন পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে গেল। কিন্তু তবু সে সদানন্দময়।

এ জীবন রাজকুমার আগে কখনও দেখে নি, দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

পাঁচ

পৃথিবীতে থাকার মেয়াদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসতে লাগল তার।

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল, সূর্যের তাপ বাড়তে লাগল।

আবার সে মেঘ হয়ে চলে গেল আকাশে। কত দেশের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াল, কত দেশে জল হয়ে নামল আবার। সাহারার মরুভূমিতেও একবার গিয়ে পড়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ছিল মাত্র। অনেকক্ষণ ছিল চেরাপুঞ্জীতে।

আফ্রিকার জঙ্গলের অভিজ্ঞতাও আছে।

মিসিসিপি, গঙ্গা, অ্যামাজন নদীর স্রোতে সে গা ঢেলে অনেক দিন বেড়িয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বিরাট পৃথিবীর বিশাল বিচিত্র রূপের অনন্ত শোভাও দেখেছে সে। তার মেঘের শরীর জল হয়ে গলে পড়ে, সেই জল আবার মেঘ হয়। এই করে অনেক দিন কেটে গেল। একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। তার শরীর বদলায় কিন্তু মন বদলায় না।

একদিন হঠাৎ সে আবিষ্কার করল মেঘরূপে যে গিরিশৃঙ্গের উপর সে রয়েছে সেটা পার্বতী পাহাড়ের শৃঙ্গ। আর একটু নীচে নেমে সে কিন্নরের গুহাটাও দেখতে পেল। দেখল গুহার সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বসে কিন্নর বীণা বাজাচ্ছেন। সুরের ফুলকিতে ভরে গেছে চারিদিক।

আর একটু নেমে এসে রাজকুমার বললে, "প্রভু, মেঘজীবন থেকে আমাকে মুক্তি দিন। এ রকম ভেসে ভেসে বেড়াতে আর ভালো লাগছে না।"

বীণাবাদন থেমে গেল।

"বেশ। আবার কি অলকাপুরীতে ফিরে যাবে?"

"না, আমি বাংলাদেশের সেই কৃষকের ঘরে ছেলে হয়ে জন্মাতে চাই।"

ছয়

গভীর রাত্রি।

কৃষকের বউ হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল বিছনায়। তারপর কৃষককে ঠেলে ওঠাল।

"ওগো শুনছ। বাইরে কচি ছেলের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখ দিকি—"

কৃষক আলো জেলে বাইরে এসে দেখল একটি অনিন্দ্যকান্তি শিশু তাদের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে শুয়ে কাঁদছে।

"কার ছেলে! কোথা থেকে এল!"

কৃষকের বউ বললে, "আহা, আগে ঘরে নিয়ে যাই চল। ওর ক্ষিধে পেয়েছে, শীতে কাঁপছে।"

বুকে করে কৃষক-বউ নিয়ে গেল তাকে ঘরের মধ্যে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না ছেলে কার।

কৃষকের বউ বললে, "আমি বুঝতে পেরেছি এ কে। আমার কানুই ফিরে এসেছে আমার কাছে।"

মাস দুই আগে কানু কলেরায় মারা গিয়েছিল।

বিরজুর মা

মনিহারী গ্রামের বিরজুর মাকে মনিহারী গ্রামবাসীদের এখন মনে আছে কিনা জানি না. কেননা, মানুষের স্মৃতি বড় ক্ষণজীবী। স্বার্থের সম্পর্ক যাহার সহিত যতক্ষণ থাকে, মানুষ তাহাকে ততক্ষণ মনে রাখে। স্বার্থের সম্পর্ক ফুরাইলেই মানুষ ভুলিয়া যায়, ইহাই নিয়ম।

বিরজুর মা আমাদের বাড়িতে যখন আসিত তখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের বেশী নয়। সে ছিল গয়লানী। বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়া বেড়াইত। সারা গ্রামে দুধ দিয়া বেড়াইত সে। যখনই আসিত সঙ্গে একটা না একটা ছেলে বা মেয়ে থাকিত। কখনও কালো, কখনও ফর্সা, কখনও বেঁটে, কখনও লম্বা। কারো নাকে সিক্‌নি, কারো চোখে পিঁচুটি, কারো মাথায় তেল নেই, কারো মুখের কোণে ঘা। সব বিরজুর মার ছেলে-মেয়ে। আমার মায়ের স্বভাব ছিল. ছেলে-মেয়েদের অসুখ তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, মা বিরজুর মায়ের ছেলে-মেয়েদের কোনো না কোনো ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

আমাদের বাড়িতেই অনেক দুধ হইত। বাহির হইতে দুধ কিনিবার দরকার ছিল না। তবু বিরজুর মা একপোয়া দুধ আমাদের বাড়িতে দিত। মা বলিতেন, তোর কালো গাইয়ের দুধ দিয়ে যাস্ একপোয়া করে। মায়ের বোধ হয় আর-একটা উদ্দেশ্য ছিল। বিরজুর মা আমাদের বাড়িতে ঘুঁটে ঠুকিয়া দিত। তাহার সহিত যে ছেলে বা মেয়ে আসিত তাহারাও ঠুকিত।

বিরজুর মার চেহারা আমার বেশ মনে আছে। সে বেঁটে লোক ছিল। ঘাডটা ডানদিকে একটু হেলিয়া থাকিত। কালো রং ছিল। একটা চোখে তারার মাঝখানে সাদা দাগ ছিল একটা। কোনকালে ঘা হইয়াছিল হয়তো। বিরজুর মায়ের কিন্তু আর একটা যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাহার কণ্ঠস্বরে উদারা মুদারা তারা এই তিনটি গ্রামই সমানভাবে বাজিত। যখন যে গ্রামে ইচ্ছা সে কথা কহিতে পারিত। যখন কাহাকেও সদুপদেশ দিত তখন তাহার কণ্ঠে বাজিত উদারা, সাধারণ কথাবার্তার সময় মুদারা, আর ঝগড়া করিবার সময় তারা। যখন চুপি চুপি বসিয়া মায়ের কাছে পরনিন্দা করিত তখনও মনে হইত যেন তারায় তাহার কণ্ঠ বাজিতেছে। মনে হইত, একটা ভ্রমর যেন দ্রুতছন্দে গুনগুন করিয়া চলিয়াছে।

বিরজুর মাকে চিরকাল একরকমই দেখিয়াছি। তাহার বয়স কত হইতে পারে তাহা কোনোদিন ভাবি নাই। মোটামুটি ধারণা ছিল, বিরজুর মা আমার মায়ের বয়সী হইবে। কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিল যে, আমার সে ধারণা বদলাইয়া গেল। বিরজুর মা একদিন ফিস ফিস করিয়া মায়ের কাছে নালিশ করিল যে, তাহার বড় ব্যাটা হুক্কু কাল তাহাকে মারিয়া তাহার রুপার মেঠিয়া (বালা) দুইটি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু (আমার বাবা) যেন তাহাকে ডাকিয়া একটু শাসন করিয়া

দেন। বাবা হক্রুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি হক্রুকে আগে দেখি নাই। তাহার চেহারা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম। তালগাছের মতো লম্বা, কালো আর ষণ্ডা। শাল-প্রাংশু মহাভুজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিরজুর মার ছেলে! অবাক হইয়া গেলাম।

বাবা তাহাকে ধমকাইতে লাগিলেন।

"তুমি বিরজুর মাকে মেরে তার মেঠিয়া নিয়ে গেছ কেন ?"

হক্রু প্রথমেই নিজের নাক কান মলিয়া ফেলিল।

"ভগবান জানে হুজুর। আমি ওর মেঠিয়া কেড়ে নিই নি। ওই আমাকে বলেছিল গরু কেনবার সময় দেবে। কাল পোখমন সিংয়ের বাচ্ছাটা কিনলাম, ও মেঠিয়া দেবে বলেছিল বলেই দর করেছিলাম, কিন্তু কেনবার সময় যখন চাইতে গেলাম তখন বললে, আমি মেঘুকে দিয়ে দিয়েছি। আমি তখন বাক্স খুলে দেখলাম। দেখি, রয়েছে মেঠিয়া। আমাকে মিছে কথা বলছে। তখন আমি নিয়ে গেলাম। তখন আর না নিয়ে করি কি ? পোখমন সিংয়ের সঙ্গে কথা তখন পাকা হয়ে গেছে।"

বিরজুর মা কাছেই চোখে কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিল, "ও আজকাল আমাকে মোটেই মানে না। ওর বৌয়ের কথায় চলে, আমার কথা একেবারেই শোনে না।"

বাবা ধমকাইয়া উঠিলেন।

"এ কি কথা! মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া! যাও, এক্ষুনি পায়ে ধরে মাপ চাও।"

হক্রু বাবার কথা অমান্য করিল না। তাহার লম্বা দেহ নত করিয়া বিরজুর মায়ের পায়ে হাত দিতে গেল। বিরজুর মা বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল। কারণ সে যখন মুখ হইতে কাপড় সরাইল, দেখা গেল তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

"হয়েছে হয়েছে, আর পা ধরতে হবে না। বাবু যা বললে তা মনে রেখো।"

মনে হইল তাহার হাসির সঙ্গে যেন গর্বও মিশিয়াছে।

হক্রু চলিয়া গেল। বিরজুর মা আড়ঘোমটা টানিয়া বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মেঠিয়া আমি ওকেই দিতাম। কিন্তু ও আমার কথা শোনে না কেন। দেখলাম, আমাকে লুকিয়ে বউকে একখানা রঙীন শাড়ি কিনে দিয়েছে। এর মানে কি ?"

বাবা ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সংক্ষেপে বলিলেন, "না, আর ওসব করবে না।"

বিরজুর মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মায়ের কাছে বসিয়া ভোমরার মতো গুনগুন করিতে করিতে হক্রুর বউয়ের নিন্দা করিতে লাগিল। বউটা নাকি অত্যন্ত পাজি। প্রায়ই লুকাইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যায়। হক্রু কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহার পিছু পিছু ছোটে। আর জিনিসপত্র ভাঙে কত! শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবে ? মাসে দুই তিনটা করিয়া হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলে। কাপড়ে প্রায়ই খোঁচ দেয়। মাথাটা যেন কাকের বাসা। তেল দেয় না। উহার বাবা নিমু গোয়ালাও নাকি ওই রকম লক্ষ্মীছাড়া ছিল।

তাড়ি খাইয়া দিনরাত পড়িয়া থাকিত। বিরজুর মা ওই মেয়ের সঙ্গে হক্কুর বিবাহ দিতে চাহে নাই। কিন্তু হক্কু না-ছোড়। মেয়েটার রং ফর্সা কিনা. আর যখন তখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে।

অনেকদিন পরে কথাটা আমার মনে হইয়াছিল। তখন আমার বয়স একটু বাড়িয়াছে।

বিরজুর মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, সবাই তোমাকে বিরজুর মা বলে, কিন্তু তোমার ছেলে বিরজুকে তো একদিনও দেখি নি। সে কোথা?"

"সে মরে গেছে খোকাবাবু! যে বছর গাঁয়ে 'হায়জা' (কলেরা) হয়েছিল, সেই বছর আমার বিরজু চলে গেল। কি ভালো ছেলে যে ছিল!"

বিরজুর মায়ের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের উদ্গত অশ্রু মুছিয়া বলিল, "সবই উপর-ওলার মর্জি খোকাবাবু!"

বিরজুর মা বেহারী, তাহার সহিত হিন্দীতেই কথাবার্তা হইত। কিন্তু সে যে আমাদের পর, একথা কখনও মনে হয় নাই। তাহাকে নিজের লোক বলিয়াই জানিতাম। আমার জন্য সর, চাঁছি, মিঠাই, পেয়ারা, কত কি যে লইয়া আসিত!

মাকে বলিত, "এও আমার আর এক ব্যাটা—"

পূজার সময় প্রতিবারই আমার জন্য একটা রঙীন 'কুর্তা' (জামা) কিনিয়া আনিত। আমাকে সেটা নিজে হাতে পরাইয়া ঠাকুর দেখাইয়া আনিত। দেখিতাম. একপাল ছেলে-মেয়ে তাহার পিছু পিছু ঘুরিতেছে। সব বিরজুর মার ছেলে-মেয়ে। মেলায় সে সকলকেই কিছু না কিছু কিনিয়া দিত। আমাকেও কতবার মাটির পুতুল কিনিয়া দিয়াছে। কোন বার গণেশ, কোন বার মহাদেব, কোন বার বা শ্রীকৃষ্ণ।

বিরজুর মার সম্বন্ধে আর একটা স্মৃতিও মনের মধ্যে জাগিয়া আছে।

তখন আমার বয়স বোধ হয় বছর দশেক। ফাঁসিয়াতলায় আমাদের কিছু জমি ছিল। রোজই শুনিতাম, সেখানে নাকি খুব ভালো মটর হইয়াছে। সাধ হইল, মাঠে বসিয়া গাছ হইতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মটরশুঁটি খাইব। জানিতাম, বাবাকে কিংবা মাকে বলিলে তাঁহারা রাজী হইবেন না। তাই এক রবিবার দুপুরে বাবা মা ঘুমাইবার পর একা বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির তো হইয়া পড়িলাম. কিন্তু ফাঁসিয়াতলা কোন্ দিকে? রাস্তা জানা ছিল না। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিতে লাগিলাম। চারিদিক সবুজে সবুজ। শীতের রোদে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। দুপুর বেলা. মাঠে বিশেষ কোনও লোক নাই, অনেক দূরে টঙের উপর একটা পাহারাদার বসিয়া আছে। এমন একটা লোক পাইলাম না, যে আমাকে বলিয়া দেয় ফাঁসিয়াতলা যাইবার রাস্তা কোন্‌টা? আলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা সরু পায়ে-চলা পথ পাইয়া গেলাম। দুইদিকে সবুজ, মাঝখানে একটা সরু ফিতার মতো পথ চলিয়া গিয়াছে।

সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই। চলিয়াছি তো চলিয়াছি। খানিকক্ষণ পরে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা সবুজ বোঝা আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝার নীচে পা দুইটাও দেখিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর দেখিলাম, পিছনে পিছনে একটি ছোট ছেলেও আসিতেছে।

আমার কাছাকাছি আসিয়াই বোঝাটা থামিয়া গেল। বোঝার ভিতর হইতে বিরজুর মা কথা কহিয়া উঠিল।

"এ কি খোকাবাবু! তুই এখানে?"

"আমি ফাঁসিয়াতলা যাব। রাস্তা কোন্‌দিকে বলে দে তো।"

"আমি তো ফাঁসিয়াতলা থেকেই আসছি। সেখানে আমারও এক টুকরো জমি আছে। তুমি সেখানে যাচ্ছ কেন এই রোদে?"

"মটরশুঁটি খাব।"

"তার জন্যে অত দূরে যাবার দরকার কি। আমার বোঝাতেই তো মটরশুঁটি আছে। চল্, ওই গাছতলায় বসবি চল্। এখানে বড় রোদ।"

দূরে একটা বটগাছ ছিল। বিরজুর মা সেইখানে আমাকে লইয়া গেল। গাছের তলায় বোঝাটা ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। তাহার পর সেই ছেলেটাকে বলিল, "মটরশুঁটি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দে খোকাবাবুকে।"

সেদিন সেই দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠের মাঝখানে বসিয়া বিরজুর মায়ের দেওয়া প্রচুর মটরশুঁটি খাইয়াছিলাম। এ স্মৃতিটি মনে সঞ্চিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে বিরজুর মা বলিল "আর খেতে হবে না। বেশী খেলে পেট ব্যথা করবে। মাইজি তখন বকবে আমাকে।"

"মাকে তুই যেন বলে দিস্ না।"

"দেব না? আমাকে কি দিবি বল্?"

"আমি আবার কি দেব!"

"একটা চুম্‌মা দে!"

হঠাৎ বুড়ি বিরজুর মা আমার গলা জড়াইয়া আমাকে চুম্বন করিল।

"তুই বাড়ি ফিরে যেতে পারবি তো?"

"তোর সঙ্গে যাব।"

"আমি এখন বাড়ি যাব না। আমাকে এখন বাজারে যেতে হবে। এগুলো বেচব না? আচ্ছা দাঁড়া, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সেই ছোট ছেলেটাকে বলিল, "ওই ওদিককার ক্ষেতে রেশমি ঘাস কাটছে, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ছেলেটা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেশমি কে?"

"আমার বেটি।"

একটু পরে রেশমি আসিল। ফর্সা লম্বা একটা মেয়ে। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়।

"খোকাবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়।"

"চল—"

রেশমির সহিত বাড়ি ফিরিলাম।

বছর দশেক পরে বিরজুর মার যেদিন মৃত্যু হইল তখন আমাদের কলেজের ছুটি ছিল। দেখিলাম, বিরজুর মার শবের পিছনে গ্রামসুদ্ধ লোক চলিয়াছে। সব বয়সের লোক। একপাল ছেলে-মেয়ে। সকলে আকুলভাবে কাঁদিতেছে।

সেইদিনই সত্যটা জানিতে পারিলাম। বিরজুর মায়ের বিবাহ হয় নাই। সে চির-কুমারী ছিল। বিরজুর বাবার সহিত তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়া শেষে বিবাহ ভাঙিয়া যায়। বিরজুর বাবার অন্যত্র বিবাহ হয়। তাহারই প্রথম সন্তান বিরজু। বিরজুর মা আর বিবাহ করিতে চাহে নাই। বিরজুর বাবা বিরজুকে তাহারই কোলে তুলিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার নাম বিরজুর মা। তাহার আসল নামটা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার আসল নাম ছিল সোহাগ।

দুর্যোধন কাকা

আমরা সকলেই তাঁহাকে দুর্যোধন কাকা বলিয়া ডাকিতাম। আমরা সকলে, মানে, আমাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। গ্রামের লোকেরা কেহ তাঁহাকে দুর্যোধন, কেহ দুর্যোধনবাবু বলিত। অনেকে তাঁহাকে কম্পাউণ্ডারবাবু বলিয়াও ডাকিত। দুর্যোধন কাকা আমার বাবার কম্পাউণ্ডার ছিলেন। বাবার সহিত দুর্যোধন কাকার যে সম্পর্ক ছিল তাহা আজকালকার মৌখিক ভদ্রতার দিনে দেখা যায় না। 'গম্ভীর' আখ্যা দিলেও তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। দুর্যোধন কাকা আমাদের বাড়ির লোক ছিলেন। দোষ করিলে বাবা তাঁহাকে বকিতেন। যতদূর মনে পড়ে প্রায়ই তাঁহাকে বকুনি খাইতে দেখিতাম। এই ছবিটি প্রায়ই চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে, বাবা তাঁহাকে খুব বকিয়া চলিয়াছেন, আর দুর্যোধন কাকা মাথা হেঁট করিয়া বাবার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুর্যোধন কাকা বাবার হাতে একাধিকবার মারও খাইয়াছেন। এ সব সত্ত্বেও দুর্যোধন কাকা আমরণ আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কোনও কারণে তিনি যে আমাদের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন ইহা আমরা ভাবিতে পারিতাম না। নিরক্ষর দুর্যোধন কাকাকে বাবা মানুষ করিয়া কম্পাউণ্ডার পদে বাহাল করিয়াছিলেন। এ ঋণ দুর্যোধন কখনও ভোলেন নাই। বলিতেন, এ ঋণ শোধ করা যায় না।

দুর্যোধনের যে দোষের জন্য বাবা তাঁহাকে বকিতেন, তাহা বাবার ভাষায় 'ফপরদালালি'। দুর্যোধন কাকা নিজেকে মনিহারী গ্রামের গার্জেন মনে করিতেন। হয়তো কোন প্রজার নিকট জমিদারের গোমস্তা খাজনা লইয়া 'চিঠা' (রসিদ) দেয় নাই, তাহার হইয়া দুর্যোধন কাকা জিয়াগঞ্জ নিবাসী জমিদারের নিকট ওজস্বিনী ভাষায় পত্র লিখিতে বসিয়া গেলেন। হয়তো গ্রামের দারোগা কাহারও নিকট ঘুষ লইয়াছে, খবর পাইবামাত্র দুর্যোধন কাকা উপরওলার নিকট বিরাট দরখাস্ত লিখিয়া প্রত্যেকের নিকট সহি লইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। কাহারও অসুখ হইলে তো কথাই নাই দুর্যোধন কারণে-অকারণে চার পাঁচবার সেখানে যাইবেনই। তাহার বাড়ির লোকদের শিখাইয়া দিবেন কি করিয়া সাবু বা বার্লি করিতে হয়। তাহারা যদি বলিত 'ওসব আমরা জানি', দুর্যোধন কাকা ধমকাইয়া উঠিতেন, জান না, যা বলছি মন দিয়ে শোন। রামধনের সহিত যদুয়ার বিবাদ হইল, দুর্যোধন কাকা কাহার কতটা দোষ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা লোকের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন। নায়েব মহাশয়ের মেয়ের বিয়ের সময় বরযাত্রীরা কিছু অভদ্রতা করিয়াছিল, দুর্যোধন কাকা ইহার প্রতিবাদে বরকর্তার নিকট একটি ডেপুটেশন লইয়া হাজির হইলেন। শুদ্ধ ভাষায় বলিলেন, আমরা কন্যাপক্ষ বলিয়া অন্যায় অভদ্র ব্যবহার মানিয়া লইব না। ভদ্রলোকের নিকট আমরা ভদ্রতাই প্রত্যাশা করিব। ইহা লইয়া মহা হৈ-হুজ্জত হইয়াছিল এবং দুর্যোধন কাকা বাবার নিকট প্রচুর বকুনি খাইয়াছিলেন। এ ধরনের কাজে মাতিলে আর কিছু না হোক প্রচুর সময় নষ্ট হয়। সময় নষ্ট করা বাবা মোটেই পছন্দ করিতেন না। দুর্যোধন কাকাকে বলিতেন পরোপকার করা ভালো। কিন্তু নিজের কাজ ক্ষতি করে পরের চরকায় তেল দিতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। যদি কেবল পরোপকার করেই জীবন কাটাতে চাও, গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাসী হও গিয়ে। দুর্যোধন কাকা বাবার দিকে পিছন করিয়া অধোবদনে সব শুনিয়া যাইতেন, কোনও উত্তর দিতেন না।

দুর্যোধন কাকা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমাদের তিন ভাইকে পড়াইতেন। আমরা তিনজন পাশাপাশি বসিতাম। দুর্যোধন কাকা আমাদের সামনে চাপটালি খাইয়া বসিতেন এবং বলিতেন, পড়ো। তিনজনকেই জোরে জোরে পড়িতে হইত। দুর্যোধন কাকা তিন দিকেই কান রাখিতেন। কেহ যদি একটু ভুল বলিত তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিতেন। তখন প্রতিবছর টেক্সট বুক বদল হইত। দুর্যোধন কাকা যে টেক্সট বুক পড়িয়াছিলেন আমাদেরও তাহাই পড়িতে হইত। দুর্যোধন কাকার আগাগোড়া সব কণ্ঠস্থ ছিল। ফার্স্ট বুক, সেকেণ্ড বুক, রয়াল রীডার, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তাঁহার কাছে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। শুধু আমাদের সম্বন্ধেই নয় গ্রামের প্রত্যেক ছেলের সম্বন্ধেই তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন। কে পড়ায় ফাঁকি দিয়া ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়াইতেছে, কে স্কুল কামাই করে, দুর্যোধন কাকা সমস্ত খবর রাখিতেন এবং স্কুলের শিক্ষকদের এ বিষয়ে সচেতন করিবারও চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার আর একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একবার ঘোষবাবু নামে একটি রেলের কর্মচারী মনিহারীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দুই তিনটি বড় বড় মেয়ে ছিল। মেয়েগুলি উজাড় ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের যুবকদের মধ্যে বেশ একটি চাঞ্চল্যও দেখা দিল। ক্রমশ স্কুলের ছেলেরাও সেই হুজুগে মাতিতে লাগিল। কিছুদিন পরে রেলের বড় সাহেব ডি. টি. এস. স্টেশন-পরিদর্শনে আসিলেন। তখন তাঁহারা সাধারণত 'সেলুন' গাড়িতে চড়িয়া আসিতেন। তিনি সেলুনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একদল লোক তাঁহার গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। দুর্যোধন কাকা ডেপুটেশন লইয়া আসিয়াছেন। গাড়ির দরজা খুলিয়া সাহেব বাহির হইয়া আসিতেই দলের নেতা দুর্যোধন কাকা আগাইয়া গিয়া সেলাম করিলেন। তাহার পর নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইল। ইংরেজিতেই হইল, আমরা তাহার বাংলা মর্মানুবাদ দিতেছি।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কি চান আপনারা?"

"আমরা এই গ্রামের লোক। মহা বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে বাঁচান। আপনি দয়া না করিলে সমস্ত গ্রাম উৎসন্ন যাইবে।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"ঘোষবাবুর তিনটি 'সোমত্ত' মেয়ে গ্রামে বড়ই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। আইনত তাহাদের কিছু বলিবার উপায় নাই। আপনি যদি ঘোষবাবুকে বদলি করিয়া দেন আমরা বাঁচি। আপনার এ দয়ার জন্য আমরা চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

এরকম একটা সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিবে ইহা সাহেবের কল্পনাতীত ছিল। এক মাসের মধ্যেই ঘোষবাবু বদলির অর্ডার পাইলেন। যাইবার পূর্বে ঘোষবাবু আসিয়া বাবাকে বলিলেন, আপনার কম্পাউণ্ডার দুর্যোধনের জন্যই আমাকে এমন একটা ভাল স্টেশন হইতে চলিয়া যাইতে হইতেছে। দুর্যোধন কাকাকে বাবা আবার একটা বকুনি দিলেন এবং দুর্যোধন কাকাও বাবার দিকে পিছন ফিরিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

দুর্যোধন কাকার আর একটা বাৎসরিক কর্তব্য ছিল। এজন্য বাবার নিকট তিনি একদিনের ছুটি লইতেন। মনিহারী গ্রামের মাইনর স্কুলের পরীক্ষা প্রতিবৎসর পূর্ণিয়া জিলা স্কুলে হইত এবং পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইত পূর্ণিয়ারই একটি কাগজে। যেদিন ফলাফল বাহির হইবে সেদিন দুর্যোধন কাকা খুব ভোরের ট্রেনে পূর্ণিয়া চলিয়া যাইতেন এবং সেখান হইতে কাগজখানা কিনিয়া সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরিয়া আসিতেন। ডাক-যোগে কাগজ পৌঁছিতে অন্ততঃ দুই তিন দিন দেরি হইত, এ দেরি দুর্যোধন কাকা সহ্য করিতে পারিতেন না। মনিহারী স্কুল হইতে যে সব ছেলে পাস করিয়াছে তাহাদের নামের নীচে লাল কালির দাগ দিয়া কাগজখানা আস্ফালন করিতে করিতে তিনি স্টেশন হইতে আসিতেন। স্কুলের ছেলেরাও অনেকে তাঁহার মুখ হইতে টাটকা খবর

শুনিবে বলিয়া স্টেশনে যাইত। ছবিটা এখনও আমার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে। দুর্যোধন কাকা কাগজটা হাতে করিয়া মাথার উপরে তুলিয়া আছেন এবং একপাল ছেলে সেটা দেখিবে বলিয়া তাঁহার খোশামোদ করিতেছে। তিনি কাগজটা কাহারও হাতে দিতে চাহিতেন না। তিনি সোজা গিয়া সেটা হেডমাস্টার মশাইয়ের হাতে আগে দিতেন। স্কুলের ফল যেবার ভালো হইত সেবার তিনি গিয়াই হেডমাস্টার মশাইকে প্রণামও করিতেন। কিন্তু ফল খারাপ হইলে আর রক্ষা ছিল না। বলিতেন, আমি দেয়াশলাই আর কেরোসিন কিনিয়া দিতেছি স্কুলে গিয়া আপনারা স্বহস্তে আগুন ধরাইয়া দিন। আপদ চুকিয়া যাক। বাপমায়ের বুকের-রক্ত-জল-করা টাকায় আপনাদের বেতন দেওয়া হয়, আর আপনাদের এই কীর্তি! ছি, ছি, ছি, ছি। আপনারা শিক্ষক, না কসাই? রক্ষক, না ভক্ষক? সারা গ্রামে মহা হৈচৈ পড়িয়া যাইত। শিক্ষকদের অপমান করিয়াছেন বলিয়া দুর্যোধন কাকাকে বাবার নিকট আর একপ্রস্থ বকুনি খাইতে হইতে। স্কুলের কোন ছেলে পরীক্ষায় ভালো ফল করিলে দুর্যোধন কাকা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। মনে আছে একবার তিনি পূর্ণিয়া হইতে একজোড়া ভালো কাপড় এবং এক হাঁড়ি ভালো রসগোল্লা লইয়া ট্রেন হইতে নামিলেন। স্টেশনে যে ছেলেরা ছিল তাহাদের বলিলেন, যতীন কই? সে জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। তার জন্যে আমি কাপড় আর মিষ্টি এনেছি।

বর্তমান যুগের অত্যন্ত স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক সমাজে বাস করিয়া মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো দুর্যোধন কাকার কথা মনে পড়ে। ছেলেবেলায় তাঁহাকে লইয়া হাসাহাসি করিতাম, আজ বুঝিতেছি তিনি কত বড় ছিলেন।

তাঁহার শেষজীবনের একটা ঘটনা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করি। আমার ভাই টুলুকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। টুলু তখন পূর্ণিয়া জেলার কসবা ডিসপেনসারির ডাক্তার।

বৃদ্ধ দুর্যোধন কাকা একবার তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি, চোখে ভালো দেখিতে পান না। মাথারও একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি ভুল করিয়া কসবার আগের স্টেশনে নামিয়া পড়িলেন এবং সেখানকার ডিসপেনসারির ডাক্তারের বাসায় গিয়া টুলু টুলু বলিয়া হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিলেন। একটি চাকর বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে বলিলেন, বল দুর্যোধন কাকা এসেছে। ডাক্তারবাবু বাসাতেই ছিলেন, তিনিই বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি টুলুকে চিনিতেন।

বলিলেন, "টুলুবাবু তো কসবায় থাকে। এখান থেকে ৪।৫ মাইল দূরে। আচ্ছা, আমি ওদিকে যাব এখনি, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু মোটরে দুর্যোধন কাকাকে তুলিয়া লইলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টুলুবাবুরা আপনার কে হন, আপনি তাঁদের কোনও আত্মীয় নাকি?"

দুর্যোধন কাকা উত্তর দিলেন, "না, রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। সে হিসাবে ওরা আমার কেউ নয়।"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "কিন্তু ওরাই আমার সব।"

পতাম্বু পাগলা

আমার ছেলেবেলায় পতাম্বু পাগলা মনিহারী গ্রামে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রাণী ছিল। প্রাণী কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিতেছি। আকৃতিতে মনুষ্য হইলেও আচার-ব্যবহারে সে পশুর মতোই ছিল। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, ঝাঁকড়া ঘন ভ্রূ দুটি যেন ঝুঁকিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ দুইটির ভিতর কি আছে। টিকোলো নাক। থুতনি নাই বলিলেই হয়। মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি, মুখে সর্বদা একটা হাসি যেন লাগিয়াই আছে। সর্বদাই যেন সে একটা মজা দেখিতেছে। মজাটা যে কিসের তাহা অন্য লোকে বুঝিতে পারিত না। হয়তো দূরে একটা ছাগল চরিতেছে, পতাম্বু তাহার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে হয়তো হাসির বেগ বাড়িয়া গেল, তখন মুখে হাত চাপা দিয়া খুকখুক করিয়া হাসিতে লাগিল। এ রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যাইত।

পতাম্বুর মা আমাদের বাড়িতে আসিত। তাহার মুখে তাহার পাগলামির আদি ইতিহাস শুনিয়াছিলাম। তাহার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি বছর তখন তাহাকে 'রংরুটে' ভুলাইয়া লইয়া যায়। তখনকার দিনে বিদেশে কাজ করিবার জন্য এদেশ হইতে কুলি চালান দেওয়া হইত। এদেশের নিরক্ষর জনসাধারণকে মিথ্যা আশায় ভুলাইয়া রিক্রুটিং অফিসাররা তাহাদের নিকট হইতে টিপসই লইয়া তাহাদিগকে কখনও সিংহল, কখনও কেনিয়া, কখনও বা আর কোথাও চালান করিয়া দিত। প্রায় এসব কুলি আর বাড়ি ফিরিত না। পতাম্বু কিন্তু বছর দশেক পরে ফিরিয়াছিল। এমন অবস্থায় ফিরিয়াছিল যে তাহার মাও প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। মাথায় চুল নাই, অথচ একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ, আসিয়া প্রথমেই সে ঘরে ঢুকিয়া একেবারে কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখে আঙুল দিয়া সভয়ে কেবল বলিয়াছিল, 'চুপ'। আর কোনও কথা বলে নাই, খাইতে দিলে খায় নাই পর্যন্ত। কোণে উবু হইয়া বসিয়াছিল সমস্ত রাত। তাহার পরদিন সকালে তাহাকে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। সাতদিন সে গা ঢাকা দিয়া রহিল। কোথায় গেল কেহই কোন পাত্তা করিতে পারিল না।

অষ্টম দিন রাত্রে গ্রামের চৌকিদার রহমন পাহারা দিতে বাহির হইয়া হঠাৎ 'ভূত' 'ভূত' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নায়েব মশাইয়ের বাড়িতে উঠিয়া পড়ে।

নায়েবমশাই বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রহমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"কি ব্যাপার রহমন ?"

"ভূত হুজুর। স্বচক্ষে দেখলাম ওই প্রকাণ্ড গামহার গাছ থেকে নামল। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে নাংগা—"

সেই রাত্রেই পতাম্বু ধরা পড়িল আবার। দিনের বেলা সে বড় গামহার গাছের মগডালে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। রাত্রে, গভীর রাত্রে চুপি চুপি নামিয়া আসিত।

সকলের পরামর্শ অনুসারে ইহার পর পতাম্বুকে বাঁধিয়া রাখা হইল। বেশী দিন নয়, মাত্র দুইদিন বাঁধিয়া রাখার পর পতাম্বু গোপ দার্শনিক হইয়া গেল। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিল। সে হৃদয়ঙ্গম করিল—লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়। বিদ্রোহ করে লাভ নেই। ইহার পর হইতে তাহার মুখের হাসিটা প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

আমরা যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম তখনও সে প্রায় উলঙ্গ হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে একটা ন্যাকড়া তাহার কোমরে জড়ানো থাকিত বটে, কিন্তু প্রায়ই থাকিত না। থাকিত কেবল দড়িটা।

সে উঁচু জায়গায় উবু হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমাদের বাড়ির সামনে যে হাট বসিত, সেই হাটতলার পূর্ব ও পশ্চিম কোণটা বেশ উঁচু। আর একটা উঁচু জায়গা ছিল পোস্টাফিসের সামনে, আর একটা পীরবাবার পাহাড়ের কাছে। ইহারই কোনও একটাতে পতাম্বু ভোরবেলা আসিয়া বসিত। বসিয়া আপন মনেই হাসিয়া যাইত। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিত, তাহার পর উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা উঁচু জায়গায় গিয়া বসিত। সেখানেও ওই, কিছু একটা দেখিয়া হাসি। হয়তো একটা ছেঁড়া কাগজ, বা একটা ছেঁড়া জুতা। এইসব দেখিয়াই খুশিতে মশগুল হইয়া থাকিত পতাম্বু।

আর সে পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

একদিন কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিল। পতাম্বু গোয়ালা পোস্টাফিসের সামনে উঁচু জায়গাটায় বসিয়া ধাড়ি সার দোকানের দিকে চাহিয়াছিল। ধাড়ি সা হালুয়াই, মানে ময়রা। সে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল। একটু পরেই স্টীমারের যাত্রীরা এদিক দিয়া যাইবে, তাহার সদ্যভাজা 'পুরি'র একটিও পড়িয়া থাকিবে না। ধাড়ি সা রোজই ইহা করে, পতাম্বুও রোজই বসিয়া দেখে। কিন্তু সেদিন পতাম্বুর মনস্তত্ত্বে কি যে গোলযোগ ঘটিয়া গেল জানি না, সে সোজা উঠিয়া ধাড়ি সার দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আমার লুচি খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে লুচি দাও।"

ধাড়ি সা তো অবাক !

বলিল, "ভাগ পাগলা ! লুচি খাবি ? পয়সা আছে ?"

পতাম্বুর পয়সা ছিল না সত্য, কিন্তু যাহা ছিল তাহা পয়সার চেয়ে প্রবল। প্রচণ্ড শক্তি ছিল তাহার।

সে সোজা দোকানে উঠিয়া গেল ও বারকোশশুদ্ধ লুচিগুলো নামাইয়া হাউ হাউ করিয়া খাইতে লাগিল। ধাড়ি সা বাধা দিতে গিয়া পড়িয়া গেল প্রচণ্ড এক চড় খাইয়া। তাহার পর সে চীৎকার চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া ফেলিল। কিন্তু পতান্নুকে সহজে কাবু করা গেল না। সে সমস্ত লুচিগুলি তাড়াতাড়ি খাইয়া মিষ্টান্নও খাইতে লাগিল। তাহার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া সহজে কেহ তাহার নিকট ভিড়িল না।

সে খাইতে খাইতে চোখ পাকাইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল, "খবরদার —"

তাহাকে পুলিসে যখন হাসপাতালে লইয়া আসিল তখন তাহার হাতে ও কোমরে দড়ি। শোনা গেল, পতান্নু ধাড়ি সার দোকানের পরাত দিয়াই কয়েকটি লোককে জখম করিয়াছে। আমার বাবাই তখন হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সে যুগে উন্মাদ পাগলের যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি করিলেন। ব্যবস্থাটি বড় ভয়ানক। পতান্নুকে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া চার-পাঁচজন বলিষ্ঠ লোক তাহাকে ধরিয়া রহিল। বাবা একটা মোটা গুণছুঁচ দিয়া তাহার ঘাড়ের মাংসে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া একটা মোটা সুতা পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "বদমায়েশী করলেই সুতোটা ধরে টানবে।" ভয়ানক চিকিৎসা। এই চিকিৎসার গুণেই কিন্তু পতান্নুর দুর্দান্ত ভাবটা কাটিয়া গেল। কিছুদিন আর সে ঘরের বাহির হইল না। মাস-দুই পরে দেখিলাম আবার একদিন সে হাটতলার উঁচু জায়গাটায় উবু হইয়া বসিয়া আছে। ঘাড়ের ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, সুতাটাও আর নাই। ভাবিলাম তাহার সহিত গিয়া একটু কথা বলি। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। পতান্নু কানে হাত দিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"ডাক্তারবাবু ব্রিন্‌ডাইন্।"

ব্রিন্‌ডাইন্? এ আবার কি ভাষা!

পতান্নু ক্রমাগত বলিয়া চলিল—"ডাক্তারবাবু ব্রিন্‌ডাইন্, ডাক্তারবাবু ব্রিন্‌ডাইন্, ডাক্তারবাবু ব্রিন্‌ডাইন্।" যতক্ষণ দম রহিল ততক্ষণ বলিল।

আমি আর আগাইতে সাহস করিলাম না। পরে দেখিলাম এই 'ব্রিনডাইন' শব্দটা পতান্নুকে পাইয়া বসিয়াছে। রোজই সে কোথাও না কোথাও বসিয়া 'ব্রিনডাইন' করিতেছে। তবে নামটা রোজ এক নয়। কোন দিন ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন, কোন দিন দারোগাবাবু ব্রিনডাইন, কোন দিন বা নায়েববাবু ব্রিনডাইন।

কিছুদিন পরে একটা পাগলা মহিষের উপদ্রবে গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহিষটা কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানা গেল না। সে মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে উন্মত্ত ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইত তাহাকেই আক্রমণ করিত। মহিষ বাহির হইয়াছে রব উঠিলেই সবাই ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল দিত।

পতান্নু একদিন পোস্টাফিসের সামনে বসিয়া 'ব্রিনডাইন' করিতেছিল। হঠাৎ পাগলা মহিষটা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িল। পতান্নু কিন্তু পলাইল না। লাফাইয়া গিয়া পাগলা মহিষের শিং দুইটা ধরিয়া ফেলিল সে। দুই পাগলে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু যমের বাহনের সহিত যুদ্ধে মানুষের পরাজয় অনিবার্য। পতান্নু ক্ষতবিক্ষত হইয়া

গেল। মহিষ শিং দিয়া তাহার পেটটাই ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে সে বলিয়া গেল—"পাগলা ভঁইস ব্রিনডাইন।"

অনেকদিন পরে একটি রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। বৃদ্ধ লোক, রিটায়ার করিয়াছেন। আসাম অঞ্চলে কাজ করিতেন। কথায় কথায় যখন জানিতে পারিলেন আমার বাড়ি মনিহারী, তখন বলিলেন যে মনিহারী গ্রামের এক পতামু তাঁহাদের চাবাগানের কুলি ছিল। লোকটা চাবাগানের সাহেব মালিককে এক ঘুষিতে ভূশায়ী করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর বলিলেন, "সাহেবটা পাজিও ছিল মশাই। কুলিদের বড়ই নির্যাতন করত। কথায় কথায় বলত—Bring down the whip. তার বাড়িতে দোতলার উপর একটা শঙ্কর মাছের ল্যাজ দিয়ে তৈরি চাবুক ছিল। সেইটে দিয়ে সপাসপ চাবকাত কুলিগুলোকে।"

কে জানে পতামুর 'ব্রিনডাইন'—ইংরেজি Bring down কথার অপভ্রংশ কি না!

অঙ্কের বাইরে

আমার মঙ্গলা গরুর অনেক গুণ। তাকে দু'মাসের রেখে তার মা চন্দন অকস্মাৎ মারা গিয়েছিল। তখন থেকেই আমরা তার সেবার ভার নিয়েছি। অনেকে বলেছিলেন, ওটাকে বিক্রি করে দাও। ওকে খাইয়ে বড় করে ওর দুধ পেতে অন্তত বছর চারেক দেরি। দৈনিক যদি এক টাকা করেও খরচ ধর তাহলে মাসে তিরিশ টাকা, বছরে তিন শ যাট টাকা, চার বছরে চোদ্দ শ চল্লিশ টাকা। এ ছাড়া একটা চাকরের খরচও ধর। খুব কম করে ধরলেও সে খরচও প্রায় ওই রকম। অর্থাৎ ওকে পুষে বড় করে ওর দুধ খেতে হলে অগ্রিম প্রায় হাজার তিনেক টাকা খরচ করতে হবে। তারপর কত দুধ দেবে তার ঠিক নেই, না-ও দিতে পারে। বিধু সেনের গরুটা তো বাঁজাই হল শেষ পর্যন্ত। বেচে দাও, বেচে দাও ওটাকে। অনেক হিতৈষীই নানা ভাষায় এই মত ব্যক্ত করলেন। মুংলির কাছে গেলাম, সে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার আদর খেতে লাগল। আর ছোট্ট জিভটা বারবার বার করে আমার হাতটা চাটতে লাগল। তার সরল চোখের দৃষ্টি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। আমি যে তাকে বিক্রি করে দিতে পারি এ শঙ্কার আভাসও সেখানে নেই। আমি যখন সরে এলাম তখনও সে গলা বাড়িয়ে রইল আর একটু আদর খাবার জন্য। তার এই ছবিটাই এখন বারবার মনে পড়ছে—দড়িটা টান করে গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছে আদরের প্রত্যাশায়।

দুই

মঙ্গলাকে বিক্রি করি নি।

দেখা গেল গণিতজ্ঞ হিতৈষীদের হিসাবও নির্ভুল নয়। মঙ্গলার বয়স যখন তিন বৎসর তখনই সে মাতৃত্ব অর্জন করে ফেলল। আর তার জন্যে আলাদা চাকরও রাখতে

হয় নি। আমার বাড়ির চাকর দুর্গাই দেখাশোনা করত ওর। ওকে লালন পালন করতে কত খরচ হয়েছিল সে হিসাব আর করি নি। শুধু তাই নয়, ও যখন দুধ দিতে শুরু করল তখন এত অবাক হয়ে গেলাম যে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে খরচের মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, ওইটুকু গরু রোজ পাঁচ সের দুধ দিতে লাগল মশাই। কলাইয়ের ডাল, ব্যাসন, তিসির খোল, কলে-কাটা খড়, চোকর সবুজ ঘাস প্রভৃতিতে যা খরচ হতে লাগল তা অনেক। কিন্তু অঙ্ককে আর আমল দিলাম না। মনে হল ও রোজ যা দিচ্ছে তার দাম অন্তত পাঁচ টাকা, আর যা খাচ্ছে তা নিশ্চয় পাঁচ টাকার চেয়ে কম। এটা আন্দাজ, হিসাব করি নি।

একনাগাড়ে বারো মাস দুধ খাওয়ালে মঙ্গলা। শুধু আমরা নয়, পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব চাকরবাকর সবাই দই, ছানা, ক্ষীর, সন্দেশ খেলাম। চায়ের স্বাদ আর রং যা হত তা অপূর্ব ও অবর্ণনীয়।

কিন্তু গরু যত ভালোই হোক বরাবর দুধ দেয় না। এক বছর পরে দুধ দেওয়া বন্ধ করল মঙ্গলা।

গৃহিণী বললেন—এখন আর ডাল, ব্যাসন, চোকর খাইয়ে লাভ কি। দোকানে অনেক বিল জমেছে।

তাই হল। কিন্তু ওকে রোজ সন্ধ্যের সময় যে এক বোঝা সবুজ ঘাস এনে দিতাম সেটা বন্ধ করলাম না। রোজই ফেরবার সময় এক বোঝা সবুজ ঘাস নিয়ে আসতাম মোটরের কেরিয়ারে।

দুধ কিনতে হচ্ছিল। রোজ আড়াই টাকা। মঙ্গলা এক ফোঁটা দুধ দিচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ফিরে মোটর থেকে নেবেই দেখি মঙ্গলা গলা বাড়িয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোটরের শব্দ পেলেই রোজই এগিয়ে আসে, ঘাসের আশায়। সেদিন কিন্তু ঘাস আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। বললাম, "মুংলি, আজ ঘাস আনতে ভুলে গেছি। কাল এনে দেব—।"

মুংলি ঘাড়টা নেড়ে কান দুটো চট্‌পট্‌ করে ফোঁস করে আওয়াজ করলে একটা। সরল না, গলা বাড়িয়ে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কি করি, মোটর ঘুরিয়ে আবার গেলাম বাজারে। বাজার মাইলখানেক দূরে। বেশ বড় এক বোঝা সবুজ ঘাস নিয়ে এলাম।

দেখলাম মঙ্গলা ঠিক তেমনিভাবে গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাস পেয়ে মহা খুশী। মচর মচর করে খেতে লাগল। একবার আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। স্নিগ্ধ সুন্দর চোখের দৃষ্টি।

জানি মঙ্গলা এখন দুধ দেবে না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সে আমাকে যা দিল তা দুধের চেয়ে অনেক বেশী, তা অমৃত।

কবিতা

নূতন বাঁকে

নূতন বাঁকে

নূতন আকাশে যবে কল্পনা আমার
ফুটেছিল আকাশ-কুসুমে,
তোমারও ময়ূরপঙ্খী গিয়েছিল ভাসিয়া ভাসিয়া
নূতন সাগরে
(হয়তো সুনীল তাহা, হয়তো ফেনিল)
জানি না তা ঠিক।

শুধু জানি,
ঝাউবনে জাগায়ে মর্মর
আনন্দিত গন্ধবহ
সেদিন যে বার্তা এনেছিল,
মেঘে মেঘে অনির্দিষ্ট বর্ণ-বীথিকায়
হয়তো বা ছিল তার ছবি,
কিম্বা ছিল কমল-কোরকে
আমরা তা শুনি নাই।

তুমি একা বসেছিলে ময়ূরপঙ্খীর বাতায়নে আনমনা,
(হয়তো শুনিতেছিলে সেই নব সাগরের নবীন কল্লোল)
আমি ছিনু কল্পনা-ফানুসে
অকস্মাৎ-আবিষ্কৃত নূতন আকাশে।
আমাদের কথা
মূর্ত হ'ত একদা যা পার্থিব ভাষায়
দেখিলাম উড়িয়া চলেছে দূরে দূরে
অপার্থিব কোন এক মহা উৎক্রোশের
আন্দোলিত ডানায় ডানায়
নব সুরে, নব ছন্দে।

অচেনা

ভুলে গেছি কবে সে……
জ্যোৎস্নার পাল-তোলা সন্ধ্যার পাথারে
ভেসেছিল স্বপ্নের তরণী,
লুব্ধক ডেকেছিল কাহারে,

উড়েছিল প্রজাপতি বিচিত্র-বর্ণা
নীল কমলের বনে রূপালি জরির পরী
নেমেছিল অপূর্ব মহিমায়,
তুমি কি সেদিনও ছিলে
(ভুলে গেছি, ভুলে গেছি)
অতীতের সেই দূর সন্ধ্যায় ?

আজ তব অঞ্জনে কালকূট মাখানো ;
সর্পিল বেণীটির উদ্যত ফণাতে
মৃত্যুর চুম্বন হানছে ।
দংশন-মধুরা,
হিংসার বংশীতে দিয়েছ কি ফুৎকার,
লক্‌লক্‌ স্বর কেঁপে উঠছে !
ফণীমনসার বনে কণ্টক পুষ্পিত হ'ল কি ?
চকচকে চোখ দুটো জ্বলছে ।
নিষ্ঠুর বেষ্টনে জড়িয়েছ শত পাকে
সংশয়-নাগিনী,
হলাহল মদিরায় অধীরা,……
জ্যোৎস্নার পাল নেই,
আঁধার নিষ্পলক,
পাথার পাথর যে,
বিষ-নীল চক্ষু ;
তবু সুন্দরি গো
তবু তুমি অপরূপ ।

অঞ্জলি চিরকাল প্রার্থী
চিরকাল প্রসারিত তৃষিত
তুমি তাতে নাম এসে ঝরণা
সুরের না সুরার তা কে জানে
জীবন না মৃত্যু
গরল না অমৃত
প্রশ্নের রং জাগে কবিতার মর্মে
বিধাতার স্বপ্নেও হয়তো ।

বহুরূপী

মেদুর মেঘের তলে স্বপ্নাবিষ্ট যেন চরাচর,
কদম্বের গন্ধ-কারাগারে ছিল সিংহ ভাব-তন্দ্রাতুর।
রিম ঝিম পটভূমিকায়
দর্দুরের মন্দ ছন্দে এক রঙা ছবি
কে যেন আঁকিয়া চলে ঘুমঘোরে নিদ্রালু নয়নে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে।

সিক্ত কাক বিমর্ষ শাখায়।

সহসা মেঘের ফাঁকে চমকিল শাণিত বিদ্যুৎ
গর্জন করিল সিংহ কাঁপায়ে অম্বর
তীব্র কেকা বিদারিল স্বপ্ন-যবনিকা
ডাকিল ডাহুক
তীক্ষ্ণতর হল যেন কেতকী-কণ্টক
মনে হল এসেছে সে।

তৃতীয় আর একজন বরষার বেশে
তোমার আমার মাঝে আসিল সহসা।
আসে চিরকাল।
দু'জনেরই দৃষ্টি-পথ বেয়ে
আর কেউ আসে যেন।
তুমি যারে মনে কর আমি
সে আমি আর একজন
আমি যারে মনে করি তুমি
সে তুমিও তুমি নও
সে সে।
রূপের তরণী বাহি সেই বহুরূপী
আসিতেছে চিরকাল তোমার আমার ছদ্মবেশে।
আকাশেতে মেঘ আনে
ফুলে আনে রং
স্বপ্ন আনে মোহমুগ্ধ নয়ন-পল্লবে।
ভুলে থাকি আমরা বিভোর।

সাড়া

শুনেছি তাহার ডাক,
শুনি বার বার।

দিবসের বর্ণ-তীর্থে,
পুষ্পে-পর্ণে,
চম্পক-রঙ্গন-জবা-পলাশের প্রবল প্রকাশে
সপ্রতিভ সে আহ্বান ;
রৌদ্রোজ্জ্বল বহ্নির অক্ষরে
নীলাকাশে দীপ্যমান তাহা ;
স্তূপীকৃত বিচ্ছুরিত, উচ্ছ্বসিত, উদ্ভাসিত সে যে
অন্তহীন মেঘ-বিচিত্রায়।

তমসার তীরে
সশঙ্ক ইঙ্গিতে
সে আহ্বান স্পষ্ট আরও ;
খদ্যোত-খচিত তার কৃষ্ণ কবরীর
ভাষা-ভরা নীরবতা
স্বপ্ন পাথারেতে ছোট ছোট জাগরণ-দ্বীপ যেন,
অন্ধকার আকাশের অবাধ ব্যাপ্তিতে
লক্ষ কোটি নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় আভাস-বুদ্বুদ।

সাড়া দিতে চাই সে আহ্বানে
এ আকাঙ্ক্ষা-স্রোতে
জন্ম হতে জন্মান্তরে ভাসিয়া বেড়াই ;
যাব কাছে, পাব কাছে
রচি স্বপ্ন,
রচি স্বর্গ।

বহুবার করিয়াছি বহু আয়োজন
বাসনা-বিহ্বল,
নানা বর্ণে সাজায়েছি রূপের ময়ূরপঙ্খী,
বাজায়েছি নানা সুরে মানস-বাঁশরী,

কল্পনা-বিমান-পোতে উড়ায়েছি রঞ্জিত পতাকা ;
কিন্তু হায় হায়
পারি নাই যেতে।
বার বার বাধা আসিয়াছে
পথ-রূপ ধরি' ;
আলোকের রূপ ধরি' এসেছে আলেয়া,
মুক্তির ছদ্মবেশে কামনা এসেছে।
বারম্বার বাঁধা পড়ে' গেছি ;
আয়োজনই হয়েছে বন্ধন।
ময়ুরপঙ্খীর রূপে আচ্ছন্ন নয়ন
দেখিতে পায় নি পথ,
মানস-বাঁশরী আত্মরতি করিয়াছে শুধু ;
কল্পনা-বিমান পোত
আমারই আকাশে শুধু মরেছে ঘুরিয়া।
কত জন্ম জন্মান্তরে হয়েছে বিলীন।
তবু বার বার শুনি তার ডাক।

দূর হতে দেখি
অপরূপ তাহার তরণী
লাগে এসে ঘাটে ঘাটে সুর সপ্তকের ;
দেখি যেন অস্পষ্ট আভাসে
সপ্ত বর্ণ অঞ্চলে তাহার
হাসিতেছে ইন্দ্রধনু :
সহসা চমকি' উঠি
শুনি যবে কল কণ্ঠ তার
অরণ্যের স্তব্ধতায়
নামহীন বিহঙ্গের অকস্মাৎ কল কাকলিতে।

ললিতা ঘাট

আলো-ছায়া-জাফরির আড়ালে
কে তুমি আসিয়া বল দাঁড়ালে
ওগো, চঞ্চলা মৃদুহাসিনী

ওই তব অভিনব গুণ্ঠন
জানি জানি নহে অবগুণ্ঠন
নহ তুমি কারাগারবাসিনী।

আজি সখি, জানিনা কি মায়াতে
আলো-আঁধারির ধুপছায়াতে
লভিলে কি অপরূপ কায়া গো
কি যে তুমি পারি না তা বলিতে
ওগো আলো-ছায়াময়ী ললিতে
নহ আলো নহ তুমি ছায়া গো।

আলো-ছায়া উভয়েরই মহিমা
দিয়েছে তোমারে সীমা-অসীমা
আকাশ নেমেছে এসে গলিতে
অধরার নন্দিনী ললিতা
হ'লে আলো-ছায়া সঙ্কলিতা
নেমে এলে কবি-মন ছলিতে।

পাথরে-বাঁধানো বট-গাছেতে
যোগ দিলে কিশলয় নাচেতে
সুর দিল কাকলির ছন্দে
পাথরকে মনে হল শিবই তো
প্রস্তর হ'ল সঞ্জীবিত
হৃদয় ভরিল মহানন্দে।

নর-নারী বানর বা ষণ্ড
যোগী ভোগী আসল বা ভণ্ড
সবারে দেখিছে চেয়ে ললিতা
চোখে-মুখে হাসি ওঠে ফুটিয়া
অঞ্চল পড়ে যেন লুটিয়া
মৃদু সমীরণ সঞ্চলিতা।

আবির্ভাব

সুপ্তির সুড়ঙ্গ পথে মোর চেতনায়
এসেছিল পলাতক রাজা।
জীর্ণ শীর্ণ দেহ তার, চক্ষু দৃষ্টিহীন
অঙ্গে নাই রাজবেশ
সঙ্গে নাহি মন্ত্রী সেনাপতি
দারিদ্র্য নখর-ছিন্ন সর্ব অঙ্গে ঝরিছে রুধির
যে আকাশে হাত তুলি' কহিল আমারে
কবি চলিলাম
দেখিলাম সে আকাশে লক্ষ কোটি সূর্য চন্দ্র তারা
রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষিছে সে রাজার শুভ-আবির্ভাব।
জীর্ণতা তাহার মিশে গেল গভীর আঁধারে;
শোণিতের বিন্দুগুলি ফিরে এল ধরণীর তৃণে
শিশির বিন্দুতে
সমুজ্জ্বল স্বচ্ছরূপে:
ছায়াপথে ঘর্ঘরিল অস্ফুট-আলোক-রথ।
নিষ্পলক জ্যোতিষ্ক-নয়নে
পড়িল পলক।

দর্পণ

কি ছায়া ফেলেছি আমি তোমার দর্পণে
তাই ভেবে দিন কাটে মোর,
সেই ভাবনার রঙে সাজাই নিজেরে নানা সাজে:
কল্পিত কি সে দর্পণ?
প্রশ্ন মনে জাগে মাঝে মাঝে।
ধীরে ধীরে তারপর
প্রশ্ন আর প্রশ্ন থাকে নাকো
স্বপ্ন হয়ে যায়,
করি' নানা প্রসাধন সে-ও দেখি নিজেরে সাজায়
তোমার দর্পণ তরে।
মঞ্জুরিত হয় তরু,

আকাশেতে জাগে বর্ণমালা,
প্রশ্ন হয় প্রশ্নাতীত,
প্রতিবিম্ব পায় যেন বিম্বের নাগাল।

প্রশ্নের-অতীত-আমি অনুভব করি সঙ্গোপনে
আমার দর্পণ
তোমারেও করেছে আকুল।
কি ছায়া পড়িবে তব আমার দর্পণে
তাহার ভাবনা
তোমারেও সাজায়েছে নানাবর্ণ বেশে,
আভরণে আবরণে ঢেকেছে তোমারে,
উতলা করেছে তব দিবস শর্বরী।
অভিনেতা আমি-বৃক্ষে
অভিনেত্রী তুমি-ফুল
ফুটিয়াছ যুগে যুগে ঃ
অভিনেত্রী তুমি-মধু-লোভে
অলি-অভিনেতা আমি
এসেছি ছুটিয়া বার বার।
বার বার মঞ্জুরিত হয়েছে বিটপী,
বহুবর্ণ বিচ্ছুরিত হয়েছে আকাশ,
সহস্র প্রশ্নের ঢেউ
জাগিয়াছে মিলায়েছে স্বপ্নের সাগরে
প্রতিবিম্ব পায় নাই বিম্বের নাগাল।

পাশাপাশি চলিয়াছি
তুমি আর আমি ;
দু'জনের হাতে শুধু দু'খানি দর্পণ।
শত শত শতাব্দীর সহস্র মিছিল
এসেছে চলিয়া গেছে বিচিত্র উৎসবে
দেখিনি চাহিয়া,
দর্পণে নিবদ্ধ ছিল আঁখি।
জড়ায়ে তোমারে বাহু পাশে
তোমার দর্পণে সখি নিজেরই স্বরূপ
খুঁজিয়াছি বারম্বার

মোর কাঁধে রাখি মাথা
নয়নে নয়ন
তুমিও খুঁজেছ সখি নিজেরেই শুধু
আমার দর্পণে ;
নিমেষে কাটিয়া গেছে যুগ যুগান্তর।

আজ তুমি নাই
হারাইয়া গিয়াছে দর্পণ
আজ বুঝিয়াছি
তুমি আমি একই
প্রশ্ন আজ প্রশ্নাতীত
প্রতিবিম্ব পাইয়াছে বিম্বের নাগাল

শাক্যসিংহ

রাজা-প্রজা, গৃহী-যোগী, ধনী ও নির্ধন
সতী ও গণিকা,
স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যহীন, সুরূপ, কুরূপ,
পণ্ডিত মূর্খের দল,
নগণ্য ও অগ্রগণ্য,
বাকী রহিল না কেহ ;

প্রান্তরে, মরুতে, বনে,
পর্বতের শিখরে, গুহায়,
(সংঘে সংঘে সংখ্যাতীত শ্রমণ-শ্রমণী
হীনযান, মহাযান)
ত্রিপিটকে, জাতকে, থেরীতে, ধাতুতে, প্রস্তরে,
সু-উচ্চ অশোক-স্তম্ভে,
অজন্তার শিল্প-সাধনায়,
সমস্বরে বিঘোষিল অর্ধেক জগত
জয় জয় অহিংসার জয় ;
ভক্তি-গদগদ-চিত্ত মানব পশুরা।

সকৌতুকে রহিল চাহিয়া রাজপুত্র শাক্যসিংহ
অমিতাভ অনিন্দ্যসুন্দর।
অন্তরে বাহিরে আজও
আকাশে ধূলায়
হিংসা-বিষ করে সঞ্চরণ,
দিকে দিকে বিস্তারিত লক্ষ ফণা ঈর্ষা নাগিনীর ;
স্বার্থের নখর-দন্ত লভিতেছে নিত্য নব-রূপ।
অহিংসার ছদ্মবেশও পরিতেছে হিংস্রক শ্বাপদ
বুদ্ধ নাম দুলাইয়া রক্তাক্ত দশনে।

যতটুকু পারিয়াছি
বুদ্ধের অহিংস-বাণী রক্ষা করিয়াছি মোরা পরম আগ্রহে,
পরিচ্ছন্ন ছাপার অক্ষরে,
সুরক্ষিত গ্রন্থাগারে।
বুদ্ধচিত্র জোগাইছে বহুবিধ শিল্পীর প্রেরণা,
বুদ্ধ-কথা কবির কাব্যের ;
বুদ্ধ-যুগ পাণ্ডিত্যের অত্যুর্বর ক্ষেত্র আজও।
বৈশাখের পূর্ণিমায়
হই মোরা উদ্বুদ্ধ বুদ্ধ-মহিমায় ;
সঙ্গীত-লহরী ওঠে,
শিহরিয়া ওঠে জ্যোৎস্না
মদিরাক্ষী তরুণীর নূপুর-নিক্কণে,
বুদ্ধের মহিমা জাগে
বক্তৃতার ফেনায়িত তরঙ্গ-চূড়ায়।
অতি দূর অতীতের অন্ধকার পট-ভূমিকায়
সকৌতুকে আজও আছে চেয়ে রাজপুত্র শাক্যসিংহ
অমিতাভ অনিন্দ্যসুন্দর।
অতি দূর অতীতের অন্ধকার পট-ভূমিকায়
জ্যোতির্ময় রূপকথালোক,
শাশ্বত রহস্যে ঘেরা
অকৃতার্থ মানবের উৎসুক মানসে
অক্ষয় হইয়া আছে রূপে রসে বর্ণে মহিমায়।

রাজপুরী কপিলাবাস্তুর।
সুরম্য সে হর্ম্যতলে
মর্মরের অম্লান শোভায়
বসে আছে রাজপুত্র।
আর বসে আছে প্রস্ফুটিতা শাক্যযুবতীরা,
অঙ্গে অঙ্গে হিল্লোলিয়া রসোচ্ছল যৌবনের রঙ্গিমা ভঙ্গিমা :
শামাদানে জ্বলিতেছে গন্ধ-দীপ,
অধীর আগ্রহে যেন উজ্জ্বল মদির লেলিহান শিখার শিখরে।
ঝলকিছে চতুর্দিকে বহুবর্ণ-বিচ্ছুরিত মায়া,
মণিমুক্তা স্বর্ণকান্তি প্রদীপ্ত প্রখর
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে নৃত্য করে কামনা অপ্সরী।
কণ্ঠে হস্তে শ্রোণীতে চরণে
মৃণাল বাহুর মুগ্ধ সাগ্রহ বেষ্টনে
জাগিতেছে আশ্লেষ আকৃতি।

সকৌতুকে আছে চেয়ে রাজপুত্র শাক্যসিংহ
অমিতাভ অনিন্দ্যসুন্দর।
তারপর মধ্য রাতে
চুপি চুপি খুলেছে অর্গল।

অন্ধকার,
সূচীভেদ্য তমিস্রা কঠিন।
সঙ্গী কেহ নাই
আছে শুধু ভয়, প্রশ্ন, দ্বিধা ও সন্দেহ,
আর আছে অদম্য সাহস।
চলিয়াছে রাজপুত্র শাক্যসিংহ
অমিতাভ অনিন্দ্যসুন্দর।
চলিয়াছে একা
আজও চলিয়াছে
মাঝে মাঝে দেখিতেছে ফিরে
আত্মভোলা জনতার বহুরূপী কুর্দন-বিলাস।
দেখিতেছে সকৌতুকে
রাজপুত্র শাক্যসিংহ অমিতাভ অনিন্দ্যসুন্দর।

যোগফল

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
ঘনিষ্ঠ অন্ধকার !
হাত বাড়াই—শূন্য সব
ঘনিষ্ঠ, না সুদূরপরাহত ?
স্পষ্ট অন্ধকার তবু অস্পষ্ট।
হাওয়া উঠল
সমীরণ-শিহরিত যূথিকার আভাস পেলাম-
যূথিকার, না হাস্নুহানার ?
সুগন্ধ অন্ধকার।
এল নূতন হাওয়া নূতন গন্ধ নিয়ে—
দুর্গন্ধ
অদগ্ধ অপ্রোথিত দুর্নিরীক্ষ্য শবের।
দুর্গন্ধ অন্ধকার।
ঝড় উঠল
উড়ে গেল সব গন্ধ
নির্গন্ধ বিগন্ধ অগন্ধ অন্ধকার।
কল্পনা বলছে মৃদু হেসে
যোগফল কিন্তু আলো।
আলো ?

পঁচিশে বৈশাখ

আকাশে আকাশে নিত্যকালের যে অভিযান
কুসুমে কুসুমে যাহার স্বপন গন্ধ-ভরা,
যে মহাগান
সূর্য তারার ছন্দ ভরা
স্মরণ-সভায় জানি না তাহার কোথায় স্থান
হায় রে, ব্যাকুল বসুন্ধরা !

তোমার চোখের জলেতে লেগেছে তাহারই রং,
তোমার শোকের ভাষায় শুনি যে ছন্দ তার,
সেই সারং
কাঁপায় রৌদ্র অন্ধকার,
উজ্জ্বল রবি উজ্জ্বলতর হয় বরং,
হয়নি যাত্রা বন্ধ তার।

গঙ্গার কূলে জ্বলেনি জ্বলেনি তাহার চিতা,
সন্ধ্যার বুকে জ্বলে ছিল শুধু সূর্য জ্বালা,
রূপের গীতা
শেষ করেছে যে একটি পালা
নিত্যকালের আকাশে ওই যে দীপান্বিতা
সাজায় তাহার দীপালি মালা।

নিত্যকালের মাটিতে ওই যে শ্যামলী বালা
তাহারই পথেতে পাতিয়া রেখেছে চোখের চাওয়া,
ফুলের মালা
দুলায় বুকেতে দখিন হাওয়া,
তাহারি লাগিয়া গভীর নিশীথে প্রদীপ জ্বালা
নিবিড় ছায়াতে দিবস ছাওয়া।

গান্ধীজী

অনেক বড় অনেক উঁচু পাহাড়
চূড়া তাহার নাই
বেড়ায় খুঁজে কোথায় সীমা তাহার
অসীম নিজে তাই।

নীল আকাশে তারার মালা দোলে
সে সব ফেলে কোথায় গেছে চলে'
কোথায় গেছে উঠে
অন্তহীনের নাগাল পাবে বলে'
আলোক মরে ছুটে।

আকাশ-ভরা মণি-মাণিক জলে
জয়-ধ্বনি ওঠে ভূমণ্ডলে।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ভিড়ে
দেখি তিনি আমার ভাঙা নীড়ে!
কিসের আশ্বাসে?
অতি তুচ্ছ ফাটা কাচের চিড়ে
ইন্দ্রধনু হাসে।

ঢাকছে ধূলি শ্যামল তৃণ-দলে
জয়-ধ্বনি ওঠে জলে স্থলে।
মহাপুরুষ? প্রশ্ন করি কা'কে!
হয়তো হবে তাই
ইচ্ছে করে প্রণাম করি তাঁকে
সাহস নাহি পাই।

মনের কথা

আমার মনের কথা হয় নি কখনো বলা—
হবে না কখনো,
শুনিয়া পরের কথা শুনাই তো সকলেরে
নকল ভাষায়।
আমার নিজের কথা অকথিত রবে চিরকাল,
সে কথা আমারই শুধু নিতান্তই আমার আপন,
চুপে চুপে মনে মনে সঙ্গোপনে সে অবগুণ্ঠিতা
রহে ভাষাহীন,
প্রকাশ করিতে নারি সে নিগূঢ় নির্বাক আকূতি
বচনহীনার।

প্রিয়া আসে, বন্ধু আসে, করে করাঘাত
বাহির-দুয়ারে,
বাহিরের ঘরে বসি বাহিরের কথা লয়ে
চলে আলোচনা।

আসে তারা, চ'লে যায়, পুনরায় আসে একদল,
আসা যাওয়া নিরন্তর চলিতেছে বাহিরের ঘরে,
অন্তরের অন্তঃপুরে বাস করে যে অবাঙ্ময়ী
অগোচরে একা—
তার কথা কে বলিবে, কে শুনিবে, কিবা প্রয়োজন
কে বুঝিবে কহ।
নিজেও দেখি নি তারে ভাল ক'রে কোন দিন
রহে সে আঁধারে,
ক্বচিৎ গভীর রাতে অকারণ বেদনায়
ভেঙে যায় ঘুম,
অন্ধকারে মনে হয়, একা একা কাঁদিছে কে যেন,
হিমানী-শীতল বায়ু হাহাকার করিছে প্রান্তরে,
বুঝিতে পারি না কিছু, ঘুমাইয়া পড়ি পুনরায়,
ভুলে যাই সব।
প্রভাতে বাহির-ঘরে ভিড় হয়, ওঠে কলরব—
সমাজবাসীর।

যখন দুঃখের দিনে চারিদিকে গভীর আঁধার,
ব'সে থাকি একা,
দুর্যোগের সে দুর্দিনে বাহিরের ঘরে কেহ
আসে না যখন,
অনুভব করি কার আলো-মাখা হাসি-ভরা আঁখি—
নির্নিমেষে মোর পানে চেয়ে আছে অকারণে যেন,
অকারণে সারা মন সান্ত্বনায় ওঠে যে ভরিয়া,
বুঝি না কেন যে!
বুঝি শুধু, বুঝি নাই—বুঝানোও যাবে না কখনো
রহস্যময়ীরে।

অমিল কবিতা

তেমন করিয়া আর তো তোমায় চিঠি
লিখিতে পারি না সই,
কলমের মুখে সোহাগের কথাগুলি
আর তো করে না ভিড়!

আকাশ আজিও তেমনি রয়েছে নীল,
পাখীর কণ্ঠে একটু কমে নি স্বর,
কুসুম-কলির রঙিন পাপড়ি ভরি
মধু করে টলমল।
তোমার লাগিয়া আমার সকল কথা
হ'ল কেন অবসান ?

অভিমানভরে হয়তো অনেক কিছু
বলিবে আমি তা জানি,
বলিবার কথা আমারও অনেক আছে,
নাই বা শুনিলে তাহা।
শ্লেষ বিদ্রূপ সংশয় সন্দেহে
তিক্ত করিয়া তুলিবে কেবল মন,
অবসন্নরে অবসান হ'তে দাও,
লাভ কি বাঁচিয়া তার ?
ফাটা জিনিসেতে কাগজ জুড়িয়া সখি,
গোটা কি কখনো হয় ?
হয়তো তোমারে পাইয়াছি পুরাপুরি,
মোহ গেছে তাই কেটে,
অথবা হয়তো বুঝি নি তোমারে কিছু,
ভুল পথে গেছি দূরে,
অথবা হয়তো এসব কিছুই নয়,
অতি স্বাভাবিক এই শেষ পরিণাম—
সময় ফুরালে শিথিলবৃন্ত ফুল
ধূলির শরণ মাগে
কারণ জানি না, জানিবারও নাহি সাধ,
জানি শুধু সুর নাই।

সাঁঝে নদীতীরে বসিয়া রয়েছি একা,
দিবস হতেছে শেষ,
কাহারও মিলন কাহারও বিরহ লাগি
নামিছে অন্ধকার।
নদীর বুকেতে উঠেছে রঙের ঢেউ,
আকাশের মেঘ সোনার স্বপনে ভরা,

মুমূর্ষু আলো অন্ধকারের বুকে
করিছে মহোৎসব।
হায় সখি, যদি দেখিতে কি সমারোহে
অস্ত যেতেছে রবি!

পরমাণু

জীবনের খরস্রোতে ভেসে যাব পরমাণু,
স্রোত সে বহিবে চিরকাল;
কভু শীর্ণ, কভু স্ফীত, কভু শান্ত, ক্ষুব্ধ কভু,
কভু মন্দ, কভু ক্ষুরধার।
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম আনিবে সে কভু সর্বনাশ,
ফেলিয়া নূতন পলি সৌভাগ্যের করিবে সূচনা,
ঋতুচক্র নানা রঙ্গে আবর্তিয়া যাবে বারংবার,
রূপ হবে নিত্য রূপান্তর।
অন্তহীন অনন্তের কখনও কি মিলিবে সন্ধান?
মেলে শুধু অনন্ত আভাস।

অতি ক্ষুদ্র পরমাণু ভাসিয়া চলেছি বেগে,
জানি না কোথায় পরিণাম!
আশ্বাস পেয়েছি শুধু যে স্রোতে চলেছি ভেসে,
সেই স্রোত চিরবহমান।
অনিত্যের ছদ্মরূপে নিত্যধারা বহে চিরন্তন,
মোর নব জন্মাঙ্কুর তার মাঝে আছে সুনিশ্চিত,
নব জন্মে নব ছন্দে নব লোকে নব প্রেরণায়
হবে মোর নব উদ্বোধন।
তবে কেন মৃত্যুভয়, বৃথা শঙ্কা হতাশা আক্ষেপ!
আছে পথ চির-পথিকের।
সান্ত্বনা মেলে না তবু, মস্তিষ্কই নহে সব,
যুক্তিসার নহি যে নির্মম।
যুক্তির শিখর হতে ভূমিসাৎ করে মোরে
অতি ক্ষুদ্র হৃদয়-স্পন্দন।

যুক্তিহীন আকুলতা, যুক্তিহীন বন্ধন-কামনা,
মোহমুগ্ধ হৃদয়ের অতি ক্ষুদ্র শঙ্কা শিহরণ,
স্তব্ধ করে সব যুক্তি, ব্যর্থ হয় আকাশ-বিলাস,
অর্থ খুঁজি অর্থহীনতার,
অতিশয় সীমাবদ্ধ আঁধার হৃদয়লোকে বসি
উপাসনা করি ভঙ্গুরের।

যে অনিত্য রূপ ধরি প্রাণপুষ্প ফুটেছে সুন্দর,
একদিন হবে তো নিঃশেষ,
জানি তবু মানি নাকো অন্তরের অন্তস্তলে
মুগ্ধ হিয়া নির্মোক লোলুপ!
অনাগত জীবনের নিত্য নব সম্ভাবনা লোভে
সূচ্যগ্র সমান ভূমি এ জীবনে ছাড়িতে পারি না,
যুক্তির আকাশ হতে আলো আসে অনিবার্য বেগে ;
মুদি আঁখি, দেখিতে চাহি না।
বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে আলোবিদ্ধ অণু-পরমাণু
খরস্রোতে চলেছি ভাসিয়া।

মৃত প্রেম ?

জীবনে পাইনি যারে
আজি একা অন্ধকারে
তাহারে স্মরিয়া
চিত্ত মোর উঠেছে ভরিয়া!

আলজ্জিত সেই মুখ
আকম্পিত সেই বুক
আনত নয়ন
স্বপ্ন-জাল করিছে বয়ন!

নিবিড় নয়ন ভরি
কাঁপিতেছে থরথরি'
এ কিসের ভাষা
—অতীতের মৃত ভালবাসা।

যে অধর বারে বারে
না-বলা কথার ভারে
কাঁপিত সে' কালে
এত কথা কে তারে শেখালে!

ভেবেছিনু মরে' গেছে
শেফালিকা ঝরে গেছে
উড়ে গেছে পাখী
আজ তারে কে আনিল ডাকি।

কহ মোরে, ওগো অন্ধকার
মৃত প্রেম বাঁচে কি আবার?
অন্ধকার উঠিল চমকি
ক্ষণকাল থাকিয়া থমকি
উত্তর সে দিল অকস্মাৎ
মহাশূন্যে হল উল্কাপাত।
দীর্ণ করি পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার
শুনিলাম আলোকিত আর্ত হাহাকার
বিচূর্ণিত জ্যোতিষ্কের ক্ষুধিত আত্মার
জ্বলন্ত চীৎকার
"—মরি নাই—মরিব না—শোন বলিতেছি
বিচূর্ণ হইয়া গেছি তবু জ্বলিতেছি।"

নূতন খবর

ফাটিতেছে বোমা কাঁপিছে ধরণী কামান রবে
টুঁটির উপরে চাপিয়া বসেছে দাঁতের পাটি,
নূতন খবর খুব কি বন্ধু? শকুনি শবে
চিরকাল ধরে জুড়িয়া রয়েছে ধরার মাটি।
চিরকাল ধরে' মরেছে জন্তু শকুনি তাদের খেয়েছে ছিঁড়ে
চিরকাল ধরে' অসহায় চাল চ্যাপটা হইয়া হয়েছে চিঁড়ে
চিরকাল ধরে' তবু মহাকাল মরণ-বীণায় নিখুঁত মীড়ে
জীবনের সুর বাজায় খাঁটি

চিরকাল ধরে' বুক দিয়ে ঘিরে নূতন জননী নূতন নীড়ে
নূতন জীবনে বাঁচাইয়া রাখে কি পরিপাটি।
পুরানো খবর ছাপার হরফে নূতন বেশে
নূতন বলিয়া চালায় নিজেকে—পায় যে হাসি
কোনটা নোন্‌তা, কোনটা মিষ্টি, কেউবা ঠেসে
ঝাল দেয় খুব—কিন্তু বন্ধু সবাই বাসি।
নানান্ ছন্দে নানা অজুহাতে পুরানো তুলোই সবাই ধোনে
সকালে উঠিয়া নূতন খবর পড়ি কাগজেতে জনে ও জনে!
তার চেয়ে চল ওই যে মেঘটি রাঙিয়া উঠেছে ঈশান কোণে
বহি অভিনব বার্তা রাশি
তার কথা শুনি ;—কিন্তু হায়রে, ওর কথা বল কেইবা শোনে
আকাশের বুকে নীরবে মিশায় নীরবে আসি।

রাজপথ

সূর্যালোকে দীপ্ত কভু—সূচীভেদ্য কভু অন্ধকার,
আলোক-আঁধার-দ্বন্দ্বে অস্বচ্ছন্দ কভু তার সুর,
সভ্যতা নির্মিত আলো পরাইলে কভু অলঙ্কার,
জোৎস্নার কিরণ পাতে রাজপথ কভু স্বপ্নাতুর।

রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচ সুখী-দুঃখী উদাসী-উন্মুখ,
দৃশ্য ও অদৃশ্য ধারা বহিতেছে নিত্য নিরন্তর,
চলে পদাতিক রথী অর্থী প্রার্থী ধনী ও ভিক্ষুক,
লক্ষ লক্ষ পদচিহ্ন বিলুপ্ত করিছে পরস্পর।

কত যে আসিল গেল সীমাবদ্ধ করিবে কে তাঁয়।
কত যে আসিবে যাবে কে করিবে গণনা তাহার
কত হর্ম্য ওঠে পড়ে কত ধর্ম মিলিল হেথায়
শোভাযাত্রা শবযাত্রা রাজপথে সবই একাকার।

নির্বিকার রাজপথ চলিয়াছে যে সুদূর পানে,
আকাশের ছায়াপথ বুঝি শুধু সে ঠিকানা জানে।

ধুমাবতী

প্রহরের পাহারায় নিযুক্ত সৈনিক-গ্রহ
জানি জানি পেয়েছিল মার্তণ্ড-সাক্ষাৎ
দৃষ্টি-স্তম্ভ সৃষ্টি-ছাড়া ছুটেছিল গগন ভেদিয়া
আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষায়
তারপর উল্কা-পরিণতি।

ছোট ছোট সরিষার ক্ষেতে
আসে যায়
তৈল-পিপাসুরা।
কেবল মানুষ নয়
নানা-নামী কীটও।
জলাধীশ মাকড়শার দল,
মশা আর মৌমাছিরা।
রৌদ্রবার্তা পাঠান তপন,
রাত্রি আসে চুপি চুপি অন্ধকার-রূপে,
জ্যোৎস্নার ফাঁদ পাতে আকাশের চাঁদ,
কবির কল্পনা-জাল ঘিরেছে তাদের।
সকলেই তৈল চায়
ছোট ছোট সরিষার ক্ষেতে।

কোন্ সে গঙ্গোত্রী হতে
জনতা-গঙ্গার স্রোত নিত্য প্রবাহিত?
যে উত্তর দিতেছে বিজ্ঞান
অভব্য, অলেখ্য তাহা
নিতান্ত অশ্লীল।
গোঁজামিল অভিধানে
প্রমাণ বিহীন তথ্য মিলিতেছে বহু.
ব্রহ্মা চতুর্মুখ
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম
সব শ্লীল। কিন্তু?......
জনতা-গঙ্গার স্রোত মিশিতেছে কলোল্লাসে
মহাজনতার মহাসিন্ধু-বুকে।

আকাশে বিজয়ী সূর্য
স্বর্ণ-তূর্যে নিঃশব্দে জয়-ধ্বনি করি
বৈদূর্য-কার্মুক তুলি
হানিতেছে সিন্ধুবুকে
অসংখ্য কলম্বকুল।
তারপর আকাশ-ঠিকানা
স্তূপ স্তর পালক মেঘের ইশারায়
হাসে ইন্দ্রধনু
বজ্রেরা গর্জন করে।
নূতন ইঙ্গিত মিলিতেছে নূতন স্রোতের।
মহাশূন্যে চলিয়াছে জনতার নির্জন মিছিল।

মনস্তত্ত্ব-কুয়াশার প্রহেলিকা ভেদি
অবশেষে দেখা দিল খেঁদি।
সেই খেঁদি
যারে আমি জ্ঞাতসারে
খেঁদিই ভাবিয়াছিনু :
স্বচক্ষে সজ্ঞানে
দেখেছিনু নাক তার বোঁচা।
তারপর মনস্তত্ত্ব···নিবিড় কুয়াশা !
সে কুয়াশা কাটিতেছে ধীরে
নূতন আলোকে।
দেখিতেছি সবিস্ময়ে
কুয়াশার পারে
সেই খেঁদি এখনও মজুত।
নাক তার
নহে বোঁচা আর
তিল-পুষ্প মানিতেছে হার।
আবার কুয়াশা······ !

পুরুষ-কোকিল-বর্ণ কবরীতে যার
বসন্তে পাই নি দেখা তার।
নয় ট্রেনে, নয় উপবনে।

দেখেছিনু তারে
আমার সত্তার ভগ্নস্তূপে।
সে স্তূপ-শিখরে
দেখেছিনু রাক্ষসীরে।
মোর কৃষ্ণ-কামনার খনি
লুণ্ঠন করিয়া
দেখেছিনু পরিয়াছে কৃষ্ণ-শিরস্ত্রাণ
কবরী জুড়িয়া,
ব'সে আছে শ্যামচঞ্চু পুরুষ-কোকিল
কৃষ্ণ-পক্ষ রক্তচক্ষু মেলি।

সহজকে অসহজ করি
নর্ম-সহচরী
উত্তীর্ণ হইল শেষে উত্তপ্ত মরুতে,
মিলাইতে হ'ল সুর মোটাতে সরুতে।
রুক্ষ দুঃখ-কাষ্ঠখণ্ডে এস্রাজ ভাবিয়া
হিয়া-ছড় তার 'পরে রেখেছি দাবিয়া,
ভুজঙ্গপ্রয়াত-ছন্দে অভিনব কাব্য-সুর বাজে
ধূপ-ছায়া মাঝে।
মনে হয় যেন তার নূপুর-ঝঞ্চনা
শোণিত-আবর্তে মম লভিতেছে নূতন ব্যঞ্জনা।
মনে হয় 'করোনারি'-পথে
হয়তো সে দেখা দেবে 'অ্যানজাইনা'-রথে ॥

স্থিরকে অস্থির বলি জেনেছেন যিনি,
অথচ আবার
অস্থিরের মাঝে যিনি মহা-স্থিরে করেন দর্শন ;
সে জ্ঞাতার লাগি
হিমালয়-শীর্ষে শম্ভু পাতে সিংহাসন
শুভ্র তুষারের।
শূন্য-সমুজ্জ্বল-কারী লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-মশাল,
জলে স্থলে জড়ে জীবে অন্তহীন উৎসব-সঙ্গম,
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ কল্পনা-বাস্তব,
অপূর্ব আলেয়া-রূপ ধরে অকস্মাৎ ;

জ্ঞাতা হয় পথহারা।
চন্দ্র-চূড় অপেক্ষিছে হিমাদ্রি-চূড়ায়,
জ্ঞাতা সে অজ্ঞাতসারে অনুসরি' আলেয়া-শিখারে
চলিয়াছে অন্ধকার পাতাল-পন্থায়!
কল্পনা-নয়নে তার ঝলসিছে খনি-লীন মণি।
যত নিম্নে নামে
কল্পনা-নয়নে তত চুনি পান্না হীরক মহিমা
রচে নব ইন্দ্রধনু মায়া : নব হয় নবতর।

জানে না সে
শেষ-শিক্ষা দিবে বলি
শেষ-নাগ ফণা তুলে ব'সে আছে সেথা
শিরে বহি ধরিত্রীর ভার।

চতুর্দিকে আলো আছে, অন্ধকার ঘোচে না তথাপি
বিবিধ বিচিত্র ধূমে সমাচ্ছন্ন আমার ধরণী,
ছাগরূপে দেখি যারে আসলে সে রাক্ষস বাতাপি
নয়ন সম্মুখে মোর এ কি মায়া-তিরস্করণী।
ধূমাচ্ছন্ন তমিস্রার তলে
জ্ঞানের প্রদীপ তবু জ্বলে।
কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা আসিয়াছে কালান্তক যম
উন্মূলিয়া মহীরুহ হানি বজ্র পর্বত-শিখরে,
ছিন্ন ভিন্ন করি সৃষ্টি তাণ্ডবেতে মেতেছে নির্মম
সেই জানি জাগাইবে শ্যামকান্তি অঙ্কুর-নিকরে।
শ্যাম-শোভা-লোভাতুরা, হায়,
ঝঞ্ঝা-বেগে কোথা উড়ে যায়।

শিবকে পাইবে ব'লে বৃথা জাগে তপস্বিনী উমা
শিব যে উদরে মোর জীর্ণ তারে করি দিবা যামী
ধূমাচ্ছন্না ধূমাবতী উদরস্থ করিয়াছে ভূমা
অবিচ্ছিন্ন হাহাকারে চীৎকারিছে —উমা নয়, আমি।
চীৎকারের অন্তরালে হায়
উমার সঙ্গীত শোনা যায়।

মহাবাণী

প্রকাশের বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছে হিমালয় ;
প্রস্তর-পঞ্জর ভেদি' লক্ষ ধারা হয়েছে বাহির।
প্রপাতের কলোল্লাসে
নির্ঝরের সঙ্গীত-ধারায়
তরঙ্গিছে পাষাণের বিগলিত আত্মনিবেদন
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি—'
উদ্বেলিত সমুদ্র-সঙ্গমে
সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র তারস্বরে করিছে ঘোষণা,
'হে সমুদ্র, আমি আছি,
অতিক্রমি' বহু দূর পথ
আসিয়াছি অবশেষে
বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

প্রকাশের বেদনায় উন্মুখ অধীর হিমালয় ;
অনন্ত নিখিল শূন্যে সমুৎসুক চূড়ায় চূড়ায়
অতি দূর তুঙ্গলোকে
সন্ধানিছে নব ছন্দ নবতর ভাষা
আত্মপ্রকাশের।
ভাব-মৌন শান্ত শুভ্রতায়
গম্ভীর গর্জনে কভু ঝঞ্ঝা-আলোড়নে,
বাণী তার শূন্যে শূন্যে মাগিছে প্রকাশ,
তন্দ্রাহীন নিত্য নবরূপে।

সে-ও কহিতেছে—
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি—'
রাধানাথে, গৌরীশৃঙ্গে, কাঞ্চনজঙ্ঘায়
ঊর্ধ্বমুখী অসংখ্য চূড়ায়

অবিরাম চলেছে ঘোষণা
'হে আকাশ আমি আছি
অতিক্রমি' বহু বিঘ্ন বাধা
আসিয়াছি এত দূর,
বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
যে বহ্নি তোমার ওই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে করেছে উজ্জ্বল
সেই বহ্নি মোরও শিরে পরায়েছে তুষার মুকুট
যে পূর্ণতা শূন্যতায় হয়েছে অসীম তোমার অনন্ত বক্ষে
সেই পূর্ণতাই আমারে দিয়াছে সীমা,
তুমি আমি ভিন্ন নহি
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'
আমি শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথি
নিখিলের বাণীমূর্তি আজি হংসারূঢ়া আকাশচারিণী,
সর্ব অবচেতনার সচেতন রূপ
মূর্ত আজি শত শতদলে।
আজিকার পুণ্যলগ্নে
কবির অন্তর-লোকে ধ্বনিত হইল মহাবাণী—
অতি ক্ষুদ্র জড় হিমালয়
প্রকাশের আবেগেতে
সাগরের আকাশের সন্ধান পাইয়া থাকে যদি,
হে মানব,
তোমার সন্ধান হবে নাকি মহত্তর আরও?
তোমার কল্পনা
মহাকাল-ভালে
অঙ্কিত করিবে নাকি নব চন্দ্রলেখা?
নবীনা উমার ক্রোড়ে নবীন কুমার সম্ভব হইবে নাকি?
নব প্রেরণায় করিবে না নব সৃষ্টি তুমি
দূর করি সর্ব মলিনতা?
নিখুঁত নবীন সৃষ্টি পরিকল্পনার তুমিই তো
একমাত্র যোগ্য অধিকারী
হে কবি, হে সৃষ্টিকর্তা
জাগো তুমি, ওঠো—।

সরস্বতী

অতীতের অন্ধকারে নয়ন মেলিয়া
দেখিতেছি বহে এক নদী,
সে নদী অদ্ভুত।

অঙ্গে তার নাহি জাগে ঊর্মি-শিহরণ,
সে তটিনী নহে তরঙ্গিণী,
নহে কল্লোলিনী,
নহে উচ্ছলিতা।
হয় না সে দুকূল-প্লাবিনী অসংযত প্রবল বন্যায়।
সন্ধ্যা-ঊষা-চন্দ্র-সূর্য-মেঘ-নক্ষত্রের
প্রতিবিম্ব-বিলাসেতে হয় না সে আত্মহারা কভু।
বক্ষে তার ধূ-ধূ করে বালুরাশি শুধু,
মনে হয় মরুভূমি
শুষ্ক নিষ্করুণ;
নদী নয় যেন।

কিন্তু দেখিতেছি
অতীতের অন্ধকারে জ্যোতির্ময় অক্ষরেতে লেখা
এ নদী সরসা।
সরস্বতী অন্তরসলিলা,
মূর্তিমতী জ্ঞানের দেবতা,
রুক্ষতার অন্তরালে রেখেছে ঢাকিয়া দুঃখহারা পিপাসার বারি,
সূক্ষ্ম পথে বহে ধারা তার লোকচক্ষু-অন্তরালে
অসংখ্য সরসী খনি' সে নদীর বুকে
দীপ্তচক্ষু ঋজুদেহ স্বর্ণকান্তি তপস্বী ব্রাহ্মণ
পান করে পুণ্য জলধারা
গান করে বেদমন্ত্র ব্রহ্মাবর্ত মুখরিত করি
বাক্ দেবী মূর্ত হন আর্য-প্রতিভায়।
কোথা ছিল ব্রহ্মবর্ত
কোথা ছিল নদী সরস্বতী··· ?
ইতিহাস-ভূগোলের পাতায় পাতায়
পাণ্ডিত্যের পণ্ডশ্রম চলিতেছে আজও

সন্দেহের অন্ধকারে।
কিন্তু জানি
সরস্বতী নিত্য প্রবাহিনী রসিকের মর্মলোকে।
সেখানে সন্দেহ নাই,
নাহি অন্ধকার,
জ্ঞানের প্রতীক নদী আজও সেথা অন্তর্বাহিনী।

কার মনোসরোবরে জানি না তো কতদিন আগে
ফুটেছিল শতদল নীলাকাশে নয়ন মেলিয়া,
কোন্ মহাশূন্য হতে দুগ্ধশুভ্র পক্ষ বিস্তারিয়া
এসেছিল উন্মুখ মরাল,
জানি না সে কবে
কোন্ কবিমানসের কল্পলোক হতে
শুভ্রবাসা কুন্দকান্তি কুচভরনমিতাঙ্গী
মদিরাক্ষী মোহিনী রূপসী
অবতীর্ণ হয়েছিল
সৃষ্টিকর্তা মানবের দৃষ্টিপথ 'পরে
বীণাপাণি পুস্তক-রঞ্জিতা,
স্বপ্নের পসরা বহি'
সত্যের ইঙ্গিত,
কোন্ সে বিস্মিত সূর্য তাহারে ঘিরিয়া
বর্ষণ করিয়াছিল আনন্দিত কনক-অঞ্জলি
হর্ষে বেদনায়
জানি না সে কবে!
শুধু জানি তারপর কালের প্রবাহে
ভেসে গেছে ডুবে গেছে বিলুপ্ত হইয়া গেছে
কত কোটি মানবের কীর্তি-অকীর্তির
কত লক্ষ ছবি
এ ছবি মোছে নি আজও।

সে মানস-সরোবরে সে কমল আজিও অম্লান,
এখনও হয় নি ক্লান্ত সে উৎসুক উন্মুখ মরাল,
নব নব তপনের অজস্র কিরণপাতে
সে তরুণী আজিও প্রোজ্জ্বলা,

মহাকাল মন্দিরেতে মৃত্তিকার শাশ্বতী প্রতিমা
দেবী সরস্বতী।

শুনেছি কাহিনী
আপন সৃষ্টির প্রেমে আত্মহারা স্রষ্টা একদিন
ডেকেছিল দেবতারে ;
বলেছিল, হে দেবতা, হে সর্বসম্ভব,
আমার প্রার্থনা শোন,
শোন—শোন—শোন—শোন—
সঞ্চারিত কর প্রাণ প্রাণহীন আমার সৃষ্টিতে,
জড়েরে জীবন্ত কর,
ওষ্ঠে তার ফুটাইয়া তোল মিষ্ট হাসি,
অপাঙ্গে মাখায়ে দাও সলজ্জ মাধুরী,
জীবন্ত ঝঙ্কারে
সঙ্গীতের মতো তাহা উঠুক বাজিয়া
মূক মৌন জীবন-বীণায়।
সিরিয়া দেশের রাজা পিগ্‌ম্যালিয়ানের
অসম্ভব এ প্রার্থনা
দেবতা শুনিয়াছিল
সৃষ্টি তার হয়েছিল প্রাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী।

শুনেছি কাহিনী
স্রষ্টার মানসসৃষ্টি মানসী ভারতী
সরস্বতী সতী নিষ্কলুষা
স্রষ্টার প্রেয়সী রূপে হয়েছেন বাণী,
নিখিল সৃষ্টির মাঝে যে বাণীর বিচিত্র প্রকাশ
ছন্দে গন্ধে রূপে রসে
বিকশিত নিত্য নব অজস্র লীলায়।
রসিকের কল্পলোকে
অন্তর্লীনা সরস্বতী আজও বহমান,
কবির মানসলোকে
বিরাজিছে সরস্বতী মরালবাহিনী
বীণাপাণি পদ্মাসনা,
কাহিনীর সরস্বতী কল্পনা-আকাশে

লভিতেছে নবরূপ স্রষ্টার খেয়ালে।
নবরসে নববর্ণে করিতেছে আত্ম-আবিষ্কার
খেয়ালী মানবস্রষ্টা
ক্ষণিকের খেলাঘরে বসি ;
ক্ষণিকের খেলা তবু হতেছে শাশ্বত :
মানবের সৃষ্টির প্রকাশ
লোক হতে লোকান্তরে
যুগ হতে যুগান্তরে
চলিয়াছে মন্ত্রে যন্ত্রে আনন্দে ব্যথায়,
রক্তাক্ত সমরাঙ্গণে
পুষ্পাকীর্ণ বাসকশয্যায়
চলিয়াছে তালে ও বেতালে
তারে ও বেতারে ;
আলোকে আঁধারে
সে বাণীর যাত্রাপথ অনন্ত অসীম
মহাকাল-পটভূমিকায়
পদচিহ্নগুলি মাঝে মাঝে জেগে আছে শুধু।

আকাশেতে রাজহংস আজও উড়িতেছে
তার পাশে উড়িতেছে প্লেন
সেদিনের শতদল হয়েছে সহস্রদল আজ
মৃন্ময় দীপের পাশে জ্বলিতেছে বিদ্যুৎবর্তিকা
জ্বলিতেছে মানুষের মন।
মানবের ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে
বিকাশের গতি দুর্নিবার
প্রকাশের অদম্য প্রয়াস
রচিতেছে নব নব শ্রীপঞ্চমীতিথি।
আমি কবি
আজি এই পুণ্যলগ্নে
তাহারেই করিনু প্রণাম।

শ্রীপঞ্চমী

পঙ্কিলতা ভেদ করি' ফুটেছে পঙ্কজ,
নীলাকাশে মহানন্দে রাজহংস মেলিয়াছে ডানা
সুদূর মানস-যাত্রী
অব্যাহত গতি-মহিমায়,
সপ্তবর্ণ শুভ্রতায় হয়েছে ভাস্বর,
ছিন্নভিন্ন স্বরজাল রাগিণীতে সংহত সহসা
সপ্ত-স্বরা বীণার তন্ত্রীতে,
জড়তার হ'ল অবসান.
মূর্ত্ত হ'ল বাণী।

ঝরে' যায় চতুর্দ্দিকে পুরাতন জীর্ণ পত্ররাশি,
সম্ভাবনা জাগে মুকুলের,
ভগ্নকণ্ঠ দহিয়াল পুনরায় ফিরে পেল স্বর,
মধুলোভী টুনটুনি পরিয়াছে নব বর-বেশ,
নব ছন্দ জাগিয়াছে খঞ্জন-গতিতে
বসন্ত-বউরির কণ্ঠে,
জাগিতেছে নব-বধূ গভীর নিশীথে
বাতায়ন পাশে একা ;
মূর্ত্ত হ'ল বাণী।

হাসে শুক্লা পঞ্চমীর শশী ;
তন্বী জ্যোৎস্না সলজ্জা কিশোরী
থমকি' দাঁড়ায়ে আছে বকুল বীথিতে,
অনাগত পূর্ণিমার স্বপ্ন মাখা চোখে।
কর্ণিকার—কিংশুক—মঞ্জরী
মাগিতেছে প্রকাশের ভাষা
বর্ণময় পর্ণপুট মেলি'
লক্ষ লক্ষ শাখার শিখরে ;
অলিরা ফুলের দ্বারে
আত্মনিবেদন বহি ধ্বনি-মঞ্জুষায়
চরিতার্থ হ'ল গুঞ্জরণে
বনে বনান্তরে ;
মূর্ত্ত হ'ল বাণী।

'দ্বার খোলো, দ্বার খোলো, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত কর দ্বার,
গ্লানি-হীন আনন্দ-লোকের'
জন্ম-জরা-মৃত্যু-বদ্ধ মানবের এ চীৎকার
আজও ভাষা-হীন ;
মহতী কল্পনা-নীহারিকা
অমূর্ত অব্যক্তলোকে
অবাঙ্‌মানসে
সঙ্কীর্ণতা-কারাগারে
যুগ-যুগান্তর
মরিছে গুমরি'।
অবাক নির্বাক
চিরকাল খুঁজিতেছে ভাষা
শব্দে বর্ণে স্বরে
কাব্যে শিল্পে সঙ্গীত-ধারায়
জলে স্থলে তেজে মরুৎ ব্যোমে ;
ভূমা-গর্ভে
কাঁপিছে অরূপ-ভ্রূণ রূপ কামনায়,
অপ্রকাশ মাগিছে প্রকাশ।
যে পর্বত মেঘরূপে সঞ্চরিবে ভবিষ্য-আকাশে,
যে মরু উদ্বেল হবে সমুদ্রের তরঙ্গে একদা,
যে বালুকণিকা ঘিরি মুক্তা-সৌধ হবে বিনির্মিত,
অগণিত সংখ্যাতীত সেই
অজ্ঞাতের অস্পষ্টের প্রচ্ছন্নের আগ্রহ বহিয়া
মূর্ত হ'ল বাণী।

হে অব্যক্ত, ব্যক্ত হবে তুমি,
অসম্পূর্ণ লভিবে পূর্ণতা,
হে মহাস্থবির,
চঞ্চলের চারুস্পর্শ রোমাঞ্চিত করিবে তোমারে,
প্রস্তর বিদীর্ণ করি' মুক্তিলাভ করিবে নির্ঝর,
মুকুল পুষ্পিত হবে,
মূর্ত হ'ল বাণী।

অবন্ধনা

ওগো প্রকাশের দেবতা অবন্ধনা,
তোমার প্রকাশে সীমায় বেঁধেছি মোরা,
দৃষ্টি মোদের সীমায় বাঁধা যে দেবি
অতি ভীরু ক্ষীণ আড়ষ্ট ভাঙা-চোরা।

শীতের অন্তে তোমারে দেখিতে চাই
হংসবাহিনী কুন্দ-শুভ্রা-বাণী
শতদল 'পরে বিছায়ে আসন তব
হাতে তুলে দিই বই আর বীণাখানি।

আমের মুকুলে যবের শীষের রূপে
দীপ্ত দিবার প্রখর আলোর মাঝে,
তোমার প্রকাশ দেখিতে শিখেছি মোরা,
অতি নির্মল নিখুঁত শুভ্র সাজে।

অতি নির্মল নিখুঁত তুমি কি শুধু ?
কালোর মাঝারে রাখনি আসন পাতি ?
দুখীর দুঃখে শোকের ছায়ায়, দেবি,
নাই কি তোমার প্রকাশ-বেদনা-ভাতি ?

দিনের আকাশে যে সূর্য ঝলমল
রাতের আকাশে থাকে না যবে সে রবি
সে কালো আকাশে তুমিই তিমিরময়ী
আঁক যে তখন তমসালোকের ছবি।

লক্ষ সূর্য চক্ষু মেলিয়া হেরে
অন্ধকারেতে সে নব প্রকাশ তব,
আমরা একথা বুঝিতে শিখিনি আজও
তুমি অনন্ত বিচিত্র অভিনব।

তুমি নহ শুধু বসন্ত-সহচরী
সকল ঋতুই তোমার বাণীতে ভরা
তপ্ত নিদাঘে তুমিই রুদ্রা দেবি,
বর্ষা গগনে তুমিই মেঘাম্বরা।

হেমন্ত শীতে তোমারই প্রকাশ ব্যথা
নিগূঢ় আবেগে সবার বুকেতে কাঁপে,
তোমারই পরশে সরমে শেফালি ঝরে
শরৎ কালের সোনালি রোদের তাপে।

তুমি শৈশব, তুমি কৈশোর দেবি,
তুমি যৌবন, তুমিই আবার জরা,
সুরে ও অসুরে দেবে ও দানবে ঘিরি
তোমার প্রকাশ নিখিল বিশ্বভরা।

একটি ঋতুর একটি প্রতিমা নহ
প্রতিটি ক্ষণের তুমি ক্ষণ-শাশ্বতী
নিখিল প্রাণের তুমি জীবন্ত ভাষা
নিখিল গানের অন্তবিহীন গতি।

ত্রি

আজিকে সম্ভব যাহা কাল তাহা হবে অসম্ভব
অন্তরীক্ষ হতে জানি হয়েছিল সমস্ত উদ্ভব
অন্তরীক্ষে পুনরায় একে একে লুপ্ত হবে সব।

শূন্যে ঘুরিছে রাহু ও কেতু
মধ্যে কেবল শূন্য-সেতু
শূন্য বিচায় শূন্য হেতু।

মনে নাই কবে কোন্ দিন
হাত পেতে লয়েছিনু ঋণ
তাহারই আভাস পাই মাঝে মাঝে ক্ষীণ

হাত পেতে আছি তব দ্বারে
বাতায়নে আস বারেবারে
দেখ তবু চেন না আমারে।

প্রত্যহ আলোর শেষে আসে অন্ধকার
অন্ধকার অবসানে আলোক আবার
প্রত্যহ ইঙ্গিত আসে জাগার যাবার।

দুরন্ত যৌবনে বল কে রাখিবে অঙ্ক দিয়া ঘেরে
উজ্জ্বল মহিমা তার তুচ্ছ করে সর্ব হিসাবেরে
সদ্য-ফোটা কমলিনী আজও চাহে বৃদ্ধ তপনেরে।

আবির্ভাবই তিরোভাব! তুমি ওই দেহটাই?
আবরণ খুলিবার সময় কোথায় পাই?
পেয়েছিনু ততখন যতখন আস নাই।

শুষ্ক রুক্ষ পত্রস্তূপে মলয় জাগায় আজও কম্পিত মর্মর
যুগে যুগে যযাতিরা কামনার স্বপ্ন দেখে জরায় জর্জর
শ্মশানেতে সুরা মাগে শবাসন তান্ত্রিকের তৃষিত খর্পর

অন্ধকারে হোক লুপ্ত সকল আলোক
নিষ্করুণ আলিঙ্গনে ছিন্নভিন্ন করহ নির্মোক
বাহুপাশ গলরজ্জু হোক।

নহ উর্বশী নহ তুমি সতী সীতা
নহ মরীচিকা নহ স্বপনের চিতা
তুমি যে অনির্মিতা।

পিপাসিতা চাতকিনী, নিশাচরী চতুরিকা শিবা
শ্যেনদৃষ্টি, সর্প-বেণী ময়ূরী-ভঙ্গিমা-ভরা গ্রীবা
একসাথে সমন্বয় কিবা।

রূপালী স্বপন বাজায়ে সোনার বীণায়
ফুলের ফানুসে সন্ধ্যা-মেঘের মীনায়
কে বল নিজেরে চিনায়?

আঁধার আসিছে ঘিরে
স্বপন নামিছে ধীরে
ভিড়িল কি তরী তীরে?

পথে জন্মি পথে চলি পথে মৃত্যু হয়
নব জন্ম জন্মান্তরে নব-অভ্যুদয়
পথের নাম কি জান? অনন্ত সময়।

সত্যের লাগি আকাশের পানে চাই
আকাশ কহিল, সত্য শূন্যে নাই
সত্যের লাগি অসীম মাগিছে সীমার করুণা ভাই।

আমি বন্ধু ভৃত্য শুধু সেবা করি যার হস্তে থাকি
জাগ্রত উদ্যত তীক্ষ্ণ জীবনে দিই নি কভু ফাঁকি…
রক্তাক্ত কৃপাণ কহে ছিন্নমুণ্ডে ডাকি।

অসৎ নাই তো কিছু সমস্তই সৎ
অপথ কোনটা নয় সমস্তই পথ
তুমিই তো রথী বন্ধু তুমিই যে রথ।

মেঘটুকু হাসে আকাশের কিনারায়,
ফুলটুকু হাসে বৃন্তবাঁধনে হায়
ভূমার কাহিনী চুমায় আঁটিয়া যায়।

সত্যের বেলা থেকে যায় কিছু বাকি
স্বপ্ন কিন্তু দেয় না কখনও ফাঁকি
বর্ণের থলি উজাড় করিয়া চলে সে চিত্র আঁকি।

বাঙালীরা উড়ে ভাষা কি হেতু কয় না,
কোকিল হয় নি কেন পাহাড়ী ময়না,
রহস্যের সমাধান কখনও হয় না

ছিলাম মস্ত পাশায়
শুনিনু নূতন ভাষায়
বাবুই পাখীর বাসায়।

শরতের রোদে লেগেছে সোনালী রং
লোহার শিকলে ধরেছে লালচে জং
সোনা ও লোহারে তুচ্ছ করিয়া ঘড়ি বাজে টং টং।

তারা কত গণিয়াছি
জ্ঞানজাল বুনিয়াছি
আছ তুমি শুনিয়াছি।

তপনের আলো সৃজিছে ইন্দু
বাড়ব অনলে শোভিছে সিন্ধু
অশরীরী লোকে বিরাজে বিন্দু।

আভরণ দিয়া সাজাইতে চাহ যারে
সে যে মরে' গেছে অলঙ্কারের ভারে,
সাজাইছ শুধু বীভৎস শবটারে।

আবরণ দিয়া যায় না কিছুই ঢাকা,
আবরণ-ঢাকে দুনিয়াকে হয় ডাকা,
আর থাকে তাতে নিজ পরিচয় আঁকা।

শিল্পী জনে আঁকেন ছবি রসিক করেন বাহা বাহা,
শিল্পী যাহা আঁকেন নাকো দেখতে কেহ পায় না তাহা
সেই ছবিটি কোথায় আহা।

কৃত্রিম পথে অকৃত্রিমের সন্ধান করি রোজ,
কখনও তাহার আভাসটা পাই কখনও মেলে না খোঁজ,
'চোখ খুলে থাক্' বলি বা কখনও কভু বলি 'চোখ বোজ'।

নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়াইয়া ছিল বিজন পথের ধারে
মশাল জ্বালায়ে খুঁজিতে গেলাম পেলাম না আর তারে।

বাহির দুয়ার খোলা অন্তর বন্ধ,
উপরে সবুজ পাতা মূলে শুধু কন্দ,
অবাঙ্‌ময়ের ভাষা কবিতার ছন্দ।

সত্য 'ছিল' নয় শুধু সত্য সদা 'আছে'
বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যের মাঝে
সত্যই একমাত্র সেতু বাঁধিয়াছে।

উচ্চে উঠাও, কখনও নিম্নে নাবাও
উৎসাহ দাও কখনও আবার দাবাও
সকল সময়ে তোমার কথাই ভাবাও।

জীবনের বহু পঙ্ক অপমান গ্লানি
অশ্রুজলাশয়তলে ঢাকা আছে জানি
আর তার তীরে আছে আশা ঠাকুরানী।

আস নাই তুমি সখি তাহা তো মানি না
এসেছিলে কবে হায় তাও তো জানি না
শুধু বাজে বীণা।

শ্রীশ্রীমা শারদা দেবী

জননি,
তোমার স্নেহ-গঙ্গায় অবগাহন করে'
পবিত্র হয়েছে কত নর-নারী,
কত সাধু, কত মহাজন এসেছে তোমার প্রেম তীর্থে,
তোমার স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-জ্যোতি
প্রদীপ্ত করেছে কত অন্ধকারকে,
জ্বেলেছে কত প্রদীপ, কত মশাল,
দীপান্বিতা করেছে কত অমা-নিশীথিনীকে।
তোমার আশীর্বাদের অমৃত ধারায়
ভাসল কত তরণী
অসীমের সন্ধানে।
তোমার স্পর্শলাভ করে'
মুঞ্জরিত হ'ল কত শুষ্ক তরু,
শ্যামল হ'ল কত মরুভূমি।
আমার সুকৃতি ছিল না পূর্বজন্মের
তাই প্রত্যক্ষ-লোকে পাইনি তোমাকে এ জীবনে।

আমার কল্প-লোকে কিন্তু পেয়েছি।
দেখেছি তোমার ছবি,
অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত।

ইতিহাসের পাতায় হয়তো আঁকা নেই সে ছবি
কিন্তু আমি দেখেছি।
দেখেছি আকাশ রূপিণী শক্তিকে,
লক্ষ-কোটি-সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-ধাত্রীকে,
মহাশূন্যাকে,
মহাপূর্ণাকে,
ভূমা-রূপিণী ভূয়িষ্ঠাকে
বাঙ্ময়ীকে, অবাঙ্ময়ীকে,
প্রকাশ-ঐশ্বর্যরূপিণী বাণী-কমলাকে
সন্ন্যাসিনী শঙ্করীকে।
দেখেছি
আকাশ-চুম্বী পর্বতের শিখরে শিখরে
অন্তহীন সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গেই নয় শুধু,
নেমে এসেছ তুমি
ধরণীর ধূলিধূসরিত ঊষর প্রাঙ্গণে
শ্যাম সম্পদে ঘুচিয়েছ তার দৈন্য।

দেখেছি তোমারই বুকে
ছয় ঋতুর বিচিত্র আবির্ভাব তিরোভাব,
আলো অন্ধকারের লীলা,
সীমা-অসীমার
বিরাট ক্ষুদ্রের মিলন,
সকল দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি,
সকল ছন্দের ঐকতান,
সকল মন্দের সত্যরূপ।
অয়ি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণি,
দেখেছি,
তুমি শুধু আকাশ নও,
তুমি ধরিত্রীও।
শ্রীরামচন্দ্রের সীতা—
পাবক-পরিশুদ্ধা জনক-নন্দিনী বৈদেহী
সমাধিস্থ হয়ে আছেন
তোমারি অন্তর-পাতালের স্তব্ধলোকে।

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী—
বিদর্ভরাজ-দুহিতা তেজস্বিনী সতী,
পতিবিরহে
আত্মবিসর্জন করেছিলেন যে প্রদীপ্ত হুতাশনে
ইন্দ্রপ্রস্থের সেই হুতাশন তোমারই অন্তর্বহ্নি।
তোমারই অরণ্য-গহনে
তপস্বিনী সত্যভামা আজও কৃষ্ণ-ধ্যান-মগ্না।

জননি,
অধন্য, অকৃতী, অযোগ্য আমি
তোমাকে পূজা করবার শক্তি আমার কোথায়
তোমাকে প্রণাম করবার অধিকারও আমার নেই
তবু তোমার স্মৃতিতীর্থে
প্রণামই বহন করে এনেছি আজ অবনত মস্তকে
আরতো নেই কিছু।

মহাত্মা গান্ধী

হে মহাপথিক, হে মহা-পথ,
হে মহাসারথি, হে মহারথ,
হে উজ্জ্বল ;
নয়ন-জল
নয়নে থাক্
শুনেছি বন্ধু তোমারি ডাক,
যুগযুগান্তে সে আহ্বান
মথিয়া তুলিবে পাষাণ-প্রাণ
অসাড় হৃদয়, বারম্বার।
নমস্কার।

হে মহাযুদ্ধ, হে মহাজয়,
হে মহা-জন্ম, হে মহা-লয়,
হে দিকপাল ;

সকল কাল
কৃতাঞ্জলি
মহতী পূজার হে মহাবলি,
পূজিবে তোমারে আনতশির
মহাভারতের হে মহাবীর,
হে উদ্‌গাতা নব-গীতার।
নমস্কার।

হে মহাকাব্য, হে মহাকবি,
হে মহাশিল্পী, হে মহাছবি,
হে নির্ভীক,
ফোটালে ঠিক
শ্বেত-কমল
রক্ত-সায়রে, কি শতদল!
ছন্দ গন্ধ বর্ণ রূপ
কি অপরূপ, কি অপরূপ,
নন্দিছে আলো-অন্ধকার।
নমস্কার।

হে মহাকর্মী হে মহা-কাজ,
হে মহা-সেবক, হে মহারাজ,
জয়তু জয়,
অশ্রু নয়
নয়কো লাজ,
কেবল কাজ—কেবল কাজ—
তোমার কাজ—তোমার ডাক
সবার হৃদয়ে ভরিয়া থাক্
খুলিয়া যাক সকল দ্বার।
নমস্কার।

হে মহা-শিষ্য, হে মহা-গুরু,
হে মহা-অন্ত, হে মহা-শুরু,
চিরন্তন,

হে মহাজন,
যুগন্ধর
পন্থা-কীর্তি হে সুন্দর,
ভারত-ভারতী বীণার সুর
তোমাতে বাজাল কি সুমধুর
সত্যের জয় অহিংসার।
নমস্কার।

নমস্কার হে মহাকাল,
হে নীল-কণ্ঠ, চন্দ্র-ভাল,
নমস্কার
বারংবার
হে নির্ভয়,
লক্ষ লক্ষ কোটি জয়
তুচ্ছ করিয়া সব তিমির
জ্বালালে আলোক তপস্বীর
হে ধ্রুব-তারা মানবতার,
নমস্কার।
নমস্কার।

দাদামশাই

[শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৬তম জন্মতিথিতে]

অসীম বাসনা কেঁদে মরে বুকে আছে কি তাহার কোথাও শেষ,
চাহিয়া চলেছি—দাও আরও দাও, শীঘ্র কর—
দীর্ঘ দাবির চাহিদা মিটাতে করে না সে দেরি এক নিমেষ
দীর্ঘের পুন নবীন আশায় করিতে চাহি যে দীর্ঘতর।

বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে ঝরিছে অশ্রু ফুটিছে হাসি
বাজিছে বেদনা বাজিছে নূপুর বাজিছে বিষাণ বাজিছে বাঁশী
হাসিছে জীবন হাসিছে মরণ হাসিছে কামনা সর্বনাশী
কহিছে—বাধারে চূর্ণ কর
আর্ত-কণ্ঠে প্রার্থনা করি পূর্ণ কর।

আর্ত-কণ্ঠে প্রার্থনা করি—প্রার্থনা করি কৃতাঞ্জলি
কখনও নীরবে কখনও সরবে ছন্দে গানে
কেন চাহি তাহা বুঝি বা না বুঝি সারাটা জীবন চাহিয়া চলি
অন্ধ নয়ন বারে বারে চাহে আলোর পানে।

দীর্ঘ পথের হে মহাযাত্রী, শুধাব না আজি তোমার কাছে
অন্তবিহীন এ চির-চাওয়ার সত্য কি কোনও অর্থ আছে ?
সারা পথ জুড়ে এই কি কেবল ? মরীচিকা আর আলেয়া নাচে ?
বিজলী-চমক বজ্র হানে ?
আর্ত-কণ্ঠে শুধাব না আজি আকুল প্রাণে।

উদার আকাশে ওঠে রবি শশী নামে আলো ছায়া যুগান্তর
এ মহামিছিলে হারাইয়া যাবে প্রশ্ন মোর
নির্বিকার এ বিরাট লীলায় আকুল প্রশ্ন অবান্তর
তাই বুঝি হায় গোপনে হয় সে নয়ন-লোর।

তাই সে প্রশ্ন গুমরিয়া ওঠে ব্যথিত-মরম-কাব্য-লোকে
দুখে লাজে ভয়ে ক্ষয়ে সংশয়ে প্রতি পথিকের চকিত চোখে
খুঁজিয়া সে ফেরে কেন এ পিপাসা কিসের কামনা এ নির্মোকে
তারা-ভরা রাতি হয় যে ভোর
এ মহামিছিলে হারাইয়া যায় প্রশ্ন মোর।

তোমার দীর্ঘ যাত্রাপথেতে উত্তর তুমি পেয়েছ জানি
মায়া-মুকুরেতে দেখিয়াছ তুমি স্বরূপ তার
বোলো না সে কথা আজিকে মোদের, বোলো না সে কথা হে সন্ধানি,
তোমারও জন্ম-তিথিতে এনেছি কামনা-হার।

বক্ষ মথিত লক্ষ বরণে কামনা-রঙিন কোমল ফুলে
যে মালা গেঁথেছি সে মালা আজিকে বলিবে তোমার গলায় দুলে
'থাকো বহুকাল—থাকো চিরকাল'—মিনতি জানাবে মর্ম-মূলে
মিনতি জানাবে বারংবার
মেটে নি পিপাসা—তৃপ্তি এখনও হয় নি তার।

রবীন্দ্রনাথ

[মৃত্যু দিবসে]

এসেছে গগন ঘিরে স্তরে স্তরে শ্রাবণের কৃষ্ণ জলধর,
সজল-সমীর-স্নিগ্ধ কদম্বের অঙ্গে অঙ্গে জাগে শিহরণ,
গুরু গুরু গুরু গুরু প্রকম্পিয়া শূন্য ব্যোম ধ্বনিছে ডম্বরু,
ঝিল্লীরবে কেকাছন্দে কণ্টকিতা কেতকীর খসিছে গুণ্ঠন,
উদ্ভাসিয়া কৃষ্ণমেঘ বিদ্যুতের মুহুমুহু প্রদীপ্ত প্রকাশ ;
কোথা বরষার কবি ?   কোথা তুমি, কোথা আজ,
কোন্ অধরায়
উত্তরিলে অকস্মাৎ তেয়াগিয়া প্রিয়তমা মৃন্ময়ী ধরারে ?

আজও মনোরমা সে যে, নিত্য নব সৌন্দর্যের মাধুরী ভাণ্ডার
আজও তার অফুরন্ত, আজও তার অঙ্গে অঙ্গে ওঠে ঝলসিয়া
নব-দ্যুতি ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দিত কবি-চিত্ত চরিতার্থ করি ;
আছে সেই রাঙা-মাটি-পথ, বাঁশী বাজে বেণুবন ছায়ে,
বকুল মল্লিকা চাঁপা কদম্ব করবী ফুটে আছে থরে থরে,
পলাতকা স্বপ্ন-সখী দেখা দেয় আজও ওই দামিনী-ঝলকে,
গ্রীষ্ম-বর্ষা-হিম-শীত-বসন্ত-শরতে, রৌদ্রে, মেঘে, অন্ধকারে,
সন্ধ্যা-উষা-জ্যোৎস্নালোকে, কান্তারে প্রান্তরে, গৃহকোণে
ধরণী মোহিনী আজও ; তুমি তারে ছেড়ে,
মাটির দুলাল কবি,
কোথা গেলে, কেন গেলে, গেলে কোন্ অমৃতের
নব প্রত্যাশায় ?
সে কি স্বর্গ দেব-লোক ?   দেব-লোকে আছে স্থান
মানব-কবির ?
লক্ষ কোটি নরনারী-হৃদয়-রাজ্যের রাজরাজেশ্বর তুমি,
ধরণীর মৃত্তিকায় অভ্রভেদী সিংহাসন তব জ্যোতির্ময়,
আকাশের সূর্য চন্দ্র সন্ধ্যা-উষা ইন্দ্রধনু জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
ছয় ঋতু নৃত্য করে বিচিত্র ভঙ্গীতে তব চন্দ্রাতপতলে,
রূপসী উর্বশী আসে নন্দনবাসিনী কাব্য-কুঞ্জ-দেহলীতে
সিন্ধু-স্নান সমাপন করি ; শুচি-স্মিতা বীণাপাণি পদ্মাসনা
সুর দেন তব গীতে স্বর্ণ-বীণা তন্ত্রে তন্ত্রে ঝঙ্কার তুলিয়া
মর্ত্যের কবির কণ্ঠে জাগাইয়া অনবদ্য অমর্ত্য-মূর্ছনা,

অনন্ত অসীম আসে বন্ধন-লোলুপ তোমার সীমার মাঝে ;
তুমি যাবে দেব-লোকে কিসের আশায় ? তুমি কবি আমাদের
লাঞ্ছিতের পীড়িতের দুর্গতের অন্তরের প্রিয় কবি তুমি,
কাঙালিনী মেয়ে, সাঁওতাল ছেলে, পুঁটুরাণী, ভৃত্য পুরাতন,
অবোধ শিশুর দল, সরমশঙ্কিতা বধূ, মূঢ় দেশবাসী,
ইহাদের ফেলে রেখে কবি, যাবে তুমি কোন্ স্বর্গলোকে ?
যেতে পার ? সুনিবিড় এ বন্ধন ছিন্ন করা এত কি সহজ ?
বন্ধন-বিলাসী তুমি, 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়'
চেয়েছিলে মুক্তি-স্বাদ, অবন্ধন লোকে তুমি লভিবে নির্বাণ ?

মিথ্যা কথা ; তুমি নাই অবিশ্বাস্য অসম্ভব মূঢ় এ কল্পনা—
প্রতারিত ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ মিথ্যা অনুভূতি ;
তুমি আছ, হে ভারত-হৃদয়-সম্রাট্, আছ তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
প্রাণে প্রাণে গানে গানে ছন্দে ছন্দে শতবন্ধে স্পন্দিত-হৃদয়ে
আছ তুমি আছ তুমি জড়াইয়া মরমের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ লোকে আছ তুমি প্রাণবন্ত অমর অক্ষয় ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের হাসি ইতি হয় যেথা সেথা শুরু ইতিহাস,
সেই হাসি-হীন গহন আঁধারে ফেলে সন্ধানী আলো,
খুঁজেছিলে তুমি হারানো মানিক, ঝরা-কুসুমের বাস,
মরণের মুঠা হইতে ছিনায়ে এনেছ যা কিছু ভাল ।

তিল তিল করি রূপ আহরিয়া রচেছ তিলোত্তমা,
কনক-কণিকা বহিয়া এনেছ তুমি সুবর্ণ-রেখা,
তব চেষ্টায়, হে শুভঙ্কর, পাওনায় হ'ল জমা
যে সব হিসাব ছিল এতকাল এলোমেলো হয়ে লেখা ।

সগর-বংশ ধ্বংস হয় যে, কাল সে কপিল মুনি,
ভস্ম হইয়া প'ড়ে থাকে তাহা অজানা সাগর-কূলে
তুমি ভগীরথ, তপস্যা-বলে এনে দিলে সুরধুনী
শুষ্ক তরুরে সাজাইয়া দিলে মনোরম ফলে ফুলে ।

যে সব কীর্তি ভেসে চ'লে যায় কীর্তিনাশার স্রোতে
তাই আহরিয়া নূতন কীর্তি স্থাপিলে বারংবার
নূতন সাগরে যাত্রা করিয়া সত্য-নিষ্ঠা-পোতে
বহিয়া আনিলে নূতন বার্তা, নূতন আবিষ্কার।

মরণের বুকে জীবনের গান শুনেছিলে কান পেতে,
তোমার বিলাস ছিল শ্মশানেতে মৃতের ভস্ম যেথা,
রসিক মৃত্যু চিনিল তোমারে শাশ্বত আলোকেতে—
আজ শুনিতেছি যম বলিতেছে, নম নম নচিকেতা,
নম নম নম সত্যনিষ্ঠ, তপস্বী ব্রাহ্মণ,
সত্যের বাণী শুনাই তোমারে হও একাগ্রমন।

মোহিতলাল মজুমদার

স্বপ্ন-নীল জ্যোৎস্না রাতে যাহার সন্ধানে
বাহির হইয়াছিলে, হে কস্তূরী মৃগ,
বিহ্বল আপন গন্ধে উদ্বেলিত প্রাণে
কহ, কহ, অবশেষে, পেলে তারে কি গো?

প্রখর তপন-তাপে স্বপ্নের মঞ্জরী
ঝ'রে পড়েছিল জানি, রুক্ষ মরীচিকা
জেগেছিল পথ-প্রান্তে; যাহার বাঁশরী
তবু মুগ্ধ করেছিল কোন্ সে অলীকা?

কে সে, বন্ধু, যার লাগি কঙ্করে কণ্টকে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিলে বিক্ষত চরণে,
তুচ্ছ করি শত্রু মিত্র স্তাবকে বঞ্চকে
পরিশ্রান্ত অবশেষে বন্দিলে মরণে!

বাহিরে ছিল না তাহা চেয়েছিলে যারে
হৃদয়-শোণিতাবর্তে ছিল তাহা হায়,
হৃদয় বিদীর্ণ করি পেতে হ'ল তারে
মৃগ সে মরিয়া গেল মৃগ-তৃষ্ণিকায়!

পুনরায় প্রশ্ন করি, হে অগ্রজ কবি,
দেখিলে কি অবশেষে, সে অদৃষ্ট-ছবি ?

সত্যের অনন্ত রূপ : সন্ধানীর মন
আপনার মত করি পায় যে তাহারে,
প্রতি সন্ধানীর সত্য স্বকীয় সৃজন
তার মূল্য অন্যে বল কেবা দিতে পারে !

তোমার মানস-দৃষ্টি যাহারে ঘিরিয়া
আরতি করিয়াছিল সে সত্য তোমারি,
তারই অর্ঘ্য রচেছিলে মরম চিরিয়া
হে একক, একনিষ্ঠ, হে স্বতন্ত্রচারি !

রসের নিরিখে কিংবা যশের নিরিখে
যে মূল্যই পেয়ে থাক, হে নিঃসঙ্গ কবি,
যে সত্য বিচিত্ররূপে মূর্ত দিকে দিকে
তারই মাঝে চিরন্তন তব সত্য ছবি ।

তোমার আগ্রহ-ভরা ব্যগ্র ব্যাকুলতা
যে বাণীরে খুঁজেছিল প্রতি পলে পলে
সহ্য করি নিন্দা-গ্লানি হতাশা-ব্যর্থতা
সে বাণী হয়েছে মূর্ত ক্ষোভ-শতদলে ।

সে বাণীর দেউলেতে সভয়ে এলাম ।
প্রণাম-প্রদীপটিরে রাখিয়া গেলাম ।

বিভূতি

অতি কাছাকাছি ছিল সে যখন
দেখি নি তখন কে সে
এখন বহিয়া গিয়াছে লগন
তরণী গিয়াছে ভেসে

এখন তাহারে খুঁজি সব ঠাঁই
আকুল নয়নে কাঁদিছে সবাই
বৃন্দাবনেতে কানু আর নাই
মথুরায় গেছে শেষে।

রাজার দুলাল মোদের কুটিরে
রাখাল সাজিয়া ছিল
সে কথা হায় রে কে যেন মোদের
সহসা বুঝায়ে দিল
আকাশের চাঁদ গ্রামের পুকুরে
হাসিতেছিল যে মায়ার মুকুরে
স্বপন-মরীচি চ'লে গেল দূরে
কে যেন হরিয়া নিল।

মোদের বিভূতি মিশিয়া গিয়াছে
শিবের বিভূতি সনে
এ কথা ভাবিয়া কোনও সান্ত্বনা
পাই না খুঁজিয়া মনে
শুধু মনে পড়ে তার সেই মুখ
সেই আঁখি দুটি চির-উৎসুক
সদা-জাগ্রত সদা-উন্মুখ
আনন্দ-আহরণে।

তাহারে ঘিরিয়া হবে এবে জানি
বহুবিধ বাচালতা
বিজ্ঞ জনের বহু কপচানি
বহু গাথা, বহু কথা
তবু সে ফিরিয়া আসিবে না আর
শূন্যে মিলাবে কথা-ফুৎকার
কমিবে না তাহে হৃদয়ের ভার
ঘুচিবে না তাহে ব্যথা।

তাহার তরণী আসিবে না আর
কখনও মোদের তীরে

এই কথাটাই জাগে বার বার
নানা সুরে ঘুরে ফিরে
চেনার আড়ালে ছিল যে অচেনা
নিজেরে চেনাতে আর ফিরিবে না
শুধিতে হইবে জানি তার দেনা
গোপন নয়ন-নীরে।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তোমারে কখনও দেখিনি চোখে
দেখেছি তোমার মহিমা কেবল
তোমারই সৃজিত কাব্য-লোকে
গঙ্গার জলে তোমারি চোখের অশ্রু ঢালা
মরুভূর বুকে জ্বলিছে তোমারি বুকের জ্বালা
আঁধার-শিবের গলায় দুলায়ে তারার মালা
মাতায়েছ তারে আকাশ-শ্মশানে সতীর শোকে
দেখেছি তোমার মহিমা বন্ধু
তোমারই সৃজিত কাব্যলোকে।

তুমিই বন্ধু খুলেছ ঢাকা
তাই তো মহেশ তোমারি দুয়ারে
বহিয়া এনেছে ভাবের ঝাঁকা
তাই তো উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে তব চিত্ত ভরি'
মুটে ও মজুরে কৃষাণী কৃষকে প্রণাম করি'
তোমার জগতে দিনে যে আঁধার দিবা শর্বরী
নিকষে স্বর্ণ, অমার ললাটে সূর্য আঁকা।
পরম-রূপের মঞ্জুষাটির
তুমিই বন্ধু খুলেছ ঢাকা।

বন্ধু, হৃদয়-বন্ধু মোর
কি যে অপরূপ সুরা-পান করি
দুখের রজনী করিলে ভোর।

জীবন-বাসরে বেদনাই তব পরম প্রিয়া
রক্তরঙীন মর্ম বেদনা নিঙাড়ি দিয়া
রচিল আসব, তাই পানে তব তৃপ্ত হিয়া
সেই তো মোহিনী, সেই তব গুরু, হৃদয়-চোর।
তাহারই কোমল বাহুবন্ধনে
টুটিল সকল বাঁধন ঘোর।
বন্ধু, হৃদয়-বন্ধু মোর।

ব্যঙ্গ কবিতা

প্রোলিটারিয়েট কবিতা

১

ইন্দ্রকে ডাকি ব্রহ্মা কয়,
"ছি ছি হে ইয়ার; কচ্ছ কী,
সারাটা বদন মেচেতা-ময়—
দিনে দিনে তুমি হচ্ছ কী ?"
"শোনো তবে ভাই চতুর্মুখ,
শিটি মেরে মেরে ফতুর বুক,
কবিতাই বুঝি লিখতে হয় ;—
বাণীর প্রসাদ কী করে পাই,
ভারতী শুনছি বেয়াড়া ভাই—
আমিষ-ভক্ত মোটেই নয়।
বুকের ভেতর জ্বলছে যা,
খাক হয়ে গেল কলজেটা—"

২

কুঞ্চিত করি আটটা চোখ
'কান্‌হি' মারিয়া ব্রহ্মা কয়,
"আপ্‌সাও কেন মিছে নাহক,
কিচ্ছু তোমার নাইক ভয়।
সত্যি যদিও বাগ্‌দেবী
সবজি এবং শাক-সেবী,
সাত্ত্বিক ভোগ কেবল চান ;
কিন্তু ভুলো না পুরন্দর,
হাঁসটি তাঁহার ধুরন্ধর—
ডুবে ডুবে তিনি গুগলি খান।"
"মাইরি বেম্‌মা বলছ কী,
গুগলি-ভক্ত গোল-চোখী ?"

৩

"গুগলির যম"—ব্রহ্মা কয়,
"ছাড়ে না কাকেও ধরলে সে,
ভেতরে ভেতরে বাণী যে নয়,
তাই বা তোমায় বললে কে ?
এমন বুদ্ধি এমন ধার—
শাক-পাতা খেয়ে সবটা তার,
এইটে আমায় বোঝাতে চাও ?
বাইরেতে আমি বুঝব তাই,
ভেতরে ভেতরে কিন্তু ভাই,
হাঁসের কাছেতে ভেট পাঠাও।
এ বুড়ো বান্দা জানে না কি ?
পর্দা থাকার মানেটা কি ?"

৪

বাহির করিয়া হলদে দাঁত
মুগ্ধ ইন্দ্র চাহিয়া রয়,
"ধরাও" বলিয়া অকস্মাৎ
কান থেকে বিড়ি ব্রহ্মা লয় ;
কয় চুপি চুপি, "না করে গোল
বারুণী পাঠাও দুটি বোতল,
পুষ্ট একটি ভেড়ার রাং,
বাণীর বীণার সাতটা তার
তুলবে দেখো না কী ঝঙ্কার—
উথলে উঠবে ভাবের গাং।"
"জানত কে এত পাঁচালি ভাই !
মাইরি বেম্‌মা বাঁচালি ভাই।"

হাসি, ১৩৫৭

পূজার বাজারে চাও হাসির খোরাক ?
তাহাই তো আছে দাদা বাকী সব ফাঁক।
পরনেতে বস্ত্র নাই, পেটে নাই ভাত
তবু মুখে হাসি ফোটে বাহিরায় দাঁত।
যে কাণ্ড ঘটিছে ভাই সারা বিশ্বময়
তা দেখে গম্ভীর থাকা সম্ভব কি হয় ?
ধরেছে পেচক রূপ যতেক বুলবুলি,
সুপ্রশস্ত বাতায়ন হয়েছে ঘুলঘুলি,
এবং তা হয়ে খুব হয়েছে খুশীও
পাও যদি দু-একটা খাঁচায় পুষিও।
একদরে বিকাইছে রসাল মাকাল ;
ঘৃতাচী দাল্‌দাচী হয়ে করিছে নাকাল,
নপুংসক ইন্দ্র ফেরে সিনেমা-লোকেতে,
চুলেতে কলপ দিয়া কাজল চোখেতে।
হিমালয় তেয়াগিয়া মহাকাল ভূতু
পপুলারিটির লোভে দেন কাতুকুতু
গণেশের বগলেতে,—তপস্যা ভুলিয়া।
যুধিষ্ঠিরের নামে হয়েছে হুলিয়া।
নূতন অজ্ঞাতবাসে ধর্মজ এবার
হইয়াছিলেন নাকি ব্যাঙ্ক ডিরেকটার।
ছাত্র-শকটেরে টানে মাস্টার-ষাঁড়েরা,
মন্ত্রিত্ব করিছে যত গোপাল ভাঁড়েরা।
হবু গবু লজ্জাভরে রজ্জু দিয়া গলে
নাম লিখায়েছে না কি শহীদের দলে।
এ দেখেও হাসি যার না ফোটে বদনে
ঠোঁট তার ফাটিয়াছে,—হাসে মনে মনে।

বিদগ্ধ পাচক

অধিকারী হয়ে যে গুণের
লাউ বেগুনের
মিলেছিল অলাবু ও বৃহতী উপাধি

(যে কথা ঘোষণা করে আজও পঞ্জিকাদি)
সে গুণে ধরেছে ঘুণ—তাই ম্লেচ্ছ আলু
বাজারেতে হইয়াছে চালু।
তাই কপি—বাঁধা কিংবা ফুল
করিতেছে বাজার মশগুল।
আলু-খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে
উক্ত চিন্তা হানা দিল সুবিদগ্ধ পাচকের মস্তিষ্ক-পাড়াতে !
বেকার-সমস্যাহত এম. এ. পাশ পাচক দুলাল,
ভুলে গেল ফুটিতেছে ডাল,
ভাবিতে লাগিল শুধু কোন্ দোষে কেন হল কাবু
বৃহতী অলাবু।
হাউ ?
ভাবিতে লাগিল যদি প্রো-বেগুন-লাউ
প্রবন্ধ লেখানো যায় ধরিয়া বিজ্ঞানী বাছা বাছা
বিজ্ঞাপিত করা যায় ভাইটামিনি সত্য চাঁছা চাঁছা
হয়তো কমানো যায় আলু আর কপির গুমোর—
চিন্তা আর এগোল না (হয়তো বা এর জন্য দায়ী কোনো
অজানা কুমোর)
সশব্দে ফাটিল হাঁড়ি, পোড়া গন্ধ ছাড়িল ডালের
প্রভু-পত্নী ছুটে এসে প্রয়োগিল যে ভাষা গালের
সে ভাষার বিশেষত্ব কোন্ বইয়ে, কোন্ পেজে,
লিখেছেন কারা
জানিত দুলাল ; কিন্তু তাহা লয়ে চিন্তা করিবার সুযোগ বেচারা
পাইল না আর
বিদায় লইতে হল কণ্ঠে পরি অর্ধচন্দ্র-হার।

হৈরব

১

দু পেগ করিয়া পান
শেষ করি গোটা 'লেগ্-রোস্টে'
হারু ঘোষ, মরি মরি,
সত্য আবিষ্কার করি,

কভু কেঁদে কভু হেসে
কবিতা লিখিল শেষে
পাগলা-গারদে নহে, স্বকীয় প্রকোষ্ঠে।
কবিতাটি এই—
(কোনো খাদ নেই।)

২

"আবিষ্কার করেছি নির্ভুল।
মাথায় থাকিত যদি চুল
বিকায়ে বিলকুল
দেনা মোর হত না উশুল,
দেনা যে অঢেল
চুলও নাই, সব টাক—ভৃঙ্গরাজ ফেল।
জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে
ধীরে ধীরে ডুবিয়াছি ধারে
কত যে জানি না
কত মানুষের কাছে কতই যে ঋণ আছে
সে কথা ঢাকিতে চাই
নানা ভাবে নানা ধাঁচে,
মানুষ দূরের কথা পশু-পাখি ফুল-ফল
তাদেরই দাক্ষিণ্যটুকু সবার যে সম্বল
কাক চিল শকুনি গৃধিনী
তাহাদেরও কাছে আছি ঋণী
কিন্তু তা মানি না!
কেন যে জানি না!
অহঙ্কার-অন্ধকারে জ্বালাইয়া বাক্য-ফুলঝুরি
করি বাহাদুরি,
শূন্যতার সিংহাসনে করি আরোহণ
কাঁপাই গগন,
চিৎকারিয়া উঠি থাকি থাকি
যে প্রহরী নাই তারে ডাকি
—কোই হ্যায়?
ত্রস্ত কোনো দৌবারিক ছুটে এসে
সাড়া নাহি দেয়।

যখন শিবের গীত গাওয়াটাই সমুচিত
গাই না কিছুতে,
ধান ও ঢেঁকির চিন্তা নিয়ে যায়
অনেক নীচুতে।
ধান ঢেঁকি মেলে যবে
শিব-গীত গাই তবে
ধান তো জানি না
কিন্তু তা মানি না
কেন যে জানি না!
এলোমেলো হয়ে যায় সব ;
কেউ বলে জ্ঞানী আমি,
কেউ বলে স্নব।
কেউ বলে ধূর্ত সঙিন,
কটাক্ষে ঢাকিবে বলে পরিয়াছে চশমা রঙিন।
হতভম্ব হই,
সকরুণ কণ্ঠে কহি—কোথা তুমি, কই
কোথা তুমি পরমাত্মা,
মেলে না তাহারও পাত্তা!
দুত্তোর বলিয়া শেষে গান গাই, বাজায়ে গীটার
পাখাটা চালাই জোরে ওঠে যদি উঠুক মিটার।
মোদ্দা কথা বুঝিয়াছি তোমাদেরই একজন আমি
কারো দাদা, কারো ভাই, কারো শালা,
কাহারও বা স্বামী
করজোড়ে অনুরোধ করিতেছি তাই বারে বারে
পায়ে ঠেলে দিও না আমারে।"

৩

বাজারে গুজব জোর হারু ঘোষ বেচে গাই গোরু
এমন কি বাঁধা দিয়ে বোন বেটী জরু,
অবতীর্ণ হবে নাকি নির্বাচন-দ্বন্দ্বে!
আর উক্ত কবিতাটি ভৈরব ছন্দে
আবৃত্তি করিবে নিজে লরি-শীর্ষে হইয়া উন্মনা
কবিতা-চুম্বক নাকি আকর্ষিবে ভোট-লৌহ কণা!

চাটুজ্যেমশাই

ঘর্ঘর শব্দে এরোপ্লেন উড়ে গেল একটা
পাড়া প্রকম্পিত করে।
চাটুজ্যেমশাই তার খোলার ঘরের দাওয়ায়
তামাক খাচ্ছিলেন
খেলো হুঁকোয়।
প্লেনটার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে
পিচ ফেলে বললেন, "আপদ!"
সামনেই প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি,
চিরকালের চক্ষুশূল।
ঠিক এই সময়ে তার থেকে আবির্ভূত হল
কর্ণশূলটাও।
গাঁকগাঁক করে রেডিওটা বেজে উঠল।
চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল চাটুজ্যের,
কুঁচকে গেল ভ্রূদুটো,
কাশির দমকটাও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে
কাশতে কাশতে বললেন "পাপ!"
তারপরই গলির ভিতর ঢুকল একটা মোটরকার
ইলেকট্রিক হর্ন বাজাতে বাজাতে।
চাটুজ্যে হড়াত করে বার করে ফেললেন
কফ খানিকটা।
হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই
এল আর-একটা মোটর
তারপর আর-একটা।
প্রত্যেকেই উচ্চগ্রামে ইলেকট্রিক হর্ন বাজাচ্ছে!
তার পিছুপিছু ঢুকল আবার একটা ছ্যাকড়া গাড়ি,
তার ছাতে বাঁধা লাউড স্পীকার একটা,
তারস্বরে বিজ্ঞাপিত করছে
কোনো এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রের
চমকপ্রদ উদ্ঘাটন-বার্তা!
চাটুজ্যেমশাই—
যিনি মহাত্মাজীর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেন রোজ
সেই চাটুজ্যেমশাই

অদ্ভুত কাণ্ড করলেন সেদিন একটা।
মহাত্মাজীকেই স্মরণ করলেন শ্রদ্ধাভরে।
বললেন, "ঠিকই বলেছিল লোকটা,
এই মেশিনই সর্বনাশ করবে আমাদের!"
সঙ্গে সঙ্গে
আর একটা অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটল।
তাঁর অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে
বসে ছিলেন যে সত্যদ্রষ্টা পুরুষ,
তাঁর মানসপটে
এই ঘটনাগুলোই
রূপান্তরিত হল প্রাচীন একটা ছবিতে।
এরোপ্লেন, তেতলা বাড়ি,
রেডিও, মোটরকার
লাউড স্পীকার, সিনেমা,
সব তালগোল পাকিয়ে
রূপান্তরিত হল
বহু-ঊর্ধ্বে দোদুল্যমান
একগোছা আঙুরে,
আর চাটুজ্যেমশাই হয়ে গেলেন
একটা শেয়াল
আঙুরে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি,
ঊর্ধ্বমুখী, লোভাতুর।
অন্তরবাসী এই পুরুষটির দিকে
একটা বিষ-দৃষ্টি হেনে
চাটুজ্যে বললেন
"আরে দূত, রেখে দাও তোমার ও-সব
ঈশপী আজগুবি…ছ্যাঃ—"
নাতনী ডাক দিলে ভিতর থেকে
"দাদু, গাড়ুতে জল দিয়েছি—"
চাটুজ্যে উঠে অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

দৈন্য

খেলো-হুঁকো ছাড়িয়াছি,
ফুঁকি সিগারেট
হুইস্কি ব্রাণ্ডি পেলে খাই,
গাঁজা-ভাং চলে না আমার।
বঙ্গ-গর্বে ভরা বুক,
কিন্তু দাদা, বাঙালী পোশাক
পরি না পারত-পক্ষে।
বাড়িতে পা-জামা ঢিলা
বাহিরেতে স্যুট,
সানন্দে পরিয়া থাকি ;
লুঙ্গিও বিকল্পে কভু।
এতদ্ব্যতীত,
ভণ্ডামির আবরণে মণ্ডিত হইয়া থাকি
অপূর্ব কৌশলে।
ঘৃণা করি যারে
তার সাথে কথা কই হেসে,
যাহারে উচিত মারা চড়
গড় করি তাহারেও।
কিন্তু বুঝি সব ,
অভ্রান্ত নিক্তি দিয়া সকলেরে করিয়া ওজন
অহঙ্কারে-নোটবুকে যে কথাটি লিখি সুগোপনে
মোদ্দা কথা তার,
সংসারে আমিই শ্রেষ্ঠ,
পরিপক্ক খাঁটি সমঝদার
একমাত্র আমি।
আমি—আমি—আমি···!
নিজের প্রশংসা করা যেহেতু বাজারে চল নাই
থাকি তাই চুপ করে।
কিন্তু তা সত্ত্বেও
যে মুচকি হাসিটি দাদা ফুটে ওঠে ঠোঁটে
আত্মপ্রশংসারই বার্তা সে হাসিতে হয় প্রচারিত,
যাহাদের কান আছে তাহারা শুনিতে পায়
যাহাদের চোখ আছে করে নিরীক্ষণ।

ইংরেজ-জাতির গর্বে ভরে আছে বুক
তাহাদেরই কথা বলি চিত্তে জাগে সুখ।
পিতামাতা নহে তারা
নহে তারা আত্মীয়-স্বজনও
এই দুঃখদায়ী সত্য ভুলিয়া থাকিতে চাই
আত্মনিন্দা-মরফিনের ইন্‌জেক্‌শন ফুটায়ে শরীরে।

ভুলেছি সুক্তের স্বাদ ;
সুস্বাদু বিলাতী খানা জোটে না কপালে।

তবু দাদা,
টেবিলের 'পরে,
হলুদের-ছোপ-লাগা চাদর বিছায়ে
কিম্ভূত-কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড-বিরচিত দোআঁশলা খানায়
তৃপ্তি পাই কথঞ্চিৎ।

ডালভাত সপাসপ খাইতে পারি না,
ফ্রাই চপ জ্যাম জেলি টুকিটাকি 'নীট' খাওয়া চাই
কিন্তু হায় এ বাজারে সে সব দুর্লভ !
আনন্দ-অমৃতে রুচি নাই
স্টেইটসম্যান পড়ি।

বুঝিতে পারি না সব তার,
আচমকা বুটের গুঁতা
কুক্ষিদেশে মাঝে মাঝে লাগে অকস্মাৎ।
তবু কিনি, তবু পড়ি তাই।

সভ্য হতে চেয়েছিনু
কিন্তু ভাগ্যদোষে
রাহুসম ঐকার একটা
গ্রাস করিয়াছে মোরে।

আড়ালে পিছনে
সকলেই বলে—ওই, ওই—! ওই সে লোকটা !

বুঝি সব
বলিতে পারি না কিছু,
আত্মনিন্দা-মরফিনের ইন্‌জেকশন্‌ লয়ে পুনরায়
চেষ্টা করি আপনারে ভুলিয়া থাকিতে ॥

অতএব

১

মানছি না হয় পাড়ছে গালি
রামধনুরে ভূষোর কালি,
পাথর না হয় হচ্ছে কাতর
পলিমাটির পেলবতায়,
পারছি নাকো বুঝতে শুধু
তুমি কেন নাচছ বঁধু?
হচ্ছ কেন মুক্ত-কচ্ছ
অকারণে ওদের কথায়?

২

রামধনুরা চিরকালই আকাশপটে উঠছে জেগে
এবং আছে ভূষোর কালি কেলে-হাঁড়ির অঙ্গে লেগে,
পাথর এবং পলিমাটি এক হবে না কোনও দিনও,
পাথরেতে শ্যাওলা হবে জন্মাবে না কোমল তৃণ।
জোলো দুধের চিরকালই ঈর্ষা হবে ক্ষীরসা দেখে
সোজা থাকবে সরল-রেখা বক্র-রেখা থাকবে বেঁকে।

৩

ঘটছে এসব চিরটা কাল
তুমি কেন হও বেসামাল,
যখন-তখন পরের কথায়
গদগদিয়ে উথলে উঠে
ফেনা ঝরাও ওষ্ঠ ভরি,
পরের মুর্গি রোস্টো করি
তোমার বলো কী লাভ দাদা,
পুড়িয়ে নিজের কয়লা ঘুঁটে?

৪

অতএব
যথাকালে ভাত খেয়ে আপিসেতে যাও
এবং সেথায় গিয়ে কাজে মন দাও
বেল যদি কোনো গাছে পেকে থাকে থাক
পেঁপে তেয়াগিয়া কভু যেও না, হে কাক।

মরাই ভালো

বাংলাদেশে মরাই ভালো
পার তো ভাই পটল তোলো!
মরলে পরে চোখ থাকে তো দেখতে পাবে অনেক লোকে
কাঁদছে ভায়া তোমার শোকে!
বেঁচে থাকতে যারা তোমায় গাল না দিয়ে জল খেত না
তোমার কোনো গুণই যাদের হৃদয়কোণে ঠাঁই পেত না
(দেখবে তারাই— হ্যাগো, তারাই)
টাঙিয়ে তোমার মস্ত ছবি ঝুলিয়ে তাতে দিচ্ছে মালা
উচ্ছ্বসিত বক্তৃতাতে দিচ্ছে কানে ধরিয়ে তালা
চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি করছে কাদা,
পদ্যে এবং প্রবন্ধেতে প্রমাণ সহ করছে গাদা
তোমার গুণের ফর্দগুলো,
বলছে হেঁকে দারুণ শীতে তুমিই ছিলে লেপের তুলো,
তুমিই ছিলে অদ্বিতীয়, তুমিই ছিলে মহান পুরুষ,
দেখবে দাদা তোমার নামে কত মুচির কত বুরুশ
সচল হল,
তাই বলছি পটল তোলো।
যতক্ষণটি আছ বেঁচে
গুটি তোমার থাকবে কেঁচে।

রঙরেজ ১৩৫৩

নব-নামাবলী নির্মিত হবে শুদ্ধ খাদিতে জানি
হৃষ্ট তাঁতিরা ভাবছে বাজার চড়বে
রঙরেজ দল সংশয়ে শুধু করছে যে কানাকানি

কোন্ রঙ দিয়ে ছাপা হবে কোন্ বাণী
কী জানি এবার কোন্ ছাপ তাতে পড়বে !
গলিতে গলিতে চলে আলোচনা চাপা
কোন্ রঙ দিয়ে নামাবলী হবে ছাপা
সমস্যা নয় সোজা—!
ত্রিবর্ণ হল স্ববর্ণযোগে বিবর্ণ বিলকুল
রাম জুটলেন হারামজাদার সঙ্গে
শকুনি-গিন্নি দোলান কর্ণে অশোক-চক্র দুল ;
ওদিকে ভৃঙ্গী শানায় শিবের শূল
নৃমুণ্ডমালা দোলে শিবানীর অঙ্গে !
বাংলা শ্মশান—শুধ্ দূরে যায় দেখা
নব-তান্ত্রিক শবাসনে জাগে একা,
রঙ তো যায় না বোঝা !

রাম-রাজ্য ১৩৫৬

১

কাছা বলে কোঁচাকে
মোর ঠাঁই আগে কেন হবে না,
খাঁদা বলে বোঁচাকে
মোরে কেন বোঁচা সবে কবে না.
কান বলে নাককে
আমিও তোমার মতো ডাকব,
টিকি বলে টাককে
তুমি আমি দুজনেই থাকব।
টুং টাং বেজে বলে পিয়ানো
সুরেতে ময়ান চাই, দু বালতি ঘি আনো।

২

টিয়া বলে শালিকে
হাঁফ ধরে সবুজের গঙ্গায়,
শিব বলে কালীকে
বদলা-বদলি করি রঙ আয়,

গোঁফ-পরা দ্রৌপদী
দাড়ি চাই বলে কেঁদে মরছে,
গজলের চৌপদী
বাঈজী-ভীমরা সব ধরছে।
তেরে কেটে বেজে বলে তবলা
ওরে ডুগী, ওরে ডুগী, তুই কিছু কবলা।

৩

জোলো মোরে বলবে ?
জল ছাড়ে হুঙ্কার গাড়ুতে,
বরফরা জ্বলবে
গুড় বলে থাকব না নাড়ুতে।
আমরা তোমরা হব
তোমরা আমরা হবে দাদা গো
এই স্বাধীনতা নব—
'যা-খুশি'র সুরে হবে সাধা গো।

টিরিরিঙ বেজে ওঠে ফোন্‌টা
রাম কন—হ্যালো সীতা, ঘোড়া ধরি কোন্‌টা ?

বার্তাকুর স্বপ্ন

১

ষণ্ড-সিদ্ধ খায় যারা পিপা পিপা মদের সহিত,
অতৃপ্ত বাসনা যেথা তৃপ্তি খোঁজে রমণী চটকায়ে,
তাদের করিল কাবু ব্রহ্মচর্য এবং গো-হিত—
আজব খটকা এ!

সামু খুড়োদের দেশে বিবেকানন্দের হল জয়,
গান্ধী-ভক্ত মার্কিনেরা উপনিষদের বুলি কয়,
কালা-প্রেমে গদগদ কী করিয়া বলো তারা হয়,
আনন্দ লভয়ে যারা ল্যাম্প-পোস্টে নিগ্রো লটকায়ে-
আজব খটকা এ!

২

কলা-সিদ্ধ খায় যারা রাশি রাশি পান্তা সহযোগে,
অতৃপ্ত বাসনা যেথা তৃপ্তি খোঁজে বেদান্ত-গীতায়,
তাহারা হইল কাবু হুইস্কি-মার্কা ফিরিঙ্গির রোগে।—
হায় হায় হায়!
বুদ্ধ-গৌরাঙ্গের দেশে প্রেমবাণী শিখাল বাইবেল,
তান্ত্রিকের পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল মাইফেল,
ভেসে যায় হতমান গদি-চ্যুত সরিষার তেল
বিলাতী সুগন্ধ-স্নিগ্ধ বুদ্বুদিত সাবান-ফেনায়।—
হায় হায় হায়!

৩

বার্তাকু শুনিয়া কহে—আশা করি রহিয়াছি আমি
আঁকশি দিয়া আমারেও পাড়িবেন একদা ভূস্বামী।

লাল

হাপরের ফুঁয়ে যে কালো লোহারা হঠাৎ লাল
যে শাদা ছানারা ফুটন্ত ঘিয়ে লালচে মেরে
রস-ডুবুডুবু পানতোয়া হয়ে কাটায় কাল
আসল লালের খবর তাহারা রাখে না যে রে।

বোঝে না-ও তারা লালের বাজারে তাহারা সং
যদিও তাদের লালিমা-পালীয় অনেক ঢং
পলাশ-জবায় জাগিছে যখন প্রাণের রং
মাটির স্বপন রাঙায় যখন রঙ্গনেরে।

হঠাৎ-লালেরা গুদোমে তখন বন্দী হায়,
তাদের লালের মহিমা তখন ভাড়া করা লোকে
কাগজে গায়।

দোলের হিড়িকে দলে দলে হই অনেকে লাল,
শুধু লাল নয়, ইন্দ্রধনুর মহিমাটায়
চেঁছে এনে যেন রঞ্জিত করি মাথা ও গাল,
লালালিত মন লুটোপুটি করে,—অপটু কায়।

চাবুকে চাবুকে হতেছে যাদের চামড়া লাল
যে লাল রক্তে লেখে ইতিহাস মহান কাল
সে লালের কথা জানি না আমরা পশুর পাল
রঙীন-ফানুস-বিহারী দুলাল আমরা হায়।
হঠাৎ-লালেরা কিন্তু হায়রে ফ্যাকাশে হয়,
নব কিংশুকে নবীন সূর্য গাহে চিরকাল
লালের জয়।

চিনেছি

১

জানালা অথবা ঘুলঘুলি দিয়া বহুবার তুমি আস বা যাও
বাতাস বলিয়া ভাবি নি তোমারে কখনও ভুলে।
সন্তর্পণে নিশীথে যখন দরজা ঠেলিয়া উঁকিটি দাও
প্রেয়সী ভাবিয়া হৃদয় কখনও ওঠে নি দুলে।
তাপসের মতো চোখ বুজে থাক, যেন কী সাধু,
তবুও তোমারে ভাবি নি কখনও কবীর দাদু,
চিনি যে জাদু,
বহু দুধ মোর করিয়াছ পান ঢাকাটি তুলে।

২

বহুবার জুতা মেরেছি তোমারে—হয়েছে তাহাতে জুতারই ক্ষয়—
তুমি আস ঠিক, এসে বসে থাক পাতের কাছে,
দেখেও দেখি না, কিন্তু শেষটা বাধ্য হইয়া দেখিতে হয়,
গুটিগুটি আসি মুখটি যখন লাগাও মাছে!
ধমক অথবা চাপড় খাইয়া বস গো সরি
হয় লেলিহান ক্রোধাগ্নি-শিখা হৃদয় ভরি,
সহ্য করি,
কারণ জানি যে ভাণ্ডার-ঘরে ইঁদুর আছে।

৩

হে বিড়াল, তুমি বিড়াল হইলে হয়তো হত না ততটা ক্ষোভ,
কিন্তু, হায়রে, মানুষ তুমি যে ভুলিতে নারি,
শুধু তাই নয় চমক-লাগানো চটক তোমার (ও বাই জোভ)
কী অনবদ্য, ওগো মনোরম হে ভেক-ধারি,
মশার ভয়েতে গরমে পচিয়া মশারি চাই,
ইঁদুরের ভয়ে তেমনি তোমারে সহিয়া যাই,
কিন্তু ভাই,
চিনেছি তোমারে ভোলাতে পার নি, হে মনোহারি।

হাসিস না

হাসির কথা ভাবাই এখন হাস্যকর
(হাসবি কি রে !)
চতুর্দিকে জ্বলছে আগুন
নাইক ঘরে পান্তা বা নুন
রুক্ষ মাথায় এখন বসে
দুঃখ করাই স্বাস্থ্যকর
(হাসছিস কি !)
হাসিস যদি অমনি সবাই করবে শুরু
কুঁচকে যত বিজ্ঞ ভুরু,
"এই যুগেতে জানিস হাসির শর্তটা কি ?
হাসি দিয়ে ভরবে পেটের গর্তটা কি ?
হাসলি যদি বল তাহলে অর্থটা কি
বিশদ করে ভাষ্য কর"
(ধরবে ছেঁকে)
"হাসির মানে নাই তো জানা একটি ছাড়া"
বলিস যদি করবে তাড়া—
"কোনো কিছুর একটি মানে
হয় না কি রে লক্ষ্মীছাড়া"
(বিশেষত এই যুগেতে)
"তেরঙ্গা, না, লাল হাসি ও ?
বামী, না, ও দক্ষিণী ?

রামশিঙে, না আড় বাঁশি ও ?
পদ্মিনী, না যক্ষিণী ?

এট্‌লি হাসি ? ট্রুম্যান হাসি ? কিংবা হাসি মান্ধাতার ?
কিংবা চীনে চিয়াং হাসি ? কিংবা হাসি চাঁদ-তারার ?
একটি হাসির একটি মানে এই যুগেতে হয় না আর
নিদেন পক্ষে পাঁচ শো কর"
(সবাই তোকে করবে তাড়া)
হাসির কথা ভাবাই এখন হাস্যকর।
চিন্তা-মনিব চালায় চাবুক
তারই এখন দাস্য কর!
(হাসিস না)

বিজ্ঞানের জয়

মাংসে ডিমে হয় বাত
দুধ খেলে বেড়ে যায় কফ
মদ খাওয়া ভালো নয়
হয় তাতে লিভার খারাপ,
ঘানি-কল দুইই এক
সরিষার তেল মানে বিষ,
ঘি মানেই বাদামের তেল
লিভারের মূর্তিমান যম।
গুরুপাক ইলিশ চিতল
রুই ভেটকি সমস্ত চালানী
অশাস্ত্রীয় আঁশহীন মাছ
কিনি নাকো শিলং বা আড়,
ভিটামিন ক্যালসিয়ম্ আশে
কচি মাছ কচি শাক খাই,
খোসা-সুদ্ধ আলু, লাল চাল,
মোটা আটা বাদামী সভুষি।
ফাটা-কাপে অতি পাতলা চায়ে
দুই বেলা চিত্ত বিনোদিয়া
অনুকম্পা করি তাহাদের
এই পথে চলে না যাহারা।

জয় জয় বিজ্ঞানের জয়
বাঁচায়েছ গরিবের মান
মাছ মাংস দুধ ঘি না হলে
করিয়া দিত যে লবেজান·!

তিনকড়ি-দর্শন

তিন আর তিন পাশাপাশি যতং ন
তেত্রিশ হয় তারা :
গুণ করো হবে নয়,
ভাগ করলেই এক হয়ে যাবে
যোগ করলেই ছয়,
তিন থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকবে না কিচ্ছুই—
তিনের প্রতাপ শূন্যেতে হবে হারা।

তিনের উক্ত মহিমা শুনিয়া কন তিনকড়ি দাম
আমার ব্যাপার তিনের আলোকে এতখনে বুঝিলাম।
শূন্য ঘরেতে বহিতেছিলাম বিয়োগ-ব্যথাই
তিনকুলে মোর আপনার লোক ছিল নাকো ভাই,
বন্ধ্যা গৃহিণী মানিয়া সিন্নি বাঁধিয়া ঢিল
গোপনে খুলিতে চাহিতেছিলেন নিয়তি-খিল।
এমন সময় অকস্মাৎ
হাজির হলেন ত্রিদিবনাথ।
কহিলেন মোরে, খাও তিন্তিড়ি-ঝোল।
বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, রয়ে গেল কিছু গোল।
তিন্তিড়ি মানে বাংলা তেঁতুল ছিল না জানা।
জানিবামাত্র বাজারে ছুটিয়া দিলাম হানা;
কিনিয়া ফেলিনু তেঁতুল কয়েক বোরা ;
তারপর থেকে প্রত্যহ খোরা খোরা
খাই তিন্তিড়ি-ঝোল,
এবং, বন্ধু, তারপর থেকে ভরা গিন্নীর কোল।
তিনকুলে কেউ ছিল না আমার
এখন শক্ত জোটানো খাবার।

নয়-ছয় সব হইয়া গিয়াছে
বাজারে প্রচুর দেনা জমিয়াছে,
এখন কেবল চিন্তা করিছে বিমর্ষ প্রাণ-পাখি
তিন আর তিন পাশাপাশি হয়ে তেত্রিশ হবে নাকি !

নব সীতা-উদ্ধার

দশানন জানকীরে হরণ করিছে চিরকাল
শ্রীরামও উদ্ধার তাঁরে করিছেন বিবিধ উপায়ে ;
ভূর্জপত্র হলুদে ছুপায়ে
মুষ্টিবদ্ধ থাগ-লেখনীতে
একটি উপায়-গাথা শ্রীবাল্মীকি হরষিত চিতে
লিখেছেন রামায়ণে অনুষ্টুভ ছন্দে নিজ
সানন্দে পড়িছে তাহা অদ্যাবধি আচণ্ডালদ্বিজ ।

২

আধুনিক যুগেতেও শ্রীরাবণ করেছে হরণ
শ্রীমতী সীতারে,
বাজিছে সে বার্তা নিত্য ম্যাণ্ডোলিনে, সেতারে, গীটারে,
ওপারে এপারে
সে বার্তা রটিয়া গেছে বিবিধ পেপারে,
বেজেছে বেতারে
বিচলিত করেছে নেতারে !
উন্মনা উদ্ভ্রান্ত তাঁরা দিবারাত্র রয়েছেন জাগি
স্বর্ণ কারাগারে বন্দী জানকীর উদ্ধারের লাগি ।
অন্ত নাই তর্ক জল্পনার ।
সচিত্র বিচিত্র বহু পরিকল্পনার ।
বুঝিতেছি যুদ্ধ হবে পুন
কিন্তু তার মোদ্দা কথা শুনো !

সে যুদ্ধেতে রহিবে না রাবণারি রাম ধনুর্ধর,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু অথবা লক্ষ্মণ শক্তিধর,
বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ,
আহত হইয়া কেহ সে যুদ্ধেতে হবেন না চিত ।

অস্ত্রাঘাতে কোনো বীর হইবে না ঘাল
রক্তপাতে লাল
অথবা শোণিত স্রাবে নীল
কারণ সে যুদ্ধের অস্ত্র পঞ্চ-শীল।

আকাশ-সমুদ্র

আকাশ তো মহাশূন্য, সমুদ্রের আছে তীর,
বলিতেন একদল চাক্ষুষী-বিজ্ঞানী
সমুদ্রের তীর নাই, আকাশে প্রচুর ভিড়,
যাঁরা বলিতেন না কি তাঁহারাও ধ্যানী।

সমুদ্র আকাশ লয়ে ঘামান না মাথা যাঁরা
তাঁহারাই গরিষ্ঠ সংখ্যায়,
ঘা মারিয়া ভোটের ডঙ্কায়
তাঁরা বলেছেন যাহা
অন্যরকম তাহা।
তাঁরা বলেছেন না কি আগে চাই রামপাখি;
তারপর বক্‌রা ও বক্‌রী,
তারপর তেল, নুন, লকড়ি।
তারপর ব্যাদানি বদন
দিবারাত্রি চালাব রদন।
আকাশ-ফাকাশ কিংবা সমুদ্র-টমুদ্র লয়ে
ভাবিবার পাব বহুদিন
সর্বাগ্রে খাবার চাই এবং তা হওয়া চাই
সুপাচ্য প্রোটিন।
ছাগোন্নতি বিভাগেতে প্রবেশ করুন আসি ওই বিজ্ঞানীরা
আকাশ-সমুদ্র নয় পোল্‌ট্রি-সমস্যা লয়ে ধ্যানমগ্ন হউন ধ্যানীরা।

অভিনব সংবিধানে হল বহু বিবর্তন,
প্রবর্তিত হল নব প্রথা
আকাশ বা সমুদ্রের হল না বদল কিছু
রহিল তেমনি নীল পুরাকালে ছিল তারা যথা।

নাক, উনবিংশ শতাব্দী

"সন্দেহ কোরো না ওহে একেলে রতন
আমাদেরই নাক ছিল নাকের মতন।
নস্য, লোম, চশমা যেথা পাইতে আদর,
ঘুঁসি, লাথি, সিক্‌নি, আতর
স্থান পেত সম-ভাবে যেথা,
যে নাকেতে কাঁদিতাম সেলাম করিয়া যেথা সেথা ;
তুলি যাহা করিতাম বাদ-প্রতিবাদ,
কুঁচকাইয়া চুলকাতাম দাদ,
ফুলাইয়া করিতাম মান,
তিল-ফুল সম নহে, ছিল যাহা খড়্গ-সমান ।
হাঁচিতাম উচ্চরোলে কাঁপাইয়া ছাদ,
ডাকাতাম তুলি ভীম নাদ,
যার পরে চড়ায়ে তিলক
দোমনা-যজমান-বক্ষে গাড়িতাম ভক্তির কীলক,
উপদংশ-প্রহারেও যাহা অলজ্জিত
মাজা-ভাঙা কেউটে সম ফুঁসিত গর্জিত
তোমাদের সেই নাক কই ?
খাঁদা খিন্ন কম্পমান তুলতুলে ওই
পাউডার মাখায়ে যারে রাখ
ফিন্‌ফিনে রুমালেতে ঢাক ।
তাহারে কি নাক বলে বাছা ?"
এই বলি বাচস্পতি গুঁজিলেন কাছা।

সদুপদেশের প্রতিক্রিয়া

লিখেছ প্রকাণ্ড চিঠি, হে দূরবাসিনি,
নানাবিধ অসুখের দিয়াছ তালিকা,
দূর হতে চিকিৎসার হবে কি সুবিধা ?
বয়স কি ? বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা
নারীত্বের কোন স্তরে পৌঁছিয়াছ গিয়া
লেখ নি কিছুই তাহা ; শুনি সিমটম্‌
চিকিৎসা করিতে পারি হেন বুদ্ধি নাই,
হোমিওপ্যাথি জানি না একদম ।

বুক ধড়ফড় করে ? হতে পারে 'করোনারি',
বাথরুমে দিন রাত যাও বার বার ?
ইউরিনে শুগার আছে ? দেখা সেটা দরকারি,
রক্তের চাপটাও জানা দরকার।
মোর উপদেশ শুনো : যাও লেডি ডাক্তারের কাছে
পরীক্ষা করাও গিয়া আপাদমস্তক
পরীক্ষার ফলাফল জানালে আমারে,
ব্যবস্থা তখন আমি করিব যা হোক।

পাইনু ফেরত ডাকে উত্তর তাহার
অতীব সংক্ষিপ্ত আর অতি সারবান
"জানিতাম কবি তুমি পরম রসিক,
সে ভুল ভাঙিল আজি, হায় ভগবান।"

ষড়ানন্দ

১

সমালোচনা

আধুনিক জগতের যেটি ঠিক মর্মবাণী
জানেন না সে কথা লেখক,
যে পথে চলিতে চান সে পথেও হায় তিনি
নহেন একক।
সে পথেতে দলে দলে কানাই বলাই চলে
চলে কত হরি ও যদুরা,
কিন্তু বলো কয়জন লাভ করে বৃন্দাবন
অথবা মথুরা !
প্রচ্ছদ ছাপাই ভালো ছবিটি আরও রসালো
মূল্যও নহে তো অধিক,
ছবিরই হইবে জয় প্রকাশক মহোদয়
তরিবেন ঠিক।

২

উক্ত সমালোচনা পড়িয়া লেখক

বিদ্যাবুদ্ধি কতটা নাই তা জানা
বিনা পয়সায় পেয়েছ কেতাবখানা
কর্ণ মলিয়া করিবে তোমারে মানা
তেমন হস্ত সম্পাদকের নাই,
তাই
দু-চার লাইনে দম্ভ করিয়া জাহির
সমালোচনাটা ছাপিয়া করেছ বাহির।
দুটো পয়সারও মুরোদ নেইকো যার
সে পাল্লা দেয় সঙ্গে মহারাজার
নূতন রকম এ কী এ কালোবাজার
সমালোচনার নামেতে হয়েছে চালু,
আলু
মুচকি হাসিয়া খেলিছে আঙুর খেল
সম্পাদকের পায়ে দিয়া কিছু তেল।

৩

পাঠক

আরে রাম রাম
পয়সা দিয়ে এ কী কিনলাম !
এর চেয়ে চিনি-পাতা দই আধ সের
ছিল ভালো ঢের।

৪

উই আর ইন্দুরের দাবি

আমরাও বাজে বই আর কাটিব না
ভাগবত-পুরাণেতে ধরেছে অরুচি,
মুচমুচে বই চাই সাগর-পারের
তাহাই করিব কুচি কুচি।
তাই মোরা সেন্‌সার বোর্ডে
রাখিয়াছি পণ্ডিতের দল
প্রচণ্ড বিদ্বান তারা
ডিগ্রি-কুণ্ডে করে খলবল।

কন্‌টিনেন্‌টালি মাল বাছিয়া সরস
আমাদের মুখে তাঁরা ধরিবেন সহ কিছু 'সস্‌'।

৫

কোনো তরুণীর দূরদৃষ্টি

ভবিষ্যৎ যুগে বন্ধু যেই কুলাচার
খাব মোরা চাখিয়া চাখিয়া
তাহার গোপন বাণী নারিলাম রাখিতে ঢাকিয়া।
এলে যুগ আণবিক
সাধারণ কুলে ঠিক,
হবে না আচার
তাহারা অকূলে গিয়া হইবে নাচার।
আকাশে আঁকশি দিয়া তখন পাড়িব তারা-কুল
স্বাতি চিত্রা রেবতীরা জবজবে হয়ে তেলে
করিবে তুলতুল,
তাই মোরা খাব চুষে চুষে
চন্দ্রলোকে যাব যবে আরোহিয়া অ্যাটম-ফানুসে।

৬

রসিক

আর কেন তবলায় তুলছিস বোল
ঝড় এসে গেল যে রে সতরঞ্চি তোল।

প্রবন্ধ

मनन

অনুজ কথাশিল্পী

শ্রীমান সতীনাথ ভাদুড়ী

কল্যাণবরেষু

বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও সমস্যা

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার ও প্রীতি গ্রহণ করুন। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে সত্যিই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ আমাকে সে সুযোগ দিয়েছেন ব'লে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতিপূর্বেও তাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সাংসারিক কারণ বশত আমি তখন আসতে পারি নি।

মেদিনীপুর শুধু বাংলাদেশের নয়, সমস্ত ভারতের তীর্থ। মেদিনীপুরের নাম এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, চিরকাল থাকবে। এ দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে মেদিনীপুরের দান এত বহুল এবং অসামান্য যে তা নিয়ে বলতে আরম্ভ করলে সময়ে কুলুবে না। অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ তা নিয়ে লেখা হয়েছে, আশা করি ভবিষ্যতে আরও হবে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আত্মাহুতি মেদিনীপুরকে পুণ্যতীর্থের মর্যাদা দান করেছে তার ইতিহাস অগ্নিযুগের এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিস্ময়কর আত্মবিসর্জনেই সীমাবদ্ধ নয়, সে ইতিহাস আরও প্রাচীন। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে, পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করেন প্রথম এই মেদিনীপুরবাসীরাই। জঙ্গল মহলের বিদ্রোহ, জেনারেল ফার্গুসনের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের বৃদ্ধ তেজস্বী রাজার সংগ্রাম, চুয়াড় সৈন্যদের বীরত্ব, ঘাটশীলার যুদ্ধ, খড়্গপুরের জমিদার নরহরি চৌধুরীর দুর্দমনীয়তা এবং আরও অনেক বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা ইংরেজ ঐতিহাসিকরাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুর অমরত্ব লাভ করেছে।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও মেদিনীপুরের দান কম নয়। যে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরে আজ আমরা সমবেত হয়েছি 'বীরসিংহের সিংহ শিশু' সেই বিদ্যাসাগর বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে একজন দিক্‌পাল। আধুনিক বাংলা গদ্যের তিনি জনক, স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারে তিনিই অগ্রণী, নিপীড়িতা নারীদের দুঃখ মোচন করবার জন্য এমনভাবে সর্বস্বান্ত আর কেউ হন নি। তাঁর জন্মভূমিতে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। "দীন যথা যায় দূরে তীর্থ দরশনে"—এখানে ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই আমি এসেছি।

মেদিনীপুরের বিরাট ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক'রে আমি সাহিত্য বিষয়ে এইবার কিছু নিবেদন করব।

বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি তা আপনাদের অবিদিত নেই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র

পর্যন্ত তার উন্নয়নের ইতিহাস বিস্ময়কর। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্য এত উন্নতি করেনি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যও নিজস্ব স্বকীয়তায় এবং বৈচিত্র্যে দেদীপ্যমান। রবীন্দ্রোত্তর যুগে শুধু সৃষ্টিধর্মী কাব্য সাহিত্যই নয়, জ্ঞানধর্মী সাহিত্যও বাংলাভাষাকে অলঙ্কৃত করেছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, গবেষণা-মূলক প্রত্নতত্ত্ব, ভ্রমণকাহিনী, লঘু নিবন্ধ, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ এবং আরও নানারকম রচনাতেও বাংলা সাহিত্য ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হচ্ছে।

সাহিত্য বলতে সাধারণত সবাই কাব্য সাহিত্যই বোঝেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক সবই কাব্য সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্য সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রধানত রূপায়িত হয়েছে ছোট গল্প এবং উপন্যাসে। নানা আঙ্গিকে বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হচ্ছে এ যুগের গল্প ও উপন্যাস। কিন্তু এর বেশী প্রশংসা-বাক্য আমি আর উচ্চারণ করব না, করলে সেটা অশোভন হবে, কারণ আমি নিজেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন সাহিত্য-সেবক। আমাদের সৃষ্টির মধ্যে ভালো যা কিছু আছে তা বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করেছে, তা নিয়ে আমি বেশী বাগাড়ম্বর করতে চাইনা। আমি বরং এর ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব। বহুকাল ধ'রে সাহিত্য সেবা করছি, অন্তর থেকে সত্য ব'লে যেটা অনুভব করেছি তাই কর্তব্য-বোধে নিবেদন করছি, বিদ্বেষ বশত নয়।

ছোট গল্প এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু মানুষেরই সুখ-দুঃখ মানুষেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র-মন্থনে মানুষের জীবনে সুধা এবং বিষ দুইই ওঠে। জীবনদ্রষ্টা কবি এই সুধা আর বিষ নিয়েই কাব্যের নৈবেদ্য রচনা করেন। কিন্তু যিনি বড় কবি তিনি তাঁর কাব্যের কলা-কুশলতায় বুঝিয়ে দেন যে বিষ যদিও জীবন-মন্থনের অপরিহার্য ফল, কিন্তু তা পরিহার ক'রে চলতে পারলেই বেশী আনন্দ, সুধা পান করলে আরও আনন্দ, একেবারে অমরত্ব। লক্ষ্য করেছি আজকাল কোন কোন লেখক বিষটাকেই মোহন মধুর ক'রে পরিবেশন করছেন। ভাবে ভঙ্গীতে বলছেন অমৃতের প্রতি আগ্রহ একটা সেকেলে কুসংস্কার, বিষ-পান করাটাই যথার্থ পৌরুষ, বিষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই, বিষে জর্জরিত হ'য়ে মৃত্যুবরণ করাটাই মানবের নিয়তি। বিষ-পান প্রসঙ্গে শিবের কথা মনে পড়ছে, তিনি বিষ-পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দেবতা বা দৈত্য কাউকে বিষপানে উৎসাহিত করেন নি, সৃষ্টি পাছে হলাহলে নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্যেই বিষপান করেছিলেন তিনি। মহাকালের মতো মহাকবিও জীবনের বিষপান করবেন, জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে বিষপান করতেই হবে, কিন্তু তিনি বিতরণ করবেন সুধা, সকলকে উৎসাহিত করবেন সুধার সন্ধানে। যৌন-লালসার ইন্ধন জুগিয়ে বা বিষয়-তৃষ্ণা জাগিয়ে বেরসিক ইতর লোকের মনোরঞ্জন করা সহজ, কিন্তু শাশ্বত সাহিত্যের কোঠায় উঠতে হলে এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যার আবেদন শাশ্বত। যৌন-ক্ষুধা বা বিষয়-ক্ষুধা কোন সভ্য

মানুষেরই গৌরবের জিনিস নয়, লজ্জার জিনিস। তার খাদ্য যারা সরবরাহ করে তাকে আমরা গোপনে মূল্য দিতে পারি; কিন্তু প্রকাশ্যে কখনও শ্রদ্ধা করি না! কোনও সুস্থ সভ্য সমাজে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল সাহিত্য বেশী দিন টেকে নি। নীতি-বিরুদ্ধ ব'লে নয়, অসুন্দর ব'লে। যা সুন্দর তার সঙ্গে সত্য ও শিবও জড়িত থাকেন অবিচ্ছেদ্যভাবে।

বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে যাঁরা কুরুচির বেসাতি করেন তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা বিজ্ঞানী নন, বিজ্ঞানের বইও তাঁরা লিখেছেন না, তাঁরা এমন কিছু করতে যাচ্ছেন যা বিশ্লেষণ নয়, যা সৃষ্টি। বিজ্ঞানের সাহায্যই যদি দিতে হয় তাহ'লে তা ওই সৃষ্টির সহায়করূপে নিতে হবে, মালী যেমন ফুল ফোটাবার জন্য সারের সহায়তা নেয়। কিন্তু ফুলই যদি না ফুটল, তাহ'লে সারের তত্ত্ব, তা সে যত গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই হোক না কেন, পুষ্পরসিককে মুগ্ধ করতে পারবে না।

এইসব কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল অসুন্দর রচনার প্রেরণা যদি আত্মিক না হ'য়ে আর্থিক হয় (ভালো ছবির চেয়ে অশ্লীল **picture post cards** এর বিক্রি সত্যিই তো বেশী) তা হলে অবস্থাটা আরও শোচনীয়।

আর এক ধরনের লেখা বেরুচ্ছে যাতে সমাজের মন্দ দিকটা, তার কুৎসিত অংশটাই লেখকের একমাত্র উপজীব্য। তাঁর চোখে সমাজের বা মানুষের ভালো দিকটা পড়ে নি, তিনি মানুষের রূপটা দেখেন নি ; দেখেছেন তাঁর মুখের ব্রণগুলি। এই মক্ষিকা-বৃত্তির মূলেও হয়তো আছে সস্তা জন-প্রিয়তা অর্জন ক'রে সংসার চালাবার চেষ্টা।

অর্থনৈতিক চাপে প'ড়ে ডাক্তারি, মাষ্টারি, ওকালতি, দোকানদারি, নেতাগিরি সবরকম পেশাই আদর্শপথচ্যুত হ'য়েছে, সাহিত্য-পেশারও যে এ দুর্গতি হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমাদের দেশে সাহিত্যকে লেখকরা পেশারূপে গ্রহণ করেছেন সম্প্রতি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা নির্মাতা, তাঁদের কেউ পেশাদার সাহিত্যিক ছিলেন না। বই বিক্রি ক'রে তাঁরা পয়সা পেয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা ছিল উপরি পাওনা। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের জন্য সাহিত্যের দাক্ষিণ্যের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হয়নি, প্রায় প্রত্যেকেরই অর্থাগমের অন্য আর একটা উপায় ছিল। অনেকে এমন মত পোষণ করেন যে সাহিত্যকে পুরোপুরি পেশায় পরিণত না করলে খাঁটি সাহিত্যিক হওয়া যায় না। আমার মনে হয় সাহিত্যকে নিছক পেশায় পরিণত করলে তা সৃষ্টি-ধর্মী প্রতিভার স্বাধীন বিকাশের অনুকূল হবে না। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ফোটাতে চান তা ফোটাতেই পারবেন না যদি তা জন-প্রিয় না হয়, যদি তার বাজার দর না থাকে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁর অন্য আর একটা উপায় থাকা প্রয়োজন, তা সে পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তি হোক, চাকরি হোক বা আর কিছু হোক। বিখ্যাত শিল্পী ভ্যান গাউ কোনও ছবিই বোধহয় আঁকতে পারতেন না যদি না তাঁর ছোট ভাই তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিতেন। তাঁর জীবনে ছবির বাজারে তিনি স্বীকৃতি পান নি। ছবি বিক্রি ক'রে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের মতো অর্থ সংগ্রহ করাও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। ভাই না থাকলে জন-প্রিয়তার সস্তা

পথে চ'লে তৎকাল-প্রচলিত রুচির খোরাক জুগিয়ে জীবন ধারণ করবার তাগিদেই তিনি অসংখ্য পেশাদার শিল্পীর ভীড়ে আর একজন পেশাদার শিল্পী মাত্র হতেন, যে মহিমা ভ্যান গাউ অর্জন করেছেন সে মহিমা তিনি অর্জন করতে পারতেন না। এ রকম আরও অনেক উদাহরণ দেখানো যেতে পারে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু এ কথাটা মোটামুটি মানতেই হবে যে পেটের দায়ে বা পেশার চাপে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে তার মহত্ত্ব বা অভিনবত্ব নষ্ট হবার সম্ভাবনা। শিল্পের মহত্ত্ব বা অভিনবত্বকে সম্যক মূল্য দিতে জনসাধারণ অনেক সময় অনেক দেরী করে।

কিন্তু একথাও মানতে হবে যে অর্থনৈতিক চাপে অনেক সাহিত্যিকই সাহিত্যকে পেশারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সাহিত্য-সম্পর্কিত একটি পেশা অবশ্যই আছে যা সাহিত্যিকদের জীবনের সঙ্গে অনেকটা খাপ খায়। এ যুগের অনেক প্রতিভাবান লেখক সেই পেশাকে আশ্রয় ক'রেই বেঁচে আছেন। সে পেশার ইংরেজি নাম জারনালিজ্‌ম্ (journalism) অর্থাৎ কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রে চাকরি করা। এই পেশা অবলম্বন ক'রে এদেশে এবং বিদেশে অনেক লেখক প্রথম শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এ নজীর আছে। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখা উচিত যে সংবাদপত্রে চাকরি করাটা সাহিত্য-সেবা নয়, সেটা আর পাঁচরকম চাকরির মতোই আর একটা চাকরি মাত্র। সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য-চর্চা করার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিপদও আছে। প্রত্যেক সংবাদপত্রই কোন না কোন রাজনৈতিক মতের পোষক। সে মতের সঙ্গে সায় দিতে না পারলে সেখানে চাকরি করা যায় না, আর সায় দিতে আরম্ভ করলে সায় দিতে দিতে অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতেও সেই বিশেষ ধরনের রাজনীতির ছোঁয়াচ লাগে, পেঁয়াজের ঘনিষ্ঠতায় ভালো খাঁটি দুধও পেঁয়াজ-গন্ধী হয়ে যায়। সেই রাজনীতি-গন্ধী সাহিত্য যদি সম্যকরূপে রসোত্তীর্ণ না হয় তাহ'লে শিল্প-লোকে আর তার স্থান হয় না, তা উক্ত রাজনীতির বিজ্ঞাপন হয়ে পড়ে।

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকা উচিত কি না এই প্রসঙ্গে সেই কথা উঠে পড়ে। জীবন নিয়েই যখন সাহিত্য এবং জীবনের সঙ্গে রাজনীতির যখন সম্পর্ক আছে তখন সাহিত্যে রাজনীতির কিছু কিছু থাকবে বই কি। কিন্তু কেবল রাজনীতি নিয়েই জীবন নয়, জীবন অতিশয় জটিল এবং রহস্যময় অভিব্যক্তি, তা কেবল রাজনীতি, কামনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতিরই সমবায় নয়, তা আরও ব্যাপক, আরও গভীর। জীবনের সম্বন্ধে এই ব্যাপক গভীর সমগ্র দৃষ্টিই কবির দৃষ্টি। সমাজে নানারকম মানুষ আছে। কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মুনাফাখোর, কেউ দারিদ্র্য-জর্জরিত, কেউ লম্পট, কেউ নীতিবাগীশ—মানুষের গায়ে মাত্র এই লেবেলগুলি লাগিয়েই কবি সন্তুষ্ট হন না, সার্থক কাব্য সৃষ্টিতে কেবল এই সংবাদগুলি বা এই সংবাদগুলির ফেনায়িত উচ্ছ্বাসই প্রাধান্য লাভ করে না, যদি করত তাহলে তিনি কবি হতেন না, সাংবাদিক মাত্র হতেন। তিনি তাঁর কাব্যে মানুষের সম্বন্ধে এমন সব সত্য খবর দেন যা কেবল

তাঁরই কবি-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। Forster সাহেব রসোত্তীর্ণ উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"In this direction fiction is truer than history because it goes beyond the evidence."

সুতরাং যদি কোনও কাব্যে একটা বিশেষ নীতি নিয়ে কোনও লেখক মাতামাতি করেন তা খুব উঁচুদরের কাব্য হবে না। কারণ তাতে জীবন-জিজ্ঞাসার সমগ্রতা পাওয়া যাবে না। অপরিহার্য এই অজুহাতে কোন একটা নীতিকে কাব্যে প্রাধান্য দিলেই তার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। জলও জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। কোনও কাব্য যদি কেবল জলময় হয়ে ওঠে, আকাশ বাতাস আলো মাটির খবর তাতে যদি না থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় খুব উপভোগ্য কাব্য হবে না।

বর্তমান যুগের গল্প উপন্যাসে রাজনীতির প্রভাব একটু বেশী রকম পড়েছে। এর কারণও খুব স্পষ্ট। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা খুব বেড়েছে, প্রত্যেক মানুষের মনেই অশান্তির আগুন জ্বলছে। আর আমরা প্রত্যেকেই মনে করছি কোনও একটা বিশেষ ছাঁচের রাজনীতির সহায়তা নিয়েই বুঝি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা-অশান্তির অবসান ঘটবে। কিন্তু তা যে ঘটবে না তার প্রমাণ ত' ইতিহাসের পাতায় প্রত্যহ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কিন্তু তবু আমাদের রাজনীতির সম্বন্ধে মোহ ঘুচছে না। আর্ত রোগী যেমন শতমারী সহস্রমারী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, আমরাও তেমনি দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হয়ে রাজনৈতিক নেতার শরণাপন্ন হচ্ছি। এই শোচনীয় অবস্থার চিত্র তাই অনেক গল্পে উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। চিররোগীর হাতে যদি অব্যর্থ ফলপ্রদ কোনও ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ে তাহলে তা সে যত আগ্রহের সঙ্গে পড়বে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সে তত আগ্রহের সঙ্গে পড়বে না।

একথাটা কিছুতেই আমাদের মাথায় ঢুকছে না যে অঙ্ক ক'ষে তর্ক ক'রে বা ভোট কুড়িয়ে সাময়িক ভাবে আমরা জীবন যাপনের মানদণ্ডে হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র সেই পরিবর্তনটুকু ঘটলেই আমরা শান্তি পাব না। রাজনীতির চেয়ে মহত্তর নীতির আশ্রয় না নিলে আমাদের অশান্তি ঘুচবে না। প্রথম শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য মানুষের মনকে সেই মহত্তর নীতির দিকে উন্মুখ করে। তা যদি না করতে পারে তাহলে সাময়িকভাবে তা যতই না জনপ্রিয় হোক শেষ পর্যন্ত তা টিকবে না। মানুষের মনে একটা শাশ্বত ক্ষুধা আছে সেই ক্ষুধার সুধা যে কাব্যে সঞ্চিত হয়েছে সেই কাব্যই সার্থক কাব্য, সাহিত্য জগতে সেই কাব্যই অমরত্ব লাভ করবে।

রাজনীতির দ্বন্দ্বে বাঙালীর পরাজয় ঘটেছে এটা অনেকরই বদ্ধমূল ধারণা। বাঙালীই স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা, স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালী অনেক ত্যাগ করেছে কিন্তু স্বাধীন ভারতে বঙ্গ ভাষাভাষীর আধিপত্য নেই বললেই চলে—এই ক্ষোভ অনেক বাঙালীর অন্তরকে বিষময় ক'রে তুলেছে। যে আধিপত্য ভোটের উপর নির্ভর করে সে আধিপত্য পাওয়ার আশা কোনও একটি ভাষা-ভাষীর পক্ষে দুরাশা মাত্র। ভারতবর্ষে অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী, সুতরাং অবাঙালীরাই ভারতবর্ষের লোকসভায়

প্রাধান্য লাভ করবে এ তো জানা কথা। ওই অবাঙালীরাও ভারতবাসী, তারাও আমাদের সঙ্গে নানা বন্ধনে সংযুক্ত, তাদের সঙ্গে একাত্মতা যদি অনুভব করতে পারি তাহলেই আমাদের মনের গ্লানি দূর হবে। পুরাকালে একধর্ম-সূত্র-পাশে সমগ্র ভারত বাঁধবার চেষ্টা হিন্দু-মুসলমান দু'দলই করেছিলেন। সে যুগের ধর্ম এখন কুসংস্কার ব'লে গণ্য হয়েছে, কিন্তু সমগ্র ভারতকে এক পাশে বাঁধবার আগ্রহ এখনও কমে নি। ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছে এখন রাজনৈতিক আদর্শ। আজকাল শাসন পরিষদে প্রাধান্য লাভ করতে হলে রাজনীতির মাধ্যমেই তা করতে হবে, ভাষা বা প্রাদেশিকতার সহায়তায় তা কখনও করা যাবে না। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে আমাদের বাঙালীত্ব বোধের একটা জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে অনেকের মনে। তিক্ত হয়ে আছে অনেকের মন। এতে আমাদের সাহিত্যেরও ক্ষতি হয়েছে। কারণ সুস্থ মন না থাকলে ভালো সাহিত্য সৃষ্টিও করা যায় না, উপভোগও করা যায় না। একটা কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত। অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চাসন এখনও অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজনীতির আবর্তে আমাদের মানস-সরোবরের জল যেন ঘোলা না হ'য়ে যায়, বাঙালী মাত্রেরই সে দিকে নজর রাখা উচিত। ভালো কাব্য সৃষ্টি বা উপভোগ করবার ক্ষমতা যদি আমরা হারাই তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁদের কাব্যধারা এখনও অব্যাহত রেখেছেন যদিও, তাঁদের অনুগামী কয়েকজন কবিও তাঁদের অনুসরণ করছেন, কিন্তু নূতন কবির ভালো কবিতা খুব কমই চোখে পড়ছে। বিদেশী আধুনিক কবিদের নকলে একজাতীয় হেঁয়ালী আজকাল কবিতার নামে কাগজে ছাপা হচ্ছে, কোন সুস্থমনা রসিক সে সব লেখাকে কবিতা আখ্যা দেবেন না। এগুলো অনেকটা জিগ্‌স-পাজ্‌লের মতো, অনেক মাথা ঘামাবার পর একটা কষ্ট-কল্পিত অর্থ সে সব থেকে হয়তো বার করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তা চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে না, চিত্তকে ঠিক সেই লোকে নিয়ে যায় না যেখানে যাওয়ার জন্য রসিক চিত্ত সতত উন্মুখ। এ দলের অনেকে বলেন উচ্চাঙ্গের গান বা ছবি বুঝতে হলে মনকে যেমন বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়, এ ধরনের কবিতার মর্ম বুঝতে হ'লেও তাই করতে হবে। এঁরা আরও বলেন বীজ-রূপে এ সব কবিতার মধ্যে না কি অনেক সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, বিশ্লেষণীশক্তি সম্পন্ন সুধীই কেবল সে সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন মোচন করতে পারবেন। অশিক্ষিত লোকও উচ্চাঙ্গের গান শুনে বা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়, হয়তো সে তার সম্পূর্ণ রস পায় না, কিন্তু চমৎকৃত যে হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কারণ উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি মাত্রেরই এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত সহজবেদ্য রূপ আছে যা সকলেরই চিত্তকে স্পর্শ করে, রসিকের চিত্তকে তো নিশ্চয়ই করে। তা কোন বিশেষ শিক্ষা বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। বিশ্লেষণ করলে ঊষর মরুতে বা ধূসর পাংশুস্তূপেও জলকণা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই জলকণাটুকুতে রসিকের আনন্দ হয় না, যেমন হয় নির্ঝরিণীর ছন্দমুখর

নৃত্যে, তরঙ্গিনীর উর্মিলীলায়, সমুদ্রের বিরাট গাম্ভীর্যে বা ফুলের উপর কম্পমান শিশির বিন্দুতে। কবিতার যদি সহজবোদ্ধ সাবলীলতা না থাকে তাহলে তার কিছুই রইল না।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা ছোট একটি বড়ির মধ্যে সমস্ত ভিটামিন সংবদ্ধ করেছেন, তা সেবন ক'রে রোগীর হয়তো উপকার হয়, কিন্তু খাদ্য-রসিকের তাতে আনন্দ নেই, তার আনন্দ টাটকা সুস্বাদু খাবারে। কবিতা-নাম-ধারী এই সব রচনার প্রধান দোষ, দুর্বোধ্যতা। মনে হয় যেন ইচ্ছে করে দুর্বোধ্য করা হয়েছে। এই সব দোমড়ানো-মোচড়ানো অর্থহীন ছন্দোহীন কিম্ভূত-কিমাকার অসম্বন্ধ বাক্যাবলীর অন্তরালে একটা চেষ্টাকৃত প্রয়াস আছে বলে সন্দেহ হয়। অনন্যতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু দুর্বোধ্য ব'লে তা রসোত্তীর্ণ হয় নি। যে দেশে এর জন্ম সে দেশের বৃহত্তর রসিক সমাজও একে কবিতার মর্যাদা দেন নি। একটা ছোটদল—তার মধ্যে ডিগ্রীধারী পণ্ডিত লোকও আছেন—এর অভিনবত্ব জাহির করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল-কাম হন নি। ওদেশের সাহিত্যেও এদের আবির্ভাব ক্রমশঃ কমে আসছে। অতি-আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা দেখতে পাবেন ওদেশের কাব্য সাহিত্য আবার সাবেক পথে চলতে আরম্ভ করছে, অর্থাৎ বিলিতি অতি-আধুনিক কবিরা যে ভাষায় কাব্য রচনা করছেন তা দুর্বোধ্য নয়। বাংলা সাহিত্যেও ইদানীং দু'চারটে কবিতা চোখে পড়েছে যার মানে বোঝা যায়। আশা ক'রে আছি নূতন আঙ্গিকে নূতন বাঙালী কবিরা আবার আমাদের সত্যিকার নূতন কবিতা শোনাবেন।

আমাদের সাহিত্যের আর একটি দৈন্য প্রকট হয়ে রয়েছে আমাদের নাট্য-সাহিত্যে। ইদানীং ভালো নাটক রচিত না হবার কারণ কি? যাঁরা মনে করেন যে চলচ্চিত্রের জন-প্রিয়তাই রঙ্গমঞ্চের অবনতির কারণ তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। বাজারে চকোলেট বা টফির চলতি হয়েছে ব'লে আমরা তো সন্দেশ খাওয়া ত্যাগ করিনি। যে দেশে সিনেমার উদ্ভব সে দেশেও তো নাটকের আদর কমে নি। আমাদের দেশেই গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে সখের থিয়েটারেরও অভাব নেই। তবু ভালো নাটক লেখা হচ্ছে না কেন? আমার মনে হয় যে সব লেখকদের ভালো নাটক লেখবার ক্ষমতা আছে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ পাচ্ছেন না। অভিনীত না হলে নাটক লেখার সার্থকতা নেই। প্রকাশক বই ছেপে তা যেমন সাধারণ্যে প্রচার করেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চও তেমনি নাটক অভিনয় ক'রে তা সাধারণের গোচরে আনেন। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে যে সব নাটক অভিনীত হয় মফঃস্বলের নাট্যামোদীরা সেই সব নাটকই মঞ্চস্থ করেন। অর্থাৎ কলিকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চই এদেশে নাট্য জগতে প্রবেশের দ্বার। নূতন নাট্যকারদের পক্ষে সে দ্বার বন্ধ। যদি বা কারও ভাগ্যে দ্বার একটু খোলে তিনি পয়সা পান না। নূতন নাট্যকারকে পয়সা দিয়ে উৎসাহিত করতে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষরা রাজী নন। নূতন লেখকের লেখা বই চুরি ক'রে অদল-বদল ক'রে লেখককে ফাঁকি দেবার চেষ্টাও করেন এঁরা। তাই প্রতিভাবান নাট্যকারেরা নাটক লেখাই ত্যাগ করেছেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি রাত্রির পর রাত্রি পুরাতন নাটকেরই অভিনয় ক'রে সন্তুষ্ট আছেন,

এতেই তাঁদের ব্যবসা হয়তো চলে যাচ্ছে। নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন। যখন নাট্য-সাহিত্যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল তখন নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছিলেন। তাঁর নিজেরই থিয়েটার ছিল, নাটকের পর নাটক লিখে তিনি নিজের থিয়েটারেই তা অভিনয় করতেন। তিনি কেবল প্রতিভাবান নাট্যকার এবং নটই ছিলেন না, তাঁর হৃদয়ও প্রশস্ত ছিল। তিনি সমসাময়িক নাট্যকারদের উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নি। তাই বাংলার নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে রসরাজ অমৃতলালের, দ্বিজেন্দ্রলালের, ক্ষীরোদ প্রসাদের এবং আরও অনেকের ভাল ভাল নাটক আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রতিভাবান অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন, কিন্তু প্রতিভাবান নূতন নাট্যকারদের সেখানে ভদ্রভাবে প্রবেশ করবার সুযোগ নেই। আমাদের গভর্ণমেণ্ট যদি সুপরিচালিত রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি ক'রে নূতন নাট্যকারদের যথোচিত মর্যাদায় সেখানে স্থান দিতে পারেন, তাহলেই এর প্রতিকার হবে। শুনেছি গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন, সুতরাং আশা আছে প্রতিভাশালী নাট্যকারগণ আবার বাংলা রঙ্গমঞ্চকে প্রাণবান ক'রে তুলতে পারবেন, বাংলা নাট্য-সাহিত্যও আবার সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

সাহিত্যের কথা তো অনেক হ'ল, এবার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একীকরণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ; কারণ এই একীকরণের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে কিনা তা চিন্তা ক'রে দেখা উচিত।

আমরা তিন পুরুষ বিহারে বাস করছি। আমর জন্ম বিহারে, বিহারী সমাজে এবং বিহারী পরিবেশেই আমি মানুষ হয়েছি, তাদের মধ্যে থেকেই আমি সাহিত্য-চর্চা করেছি, অন্নসংস্থানও করছি। তাদের আমি ভালবাসি, তাদের মহত্ত্বে ও সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করি। বিহারী জনসাধারণ বাঙালীদের মতোই গুণগ্রাহী এবং সাহিত্যরসিক।

কিন্তু ভয় করি আমি রাজনৈতিক নেতাদের। তাঁরাই যত গণ্ডগোলের মূল। শুধু বিহারী নেতারা নয়, বাঙালী নেতারাও এ বিষয়ে দায়ী। ইংরেজরা যে 'বাঙালী-বিহারী ফিলিং' সৃষ্টি ক'রে গেছেন এই নেতাদের নেতৃত্বে সে 'ফিলিং' ক্রমশঃ তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠেছে। এই একীকরণের ফলে যদি সে তিক্ততার অবসান ঘটে তাহলে তা নিশ্চয়ই আনন্দজনক, কিন্তু এই একীকরণের ফলে যদি সংখ্যা-লঘু বাঙালীরা সংখ্যা-গুরু বিহারীদের কবলে পড়ে আরও নির্যাতিত হয়, যদি বেনো জল ঢুকে তাদের ঘরের জলটুকুকেও বার করে নিয়ে যায় তাহলে তা আশঙ্কাজনক। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমগ্র ভারতের দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই একীকরণ শুভফলপ্রসূ হবে বলেই মনে হয় যদি তাতে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ থাকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর বিবৃতিতে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে সে সুযোগ থাকবে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের নিরাপত্তার জন্য সংবিধানে তাঁরা রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখবেন। এইখানেই আমার

একটু ভয় আছে। সংবিধানে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা থাকলেই তা যে বর্ণে বর্ণে পালিত হবে এ প্রত্যয় অন্ততঃ বিহারবাসী বাঙালীদের নেই। এখনই সংবিধানে সংখ্যা-লঘু-সম্প্রদায়ের জন্য যে সব উদার আইন আছে সে সব যদি ঠিকভাবে অনুসৃত হ'ত তাহলে বিহারবাসী বাঙালীদের মন এত বিষিয়ে উঠত না। বিহারে হিন্দি ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য যে খরচ বিহার গভর্ণমেণ্ট করেছেন ও করছেন অন্য ভাষার জন্য তার সিকির সিকিও করেন নি। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয় হিন্দি ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছে। আর্থিক এবং রাজনৈতিক চেষ্টা তো হয়েইছে, শারীরিক বলপ্রয়োগ করাও হয়েছে এমন সংবাদও খবরের কাগজে পড়েছি। বিহারে বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া করবার সুযোগ খুব কম বিদ্যালয়ে আছে, যে সব বিদ্যালয়ে আছে সেগুলি শাসক-সম্প্রদায়ের কৃপাদৃষ্টি-বঞ্চিত। যে সব বিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয়, সেখানকার পাঠ্যপুস্তকগুলি বাংলা হরফে মুদ্রিত বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মর্যাদার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। গ্রন্থকর্তারা প্রায়ই অবাঙালী। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক কলেজেই বাংলা পড়াবার অধ্যাপক নেই। ইংলণ্ডে আছে, জার্মানীতে আছে কিন্তু বিহারে নেই। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পূর্বে গভর্ণমেণ্টের কাছে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য পেত এখন তারা তার বদলে পায় কিছু হিন্দি বই। বাঙালী ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেও যথোচিত সম্মান পায়নি এরকম একাধিক উদাহরণ আমার জানা আছে। যেখানে প্রতিযোগিতা দ্বারা যোগ্যতা নির্ণীত হয় সেখানে কিছু কিছু চাকরি বাঙালীরা পায় কিন্তু যেখানে তা হয় না সেখানে বাঙালীর চাকরি পাওয়া শক্ত, এমন কি নিয়োগ-কর্তা যদি বাঙালীও হন তবু তিনি যোগ্য বাঙালীকে চাকরি দিতে ভয় পান। হিন্দি রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু অনেক বিহারী নেতা তাঁদের ভাষণে তার-স্বরে বলেছেন যে হিন্দি is the national language of India. রাষ্ট্র-ভাষা আর National language এক জিনিস নয়, তবু ওঁরা সেটা বলছেন। আর একটা ভয়ঙ্কর আইনও বাঙালী সাহিত্যিকদের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছে। এই আইনটি প্রণীত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের আমলে। সে আইনটি হচ্ছে এই যে কোনও প্রাদেশিক ভাষায় কোনও বই প্রকাশিত হওয়ার দশ বৎসর পরে যে কোনও ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় তা অনূদিত হ'তে পারে মূল গ্রন্থ-লেখকের অনুমতি বা সম্মতি না নিয়েও। অনেক চতুর প্রকাশক ও অনুবাদক এই আইনটির সুযোগ নিয়ে অনেক বাংলা গল্প উপন্যাস হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন। তা ক'রে তাঁরা যে অর্থ উপার্জন করেছেন তাঁর অংশ মূল লেখকরা পাচ্ছেন না। আমার নিজেরই লেখা এইভাবে অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে, অনেক সময় আমি তার খবর পর্যন্ত পাইনি, আকস্মিকভাবে কোনও বন্ধুর মুখে জানতে পেরেছি। কোন কোন ভদ্র অনুবাদক বা প্রকাশক অনুমতি নিয়েছেন অবশ্য, কেউ কেউ কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দিয়েছেন, কিন্তু তা তাঁরা করেছেন ভদ্রতাবশে, আইনত আমি তাঁদের বাধ্য করতে পারতাম না। যে সব বইয়ের বয়স দশ বৎসর হয়নি তার অনুবাদ প্রকাশকেরা

সহজে ছাপতে চান না, কারণ তাঁরা জানেন দশ বৎসর পরে গ্রন্থকারকে এক পয়সা না দিয়েও তাঁরা ওসব বই ছাপতে পারবেন। এ আইন সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বাঙালী লেখকদের। কারণ বাংলা বই, বিশেষতঃ বাংলা গল্প উপন্যাস, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যত অনূদিত হয়েছে অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তত হয় নি।

তাই এই সব রক্ষা-কবচের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অনেকে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন না, তাঁদের ভয় হচ্ছে যে হিন্দি অটোক্র্যাসি মদমত্ত মাতঙ্গের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পদ্মবনকে বিদলিত করবে।

আমার মনে হয় একীকরণ সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় শিক্ষা এবং বাংলা সাহিত্য-সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর ভার যদি বাঙালীদের হাতেই থাকে তাহলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। হিন্দি ভাষা, হিন্দি সাহিত্য এবং হিন্দি শিক্ষার ভার বিহারীদের উপর থাকুক। কোনও জাতির ভাষা ও সাহিত্য তার অন্তরের জিনিস এবং তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেখানে ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের আধিপত্য সহ্য করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

বিহারী বাঙালী এক হয়ে আমরা বাঁধ বাঁধতে পারি, খনি খুঁড়তে পারি, ফ্যাক্টারি বা কারখানা পরিচালনা করতে পারি, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষা-ভাষীরই স্বাতন্ত্র্য দাবী করবার ন্যায্য অধিকার আছে।

বঙ্গ-বিহারের সংযুক্ত সংবিধানে এ ব্যবস্থা করা অসম্ভবও নয়।

পাশাপাশি দু'টি সাহিত্য যদি নির্বিরোধে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায় তাহলে সাহিত্যের মাধ্যমেই আমাদের এই আপাত বিরোধের অবসান হবে একদিন। কারণ সাহিত্যের ধর্মই হচ্ছে এককে অপরের সহিত প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ করা।

আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাই বললাম, সংস্কৃতির কথা ইচ্ছে ক'রে আমি তুলি নি। যে সংস্কৃতিকে আমরা বাঙালী সংস্কৃতি বলে জানি সে সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে থেকে লোপ পেয়েছে। আচারে-বিচারে পোষাকে-পরিচ্ছদে আহারে-বিহারে উৎসবে-সামাজিকতায়, পূজায়-পার্বণে যে বাঙালী-সংস্কৃতি সৌরভের মতো এককালে সকলকে মুগ্ধ করত তা আর নেই। অন্যান্য প্রদেশ-বাসীর সঙ্গে অবাধ মিশ্রণের ফলে, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সংঘাতে, রেডিও-সিনেমা-লাউড-স্পীকারের বহুল প্রচারে, নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে বাঙালী সংস্কৃতি মারা গিয়াছে। তা হারাবার ভয় আর নেই। আমরা পট কাঁথা পুঁথি প্রভৃতির সমাবেশ ক'রে মাঝে মাঝে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি সেগুলি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান মাত্র। যে পাঁচ-মিশেলী সংস্কৃতি আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তা পরিপাক ক'রে বাঙালী হয়তো আবার নূতন কোন সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলবে, কারণ নূতন কিছু করার অগ্রণী চিরকাল এই বাঙালীরাই।

আমার বক্তব্য শেষ হ'ল। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর শাখার ত্রি-চত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ভাষণ

সংস্কৃতি কোন পথে

সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। সংস্কৃতি 'ফ্যাশন' নয়। একটা বিশেষ ধরনের পোষাক পরা, চুল দাড়ি ছাঁটা, বিশেষ কোন আহার বা পানীয়ে অনুরক্ত হওয়া, এমন কি মাঝে মাঝে আড়ম্বর ক'রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করাও সব সময়ে প্রকৃত সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। এগুলো এক-একটা বিশেষ যুগের বিশেষ সভ্যতার বহিরঙ্গ মাত্র। সংস্কৃতি কিন্তু সভ্যতার বহিরঙ্গ মাত্র নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার অন্তরের সুষ্ঠু বিকাশ। সুরুচি, শিক্ষা, ভদ্রতা, শালীনতা, সামাজিকতা, শ্রদ্ধা, প্রেম, মহত্ত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ এই সবই সংস্কৃতির উপকরণ। সংস্কৃতি জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি। সংস্কৃতির মূল স্বার্থপরতা নয় পরার্থপরতা, অহঙ্কার নয় বিনয়, তামসিকতা নয় আধ্যাত্মিকতা। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ যে সংস্কৃতির ভিত্তি পত্তন করেছিল সে সংস্কৃতি যুগে যুগে নানারূপে অলঙ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তার মূল-রূপটি এখনও ঠিক আছে এবং চিরকাল থাকবে। সভ্যতার অনেক সময় বিনাশ হয়, অন্ততঃ তার বহিরঙ্গের চেহারা বদলাতে দেরি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতি অনেক দিন টিকে থাকে। একজন মানুষ অতি দ্রুত কৌপীন থেকে লুঙ্গী, লুঙ্গী থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে প্যাণ্টে নিজেকে সজ্জিত করতে পারে, কিন্তু অত সহজে বা অত দ্রুত সে নিজের সংস্কৃতি বদলাতে পারে না। পশু-জগতে সংস্কারের মতো সভ্য মানুষের সংস্কৃতিও মর্মগত মজ্জাগত জিনিস। সহজে তা মরতে চায় না। কিন্তু একেবারেই তা যে অমর একথাও বলা যায় না। সভ্য মানুষ অসভ্য হয়ে গেছে, পশুত্ব মনুষ্যত্বকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে এমন নিদর্শনও ইতিহাসে আছে।

কিন্তু তবু একথা সত্য যে সংস্কৃতি সহজে বিনষ্ট হয় না। সভ্যতার বাইরের জৌলুষ বহিরঙ্গের জাঁকজমক লুপ্ত হলেও এই সংস্কৃতি একটা জাতকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতি লোপ পেলে শুধু সভ্যতার বহিরঙ্গের আড়ম্বর দিয়ে একটা জাতকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের শারীরিক উত্তাপের তুলনা দেওয়া চলে এক্ষেত্রে। নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেই শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। বাইরের উত্তাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে এই উত্তাপ শরীরে সঞ্চিত করবার অথবা শরীর থেকে বিকীর্ণ করবার উপায় আমাদের শরীরের নির্মাণ কৌশলের মধ্যেই বিদ্যমান। আমাদের যখন শীত করে তখন আমরা গরম কাপড় জামা পরি, আমাদের শীত নিবারিত হয়; গরম কাপড় জামা কিন্তু উত্তাপ সৃষ্টি করে না, তারা শরীরের উত্তাপকে রক্ষা করে। অর্থাৎ গরম জামা কাপড় শরীরকে উত্তাপ সঞ্চয়ে সাহায্য করে মাত্র। আমাদের সভ্যতার বহিরঙ্গ এই গরম জামা কাপড়ের মতো। তা সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। কিন্তু যদি গরম জামা কাপড় না থাকত? আদিম অসভ্য মানুষদের জামা কাপড় ছিল না—তারা তো সবাই শীতে মরে যায় নি। সবাই মরে গেলে মনুষ্যজাতি বাঁচত না। আমাদের শরীরের মধ্যেই শীত নিবারণের কৌশল আছে, তারই জোরে আমরা জামা কাপড় না থাকলেও শীত থেকে খানিকটা বাঁচতে পারি। কিন্তু শরীরেই যদি তাপ সৃষ্টি না হয় তাহলে অতি মহার্ঘ শীতবস্ত্রও আমাদের শীতের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। ক্রমশ

আমাদের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আমাদের মৃত্যু হবে। অতিশয় শীতের সময় অনেক সময় আমরা বাইরের উত্তাপের সহায়তা নিয়ে থাকি। রোদে বসি কিংবা আগুন জ্বালাই। তেমনি একটা জাতিও যখন নিজের সংস্কৃতির জোরে টিকে থাকতে পারে না তখন বাইরের একটা সজীব সংস্কৃতির সাহায্যে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে। সব দেশের সব জাতির ইতিহাসেই এ ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দেশে তো ঘটেইছে। অনার্য, আর্য, ইসলাম, ইংরেজ এবং আধুনিক কালে সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের উপর একের পর এক নিজেদের সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করেছে এবং হয়তো আমাদের বারবার পুনরুজ্জীবিতও করেছে।

এদের সহায়তায় অনেক দুঃসময় আমরা পার হয়েছি কিংবা হব—কিন্তু তবু একটা কথা অতি অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রাণশক্তি যদি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, বাইরের উত্তাপও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মড়াকে বাইরের উত্তাপ দিয়ে জীবন-দান করা অসম্ভব। সংস্কৃতি যখন মৃতপ্রায় হয় তখন বাইরের কতকগুলো লক্ষণ থেকে তা বোঝা যায়। তখন সে জাতি বস্তুগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকেই একমাত্র কাম্য মনে করে। অর্থ ই তাদের কাছে পরমার্থ ব'লে গণ্য হয়। সে জাতির মধ্যে জ্ঞানী গুণীরা আদৃত হন না, হন ধনী বা ক্ষমতা দৃপ্ত রাজপুরুষরা। সে জাতির আত্মসম্মানবোধও ক্রমশঃ কমে আসে। সামান্য আধিভৌতিক সুবিধার জন্যও সে জাতি আত্মবিক্রয় করতে ইতস্ততঃ করে না। পরের ভাষা, পরের বেশ, পরের জীবন দর্শন অনুকরণ ক'রে তা আস্ফালন করতে পারলেই সে যেন নিজেকে ধন্য মনে করে। তুচ্ছ উপভোগই সে জাতির আনন্দের উৎস হয়। ছলে বলে কৌশলে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করাটাই সে জাতি বীরত্বের এবং বুদ্ধির নিদর্শন ব'লে মনে করে। তথাকথিত জ্ঞানী গুণীরাও সে সমাজে ভণ্ডামির মুখোশ প'রে মিথ্যাভাষণ করতে ইতস্ততঃ করেন না।

যদিও ইসলামী এবং ইংরেজি ছোঁয়াচ লেগেছে তবু ভারতীয় সংস্কৃতি প্রধানত আর্য সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শ রক্ষা করতেন ব্রাহ্মণেরা। রবীন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে বলেছেন—"সেই আদর্শকে কাহারা অটলভাবে রক্ষা করিতে পারে? যাহারা পুরুষানুক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে দূরে আছে, আর্থিক দারিদ্র্যেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা, মঙ্গলকর্মকে যাহারা পণ্যদ্রব্যের মতো দেখে না, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্মের মধ্যে যাহাদের চিত্ত অভ্রভেদী হইয়া বিরাজ করে এবং অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নততম আদর্শকে রক্ষা করিবার মহদ্ভাবই যাঁহাদিগকে পবিত্র ও পূজনীয় করিয়াছে…"

ইসলাম ধর্মে এবং ইংরেজ সমাজেও এরকম ব্রাহ্মণ আছেন, না থাকলে ওরা মরে যেত। ব্রাহ্মণরাই সব দেশে সব সমাজে সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষক।

আমাদের দেশে আজকাল ব্রাহ্মণ নেই। 'বামুন' আছে, যারা পয়সার লোভে রান্না করে, পূজা করে এবং যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে দ্বিধামাত্র করে না। তাই আমাদের সংস্কৃতি ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আমাদের এই সব বাহ্যিক আড়ম্বর যে

আসলে পশুত্বেরই হুল্লোড় একথা বোঝবার সময় এসেছে। আমরা যদি সমাজে পুনরায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করতে না পারি, প্রকৃত ব্রাহ্মণকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হই, তাহলে আমাদের মুমূর্ষু সংস্কৃতির বাঁচবার আশা নেই। নাচগানের আসর বসিয়ে বা মেকি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভড়ং ক'রে তাকে বাঁচান যাবে না।

সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওরা যেন পরস্পরের পরিপূরক। একের অভাবে অপরের মৃত্যু হয়।

সাহিত্য এবং সংস্কৃতিই জাতির প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখে। যে জাতির সাহিত্য নিকৃষ্ট এবং সংস্কৃতি মরণোন্মুখ সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আজ এ প্রশ্ন মনে স্বতঃই জাগছে আমাদের স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি? যতটা দেখতে পাচ্ছি তাতে আশার আলোক কিছু নেই। আমরা নিজেদের সংস্কৃতি ক্রমশঃ হারাচ্ছি, বিদেশাগত সংস্কৃতিও আমাদের বাঁচাতে পারছে না, কারণ সে সংস্কৃতিও নিঃস্ব। বিদেশের যে সংস্কৃতির আস্ফালন অহরহ শুনতে পাই তা পশুর গর্জন, সুসভ্য মানবতার সঙ্গীত নয়। আমাদের দেশে ভালো বইয়ের চাহিদা কম, যে-সব বইয়ের চাহিদা বেশী, তা হয় কোন রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা, না হয় লালসাউদ্দীপক। যে সব নাটক আজকাল জনপ্রিয় তা গভীরভাবে মনকে আলোড়িত করে না। ভাল ছবিও বেশী চলে না। সিনেমা ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার জন্যে যে-সব ছবি নির্মাণ করছেন সংস্কৃতির বাজারে তা অচল, কিন্তু সাধারণ দর্শকদের বাজারে তা খুব চলছে। সমাজের কোনও শৃঙ্খলা নেই, টাকার জোরে মনুষ্যত্ব অহরহ ক্রীত-বিক্রীত হচ্ছে। নারীরা অপমানিত, লাঞ্ছিত, কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই। আমরা এসব সহ্য করছি। কোনও সভায় গুণী বা বিদ্বান এলে ভীড় হয় না, কিন্তু সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রী এলে শহরের লোক ভেঙে পড়ে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ এখনও দু'চারজন আছেন, কিন্তু তাঁরা অবজ্ঞাত, অসম্মানিত। আজকাল সম্মানের শ্রেষ্ঠ দাবী যেনতেন-প্রকারে-ভোট-যুদ্ধ-জয়ী নেতাদের। চতুর্দিকেই আজকাল স্বেচ্ছাচার। আর ভয়ের কথা সে-সব আমরা সহ্য করছি। সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ কোনও সমাজ এ সব সহ্য করত না। তারা এর প্রতিকার খুঁজত, প্রয়োজন হলে বিদ্রোহ করত। আমরা মাঝে মাঝে নিষ্ফল বক্তৃতা করি হাততালি পাবার লোভে। এসব সুলক্ষণ নয়। তবু আমরা আশা ক'রে থাকব দুর্দিন কেটে যাবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চেষ্টা ক'রব "কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর—"

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সঙ্কটে মুহ্যমান হয়ে শেষে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন আমাদেরও সেই বাণীর প্রতিই আস্থা রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের

জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে—"

আশা করব, আজ যারা ছাত্রছাত্রী তারাই এই জয়যাত্রায় দুরূহ অভিযানে যাত্রা করবে, তারাই আবার প্রতিষ্ঠা করবে সেই শাশ্বত সংস্কৃতির হর্ম্য যা আজ অমানুষদের অত্যাচারে ভেঙে যাচ্ছে। এই ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের একমাত্র ভরসা-স্থল। তাদের প্রাণশক্তি নবীন, তাদের কল্পনা নবাঙ্কুরের মতো আকাশমুখী, দুঃসাধ্য সাধন করবার অমিতবীর্য সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো তাদেরই দেহে-মনে বিদ্যমান। কিন্তু এদের চরিত্র সুগঠিত ক'রে সুপথে চালিত করবার দায়িত্ব সমস্ত দেশের। স্কুল বা কলেজে পাঠ্যপুস্তকের পরিমিত বিদ্যা জোর করে গলাধঃকরণ করিয়ে পরীক্ষা পাশের শিরোপা দিলেই ছাত্রছাত্রীরা সম্যক মর্যাদা পাবে না, দেশকেও তারা পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারবে না। তাদের উচ্চ-আদর্শের পরিবেশে মানুষ করতে হবে। তবেই তারা দেশকে গৌরবান্বিত করতে পারবে। সে পরিবেশ কি আমাদের দেশে বর্তমানে আছে? নেই। আমাদের দেশে বর্তমান আদর্শ হচ্ছে—জোর যার মুলুক তার। টাকা যার দুনিয়া তার। এ আদর্শ ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমরা আজ যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অসংযম লক্ষ্য করছি তার মূল এইখানে। উদার এবং মহৎ আবেষ্টনীতেই উদারতা এবং মহত্ত্বের জন্ম হয়। সামাজিক পরিবেশ মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের অনুকূল না হ'লে মনুষ্যত্ব জাগবে না। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভিত্তি-পত্তন হয় ঘরে পিতামাতার কাছে সামাজিক পরিবেশে। পিতামাতার জীবনাদর্শ নির্মল নিষ্কলুষ না হলে, সামাজিক পরিবেশ স্বার্থ হিংসা ঘৃণার বিষ-বাষ্পে সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে ভালো ছেলে-মেয়ে হবে কি ক'রে? চোর চরিত্রহীনের সমাজে চোর চরিত্র-হীনেরই উদ্ভব স্বাভাবিক। সুতরাং সুস্থ সবল উজ্জ্বল সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সমাজ সৃষ্টি করবার বাসনা যদি আমাদের থাকে তাহলে আমাদের নিজেদেরই প্রথমে সংশোধন করতে হবে। কেবল ছাত্রছাত্রীদের গালাগালি বা উপদেশ দিলে বা শিক্ষকদের সমালোচনা করলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমাদের আত্মানুসন্ধান করতে হবে, আমাদের নিজেদেরই নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে—আমি কি সুপুত্র বা সুকন্যা লাভের অধিকারী? আমি সত্যিই কি সভ্য সুসংস্কৃত সত্যনিষ্ঠ সমাজে বাস করতে চাই? যেদিন আমরা সকলেই এ সব প্রশ্নে সদুত্তর দিতে পারব সেদিনই আমাদের অন্ধকার আকাশে আলোক-পাত হবে। এই ছাত্রছাত্রীরাই তখন উৎসাহী ভৃঙ্গের মতো পরিমল আহরণ ক'রে সৃষ্টি করবে নবযুগের অভিনব মধুচক্র।

আর একটা সম্ভাবনাও আছে। অত্যাচার অবিচার যখন চরমে ওঠে, অন্ধকার যখন সূচীভেদ্য হয়, আর্ত-আতুরের হাহাকার মহাকাশও যখন আর বহন করতে পারে না, সুসভ্য সংস্কৃতিকে মাৎস্যন্যায়ের ব্যাদিত আনন যখন সম্পূর্ণ-রূপে গ্রাস ক'রে ফেলে তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ঐতিহাসিক প্রতিকার আসে মহাশূন্য থেকে। পঙ্ক থেকে পঙ্কজের আবির্ভাব হয়, বজ্রাহত বনস্পতির বিদীর্ণ কাণ্ডেও আত্মপ্রকাশ করে নবপল্লব,

কংসের কারাগারে জন্মলাভ করেন শ্রীকৃষ্ণ। এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধিত। তার উদ্যত দণ্ড তখন ধ্বংস করে অমঙ্গলকে।

আমরা স্বাভাবিক পন্থায় আমাদের মঙ্গলকে যদি আহ্বান ক'রে না আনতে পারি, তাহলে এই অপ্রত্যাশিত প্রতিকারের প্রতীক্ষায় আমাদের থাকতে হবে। এ প্রতিকার আসবেই। অসত্য, অশিব, অসুন্দর চিরকাল রাজত্ব করতে পারে না। সত্য-শিব-সুন্দরই চিরন্তন, তার দ্যুতি সাময়িকভাবে ম্লান হতে পারে কিন্তু চিরকালের জন্য অস্তমিত হয় না।

কারণ, এই সংস্কৃতির ক্ষুধা মানুষের চিরন্তন ক্ষুধা—সামান্য অন্নে মেটে না, বস্তু-তান্ত্রিক আড়ম্বরেও তার তৃপ্তি হয় না, এ ক্ষুধার তৃপ্তি সুধাতে। দানবরাও এ সুধার জন্য লালায়িত—এই সুধার জন্যই দেবাসুরে সমুদ্র-মন্থন করেছিল একদিন। সে সমুদ্রমন্থন চিরকাল চলছে, চিরকাল চলবে। সে মন্থনে আজ বিষ উঠেছে, কিন্তু অমৃতও উঠবে একথা যেন আমরা না ভুলি। *

নাট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার লিখেছিলেন, সৃষ্টি-রংগ-লীলার সবচেয়ে কাছের জিনিস নাট্য-রংগ-লীলা। সৃষ্টিকর্তা যেমন নিজের সৃষ্টির ভিতর দিয়েই সার্থক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন নাট্যকারের পক্ষেও তেমনি নিজেকে নিজের নাটকের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর, শোভন এবং সার্থকভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিক থেকেই নাটকের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। কবিতা ও গানের পরই তাঁর নাটক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমা-লোচকেরা তাঁর নাটককে নানাভাবে ভাগ করেছেন—গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, সামাজিক নাটক, প্রহসন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তত্ত্বনাট্য নাম দিয়ে তাঁর নাটকের আর একটা শ্রেণী বিভাগও করেছেন। বাহ্যিক নানা লক্ষণ ভেদে তাঁর নাটকের হয়তো আরও নানারকম শ্রেণী-বিভাগ করা সম্ভব। আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমি সে চেষ্টা করব না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাটক বিষয়ে যে সামান্য আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম তাই লিখব। আমার 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি যখন ধারা-বাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই সেটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁর। নাটকটি যখন শেষ হ'ল তখন তিনি আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন শান্তিনিকেতনে। শ্রীমধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। আমার নাটকের দু'টি দোষ দেখালেন তিনি। মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের জীবন-চিত্র দেখাবার জন্যে আমি স্বপ্নের

* জামালপুরে জগজীবনরাম শ্রমিক কলেজে দেওয়া বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অংশ

সহায়তা নিয়েছিলাম। তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাক যেন স্বপ্ন দেখছেন যে, তিনি মাদ্রাজে গেছেন এবং তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছেন। রবীন্দ্রনাথ এই স্বপ্নের ব্যাপারটায় আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, অমন একটা বাস্তব জীবনী-চিত্রের সঙ্গে স্বপ্নের অবতারণাটা গোঁজামিল হয়েছে। সমস্ত নাটকটাই যদি গৌরদাসের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখাতে পারতে তাহলে সেটা একটা 'চীজ্' হ'ত। এই 'চীজ্' কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে পরে একটা চিঠিও লিখেছিলেন তিনি। তাতেও এই কথাই ছিল। চিঠিটা এখন হাতের কাছে নেই, থাকলে উদ্ধৃত ক'রে দিতাম। তখন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বার্লেন বোধহয় জর্মানির সঙ্গে কি একটা রাজনৈতিক আপোষ করবার চেষ্টা করছিলেন। তার উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছিলেন—কোনও চেম্বার্লেন এই দু'টিকে (বাস্তব আর স্বপ্ন) একঘাটে জল খাওয়াতে পারবে না।

পরবর্তী সংস্করণে স্বপ্নের দৃশ্যটা আমি তুলে দিয়েছিলাম।

শ্রীমধুসূদন সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি ছিল শেষ দৃশ্য নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মধুসূদনের ভৌতিক আবির্ভাব তিনি পছন্দ করেননি। আমাকে বললেন, ভূতটা ছাড়াতে হবে। সসংকোচে আমি চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর বললাম, "মধুসূদনের জীবনের শেষ পরিণাম কি হয়েছিল তা তো সবাই জানে। সেটা শেষ দৃশ্য করলে কি ভালো হ'ত? ভূতে আপত্তি করছেন কেন, শেক্‌সপীয়রের মতো নাট্যকার তাঁর নাটকে ভূত এনেছেন। আমি তো মধুসূদনের জীবনচরিত লিখছি না, আমি নাটক লিখছি। শেষ দৃশ্যটা নাটকীয় হয়েছে কি না তাই বলুন—।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই প্রদীপ্ত দৃষ্টি আমার চোখের দিকে নিবদ্ধ ক'রে হাসলেন, তারপর বললেন, "তুমিও দেখছি আমারি মতো 'টাচি' (touchy), আচ্ছা, বিকেলে বলব, ওটা রাখা চলবে কি না।"

বিকেলে বললেন, "আচ্ছা ওটা যেমন আছে থাক।" তারপর একটু হেসে বললেন, "তুমি আমার কথা রাখলে না, কিন্তু আমি একজনের কথায় গোরার শেষটা বদলে দিয়েছিলাম।"

শুনে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম।

"গোরার শেষটা আগে কি রকম ছিল?"

"ছিল বিয়োগান্ত। যখন জানা গেল যে, গোরা সাহেবের ছেলে তখনও তার সুচারিতার সঙ্গে বিয়ে হয়নি। বিয়ে হবে এইটে ঠিক হয়ে আছে কেবল। নিদারুণ খবরটা প্রকাশ হওয়ার পর সুচরিতা এসে দেখল গোরা নিজের ঘরে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। সুচরিতা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—আমি আপনাকেই গুরুপদে বরণ করেছি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব, যে-সত্য এখন প্রকাশ পেয়েছে তার আলোকে আমি এখন কি করব আপনিই ব'লে দিন। গোরা কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। সুচরিতা কয়েক মুহূর্ত ব'সে থেকে প্রণাম ক'রে উঠে চলে গেল। 'প্রবাসী'তে যখন উপন্যাসটা বেরুচ্ছিল তখন একটি মহিলা প্রতিমাসে সেটা তো পড়তই

তারপর কতটা লেখা হ'ল তা জানবার জন্তেও আমার কাছে চ'লে আসত। সে এসে যখন দেখলে আমি এইভাবে শেষ করছি তখন সে বললে—'না, না, এ রকম ভাবে আমি শেষ হ'তে দেব না। ওদের দুজনের মিলন আপনাকে করাতেই হবে। তার কথা রাখতে হল শেষ পর্যন্ত।"

এরপর নাটক সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা হয়েছিল। বলেছিলেন, সেকালের নাট্যকাররা চোখ-ভোলানো লোক-ভোলানো নাটক লিখতেন জনপ্রিয় হবার জন্য। থিয়েটার করা তাঁদের পেশা ছিল, নাটক জন-প্রিয় না হলে তাঁদের চলত না। এই জন্তেই তাঁরা মানুষের মনের মোটা মোটা ভাবকেই নাটকের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতেন। তীব্র প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, ভাঁড়ামি, সস্তা চটকদার নাচ-গান, এই সবই তাই তাঁরা নাটকের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করতেন। পৌরাণিক উপাখ্যানকেও নাটকের রূপ দেবার কারণ এই—লোকে সহজে বুঝতে পারবে, লোকের চিত্ত সহজে উদ্‌বুদ্ধ হবে। সূক্ষ্মভাবের সূক্ষ্ম কারুকার্য সাধারণত জন-প্রিয় হয় না। সূক্ষ্মভাবের রসিক কম। দেশের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগরিত ক'রে মানুষকে বৃহত্তর মুক্তির পথে চালিত করাও নাট্যকারের কাজ। কিন্তু সে কাজে অগ্রসর হওয়ার বিস্তর বাধা। এ ধরনের নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চ অভিনয় করতেই চাইবে না। আমি এ পথে কিছু চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার জন্তে আমাকে নিজেই সব করতে হয়েছে, নিজের ষ্টেজ, নিজের দল, সব। জন-সাধারণের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পাই নি।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার শেষ রক্ষা, চিরকুমার সভা তো খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, ওরকম বই আর লিখলেন না কেন ?

হেসে বললেন, লেখাটা তো উনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা। কখন কি যে এসে মাথায় ভর করে কিছু বলা যায় না। তাছাড়া একঘেয়ে জিনিস লিখতে ভালও লাগে না।

আমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটা যখন 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন সেটাও তিনি খুব আগ্রহ সহকারে পড়েছিলেন এবং আমাকে খুব উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির এক জায়গায় ছিল,—তোমাদের নাটক ঠিক লাইন ধ'রে চলেছে। ডিরেলড্ হবার ভয় নেই। যে হতভাগাদের পাড়ায় ওর টার্মিনাস্ আচারে ব্যবহারে কথায় বার্তায় তাদের ঠিক ছবিটি তুমি ফুটিয়েছ। প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, ওদের তুমি চেন। আর্টে তুচ্ছতাই গৌরবান্বিত হয় তাদের যথার্থরূপে চিত্রিত করলে। এগুলো অবশ্য হুবহু রবীন্দ্রনাথের কথা নয়, তবে ভাবটা এই। এই চিঠিতে একথাও উনি লিখেছিলেন যে, তাঁর 'মুক্তির উপায়' নাটকটি পাঁচজনের অনুরোধে প'ড়ে লিখতে হয়েছিল তাঁকে। নাটকটি লিখে তিনি তৃপ্তি পান নি। নাটকে যে চরিত্রগুলি এঁকেছেন সে চরিত্রগুলিকে যে তিনি যথার্থরূপে চেনেন তার সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই নাটকটিতে। যতদূর মনে পড়ছে লিখেছিলেন 'মাসিক পত্রের পাতায় মরা চ্যাপ্‌টা ব্যাঙের মতো দেখাবে।' আমার মনে হয়, এটা তাঁর অত্যুক্তি। তবে এই প্রসঙ্গে একটা ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায় : মনে হয়, সাধারণত যে স্তরের লোকদের নিয়ে আমাদের

দেশে প্রহসন বা সামাজিক নাটক জমে সে স্তরের লোকদের সঙ্গে ওঁর সম্যক পরিচয় বা অন্তরঙ্গতা ছিল না। তিনি তাঁর চতুর্দিকে যে মহিমময় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রাখতেন তা স্বভাবতই তাঁকে নিঃসঙ্গ ক'রে রাখত। তাই তিনি যে সব নাটক লিখেছেন সে সবে মানুষের চেয়ে আদর্শই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তাঁর নাটকে পাত্র-পাত্রীর চেয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত প্রেরণাই বড়। মানুষের নৈতিক দীনতাকে, নিষ্ঠুরতাকে, কুসংস্কারকে তিনি বার বার আঘাত করেছেন, মানবতাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সত্য-শিব-সুন্দরের তীর্থে। অনেক রকম স্বপ্ন দেখেছেন তিনি নাটকের মাধ্যমে। তাঁর দু'একটা স্বপ্ন সফলও হয়েছে তাঁর জীবনে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটেছিল ধনঞ্জয় বৈরাগীর। তাই বোধহয় মহাত্মাজীকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের সম্যক মর্যাদা আমরা এখনও দিতে পারি নি। এখনও অত্যন্ত সস্তা খেলো নাটকেই আমাদের রুচি নিবদ্ধ। পেশাদার নাটক-ব্যবসায়ীরা তাই নিয়েই কারবার করছেন এবং অত্যন্ত বাজে বইয়ের জনপ্রিয়তা দেখে রসিকরা আতংকিত হচ্ছেন।

এর কারণ দর্শকদের সুরুচি গ'ড়ে তোলবার কোনও ব্যাপক চেষ্টা আমাদের দেশে হয় নি। এ চেষ্টা করতে পারেন গভর্ণমেণ্ট, কোনও ব্যক্তি-বিশেষ বা মুনাফা-প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। লাভ-ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না রেখে এ কাজ একমাত্র গভর্ণমেণ্টের দ্বারাই সম্ভব। দেশের লোকের বুদ্ধিবৃত্তিকে, দেশের লোকের রুচির মানকে উন্নততর করতে হলে ভালো নাটকের অভিনয়, এক আধবার নয়, বার বার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলিতে অনেক ক্রান্তিকারী ভাব ও আদর্শ রেখে গেছেন। ক্রান্তিকারী ভাব ও আদর্শের মৃত্যু নেই। তারা time bomb-এর মতো অপেক্ষা ক'রে থাকে এবং যথাসময়ে তাদের বিস্ফোরণে দশ দিক সচকিত হয়ে ওঠে।

গভর্ণমেণ্ট মাত্রেই ক্রান্তিকারী আদর্শের শত্রু। জনসাধারণের উপর অবাধে প্রভুত্ব চালাবার সুযোগ কোনও গভর্ণমেণ্টই সহজে ছাড়তে চায় না। তাই মনে হয়, গভর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী আত্মসম্মানী রবীন্দ্রনাথের প্রচারে কখনও সহায়ক হবে না। আমাদেরই উদ্যোগী হয়ে এ কাজ করতে হবে। ওদের দেশের জনসাধারণের চেষ্টাতে ইব্‌সেন, শেখভ, শ, স্ট্রিণ্ডবার্গ নাটকজগতে আজ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। ওঁদের নাটক অভিনয় করবার জন্য নূতন ধরনের মঞ্চের পরিকল্পনা করতে ওঁরা পশ্চাৎপদ হন নি।

আশা করি, আমরাও হব না। রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে, আশা করি, আমরাও সগর্বে সার্থক রূপ দিতে পারব। আশা করি, আমরা মনে রাখতে পারব যে, মঞ্চের বাহ্যাড়ম্বরের চেয়ে আসল নাটকের মূল্য অনেক বেশী এবং সে নাটক খুন জখম, বাজে হাসি-হুল্লোড় বা সস্তা সেণ্টিমেণ্টের বাহক নয়, তা নূতন যুগের নূতন মনের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ, তার ইংগিত বন্ধনের দিকে নয়, মুক্তির দিকে।

ভাল বাংলা নাটক কেন নেই

বাংলা সাহিত্যে ভালো নাটক কেন রচিত হচ্ছে না এ নিয়ে কিছু লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। ইতি পূর্বে আমি এ বিষয়ে দু'একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

সার্থক নাটকের সঙ্গে নাট্যমঞ্চ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট। নাটক অভিনীত না হলে তা অসজ্জিতা অনলঙ্কৃতা প্রতিমার মতো অসম্পূর্ণ অসার্থক সৃষ্টি হয়। নাটকার নাটকে যে রূপ ও রসের সমাবেশ করতে চান তার অনেকটা নির্ভর করে তার অভিনয়ের উপর। লিখিত নাটক পাঠ ক'রে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার দশগুণ আনন্দ পাওয়া যায় সে নাটক সু-অভিনীত হলে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই নাট্যসাহিত্য যখন সমৃদ্ধ হয়েছিল তখন নাট্যকার নাট্যমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক সময় তাঁদের নিজেদেরই থিয়েটার ছিল, তাঁরাই সর্বেসর্বা মালিক ছিলেন সে সব থিয়েটারের। তাঁদের নাটকের সম্বন্ধে তাঁরা যা করতেন তাই হ'ত, বাইরের কোন বেরসিকের স্থূল হস্তাবলেপ তাঁরা সহ্য করতেন না। ম্যাকবেথের প্রথম দৃশ্যটা বাদ দিয়ে দেওয়া হোক বা ওথেলো-ডেসডেমোনার পুনর্মিলন করালে নাটক বেশী 'পপুলার' হবে—এ ধরনের অশ্রদ্ধেয় ডেঁপোমি সেকালে কল্পনাতীত ছিল। নাট্যকারই তাঁর নাটকের প্রযোজক, আর্ট ডিরেক্টার, সব ছিলেন। তাঁরা রঙ্গমঞ্চের প্রসাধনের জন্য অনেক লোকের সাহায্য নিতেন অবশ্য, কিন্তু রাশটা থাকত তাঁদের হাতে। বাংলা নাটকের সমৃদ্ধির যুগেও নাট্যকারই রঙ্গমঞ্চের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃত লাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালই রঙ্গমঞ্চকে পরিচালনা করতেন, রঙ্গমঞ্চ তাঁদের শিল্প-বোধকে নিয়ন্ত্রিত করত না, কিংবা তাঁদের নাটক অভিনয় ক'রে তাঁদের কৃতার্থ করেছেন একথা আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করবারও সাহস পেত না। রবীন্দ্রনাথও নিজের নাটককে রূপ দেবার জন্য নিজের মতো ক'রে নিজের নাট্যসম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন, কোনও পেশাদারী নাট্যমঞ্চের দ্বারস্থ হন নি।

আজকাল কিন্তু পেশাদারী নাট্যমঞ্চের মালিকের দ্বারস্থ না হলে নাটক অভিনীত হয় না। উক্ত মালিক যদি সত্যিকারের রসিক, রসস্রষ্টা বা কীর্তিমান সাহিত্যিক হ'ন তাহলে তাঁর দ্বারস্থ হতে কোন নাট্য-শিল্পীর আপত্তি হবার কথা নয়, কিন্তু আজকাল সাধারণত নাট্যমঞ্চের যাঁরা মালিক হ'ন তাঁদের একমাত্র গুণ তাঁরা ধনবান, গুণী বা গুণীর সমঝদার নন। কোনও আত্মসম্মানী নাট্যকার এরকম লোকের 'দ্বারস্থ' হতে রাজী হবেন না। এর জন্যে তাঁর বিশেষ কোনও ক্ষতিও হবে না। কারণ যে সকল মূল উপাদান দিয়ে নাটক তৈরী হয় সেই সব উপাদান দিয়েই সৃষ্টি হয় উপন্যাস গল্প। তাই তাঁরা নাটক না লিখে গল্প উপন্যাস লেখেন। সে সবের চাহিদাও বাজারে কম নয়। নিজেকে অবনত ক'রে তাঁরা নাটক লিখতে যাবেন কেন? যদিই-বা কোনও প্রতিভাবান নাট্যকার আন্তরিক প্রেরণার তাগিদে নাটক লেখেন এই কারণেই তা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় না কখনও।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলির একমাত্র লক্ষ্য অর্থোপার্জন। জনমত গঠন করা বা জীবনের নব নব চেতনাকে রূপ দেওয়া অথবা সত্যিকারের রসিক শ্রোতৃমণ্ডলী সৃষ্টি করা, এসব পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সাধ্যাতীত, হয়তো কল্পনারও অতীত। সুতরাং তাঁরা তাই করছেন যার 'মাস অ্যাপীল' আছে। উচ্চস্তরের নাটক অভিনয় করে তাঁরা রিস্‌ক নিতে রাজি নন। তাঁদের দোষ দিতে পারি না, কারণ তাঁরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিতে চান না, অনেক সময় নেবার ক্ষমতাও নেই। তাঁরা ব্যবসায়ী, বাংলা সাহিত্যের বা নাট্যসাহিত্যের উন্নতি হচ্ছে কিনা তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। আর দুঃখের বিষয় এঁরাই বাংলা দেশের নাট্যসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছেন।

আমাদের সরকার যদি প্রকৃত জাতীয় নাট্যশালা গঠনের দিকে মন দেন তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে প্রতিভাবান নাট্যকার এবং নটনটীরা উচ্চাঙ্গের নাটক দেখিয়ে নাট্য-রস পিপাসুদের তৃপ্ত করতে পারবেন, কিন্তু এখন সরকার যে ডান্স-ড্রামা একাডমী করেছেন তাতে একেবারে খোলাখুলিভাবে না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁরা চাইছেন যে নাট্যকাররা তাঁদের হয়ে তাঁদের সৎপ্রচেষ্টাগুলির প্রোপ্যাগাণ্ডা করুক। এরকম প্রোপ্যাগাণ্ডার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাররা প্রচারক হতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং সরকার-লালিত রঙ্গমঞ্চেও ভালো নাটক অভিনীত হবার আশা নেই।

যদি কোনও প্রতিভাবান নাট্যকারকে কেন্দ্র ক'রে কোনও নাট্যসম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং সে সম্প্রদায়ে নাট্যকারের যদি শ্রদ্ধার আসন থাকে তাহলেই ভালো নাটক হবার আশা আছে বলে মনে হয়।

আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা এবং প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী আছেন। তাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, কিন্তু নাটক ভালো নেই। এর আসল কারণ নাট্যসম্প্রদায়ে নাট্যকারের কদর নেই। অপরের লেখা কোনো ভালো নাটক কিছুটা অদল-বদল ক'রে (অর্থাৎ তার থেকে চুরি ক'রে), বিদেশী বইয়ের ব্যর্থ নকল ক'রে উপন্যাসকে ভেঙ্গে-চুরে যে সব নাটক আজকাল মঞ্চস্থ হচ্ছে সেগুলি দিয়ে পয়সা রোজগার হতে পারে ; সেগুলি ভালো নাটক নয় একথা রসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। বাংলা দেশে নাট্যামোদী অনেক আছেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যে সম্ভ্রমপূর্ণ সশ্রদ্ধ ব্যবহার করলে তাঁরা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন সেইটেরই অভাব আছে ব'লে আমার মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব-উপলক্ষে এই কথাটিই বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবের জন্মদিন একটিমাত্র নহে, তিনি একই জীবনে নব-নব রূপে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি বিদগ্ধসমাজে বিস্ময়-ভাজন। ১৭৮৩

সংবতে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতা শহরে আরও অনেক মানবশিশু নিশ্চয় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কথা আমরা এমন ব্যাপকভাবে স্মরণ করি না। যে দিব্যপ্রতিভার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার সমুচ্চ আসনে বসাইয়া অভিনন্দিত করিয়া থাকি, সেই প্রতিভার প্রথম প্রকাশ যেদিন হইয়াছিল—সেই দিনই রসিক সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কাব্য-প্রতিভা ঠিক কবে স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কোন একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেনসিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম"—তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর। কবি-কীর্তি তখন কবির জামার পকেটেই নিবদ্ধ। তিনি নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, আর দাদা সোমেন্দ্রনাথ উৎসাহী সমঝদার ও বিজ্ঞাপন-দাতা। তখনকার ন্যাশন্যাল পেপারের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ও তাঁহার সে সময়কার লেখা পদ্ম-বিষয়ক কবিতাটি শুনিয়াছিলেন এবং তাহাতে কবি 'ভ্রমরের' পরিবর্তে 'দ্বিরেফ' শব্দ ব্যবহার করাতে একটু কৌতুকবোধও করিয়াছিলেন।

এই নীলখাতায় লেখা কবিতাগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যচর্চার নিদর্শন হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারিত যদি সেগুলির প্রথম আবির্ভাবকালের সন-তারিখ আমরা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন—"সেই নীল ফুলস্ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তি দেবী কবে কোন্ বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভব-ভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠর-যন্ত্রণার হাত সে এড়াইল"; সেই-জন্য দলিল হিসাবে এই লেখাগুলির মূল্য দিতে ঐতিহাসিকেরা ইতস্তত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম যে কবিতাটি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার বিবরণ গবেষকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিতাটির নাম 'অভিলাষ'। কবিতাটি ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দলিল হিসাবে ইহাতেও একটু খুঁত আছে, কারণ কবিতার নীচে রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা হয় নাই। লেখা ছিল দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে অবশ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন কবিতাটি তাঁহার লেখা; সুতরাং বাংলা সাহিত্যে এই তারিখটিকেই কবির প্রথম জন্মদিন বলা যাইতে পারে। ছাপার অক্ষরে এইটিই তাঁহার প্রথম কবিতা। কবিতাটি দীর্ঘ। চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচার-চয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুতপদে
তোমার মোহন-জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।"

আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি তাঁহার অন্তিম রচনা তাহাতেও অনেকটা এই সুর বাজিয়াছে—

"তোমার সৃষ্টি পথ রেখেছে আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা-জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ..."

ছাপার অক্ষরে তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা-পুস্তক 'কবি-কাহিনী'। এ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সংবতে, ইংরেজী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পাঁচই নভেম্বর তারিখে। গ্রন্থকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম আবির্ভাবের দিনটিকেও তাঁহার জন্মদিন বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি হইয়াছিল নোবেল প্রাইজ পাইবার পর। পাশ্চাত্য দেশই রবীন্দ্রনাথকে সে সম্মান দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম কাব্য-গ্রন্থখানিও একটি পাশ্চাত্য মহিলাকে মুগ্ধ করে। তাঁহার নাম অ্যানা টারখুদ। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে লিখিতেছেন—"I have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart."

'কবি-কাহিনী'তে আরম্ভ হইয়া তাঁহার কল্পনা-প্রবাহ নব নব বিস্ময়সৃষ্টি করিয়াছে, কিছুদিন অন্তর অন্তর তাহা দিক-পরিবর্তন করিয়াছে, রূপও পরিবর্তন করিয়াছে, 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতের' কবিতার সহিত 'নৈবেদ্য', 'সোনার তরী', 'ক্ষণিকা' বা 'বলাকা'র কবিতার অনেক পার্থক্য, এইগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলেও কবির আরও নব নব জন্মদিনের সন্ধান পাওয়া যাইবে, কিন্তু আমি আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহার ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি নাই। সাহিত্যের যে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজের অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম আবির্ভাবের তারিখগুলিকেই আমি এই নিবন্ধে সংগ্রহ করিয়াছি।

এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আর-এক জন্মতারিখ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে। যে পত্র-সাহিত্য রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে সেই পত্র-সাহিত্যের প্রথম পুস্তক 'য়ুরোপযাত্রীর পত্র' এই সময় প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে ইহাই অবশ্য তাঁহার প্রথম গদ্যরচনা নহে, তাঁহার প্রথম গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায়। প্রবন্ধটি একটি সমালোচনা '—ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'।

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ২৫শে জুন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ, শকাব্দ ১৮০৩। এই তারিখে তাঁহার প্রথম নাটক 'রুদ্রচণ্ড' প্রকাশিত হয়। যে নাট্যকারের লেখনী হইতে পরে বহু বিস্ময়কর নাটক বাহির হইয়াছে তাঁহার জন্ম মানুষ রবীন্দ্রনাথের জন্মের কুড়ি বৎসর পরে। ইহার দুই বৎসর পরে আর-এক রবীন্দ্রনাথ

আবির্ভূত হইলেন, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতির লেখক ওই বিশেষ দিনে বাংলা-সাহিত্য-সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার আর-এক জন্মদিবস। ইহার কিছুকাল পরে ১৮০৫ শকের বৈশাখ মাসে তাঁহার 'প্রভাত সঙ্গীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের একটি কবিতা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। এই কাব্যগ্রন্থে কবি যেন আর-এক নবজন্ম লাভ করিলেন। তাঁহার এই সময়কার মনের ভাব নিজেই তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়া গিয়াছেন—তখন তিনি সদর স্ট্রীটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। লিখিয়াছেন—"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখলাম। একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে…"

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের শেষের কয়েকটি ছত্র—

"আমি যাব আমি যাব কোথায় সে কোন্ দেশ
জগতে ঢালিব প্রাণ
গাহিব করুণা গান
উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর
এ-কী কারাগার ঘোর
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর্
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী
এসেছে রবির কর।"

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। যে বিশ্বপ্রেম, যে ভূমার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পরবর্তী কাব্য-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে 'প্রভাত-সঙ্গীত' কাব্যেই তাহার প্রথম সূচনা।

সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই রবীন্দ্রনাথকে কোন না কোন সাময়িকপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইয়াছিল বলিয়াই সম্ভবত প্রায় একই কালে তাঁহাকে নানা ধরনের লেখা লিখিতে হইয়াছে। ওই ১৮০৫ শকের ভাদ্র মাসে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে বাহির হয়। প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম আবির্ভাব। প্রবন্ধগুলি ১২৮৮-৮৯ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তেমন গুরুত্ব দেন নাই। এগুলির সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এ-ও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোট ছোট স্বল্পায়ু রঙীন ভাবনা উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল।...মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার উত্তেজনা..." এ পুস্তকের আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "—প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।" ইতিহাসের দৃষ্টিতে কিন্তু প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব অনেক, কারণ প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব এইগুলিতেই।

১২৯১ সালে, ইংরেজী ১লা জুলাই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আর এক নূতন সুর ঝঙ্কৃত হইল ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে। ইহাতে তাঁহার আর-এক নবজন্ম।

'প্রভাত-সঙ্গীতের' কবিতার নমুনা—

"এখনো সে মনে আছে সেই জানালার কাছে
বসে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে
অনন্ত আকাশ নীল ডেকে চলে যেত চিল
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণ স্বরে"

ভানুসিংহ ঠাকুর গাহিলেন—

"বসন্ত আওল রে
মধুকর গুন গুন অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।"

একেবারে অন্য সুর। এ যেন রবীন্দ্রনাথ নয়, বিদ্যাপতি।

ইহার পরেই বাঙালী রসিক-সমাজ রবীন্দ্রনাথকে আর এক নূতন মূর্তিতে দেখিতে পাইলেন—'রাজা রামমোহন রায়' নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮ই মার্চ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। জীবনচরিতকার রবীন্দ্রনাথ, চারিত্রপূজার রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব ওই প্রবন্ধে।

ইহার কিছুদিন পরেই আমরা আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। তিনি আবার নবজন্ম লাভ করিলেন যেন। জালিওয়ানবালাবাগে ইংরেজদের পাশবিক হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ হইয়া পরে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঐতিহাসিক

পত্রখানি লিখিয়া 'সার' উপাধি বর্জন করেন সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথমে দেখিলাম ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সালে—যেদিন তিনি এমারেল্ড নাট্যশালার এক জনসভায় 'মন্ত্রী-অভিষেক' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। লর্ড ক্রসের বিল-এর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে এই সভা আহূত হইয়াছিল। এই রবীন্দ্রনাথই পরে কারারুদ্ধ জওহরলালের হইয়া এক বিদেশিনী মহিলাকে তীব্র জবাব দিয়াছিলেন। এ রবীন্দ্রনাথ একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইহার বর্ণনা শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমল হোম তাঁহার 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "স্বদেশের অপমান-বেদনা, দুর্গতি-লাঞ্ছনা, তীব্র অনুভূতিতে মর্ম-জ্বালায় রবীন্দ্রনাথকে বার বার যেমন ক্ষুব্ধ করেছে, প্রত্যেক সঙ্কটকালে তিনি যেভাবে তাঁর স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার তুলনা আর কোনো দেশের আর কোনো কবির জীবনে পাওয়া যায় কিনা জানি না…"

উক্ত 'মন্ত্রী-অভিষেক' নামক প্রবন্ধে তাঁহার রাজনৈতিক মতও ব্যক্ত হইয়াছে; এই মত তিনি আজীবন পোষণ করিয়াছেন, স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিষয়ক তাঁহার নানা প্রবন্ধে বারম্বার তাহা ঘোষণাও করিয়াছেন। তাঁহার সে মতটি এই যে—স্বাধীনতা নিজে অর্জন করিতে হয়, তাহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, কোনও ফাঁকি, কোনও মন্ত্র, কোনও বিশেষ হুজুকের আস্ফালন-আতিশয্যে তাহাকে পাওয়া যায় না। তাঁর শেষ-জীবনে লিখিত একটি প্রবন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—"আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকলপ্রকার হিতকর দান কোন একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হ'তেই পারে না। সরকার-বাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণের আর কোন উপায় আমাদের হাতে নেই, এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হ'তে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয়নি তার প্রধান কারণ এ নয়, যে এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে যে-দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলিনি: একে অধিকার করতে পারিনি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রেম দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি…"

এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব উক্ত 'মন্ত্রী-অভিষেক' প্রবন্ধে ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সালে।

ইহার প্রায় বছর দুই পরে রবীন্দ্রনাথের আবার এক নবজন্ম হইল। ১২৯৯ সালে ২৮শে ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত চিত্রাঙ্গদা কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ আর-এক নূতন মূর্তিতে দেখিয়া বঙ্গভারতী আনন্দিত হইলেন। যে আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য রচনা করিয়াছেন সেই আঙ্গিক তাঁহার আরও অনেক বিখ্যাত কবিতায় অনুসৃত হইয়াছে। বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যে আর-একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সেই কথা বলিয়াছেন। দয়িতা দয়িতের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্যই উন্মুখ। কিন্তু নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা তখনই সার্থক হয় যখন সে সত্তা সর্ব-আবরণ সর্ব-আভরণ মুক্ত; কোন কিছুর আড়াল, রূপের আড়াল এমন কি দেহের আড়ালও মিলনকে ব্যাহত করে। এইজন্যই শ্রীরাধা কামনা করিয়াছিলেন—পরজন্মে যেন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আর কোন বাধা থাকিবে না। চিত্রাঙ্গদা কাব্যে আর-একটি সুরও বাজিয়াছে যাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সুর। এই কাব্যে সর্বপ্রথম তিনি নারীকে তাহার স্বকীয় মর্যাদায় মহিমময়ী করিয়াছেন। শেষদৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলিতেছে—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

পরে এই সুর রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যে বাজিয়াছে, কিন্তু এই কাব্যেই তাহার প্রথম সুষ্ঠু প্রকাশ।

ইহার কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের আর-এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব আবির্ভাব ঘটিল। বিখ্যাত প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশিত হইল ৩১শে ভাদ্র ১২৯৯ সালে। হিউমার (humour) আর উইট (wit) রবীন্দ্রনাথের রচনার এবং চরিত্রের একটি সুমধুর দিক। বঙ্কিমচন্দ্রের পর তিনিই বাংলা সাহিত্যকে সুমার্জিত হিউমার এবং উইট দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। গোড়ায় গলদে হিউমারিস্ট রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। ইহাও তাঁহার আর-এক জন্মদিন। এই 'গোড়ায় গলদ' পরে 'শেষরক্ষা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে।

ইহার কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্র-প্রতিভার আর-এক নূতন প্রকাশ বঙ্গসাহিত্য-আকাশকে উদ্ভাসিত করিল। ১৫ই ফাল্গুন ১৩০০ সালে তাঁহার প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট-গল্প' প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের এ আবির্ভাবও সম্পূর্ণ অভিনব। বাংলা সাহিত্যে ওই তারিখটিকেও রবীন্দ্রনাথের আর-একটি জন্মদিন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্য যে ছোট-গল্পের গৌরবে আজ পৃথিবীর যে-কোনও সাহিত্যের সমকক্ষ, সেই ছোট গল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

ইহার বছর দুই পরে—২২শে মাঘ ১৩০২ সালে—রবীন্দ্রনাথের আর-একটি

জন্মতারিখ পাইতেছি। উক্ত তারিখে বালক-বালিকাদের পাঠের জন্ম তিনি 'নদী' নামক কাব্যগ্রন্থ লইয়া সাহিত্য-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান যে কত তাহা সুধী-সমাজে অবিদিত নাই। শুধু মনোরঞ্জনের জন্মে নহে, তাহাদের শিক্ষার জন্মও তিনি অনেক পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন—সংস্কৃত-শিক্ষা, ইংরেজি-সোপান, ইংরেজি-পাঠ, ছুটির পড়া, অনুবাদ-চর্চা, পাঠ-প্রচয়, সহজ পাঠ প্রভৃতি পুস্তক শস্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনে সুপরিচিত। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্মও তাঁহার পুস্তকসংখ্যা অনেক। শিশু-সাহিত্যে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব ২২শে মাঘ, ১৩০২ সাল।

ইহার কিছুদিন পরে ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হইল 'পঞ্চভূত'। ইহা একটি অদ্ভুত এবং অপূর্ব রচনা। এই রচনার তারিখকেও এক নব-রবীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ বলিতে পারি।

১৩০৬ সালে ৪ঠা অগ্রহায়ণ 'কণিকা' প্রকাশিত হয়। ইহাতে আর-এক রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ আমরা পাই। ইহারই গদ্য-রূপ 'লিপিকা' অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রের মধ্যে অতিবৃহৎকে অপরূপ শিল্প-সুষমায় প্রকাশ করিবার নিদর্শন এই বই দুটি। সংস্কৃত শ্লোকে এই নৈপুণ্য দেখিতে পাই। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই ইহা প্রথম প্রবর্তন করিলেন। এই পুস্তক প্রকাশকালও রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এই ১৩০৬ সালেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা আরও দুই বিভিন্ন স্রষ্টারূপে পাইয়াছি। ১৩০৬ সালে ১লা মাঘ প্রকাশিত হয় 'কথা', ৭ই মাঘ 'ব্রহ্মোপনিষদ' এবং ২৪ শে ফাল্গুন 'কাহিনী'।

'কথা ও কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্য হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। ইংরেজীতে যাহাকে Ballad বলে, এগুলি সেই জাতীয় কবিতা। রবীন্দ্রনাথই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রহ্মোপনিষদে ছাপার অক্ষরে উপনিষদ-মুগ্ধ ভক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ। উপনিষদের বাণীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও সাহিত্যে সুস্পষ্ট। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি বহু কবিতা, বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন; বস্তুত উপনিষদই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট ভিত্তি-ভূমির একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে। সমগ্র 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালাই তাঁহার এই উপলব্ধির বিচিত্র শিল্প-সৌধ। ব্রহ্মোপনিষদ গ্রন্থে শিল্পীর প্রথম আবির্ভাব। সুতরাং ১৩০৬ সালেই রবীন্দ্রনাথ দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আমি এই নিবন্ধে যে দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে আরও অনেকগুলি জন্মদিনের সন্ধান আমরা পাইতে পারি।

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব ১৩১২ সালে তাহার 'স্বদেশ' নামক কাব্য-গ্রন্থে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁহার 'সমালোচনা' নামক পুস্তকে ১২৯১ সালে ১লা জুলাই ১৮৮৪। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ভাষা-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখা দিলেন তাঁহার 'শব্দতত্ত্ব' নামক

পুস্তকে। যে রবীন্দ্রনাথ পরে 'ছন্দ' ও 'বাংলাভাষা পরিচয়' লিখিয়াছেন তিনি প্রথম জন্মগ্রহণ করিলেন উক্ত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে। শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথম দেখিতে পাই তাঁহার 'শিক্ষা' নামক পুস্তকে—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ নভেম্বর তারিখে। এই বিষয়ে তিনি পরে আরও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন : 'শিক্ষার মিলন' (১৪ আগস্ট, ১৯২১), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (জানুয়ারি, ১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (মে, ১৯৩৩), শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)।

ইহা ছাড়া গায়ক রবীন্দ্রনাথ, সুরকার রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, রাজনীতি-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ, বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ, শ্রীনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ, পথিক রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী রবীন্দ্রনাথ, সাধক রবীন্দ্রনাথ—প্রত্যেকেই কবি রবীন্দ্রনাথের এক একটি বিভিন্ন প্রকাশ, বিভিন্ন সত্তা। প্রত্যেক সত্তারই বিশিষ্ট রূপ আছে, জন্মদিনও আছে। বিশ্বকবি, পুরুষোত্তম, আধুনিক ভারতের দিক্‌পাল, বঙ্গসাহিত্যে একাধিক যুগের প্রবর্তক, বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন একটিমাত্র নহে। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহুবার নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া নব-নব-রূপে আমাদের বিস্মিত করিয়াছেন।

একই জল যেমন কখনও পানীয় রূপে, কখনও স্নানীয় রূপে, কখনও আকাশের মেঘে, কখনও কুজ্‌ঝটিকায়, কখনও ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে, কখনও হিমানীর শুভ্রতায়, কখনও কম্পমান শিশিরবিন্দুতে, কখনও নির্ঝরের কলোল্লাসে, কখনও স্রোতস্বিনীর খরবেগে, কখনও দিগন্ত পরিব্যাপ্ত সমুদ্রের উদার গাম্ভীর্যে পৃথিবীর লীলারঙ্গমঞ্চে প্রকাশিত—তাহা কখনও যেমন আকাশব্যাপী, কখনও পর্বতচূড়ালগ্ন, কখনও ভূতল-নিবদ্ধ—রবীন্দ্র-প্রতিভাও অনেকটা তেমন ; তাহার নানা প্রকাশ, নানা আবেদন, নানা পরিবেশ। আমরা এ যুগে তাঁহাকে যে রূপে দেখিতেছি, হয়তো যুগান্তরে সে রূপ পরিবর্তিত হইবে। নূতন যুগের মানুষেরা তাঁহাকে নূতন রূপে দেখিয়া নূতন ভাবে মুগ্ধ হইবে, নূতন ভাষায় তাঁহার কাব্যের নূতন ভাষ্য রচনা করিবে। কারণ কবির কাব্যে মানুষ আত্ম-আবিষ্কার করে। এক যুগের আত্ম-আবিষ্কারের সঙ্গে আর-এক যুগের আত্ম-আবিষ্কারের মিল থাকে না ; কিন্তু কবি চিরদিনই সঙ্গে থাকেন, তাঁহারই প্রতিভার আলোকে আমরা আমাদের স্বরূপ আবিষ্কার করি। কিছুদিন পূর্বে এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।—

আকাশে আকাশে নিত্যকালের যে অভিযান
কুসুমে কুসুমে যাহার স্বপন গন্ধ-ভরা
যে মহা-গান
সূর্য-তারার ছন্দ ভরা
স্মরণ-সভায় জানি না তাহার কোথায় স্থান
হায়রে, ব্যাকুল বসুন্ধরা।

তোমার চোখের জলেতে লেগেছে তাহারই রং
তোমার শোকের ভাষায় শুনি যে ছন্দ তার,
সেই সারং
কাঁপায় রৌদ্র অন্ধকার,
উজ্জ্বল রবি উজ্জ্বলতর হয় বরং
হয়নি যাত্রা বন্ধ তার।
গঙ্গার কূলে জ্বলেনি জ্বলেনি তাহার চিতা
সন্ধ্যার বুকে জ্বলেছিল শুধু স্বর্ণ-জ্বালা
রূপের গীতা
শেষ করেছে যে একটি পালা
নিত্যকালের আকাশে ওই যে দীপান্বিতা
সাজায় তাহার দীপালি-মালা।
নিত্যকালের মাটিতে ওই যে শ্যামলী বালা
তাহারই পথেতে পাতিয়া রেখেছে চোখের চাওয়া
ফুলের মালা
তুলায় বুকেতে দখিন হাওয়া
তাহারি লাগিয়া গভীর নিশীথে প্রদীপ জ্বালা
নিবিড় ছায়াতে দিবস ছাওয়া। *

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। বিশ্বব্যাপী যে উৎসবে আজ আমাদের কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পিত হইতেছে সে উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ আজ সমস্ত পার্থিব প্রয়োজনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, নিজের সুমহতী কীর্তির অমরাবতীতে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত—এসব উৎসবে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের আছে। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরাই উপকৃত হইব, আমরাই আনন্দিত হইব, আমাদেরই মনুষ্য-

*** এই প্রবন্ধে উল্লিখিত তারিখগুলি স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।**

দেহাশ্রয়ী পশুত্ব হয়তো প্রকৃত মনুষ্যত্বের কিছু আস্বাদ পাইয়া আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে। এই প্রয়োজনই এখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব আছে, আমাদের বেকার-সমস্যার সমাধান হয় নাই, আমাদের দেশের অনেক জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল ফলানো প্রয়োজন, বাণিজ্য-ব্যবসায় ও স্বদেশী উৎ-পাদনের বহুক্ষেত্রে এখনও আমরা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই, আমাদের অভাব অনেক, প্রয়োজনও অনেক; কিন্তু আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভাব মনুষ্যত্বের, আমাদের সমধিক প্রয়োজন মনুষ্যত্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শঙ্করাচার্য, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের দেশে এখনও মনুষ্যবেশধারী পশুর সংখ্যা অগণিত। এই পশু-মানবের দল যে আধুনিক যুগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে রোমাঞ্চকর পাশবিকতার অনেক উদাহরণ মিলিবে। এই পশুত্বের রঙটা খুব পাকা, প্রকৃতির সৃষ্টিরক্ষার সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাই ইহা সহজে আমাদের স্বভাব হইতে লোপ পায় না। অবশ্য একমাত্র মানুষই এই পশুত্বের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চায়, এই মুক্তিরই সে নাম দিয়াছে সভ্যতা। যাহারা সত্যসত্যই পশু, এ বিষয়ে তাহাদের কোন আগ্রহ নাই। মানুষদের মধ্যে এ বিষয়ে যঁাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহশীল, আমাদের অভিধানে তাঁহাদের অনেক নাম। সাধু, তপস্বী, ঋষি, মহাপুরুষ, যোগী প্রভৃতি অনেক নামেই তাঁহারা পরিচিত, কিন্তু প্রাচীন যুগে, বিশেষ করিয়া উপনিষদের যুগে তাঁহাদের আর এক নাম ছিল কবি। যাঁহাদের উপনিষদের সহিত কিঞ্চিৎমাত্রও পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন যে কবি এবং ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের কাছে সমার্থক ছিল। ব্রহ্মকে তাঁহারা রসো বৈ সঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রস তাঁহাদের সংজ্ঞায় ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর, কবিও তাই তাঁহাদের বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মূলতঃ তিনি কবি ছিলেন, ব্রহ্মো-পলব্ধির বিচিত্র লীলা, সীমার মাঝে অসীমের আবির্ভাব, তাঁহার বিরাট সাহিত্যকীর্তির মধ্যে নানাভাবে নানাছন্দে নানা রূপ-ভঙ্গিমায় রসিক পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে যে কথাটি তিনি বারংবার নিত্য নূতন সুরে বলিয়াছেন সে কথাটি এই—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, ধন্য হল অঙ্গ মম, পুণ্য হল অন্তর'। যে অরূপ-রতনের আশায় তিনি বারংবার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন সে অরূপ-রতনের দিব্যদ্যুতিতে বঙ্গবাণীর মন্দির আজ আলোকিত, সে আলোক আজ বিশ্ববাণীর মন্দিরকেও উজ্জ্বল করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের বাণী আজ বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের বাণী। সে বাণীর অন্তর্নিহিত মন্ত্র চিরন্তনের বাঁধা, বিরাট ভূমার অফুরন্ত আমন্ত্রণে সে বাণী চির-অভিসারিকা। নির্ঝ'রের স্বপ্নভঙ্গে যাহার যাত্রা শুরু হইয়াছিল সে যাত্রা কোথাও থামিয়া যায় নাই, তাহা অশেষ, তাহা চিরপ্রসারিত, যাত্রা-পথের বাঁকে বাঁকে তাহা নিত্যনূতন শোভায় বিস্মিত, আনন্দিত, অভিভূত। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি—

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
কী জানি কী হ'ল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

—প্রভাত সঙ্গীত

*　　*　　*

একখানি ছোট ক্ষেত, আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা
পরপারে দেখি আঁকা তরু-ছায়া মসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা॥

—সোনার তরী

*　　*　　*

গো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল
দে দোল দোল।
পশ্চাৎ হতে হা হা করে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি
যেন সে লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল
দে দোল দোল।

—সোনার তরী

*   *   *

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া করা
ছেয়ে গেছে ঝরে, পড়া বকুলে
সারি সারি নিকেতন, বেড়া-দেওয়া উপবন
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

—চিত্রা

*   *   *

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা দিশা-হারা নিবিড় তিমির আঁকা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

—কল্পনা

*   *   *

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

—উৎসর্গ

* * *

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

—গীতাঞ্জলি

* * *

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী
দিন সে কাটায়, গণি গণি বিশ্বলোকের চরণ-ধ্বনি
তারার আলোয় গায় সে সারা রাতি।
কত যুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আঁকে লেখা
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধূলায়, আঁচল পাতি॥

—গীতাঞ্জলি

* * *

তোমার ছুটি নীল আকাশে, তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থই-হারা ওই, দীঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল তলায়, গোলাবাড়ির কোণে
তোমার ছুটি ঝোপে ঝাড়ে, পারুল ডাঙার বনে
তোমার ছুটির আশা কাঁপে কাঁচা ধানের ক্ষেতে
তোমার ছুটির খুসী নাচে নদীর তরঙ্গেতে।

—শিশু ভোলানাথ

* * *

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোন দিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে,
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎ পাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

—বলাকা

* * *

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি, যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর্ গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল কোলাহল আনি
মোর গান হানি।

—পূরবী

* * *

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান ভরা ধন
বৎসরের শেষে
শুধু এক বার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবন মোহন
নব বরবেশে
তারি লাগি তপস্বিনী কি তপস্যা করে অনুক্ষণ
আপনারে তপ্ত করে ধৌত করে ছাড়ে আভরণ
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

—বনবাণী

* * *

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব,
পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙ্গে যদি ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব, তুমি আছ আমি আছি।

—মহুয়া

* * *

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়
ঝুমকো লতার চিকন পাতা কাঁপেরে কার চমকে চাওয়ায়।
হারিয়ে যাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্মরণখানি
আমের বোলের গন্ধে মিশে, কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়!

—গীতবিতান

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি
নিত্য কালের আলো আমি
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দ ধারা আমি
অকিঞ্চন আমি
আমার কোন কিছুই নেই অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।
—শেষ সপ্তক

*   *   *

নক্ষত্র বেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া উর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মি জাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ, তোমার আমার মাঝে এক॥
—প্রান্তিক

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সুদীর্ঘকাল নানাভাবে যে বিরাট আত্মোপলব্ধির বৈচিত্র্য-সম্ভারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহারই স্বল্প নিদর্শন এই উদ্ধৃতিগুলি। রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি এই নিখিল বিশ্বের নিত্য নবীনরূপে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা উপনিষদের ঋষিবর্ণিত সত্যের মতই নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, তাহা অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান। এই অবর্ণনীয়কেই তিনি সারাজীবন বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এই শব্দাতীতকে শব্দের মালায় গাঁথিয়া বঙ্গবাণীকে উপহার দিয়াছেন, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার আকুলতাই তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর অলঙ্কার-শিঞ্জনে, প্রসাধন-কলায়, ছন্দে, গন্ধে, রূপে, রসে প্রকাশিত। ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই—রবীন্দ্রনাথও পারেন নাই—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ওই একটি জিনিসই কখনও এঁটো হয়নি"—কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মোপলব্ধির অপূর্ব উজ্জ্বল প্রকাশ কেবল তাঁহার কাব্যকেই উদ্ভাসিত করে নাই, তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকেও মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রভাব সাধকের চরিত্রে যে সকল দিব্যগুণাবলীর সমাবেশ করে ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রকাশ অহঙ্কার-মুক্ত সুভদ্র সৌম্যতায়, কিন্তু সেই সুভদ্র সৌম্যতাই রুদ্র প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয় যখনই কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বর্বরতা মনুষ্যত্বের মহিমাকে আঘাত করে, যখনই মানবের আত্মা অপমানিত হয়, আধ্যাত্মিকতার অসম্মানে যখন সমগ্র মানবিক সভ্যতা কলঙ্কিত হয়। যে সব ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ সংসারত্যাগী, বৈরাগ্যের সাধনাতেই যাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত, তাঁহারা সংসারের অবিচার অত্যাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু যে ব্রহ্মদর্শী কবি ঘোষণা করিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ—

তিনি সংসারের, সমাজের, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সে মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোন অমানব বা অতি-মানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানব-বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। মানব নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না। এও সত্য। জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।"

এই মুক্তির সন্ধান করিতে গিয়া প্রত্যহের কুশাঙ্কুরে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, পশুত্বের সংঘাতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বিচলিত হইয়াছে এবং তীব্র প্রতিবাদে বারংবার তিনি বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছেন। মানবসমাজে যে সব ছদ্মবেশী দানব বর্তমান, তাহাদের আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহার বৃহৎ আত্মসম্মান নানা সুরে বহুবার ছন্দিত হইয়াছে। জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়াও তিনি লিখিয়াছেন—

মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।

লিখিয়া গিয়াছেন—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে।

আহত আত্মসম্মানের বাণী, পশুত্বের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের উদাত্ত উদ্‌ঘোষণা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু হায়, ললিতবাণীর মোহে মুগ্ধ হইয়া নাচগানের হুজুগে মাতিয়া আমরা আমাদের এই দুর্দিনেও রবীন্দ্রনাথের পৌরুষের দিকটা একেবারে ভুলিয়াছি। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় যে বোধ হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত আমাদের অনেকেরই সম্যক পরিচয় নাই, পল্লবগ্রাহিতার সংক্ষিপ্ত সহজ পথে রবীন্দ্রনাথের স্বল্প পরিচয় পাইয়াই আমরা সন্তুষ্ট আছি এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অংশভাক্ হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। তাহা না হইলে আজ আমাদের এ দুর্দশা কেন? স্বাধীনতার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে বাণীমন্ত্র একদা বঙ্গবাণীর মন্দিরকে মন্ত্রিত করিয়াছিল

সে বাণী আজ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে না কেন? নিজেদের দুঃখ দুর্দশা লজ্জার কাহিনী সাড়ম্বরে সংবাদপত্রে ছাপাইয়া নির্বীর্য নপুংসকদের মত অহোরাত্র থিয়েটারী ভঙ্গিতে আজও আমরা কেবলমাত্র হায় হায় করি কেন? আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনি না, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আমরা পাঠ করি নাই। যদিও বা করিয়া থাকি তাহা আমাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে নাই, মনকে স্পর্শ করে নাই, আমাদের পশুত্বের ঘন অন্ধকারে রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্যোতির্ময় আবেদনও ব্যর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আত্মসম্মানের যে চিত্র দেখিতে পাই তাহার মূল কথা আত্ম-শক্তির উদ্বোধন, কোনও বাহিরের শক্তিতে নয়, আত্মার শক্তিতেই বিশ্বাস স্থাপন।

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
    বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
দুঃখ-তাপে-ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
    দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
    নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায়, বহু প্রবন্ধে বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার আত্মসম্মান তাঁহাকে আত্মমুখী করিয়াছে, তিনি কাহারও কাছে কখনও ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করেন নাই। ভিক্ষা করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। একটি উদাহরণ দিতে পারি। তিনি যখন স্বকীয় আদর্শের অনুরূপ শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন তখন তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু অর্থের জন্য কাহারও নিকট তিনি ভিক্ষা করেন নাই। শুধু একবার নহে একাধিক বার শান্তিনিকেতনের আর্থিক সঙ্কট তাঁহাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়াছে, যখন তাঁহার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী তখনও তিনি এ দুশ্চিন্তামুক্ত হন নাই এবং তখন ভারতবর্ষের ধনী অথবা রাজন্যবর্গের দ্বারস্থ হইলে তাঁহার শান্তিনিকেতন হয়তো অর্থাভাবমুক্ত হইতে পারিত—মালবীয়জীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রাজন্যবর্গের বদান্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্ম-সম্মান তাঁহাকে এ পথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে যাহা দিয়াছে তাহা অবশ্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কাহারও বদান্যতার উপর ভিক্ষার দাবি চাপাইতে চাহেন নাই। তিনি শান্তি-নিকেতনকে চালাইতে চাহিয়াছিলেন স্বোপার্জিত অর্থদ্বারা। নিজের পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তো দিয়াছিলেনই, কিন্তু তাহাতেও যখন কুলাইতেছিল না তখন বৃদ্ধ বয়সে নাচ-গান অভিনয় করিয়া ভারতবর্ষের শহরে শহরে ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তবু কাহারও নিকট ভিক্ষা করেন নাই। শেষে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন এবং শান্তিনিকেতনের তাৎকালিক অর্থাভাব মিটাইয়া দেন।

তাঁহার জীবন ও সাহিত্যে আত্মসম্মানের এরূপ বহু নিদর্শন বর্তমান। যাঁহারা জীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই আত্মাকে সম্মান করিতে পারেন।

তাঁহাদের চিত্ত বিরাট উপলব্ধির মহান আনন্দে সদাপ্রদীপ্ত, তাই তাঁহারা নির্ভীক, কোন কারণেই তাঁহারা আত্ম-অপমান বা আত্ম-অবনতির পঙ্কে অবলিপ্ত হইতে চাহেন না। যখনই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব, সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ লাঞ্ছিত ব্যাহত হয় তখনই তাঁহারা সমস্ত ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিয়া সমস্ত ক্ষয় ক্ষতির উর্ধ্বে উঠিয়া রাজরোষ বা রাজদণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া অকুতোভয়ে বলিয়া উঠেন—

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র-দূতে বল কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি? শাস্তি তার তরে
যে পারেনা শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর
কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভা-মাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃ-রক্ত প্রায়
সেই ভীরু নত-শির চির শাস্তিভারে
রাজ-কারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।

অরবিন্দ-নমস্কারে রবীন্দ্রনাথ নিজের আত্মার ঐশ্বর্যকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার দেশাত্মবোধ এবং আত্ম-সম্মান একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। দেশ যখন ইংরেজের অধীনে ছিল তখন দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য রাজ-সরকারে আবেদন-নিবেদন করা তিনি আত্মসম্মান-হানিকর মনে করিতেন।

১৩১১ সালে "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "ইংরেজ যদি বলে, সাধারণ মনুষ্য-স্বভাবের যে নিম্নতম কোঠায় আমি আছি সেই কোঠায় তুমিও এস, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই, স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ কর, স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার, অন্ততঃ আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!"

এ কথা বলিলে তাহার কী উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি—আলস্য-পূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই। ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও 'হাণ্টার' বই গতি নাই। তারপর দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল. ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল নিজের চেষ্টা দ্বারা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতা সত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য পালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনও দিনই কোনও কাজে লাগিতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে—যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই—এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনই যথার্থ আদান প্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে অনেক টাকা আছে অন্য পক্ষে শুধু মাত্র চেক বইখানি আছে; এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক ভাঙ্গানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবীস্বরূপে বরাবর চলে না, ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, এক একবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল, কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হউক আর নিঃশব্দেই হউক গলাধঃকরণ-পূর্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড় কঠিন তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিন তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না"।

এই প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে কি কোনও পরিবর্তন আসিয়াছে? পরিবর্তনের মধ্যে তখন আমাদের প্রভু ছিলেন বিদেশীরা, এখন হইয়াছেন স্বদেশীরা। কিন্তু এখনও আমাদের দুর্দশা যেমন ক্রমবর্ধমান, আমাদের জড়ত্বও তেমনি। যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ, বহু কবিতা, বহু গান লিখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সাহিত্য-কীর্তির একটা প্রধান অঙ্গ, সে বঙ্গব্যবচ্ছেদ তাঁহার মৃত্যুর পর হইয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহা সহ্য করিয়াছি। মাঝে মাঝে আজকাল আমরা কোলাহল করিয়া থাকি রিফিউজিদের প্রাপ্য ভিক্ষার আকাঁড়া চাউল ঠিকমত বণ্টিত হইতেছে না বলিয়া, মাঝে মাঝে আমাদের খবরের কাগজে সরকারের হুমকি ছাপা হয় অমুক তারিখের মধ্যে এই গৃহহারা ভিখারীর দল বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরের অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি ঝাঁপাইয়া না পড়িতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে সন্তপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সার' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহা লইয়া আমাদের গর্বের অন্ত নাই; যেখানে-সেখানে ইহা লইয়া আমরা আস্ফালন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা কি আমাদের মনে সত্যই কোন দাগ কাটিয়াছে? সত্যই কি

আমরা আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি? কই, আসাম হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হইয়া কোনও উপাধিধারীকে তো উপাধি ত্যাগ করিতে দেখিলাম না। সে কালেও যেমন যো-হুজুরের দল আশা করিত যে ইংরেজ সভ্য জাতি, তাহারা আমাদের সম্বন্ধে সাম্যনীতির প্রয়োগ করিবে, একালের যো-হুজুরের দলও ঠিক তাহাই মনে করিতেছেন। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভুলিয়া গিয়াছেন কিংবা ভুলিয়া থাকিবার ভান করিতেছেন—"সাম্য নীতি সেইখানেই খাটে যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই; তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতা মাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনো মতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? সে প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব, সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।"

পূর্বে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মানের ভিত্তি তাঁহার আত্মশক্তিতে এবং তাঁহার আত্মশক্তির মূল তাঁহার ব্রহ্মবোধে। বহুকাল পূর্বে ১৩০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "নববর্ষ" প্রবন্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীন সত্তার যে বিশিষ্টতা অনুভব করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের যে রূপ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। তিনি ফললোলুপ কর্মের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসঙ্ঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে, ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু তাহা স্পর্ধিত তাহা নিষ্ঠুর। তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এই জন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে চর্মে অস্ত্রেশস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্র মাত্র। এই দানবীয় 'ফ্রীডম্' কোনও কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না, কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীন ছিল। এখনও আধুনিক কালের ধিক্কার সত্ত্বেও এই ফ্রীডম্ আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল। এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে

মহত্ত্ব. যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে ···আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসব-বস্ত্র পরিয়াছেন এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষি কবিরা ত্রিষ্টুভ ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীত-হরিৎ বস্ত্রখানিতে বন-শ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এই সমীর-কম্পিত কুসুমগন্ধী অঞ্চলপ্রান্তটি নব সূর্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবন-সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়···"

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান স্বাধীন ভারতবর্ষকে তাহার সনাতন শুভ্র সত্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিল। বাহিরের কোনও জড়বাদী সভ্যতার নকলে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইবে এ কল্পনা তাঁহার আত্মসম্মানকে আঘাত করিত। সর্বপ্রকার অন্ধ অনুকরণ এবং ভণ্ডামির ছদ্মবেশকে তীব্র ব্যঙ্গে বারংবার তিনি ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। দুই-একটা উদাহরণ দিই—

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুর্গুণ লাজ
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান।
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না "ওরে দীন যত্নে মোরে ধর
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?"

* * *

ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?
বলিতেছে যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়!
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কি অহঙ্কার
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার।

সাহেবিয়ানার নকলকেই তিনি যে কেবল ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা নয়, অন্তঃসারশূন্য ভণ্ড আর্যামিকেও করিয়াছেন।

"এটা আমাদের স্মরণ নেই যে যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ, সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ। ···তোমার আমার মত লোক যারা তপস্যাও করিনে, হবিষ্যও খাইনে, জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে পান চিবতে চিবতে নিয়মিত অফিসে স্কুলে যাই, যাদের

আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, জরৎকারু, বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ পর্যন্ত কারো ভ্রম হয়নি একদিন তিন সন্ধ্যা করে একটা হরিতকী মুখে দিলে যাদের তারপর একাদিক্রমে কিছুকাল অফিস কিংবা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এরকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্যোগ-পরায়ণ মান্য জাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সিটকার করা, কেবলমাত্র যে অদ্ভুত, অসঙ্গত, হাস্যকর তা নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।…অতএব হয় সত্যই তপস্যা কর, নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়।"

ভারত-সভ্যতার যে রূপ তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র তাহার আধ্যাত্মিক রূপই নয় তাহা কর্মে প্রচেষ্টায় প্রতিভায় প্রেরণায় সমৃদ্ধ প্রাণবন্ত রূপ।

"নূতন ও পুরাতন" প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—"আমরা যখন একটা জাতির মত জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ, বাণিজ্য, শিল্প, দেশবিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদান-প্রদান, দিগ্বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্ত দেশে আমরা সেই ভারত-সভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতি দূরবর্তী একটি তপঃপূত হোম ধূম রচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মত দেখতে পাই এবং আমাদের এই বর্তমান কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনই প্রকৃত নয়। …আমরা যে কল্পনা করি আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল, আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলি শান দিতেন, তাকে একেবারে কর্মাতীত, অতিসূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা করতেন, সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারি প্রেতযোনি মাত্র।…"

সমাজ হইতে এই প্রেতযোনিকে দূর করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান তাঁহাকে দিয়া অনেক প্রবন্ধ, অনেক কবিতা লিখাইয়াছে। এ প্রেতযোনি শুধু অতীতের নয়, বর্তমানেরও। শুধু সামাজিক নয়, রাজনৈতিকও। তাঁহার "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম", "সভ্যতার সংকট" যদিও ইংরেজের শাসনকালে লিখিত হইয়াছিল কিন্তু উহাদের বক্তব্য চিরন্তন সত্যের বাণী। যখনই একদল অত্যাচারী শাসনকর্তা ক্ষমতা-মদ-দৃপ্ত হইয়া অসহায় জনসাধারণের উপর যথেচ্ছাচারের ষ্টীমরোলার চালাইতে যাইবে তখনই উক্ত প্রবন্ধ দুইটির বজ্রবাণী সচকিত করিয়া তুলিবে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কেই।

"কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" হইতে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—"প্রেষ্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেক দিনের চেনা লোক। ওই তো কর্তা, ওই তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী; ওই তো বেহুলা কাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। অতএব—

যা দেবী রাজ্যশাসনে প্রেষ্টিজরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

সমাজের কল্যাণের ক্ষেত্রে স্টেটের হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ কাম্য মনে করিতেন না। আমাদের জল-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হওয়াটা তিনি আত্মসম্মান-হানিকর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই,তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠেনা। কাজেই জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর লইল কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?"

সম্মানের জন্যও তিনি সমাজের দিকেই চাহিতে বলিয়া গিয়াছেন, রাজদরবারের দিকে নয়। উক্ত প্রবন্ধেরই একস্থানে তিনি বলিতেছেন, "পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায় রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না, সমাজের প্রসাদ রাজ-প্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত, দেশের-সামান্য লোকে বলিবে মহাশয় ব্যক্তি ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই।"

রবীন্দ্রনাথের এই অমিত আত্মসম্মানের নিদর্শন তাঁহার সাহিত্যকৃতির বহুস্থানে লিপিবদ্ধ। তাঁহার 'কথা ও কাহিনী', 'সমাজ', 'স্বদেশ', 'আত্মশক্তি', 'নৈবেদ্য', 'শান্তিনিকেতন', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'রাশিয়ার চিঠি', 'গোরা' প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার অজস্র পরিচয় বর্তমান। এইসব গ্রন্থ ছাড়াও বহু পত্রে, বহু গল্পে, বহু নিবন্ধে ও কবিতায় তাঁহার বহু আলাপ-আলোচনায় প্রদীপ্ত আত্মসম্মানের দ্যুতি তাঁহার চারিত্রিক মহত্বকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আত্মসম্মানের আর একটা বৃহৎ পরিচয় আমরা পাই তাঁহার শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়াসে। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার সপক্ষে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্কুল-কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ আইন-শৃঙ্খলে নিজেদের আবদ্ধ না করিয়াও দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে ঘরে পড়িয়া নিজের মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও তিনি শ্রীনিকেতনে করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষার একটি অর্থই সুস্পষ্ট ছিল মনুষ্যত্বলাভ, ডিগ্রী অর্জন করিয়া চাকুরী লাভ নয়। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহারও অনেক আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন শ্রীনিকেতনে। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার এই আত্মসম্মানবোধ দেশের লোকের নিকট কিন্তু তেমন প্রশ্রয় পায় নাই। দেশের সম্বন্ধে দেশের উন্নতিকল্পে যখনই তিনি সত্য-ভাষণ করিয়াছেন, দেশের জড়তাকে বা মেকী অতি আধুনিকতাকে যখনই তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন তখনই দেশের লোক তাঁহার উপর যে খড়্গহস্ত হইয়াছেন ইহার অজস্র প্রমাণ পুরাতন পত্রিকার ফাইল ঘাঁটিলেই পাওয়া যাইবে। এ সবের উত্তরও তিনি মাঝে মাঝে দিয়াছেন, কিন্তু সে উত্তরের মধ্যেও তাঁহার শালীনতা তাঁহার আত্মসম্মানের দীপ্তি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার "নিন্দুকের প্রতি" নিবেদন নামক কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

হউক ধন্য তোমার যশ, লেখনী ধন্য হোক
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে জাগাক সপ্ত লোক
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ, বিদ্রূপ কেন ভাই।

এই প্রবল আত্মসম্মানের জন্য তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত নিন্দা বা কটূক্তি বা এ সম্বন্ধে দেশবাসীর ঔদাসীন্যকে তিনিও যেন তেমন একটা আমল দেন নাই।

আমেরিকার কাষ্টম্‌স্ হাউসের কর্মচারীদের অভদ্রতায় বিরক্ত হইয়া তিনি যে আমেরিকা হইতে ফিরিয়াই আসিয়াছিলেন এ সংবাদ অনেকদিন দেশবাসীর গোচর হয় নাই। শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রণীত 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' পুস্তক হইতে প্রথম জানিতে পারিলাম যে তিনি যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতায় ক্ষুব্ধ হইয়া 'সার' উপাধি ত্যাগ করেন তখন তাহা অমৃতসর কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, যদিও সে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু এবং প্রধান পাণ্ডাদের মধ্যে ছিলেন এমন অনেকে যাঁহারা আজ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমল হোম লিখিয়াছেন—"শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে পাঞ্জাব-ব্যাপারে বড়লাটের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে কোন প্রস্তাবই পেশ বা পাস হল না। অমৃতসরে বেঙ্গল ডেলিগেটদের ক্যাম্পে এ নিয়ে কোন চাঞ্চল্য দেখি নি।...রবীন্দ্রনাথের এই উপাধি বর্জন ব্যাপারটা সেদিনের কংগ্রেস মহলে কি এ দিনে গান্ধিজীর আসন্ন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কোন দিন বিশেষ কোন সাড়া জাগায় নি।" রবীন্দ্রনাথের উপাধি বর্জনের কথাটাই অনেকে জানেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর পাইয়া তাঁহার আহত আত্মসম্মান যে কি পর্যন্ত মুহ্যমান হইয়াছিল তাহার খবরও উক্ত গ্রন্থে আছে। তখন শান্তিনিকেতনে নিদারুণ গ্রীষ্ম। ভাইস্‌রয়কে চিঠি লিখিবার আট দিন পূর্বে তিনি লেডি রাণু মুখার্জীকে একটি পত্রে লিখিতেছেন—"আকাশের এই প্রতাপ আমি এক রকম সইতে পারি, কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবেই আছ,

পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।" মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আছে—"শুনে যে কি প্রবল কষ্ট অসহ্য কষ্ট হয়েছিল তা আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হ'তে লাগল—এর কোন উপায় নেই ? কোন প্রতিকার নেই ? কোন উত্তর দিতে পারব না ? এও যদি নীরবে সইতে হয় তা হলে জীবন ধারণ যে অসহ্য হয়ে উঠবে।" ইহার পর তিনি কলিকাতায় গেলেন বিখ্যাত এক দেশনেতার কাছে প্রটেস্ট মিটিংয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য। তিনি রাজী হন নাই। আরও কয়েকজনের কাছে গিয়াছিলেন, কেহই রাজী হইলেন না—ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের ভয়ে। তিনি অবশেষে মহাত্মা গান্ধিজীকে জানাইলেন যে তাঁহার সহিত তিনি পাঞ্জাবে যাইতে প্রস্তুত আছেন। গান্ধিজীও ইহাতে সম্মত হন নাই।

তখন তাঁহার নিজের হাতে যতটুকু করিবার ছিল, তাহাই করিলেন। একখানি অমর পত্র লিখিয়া বর্জন করিলেন ছার 'সার' উপাধিটাকে।

ইহার পর কবি বিলাত যান। সেখানেও তিনি এক সংবর্ধনা সভায় ঐ বিষয়ে ভাইকাউণ্ট সেসিল, অধ্যাপক গিলবার্ট মারে এবং অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ফলে কিছুই হয় নাই। পার্লামেণ্টের ডিবেটে হাউস অব লর্ডস্ জেনারেল ডায়ারকে সমর্থনই করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ সাহেবকে লিখিলেন—"The unashamed condonation of brutality expressed in their speeches and echoed in their newspapers is ugly in its frightfulness···The late events have conclusively proved that our salvation lies in our hands...the one path of fulfilment is the difficult path of suffering and self-sacrifice."

যেখানেই দেশের এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে সেইখানেই কবি প্রতিবাদ করিয়াছেন। জাপান যখন চীনের উপর অত্যাচার করিতেছিল তখনও তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আফ্রিকায় যখন অসহায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের বীরত্ব মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছিল তখনও তিনি নীরব থাকেন নাই। যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বালগঙ্গাধর তিলকের অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথই বার্ধক্যে কারারুদ্ধ জওহরলালের হইয়া জবাব দিয়াছিলেন মিস্ র‍্যাথবোন্‌কে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান তাঁহার নিজের বিবেকের প্রতিই সম্মান। কোন কারণেই তিনি কখনও নিজের বিবেকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন নাই। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকতাও অনেকদিন করিয়াছিলেন কিন্তু যখনই সমাজের সহিত তাঁহার ব্যক্তিসত্তার সংঘাত বাধিল তিনি সম্পাদকের আসন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেশাত্মবোধের, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণার জ্যোতির্ময় দীপ্তি তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে দেদীপ্যমান, তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গান রচনা করিয়া কংগ্রেসমণ্ডপে গাহিয়াছিলেন, তিনি

বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত নিজের দেওয়া সুরে গাহিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস সভাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সহিত বা দেশের রাজনীতির সহিত সম্পর্ক রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ রাজনীতির হীন চক্রান্ত ও দলাদলির নোংরামি তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। বিদেশীর অনুকরণে কংগ্রেস অধিবেশনও তিনি পছন্দ করিতেন না। দেশের জনসাধারণের সহিত মিলিবার জন্য আমাদের দেশের মেলাগুলিকেই তিনি সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু নিয়মিত খদ্দর পরিতেন না, চরকাও কাটেন নাই। গান্ধীজি যে আদর্শ শান্তিনিকেতনে প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও তিনি পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আত্মসম্মানবোধে ঝুটা বা মেকী কিছু ছিল না, তাহা ছিল তাঁহার বিবেকের অকুণ্ঠিত প্রকাশ। তিনি চিরকাল নবীনের পূজারী। তিনি বারবার দেশের যৌবনকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

কিন্তু অতিআধুনিকদের উন্নাসিকতা বা ন্যাকামি তিনি সহ্য করেন নাই। তীব্র ব্যঙ্গে তাহাকে বারংবার ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মসম্মানের আর একটা দিকের কথা বলিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব। তিনি নিজেকে কখনও বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তাঁহার উদার চেতনা সমস্ত ভারতকে তো বটেই, সমস্ত মানবজাতিকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

তিনি লিখিয়াছেন—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে—

তিনি লিখিয়াছেন—

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
"জয়তু শিবাজি"
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, একসঙ্গে চলো
মহোৎসবে আজি।

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

তিনি লিখিয়াছেন—

জনগণমন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা।

ভারতের সভ্যতাকে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে, ভারতের সমগ্রতাকে, ভারতের ভাব-বিগ্রহকে তিনি সারাজীবন নানাভাবে বন্দনা করিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজেকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

ও আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

* * *

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

* * *

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে
তব আম্রবনঘেরা সহস্র কুটিরে
দোহনমুখর গোষ্ঠে ছায়া বটমূলে
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ জননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

*   *   *

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে
পারে না বহিতে নদী জল-ধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎ কালের প্রভাতে।

শুধু বাংলার প্রকৃতিকেই নয় বাংলার ছেলেকে, বাংলার মেয়েকে, বাংলার সমাজকে, বাংলার নেতাকে, বাংলার বাউলকে, বাংলার কীর্তনকে, বাঙালী-প্রতিভার বৈচিত্র্যকে তিনি সগৌরবে তাঁহার সাহিত্য-কৃতির মধ্যে স্থান দিয়া গিয়াছেন। এই কথা আজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই 'আমি বাঙালী' এ কথা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে শঙ্কিত হন পাছে কেহ তাঁহাদের প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট বলিয়া মনে করেন। এ আশঙ্কা অমূলক নয় এবং এ আশঙ্কার মূল আমাদেরই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিহিত আছে। আমরা সত্যই আজ সকলে মনে মনে প্রাদেশিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত, তাই বাহিরে একটা সর্বভারতীয়তার মুখোশকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাই। আসলে আমরা সকলেই প্রায় ছিন্নমূল ভণ্ডের বেশে সাময়িক আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট। যে ঘুড়ি আকাশে স্বচ্ছন্দে ওড়ে সে লাটাইয়ের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করে না। সে সম্পর্ক স্বীকার করিয়াই সে নিজের আকাশ-ভ্রমণ সার্থক করিতে পারে। কিন্তু যে ঘুড়ি কাটিয়া গিয়াছে, লাটাইয়ের সহিত যাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন, সে যতই না কেন আকাশ-বিহারের আস্ফালন করুক তাহাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে পড়িতে হয়। আমাদের অনেকেরই অবস্থা অনেকটা এই ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত।

এই প্রবন্ধে আমি বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান লইয়াই আলোচনা করিলাম। সে আত্মসম্মানের উৎস যে তাঁহার বিরাট ব্রহ্মোপলব্ধি তাহাই দেখাইবার জন্য তাঁহার কাব্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের আজ যা অবস্থা তাহাতে তাঁহার কাব্যের মাধুর্য, নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য, সঙ্গীতের ঐশ্বর্য, অথবা গল্প উপন্যাস প্রভৃতির অপূর্ব রসোত্তীর্ণতা লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সে আলোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি? রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা এবং বিচিত্র কাব্যসম্ভার সুস্থ, সবল, আত্ম-সম্মানশীল, রসিক, সভ্য, উন্নত সমাজের অনুধাবনযোগ্য। আমরা রবীন্দ্রনাথের গান নাকী সুরে গাহিয়া এবং রবীন্দ্র-নৃত্যের ব্যর্থ নকল করিয়া যাহা করিতেছি তাহা

নিতান্তই হাস্যকর। আমরা যদি কোনদিন সুস্থ সবল প্রাণবন্ত জাতি হইতে পারি তবেই রবীন্দ্র-আলোচনা আমাদের পক্ষে সার্থক হইবে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান এবং রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব-মর্যাদাবোধের আদর্শই এখন আমাদের রক্ষা করিতে পারে যদি আমরা সে বিষয়ে সচেতন হই। কিন্তু সচেতন হইব কি?

রবীন্দ্রনাথ যে পরনির্ভরতার গ্লানি হইতে আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, কবিতার পর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, স্বাধীনতা পাইবার পর আমাদের সেই পরনির্ভরতা, সেই প্রভুদের পদলেহন প্রবৃত্তি যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আত্মরক্ষা, আমাদের চরিত্র গঠন, আমাদের সাহিত্যের বা শিল্পের মান নির্ণয় সমস্ত কিছুর জন্যই আমরা আজ দিল্লীর দরবারের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। মনে হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর দরবার আমাদের দাম্পত্য-প্রণয়, পিতামাতার স্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম এবং বন্ধুত্বের প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট বা উপাধি বিতরণ করিবে এবং আমরা তাহা কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিব। আমরা যেন মানুষ নই, আমরা যেন একদল ভিক্ষুক, একদল স্তাবক, একদল মতলববাজ অভিনেতা। আমাদের আত্মসম্মান নাই, মেরুদণ্ডের জোর নাই, সত্য কথা বলিবার সাহস নাই, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার স্পর্ধা নাই। চাতুর্যপূর্ণ কৌশলাকীর্ণ রাজনীতির দাবা খেলার চালে বারবার মাত হইয়াও আমাদের লজ্জা নাই। আমরা কি রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করিবার যোগ্য?

কিন্তু না, হতাশ হইলে চলিবে না। আসুন, আজই আমরা সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে আমরা মনুষ্যত্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবই। মনুষ্যত্বই একমাত্র আধার যাহা আমাদের ক্ষুধার অন্ন ধারণ করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র যষ্টি যাহার উপর ভর করিয়া আমরা বাধার দুর্গম দুরারোহ পর্বত লঙ্ঘন করিব, মনুষ্যত্বই একমাত্র আলোক যাহা আমাদের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র আদর্শ যাহার জন্য মরিয়াও সুখ পাইব, মনুষ্যত্বই একমাত্র সঞ্জীবনী যাহা মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র সুধা, যাহা মৃত্যুভীতকেও রূপান্তরিত করিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরে।

এই সুধা লাভ করিবার জন্য যদি আমাদের সমুদ্রমন্থনও করিতে হয়, তাহাও আমরা করিব। আসুন, আজ আমরা বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিশাল মনুষ্যত্ব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করি—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস-মুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান গতি

ভাই মনোজ,

তোমার 'সাহিত্যের খবর'-এর জন্য বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গতি বিষয়ে কিছু লেখবার জন্য অনুরোধ করে আমাকে একটু বিব্রত করেছ। তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করা শক্ত বলেই লিখছি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা বলছি বাংলা সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা কোনও জীবিত বাঙালী সাহিত্যিকের কাছ থেকে পাওয়া শক্ত। এর কারণ সাধারণত একজন বাঙালী লেখকের লেখা আর একজন বাঙালী লেখক পড়ে না। প্রথমত, সময় পায় না, নিজের লেখা-পড়া নিয়েই তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্যদিকে মন দেবার অবসর পায় না সে। দ্বিতীয় কারণ, লেখকরা আজকাল নানা দলে বিভক্ত হয়েছে। এক দলের লেখা অন্য দলের লেখকদের আসরে অপাংক্তেয়। তৃতীয় আর একটা কারণ—অনেক লেখক সাহিত্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে আছেন আজকাল। তাঁরা নিজের নিজের ব্যবসায়ের সুবিধা অনুসারে বইয়ের বা লেখকের বিচার করেন। সুতরাং লেখকদের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে সত্য নির্দেশ পাওয়ার আশা দুরাশা বলেই মনে হয়।

ইংরেজী সাহিত্যে একদল লেখক আছেন যাঁরা কেবল বইয়ের সমালোচনা করেন, তাঁদের সমালোচনা উচ্চ কোটির সাহিত্যমর্যাদাও লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এ রকম সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেনি এখনও। আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা-সাহিত্য এখনও একদেশদর্শী এবং পক্ষপাতদুষ্ট। পাঠকদের মধ্যে অবশ্য অনেক রসিক বিদ্বান সমঝদার লোক আছেন, তাঁদের আলোচনা অনেক সময়েই প্রকৃত সমালোচনা হয়, কিন্তু তাঁরা লেখেন না। তাঁদের যদি তোমার আসরে টেনে আনতে পার তাহলে বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক সত্য খবর পাবে।

যাই হোক এ বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তা অকপটে বলছি। একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্য-

আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় নি। এঁদের পরও সৃষ্টিধর্মী কথা-সাহিত্যে গৌরব করবার মতো রচনাসমারোহ দেখা যাচ্ছে। অতি-আধুনিক গল্প-উপন্যাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একদল লেখক-লেখিকা এদেশের আদর্শের বৈশিষ্ট্যকেই মহিমান্বিত করেছেন তাঁদের লেখায়। আমাদের যে চরিত্র আমাদের প্রেমে আত্মত্যাগে ক্ষমায় বীরত্বে, আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের হাটে-মেলায় নাচে-গানে পটে-পুতুলে মন্দিরে-মসজিদে পূজায়-উৎসবে আজও সজীব হয়ে আছে, যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারে আমাদের জীবন আবর্তিত · এঁদের লেখায় আমরা তারই শিল্পান্বিত রূপ দেখতে পাই। দ্বিতীয় আর একদল লেখক বিদেশ-জাত হতাশাবাদকেই তাঁদের রচনার মূল সুর করেছেন। এঁরা কোন কিছুতেই আস্থাবান নন, কোথাও কিছু ভালো এঁরা দেখতে পান না। এঁদের চোখে সত্য-শিব-সুন্দর ধরা দেননি, এঁরা সর্বত্র অসত্য অশিব এবং অসুন্দরের লীলা দেখছেন। এঁদের মধ্যেও বেশ শক্তিশালী লেখক আছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁদের লেখা শাশ্বত সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবে কিনা তা বলবার সময় এখনও আসে নি।

তৃতীয় আর একদল লেখক রচনার মাল-মশলা সংগ্রহ করছেন প্রধানত রাজনীতি থেকে। কমিউনিজম্ বা কংগ্রেস, গান্ধিজি বা বিনোবাজি এঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এঁরা প্রায়ই বেশ বিদ্বান লোক।

আর এক ধরনের লেখা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যা অনেকটা আত্মজীবনীমূলক। ডাক্তার লিখছেন নিজের ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা, উকিল লিখছেন উকিল-জীবনের। ব্যারিষ্টারের মুহুরী, কারা-রক্ষক জেলার, তান্ত্রিক সাধু, পুলিশের দারোগা—সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সরস করে লিখেছেন। অনেক কাহিনী বেশ রসোত্তীর্ণও হয়েছে। কিন্তু একটা আশঙ্কা জাগে। এঁদের অভিজ্ঞতার পুঁজি যখন ফুরিয়ে যাবে তখনও কি এঁরা লিখতে পারবেন ? আর একটা কথা। অভিজ্ঞতার সরস বর্ণনা সাময়িকভাবে মনোরোচক হয়, কিন্তু তা শাশ্বত সাহিত্যের দরবারে স্থান লাভ করতে পারে যদি তাতে 'সৃষ্টি'র ছাপ থাকে। এ ধরনের অনেক লেখাতে অবশ্য সে ছাপ আছে।

চতুর্থ আর একদল লেখক আছেন যাঁরা অশ্লীলতার কারবারী। এ বিষয়ে Peter Fontaine নামক সমালোচকের 'Secrets of an Author' বই থেকে কিছু উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। তিনি লিখেছেন—

"Do I hear you say that this amounts to advocating the prostitution of your art ? Well, may be so. But, as was said by a colleague of mine, the trouble with high-brow literature is that it is often so high-brow that it won't sell. Whereas anything low-brow, especially when lower than the navel, usually sells very well. What to do about it ? I don't know. One can't alter human nature.

In any discussion on love stories the question inevitably crops

up how far it is permissible to go, with good taste, in dealing the intimacies of sex. This is not an age of reticence……Still, even to-day, there is a limit. Some readers thought that this limit had been reached, if not over-stepped, by Kathleen Winsor in 'For Ever Amber", a story which is very largely concerned with the sex-life of a girl who, in each succeeding chapter climbs into bed with a different man. Yet the book was an unqualified suceess……"

এ বিষয়ে উক্ত বিদেশী রসিক লেখকটি 'সেল্' এবং 'আনকোয়ালিফায়েড সাকসেস' —এই কথা দুটির উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। বইয়ের বেশী কাটতিই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে একটু অশ্লীলতার মশলা দিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। ঝাল আর পেঁয়াজ দিলে অনেক বাজে তরকারিও মুখরোচক হয় তা কে না জানে। উনি যে 'For Ever Amber' বইটির উল্লেখ করেছেন সেটি পড়লে কিন্তু যৌন-জীবনের খুঁটিনাটি তত বিস্মিত করে না যত করে সে যুগের ইংলণ্ডের নিখুঁত চিত্রটি। Amber মেয়েটির প্রেম-নিষ্ঠাও মনে দাগ কাটে। বইটি সত্যই রসোত্তীর্ণ। সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধে এইটিই শেষ কথা। আধুনিক যুগের লেখকদের অশ্লীলতা গন্ধী লেখা দু-চারটে পড়েছি, খুব ভালো লাগেনি।

বাংলা সাহিত্যের আর একটা বড় দিক গড়ে উঠেছে যা উল্লেখযোগ্য। সেটি উপকরণ-সংগ্রহের দিক। অনেক সাধক ও গবেষক ইতিহাস. ব্যাকরণ, অভিধান ও পরিভাষা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়েও ভালো বই লেখা হচ্ছে। আমাদের জীবনী-সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমশ। অনেক পুরাতন প্রায়-লুপ্ত বই নতুন করে ছাপা হচ্ছে আবার। এ-সব ছাড়াও ছোট বড় রসোত্তীর্ণ নানা প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হচ্ছে আজকাল। বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদও হচ্ছে খুব, প্রবন্ধ, গল্প. উপন্যাস সব রকমই।

সাহিত্যের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ—কবিতা এবং নাটক। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য এ দুটি বিভাগেই পঙ্গু হয়ে আছে। যুদ্ধোত্তর বিদেশী কবিদের নকলে এবং রবীন্দ্র প্রভাব এড়িয়ে নূতন-কিছু করবার ঝোঁকে আধুনিক কবিতা নামে যে হেঁয়ালিগুলি রচিত হয়ে ছাপা হয় আজকাল, তা সুস্থমনা কোন রসিক চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারে না। অবশ্য দু-চারজন তরুণ কবির লেখায় সত্যিকার নূতন সুর বাজছে। তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও, তাঁরাই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভরসা, যে সব নামজাদা অতি-আধুনিক কবিরা আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন তাঁরা নন।

অনেক দিন ভালো বাংলা নাটক রচিত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত নাটক লেখবার প্রতিভা যাঁদের আছে তাঁরা বর্তমান রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান না। বিখ্যাত উপন্যাসগুলিকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে নাট্য-ব্যবসায়ীদের হয়তো দুপয়সা হচ্ছে কিন্তু নাট্যামোদীদের তৃপ্তি হচ্ছে না। নাট্য সাহিত্যের সম্পদও বাড়ছে না। এসব

বই যে রাতের পর রাত চলছে এর কারণ আমাদের দেশে একদল থিয়েটার-দেখিয়ে দর্শক অনেকদিন থেকেই আছে। তারা থিয়েটার দেখবেই, এটা তাদের নেশার মতো। ভালো মন্দ যে কোনও বই-ই তারা দেখবে।

শ্রদ্ধেয় নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশাই গত দীপালী সংখ্যা গল্প-ভারতীতে লিখেছেন যে 'আমাদের দেশে ব্যয়সাধ্য থিয়েটারের শরণাপন্ন না হয়ে যদি আমরা আমাদের স্বদেশী যাত্রাকে ভদ্রভাবে সঞ্জীবিত করতে পারি তাহলে আমাদের নাট্যসম্পদও বাড়বে, জাতীয় নাট্য-প্রতিভাও বিকশিত হবার সুযোগ পাবে।'

কথাটা ভেবে দেখবার মতো।

বাংলার অতীত ও ভবিষ্যৎ*

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। কানপুর বঙ্গসাহিত্য সমাজের উদ্যোগে যে গ্রন্থাগারের আজ হীরকজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে সে গ্রন্থাগার শতায়ু হোক, সহস্রায়ু হোক, তাহা জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিকদিগের নিকট অনাবিল আনন্দের ও জ্ঞানের আকররূপে উত্তরোত্তর আদৃত হোক, ইহাই কামনা করি। সাহিত্যরসিকগণের নিকট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার তীর্থ স্বরূপ। আপনাদের গ্রন্থাগারও আশা করি এই আদর্শের অনুরূপ।

এই গ্রন্থাগার যিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনের পূর্ণ পরিচয় আমি জানি না। যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই :—তিনি নিরহঙ্কার ও কর্মী মানুষ ছিলেন। গ্রন্থাগার স্থাপন ছাড়া কানপুরে একটি মেয়েদের কলেজ স্থাপন করিয়া তিনি এই প্রদেশের লোকের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বাঙালী অবাঙালী সকলেই তাঁহাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি কানপুরের Medical Association ও SPCA এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরও প্রতিষ্ঠাতা। ছেলেদের জন্য একটি স্কুলও তিনি স্থাপন করেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি অন্যতম।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনিও প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বাঙালী যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই সে তাহার সংস্কৃতির কিছু চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা জানেন বঙ্গদেশের সীমারেখা বারম্বার স্থান পরিবর্তন করিয়াছে,

*বঙ্গ সাহিত্য-সমাজের হীরক জয়ন্তী উৎসব—কানপুর

কিন্তু সে রেখা বঙ্গদেশবাসীকে কখনও সীমাবদ্ধ করিতে পারে নাই। বাঙালী বিজয় সিংহ লঙ্কা-বিজয়ী ছিলেন, অজন্তা চিত্রে বিজয়ের রাজ্যাভিষেক আজও অঙ্কিত হইয়া আছে। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি তিনি সে দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সিংহল-কলম্বো নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরম্ লিখিত একটি প্রবন্ধ স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বৃহৎবঙ্গ' পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরম্ লিখিতেছেন—

"The Singalese who form the vast majority of the Ceylonese are descendants of Vijay the Bengali Prince, and hence, in language specially, the Singalese has close affinity with the Bengali. Fifty percent of words of classical Singalese are identical with those of Bengali."

সংস্কৃতির বর্তিকা হস্তে লইয়া, বাংলার পণ্যদ্রব্য ও শিল্প-সম্ভার বহন করিয়া বাঙালীরা যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়াছেন। গুপ্ত ও পাল রাজত্বে বাঙালী চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। যাভা, বালী, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাঙালীদের অভিযানের চিহ্ন ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর আজও বর্তমান। কবি সত্যেন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে—

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষার ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষপাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে, বরভূধরের ভিত্তি
শ্যাম-কম্বোজে ওঙ্কারধাম মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বীট্‌পাল আর ধীমান যাদের নাম অবিনশ্বর!
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্র বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান
বিফল নহে এ বাঙালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।

পাঠান যুগে প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যা সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল।

রাজনৈতিক ইতিহাসের আবর্তে বাংলার সীমারেখা বারম্বার স্থান পরিবর্তন করিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙালী প্রতিভা সে সীমারেখাকে বারম্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া

স্বকীয় শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য কীর্তি প্রচার করিতে বিরত হয় নাই। বাঙালী কোন দিন ঘরের কোণে বসিয়া থাকে নাই। কাম্বেল সাহেব বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এসিয়াখণ্ডের মধ্যে বাঙালীরা এথিনীয় জাতির তুল্য, বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিকতায়।

ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া আজ কিন্তু সেই বাঙালী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। যে সমস্যার আজ সে সম্মুখীন তাহা জীবন-মরণ সমস্যা। সমাধান করিতে না পারিলে বাঙালী জাতি লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বাংলার অতিদূর অতীতের চিত্র যে কত উজ্জ্বল তাহা সকলেই জানেন। অনতিদূর অতীতের চিত্রও কম উজ্জ্বল নহে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রতিভার যে মিছিল দেখা গিয়াছিল তাহার তুলনা শুধু ভারতের ইতিহাসেই নহে পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। কিন্তু আজ সেই প্রতিভার সমারোহ কোথায়? তুবড়ীর মতো উর্ধ্বমুখী অগ্ন্যুৎসবে অন্ধকার আকাশ কিছুক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত করিয়া তাহা কি চিরদিনের মতো নির্বাপিত হইয়া গেল? অতবড় হর্ম্য তাসের প্রাসাদের মতো ভাঙিয়া পড়িল? নিশ্চয়ই ইহার একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। এই প্রবন্ধে সেই কারণই নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইব। আমাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা একদিনে সহসা হয় নাই। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে সহজেই বোঝা যায় যে বহু রোগের বীজ বহু পূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল, আজ যাহা দেখিতেছি তাহা সেই সকলেরই অনিবার্য ফলমাত্র। এখন আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি—আজকালকার ছেলে-মেয়েরা অপদার্থ, তাহারা লেখাপড়া করে না, উপার্জন করিতে পারে না, তাহাদের নৈতিক চরিত্র নাই, সামাজিক শিষ্টাচার নাই, বিদেশী পোশাক পরিহিত সঙের মতো তাহারা সমাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সবই সত্য, কিন্তু আমার প্রশ্ন, আমগাছে মাকাল ফল ফলিল কিরূপে? সমাজে মাকাল গাছের নিশ্চয়ই আধিক্য হইয়াছে, তাই বাজারে মাকাল ফলের এত ছড়াছড়ি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভালো ছেলেমেয়ে সমাজে এখনও অনেক আছে যাহারা এখনও আমাদের ভাগ্যের মোড় ফিরাইয়া দিতে পারে, সে বিশ্বাস না থাকিলে এ প্রবন্ধ লিখিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ভারতের সার্বভৌম স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য যে জাতি এই কিছুদিন পূর্বে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল তাহারা যে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে এ কথা বিশ্বাস করি না। তাহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তাহাদেরই উপর আমার আশা। তাহাদেরই আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে কি লিখিয়া গিয়াছেন—

"বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময় উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পাল বংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া কীর্তিত। লক্ষ্মণ সেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্তত ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল,

যাহার জয়পতাকা হিমালয় মূলে, যমুনাতটে, সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালীদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখনও ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।"

বাঙালী যে ক্ষুদ্র জাতি নহে তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, তাহা স্তূপীকৃত করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, যে জাতি এই কিছুদিন আগে ভারতে নবজাগরণের মাঙ্গলিক গাহিয়াছিল, যে জাতির মধ্যে এই কিছুদিন আগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে জাতির মধ্যে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন দাস, যতীন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো শহীদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যে জাতির পথ-প্রদর্শক মাত্র কিছুদিন আগে দেশবন্ধু এবং নেতাজী ছিলেন সে জাতির আজ এ অধঃপতন কেন? সে জাতি আজ অন্নহীন কেন, কর্মহীন কেন? চারিত্রিক মর্যাদা বিসর্জন দিয়া অতি সামান্য অনুগ্রহের জন্য লালায়িত কেন? এ নৈতিক অধঃপতন কবে শুরু হইয়াছিল? আমি ইতিহাসের গবেষক নহি, সামান্য ছাত্র মাত্র, আমার স্বল্প অধ্যয়ন হইতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি। আমার মনে হয় তন্ত্রের অপব্যবহার যখন হইতে আমাদের দেশে শুরু হইয়াছে তখন হইতেই আমাদের নৈতিক অধঃপতনের আরম্ভ। বৌদ্ধধর্ম যখন আমাদের দেশে বিনষ্ট হইয়া গেল, যখন তাহা সহজিয়া ধর্ম, বীরাচার প্রভৃতি বীভৎস অনুষ্ঠানে দেশের সাধারণ জনমনকে অভিভূত করিল, তখন হইতেই আমাদের নৈতিক অধঃপতন আরম্ভ। তখন তন্ত্রের নামে সারা দেশে প্রচলিত অতি জঘন্য ভোগ-লিপ্সার যে ঘৃণ্কারজনক বিবরণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেও লজ্জা বোধ করে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গুহ্যপূজা আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব, কাহাকেও দেখিতে দিব না, এ পূজার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সে সকল দেবমূর্ত্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ সকল মূর্ত্তির নাম উহারা বলিত 'শম্বর'। একে তো অশ্লীল মূর্ত্তি,— তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈরি — সুতরাং অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল মূর্ত্তি যখন বুদ্ধত্বের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল তখন আর অধঃপাতের বাকী রহিল কি? একজন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই সকল পুঁথি 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র'।......"

ইহার পরই মুসলমান রাজত্ব। মুসলমান রাজত্বে যে আমাদের নৈতিক অবনতি আরও নিম্নমুখী হয় ইহার অজস্র প্রমাণ আছে। বাদশাহ, নবাব, আমীর-ওমরাহগণ সকলেই প্রায় কামুক ছিলেন। তাঁহাদের আমলে বাঙালীর নৈতিক চরিত্র আরও অধঃপাতে গিয়াছিল।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"এমন সময় মূর্ত্তি ধ্বংসকারী দেখা দিলেন, চিত্রকরের তুলি ও ভাস্করের বাটালি হস্তচ্যুত হইল।... অত্যাচারীদের প্রলয়ঙ্কর চেষ্টায় ভাস্কর্য্য বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইল। লক্ষ্মণ

সেনের পরে ভাস্করের অতুলনীয় বিপণির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গত সাত শত বৎসরে একখানিও উৎকৃষ্ট শিলামূর্ত্তি এদেশে গড়া হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয়, নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভাস্কর নবীন ষোড়শ-শতাব্দীতে পাথরের দেবতা তৈরি করিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই লিঙ্গমূর্ত্তি, যাহা অত্যাচারীরা ভাঙিবে না। যে সকল দুই তিন মণ ওজনের স্বর্ণবিগ্রহের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশও কি আর স্বর্ণকার গড়িতে উৎসাহ পাইত! অত্যাচার অনেক সময় দুইভাবে চলিয়াছে—একদফা কোথায় কাহার বাড়িতে কোন সুন্দরী রমণী আছেন—তাহার সংবাদ দিবার জন্য 'সিন্ধুকী' নামক গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল এবং অপরেরা কোথায় কোন্ দেবতা নির্ম্মিত হইতেছেন বা আছেন তাহারও খবর দেওয়ার জন্য গুপ্তচর সর্ব্বত্র আনা-গোনা করিত—"

এই সব সংবাদ হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় মুসলমানদের সময় বাঙালীর নৈতিক বিনষ্টি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সব যুগে চরিত্রবান বাঙালী যে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা ব্যতিক্রম।

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন বৌদ্ধ-বঙ্গদেশকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য শূরবংশীয় কোনও রাজা—সম্ভবত আদিশূর—কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বাংলা দেশে আনাইয়াছিলেন। ইঁহারাই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক। এই কুলীনদের বংশধরেরা মুসলমানদের সময় কুলধর্ম্মের বিবিধ বন্ধনে বাঙ্গালী সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা মুসলমানদের যথেচ্ছাচারের প্রতিক্রিয়া বলিয়া মনে হয়, এবং সম্ভবত ইহা তাঁহারা সাময়িক সাবধানতার জন্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"কনোজের ব্রাহ্মণেরা যে সকল বন্ধনী দিয়া সমাজকে বাঁধিয়া ফেলিলেন তাহা আপৎকালের জন্য বিধান; তাহা সর্ব্বকালের জন্য নহে। জ্বর হইলে রোগীর ভাত বন্ধ হয়, পায়ে ঘা হইলে পক্ষীরাজ ঘোড়াকেও দৌড়াইতে দেওয়া হয় না..."

কিন্তু হায়, রাজনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর এমন হইল যে রোগী সুস্থ হইয়াও আর ভাত পাইল না, পক্ষীরাজ ঘোড়া শেষ পর্যন্ত পঙ্গু হইয়া গেল।

এই কৌলিন্য প্রথা শেষ পর্যন্ত বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির কণ্ঠরোধ করিয়াছে! ইহার উপর ছিল মগ ও বিদেশী জলদস্যুদের অত্যাচার, লুণ্ঠন ও নারীহরণ। এই সমস্তই সমবেতভাবে বাংলার নৈতিক চরিত্রকে ক্রমশ হীন হইতে হীনতর করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামক গ্রন্থে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজের শোচনীয় দুর্গতির প্রমাণসহ অনেক উদাহরণ দেখাইয়া একস্থানে লিখিয়াছেন, "ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামাজিক জীবনের এরকম অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া যায় এবং তা থেকে বোঝা যায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী সমাজের কি শোচনীয় বিকৃতি ও অবনতি ঘটেছিল, জাতিগত ও কুলগত দৃঢ়বন্ধনের জন্য। সামাজিক কুলগ্রন্থে পারিবারিক কলঙ্কের কথা থাকা উচিত নয়। সুতরাং কুলগ্রন্থে তা সত্ত্বেও যে সব কাহিনী ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে

সামাজিক জীবনে তা যে আরও ব্যাপকভাবে ঘটেছিল তা অনুমান করা যায়। কুলাচার শেষকালে স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার কুলীন সমাজে। তার সঙ্গে আর্থিক দুর্গতিও ক্রমে চরম সীমায় পৌঁছেছিল। আর্থিক সংকট যত গভীর হচ্ছিল, সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সমাজ জীবনের নিয়মই তাই এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম ইতিহাসে কখনও হয়েছে বলে জানা নেই—"

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আমাদের নৈতিক দুর্গতির সঙ্গে যে আর্থিক দুর্গতির কথা বলিয়াছেন তাহা মোগল রাজত্বের সময় ততটা হয় নাই, যতটা হইয়াছিল মোগল রাজত্বের অবসানের পর, ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে।

ঔরংজীবের রাজত্বকালে পর্যটক বার্ণিয়ের এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন বাংলা দেশের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তখন বাংলাদেশে অন্নাভাব মোটেই ছিল না, আর্থিক অবস্থাও বেশ ভালো ছিল। তখন বাংলাদেশে ধান এত প্রচুর হইত যে নিজেদের অভাব মিটাইয়া বাঙালী বণিকেরা তাহা নৌকা-যোগে ভারতের নানাস্থানে—বিশেষ করিয়া পাটনায় এবং সমুদ্রপথে ভারতের বিবিধ বন্দরে মুসলিপত্তমে ও করোমণ্ডল উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে রপ্তানী করিতেন। প্রচুর চিনি বাংলাদেশ হইতে গোলকুণ্ডা এবং কর্ণাটে যাইত। বাংলাদেশে নানা মিষ্টান্নের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যও তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। তরিতরকারী দুধ মাখন মাছ মাংস প্রচুর পাওয়া যাইত। কুড়িটা মুরগী এক টাকায় মিলিত। হাঁসও খুব শস্তা ছিল। ইহা ছাড়া তখন তুলা ও রেশমের সমৃদ্ধ ব্যবসার আড়ত ছিল বাংলাদেশে। 'বৃহৎবঙ্গ' পুস্তকে দীনেশবাবু একটা হিসাব দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে বিক্রীত হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার, ১৭৯৩ অব্দে, ১৩,৬২,১৫৪ টাকার। শেষের দিকে অঙ্ক কম হইবার কারণ ইংরেজ রাজত্ব তখন শুরু হইয়াছে। তাঁহারা অনেক কলকব্জা করিয়াও বাঙালী শিল্পীদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারেন নাই। শেষে অসাধু উপায়ে, অন্যায় আইন প্রণয়ন করিয়া, শিল্পীদের হাতের আঙুল কাটিয়া দিয়া তাঁহারা এই ব্যবসাকে বিনষ্ট করিয়া দেন।

মুসলমানদের রাজত্বকালে আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা অন্নহীন হই নাই। ইংরেজ অধিকারের প্রথম যুগে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলারা দেশের অর্থ দুই হাতে লুণ্ঠন করিয়াছে। লর্ড ক্লাইভ নিজেই লিখিয়াছেন—

"The sudden, and among many, the unwarrantable acquisition of riches had introduced luxury in every shape and in the most pernicious excess···every inferior seemed to have grasped at wealth that he might be able to assume that spirit of profusion which was now the only distinction between him and his superior."

এই লুণ্ঠনের ফলে আমরা হৃতসর্বস্ব অন্নহীন হইলাম। ইহার কিছুদিন পরেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Economic History of British India পুস্তকে ইহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও দিয়াছেন 'আনন্দমঠে'—

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলেমেয়ে স্ত্রী কে কিনে? সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর ইন্দুর বিড়াল খাইতে লাগিল।..."

এই সময় বাঙালী জাতি দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইল। পূর্বে তাহার সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছিল, এইবার সে অন্নহীন ও অর্থহীন হইল। ইংরেজ তাহাদের উপার্জনের পথও রোধ করিয়া দিল। নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থে তাহারা এমন সব আইন প্রণয়ন করিতে লাগিল যাহাতে বাঙালীদের জগদ্বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পায়। নীলকরদের অত্যাচার বাংলার চাষীদের রক্তও নীল করিয়া দিল। অন্যান্য চাষীদের চাষের উন্নতির জন্যও ইংরেজ সরকার কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের বিখ্যাত পুস্তক 'দেশের কথা'য় লেখা আছে—"কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় জলপূর্ত্তির বিস্তার। কিন্তু এই উপায়ের অবলম্বনে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ব্যয়কুণ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।" বিস্তৃত আলোচনা করিয়া উক্ত পুস্তকে তিনি ইহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

সোনার বাংলা শেষে শ্মশানে পরিণত হইল। তখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায় রহিল ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজ সরকারে চাকুরি গ্রহণ। ইংরেজ সরকারের চাকুরি মানে, হয় ইংরেজের রাজ্যবিস্তারে বা রাজ্যশাসনে সহায়তা করা, অথবা বিলাতী মালের দালালী বা মুৎসুদ্দি-গিরি করা।

বাংলা দেশের এই ভয়ঙ্কর যুগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, কেহ কেহ বলেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা পাটনায় হইয়াছিল। সেখানে আরবী ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া তিনি পরে পারস্য ভাষাও অধ্যয়ন করেন। ইসলামী শিক্ষার উপরই তাঁহার জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু শেষে তাঁহাকে ইংরেজিও শিক্ষা করিতে হইয়াছিল চাকুরির জন্য। পূর্বেই বলিয়াছি সে যুগে ইংরেজের অধীনে চাকুরি করা ছাড়া ভদ্র বাঙালীর অর্থোপার্জনের অন্য কোন উপায় ছিল না। রামমোহন রায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে ইংরাজি শিক্ষা না করিলে আমাদের বাঁচিবার পথ নাই। নবজাগ্রত ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণই কেবল উদ্দেশ্য ছিল না—সেটা মুখ্য ব্যাপারও ছিল না—মুখ্য ব্যাপার ছিল কিছু ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজ

সরকারে চাকুরি গ্রহণ করিয়া অন্নসংস্থান করা। ইংরেজি ভাষা যাহাতে এদেশে অবশ্য শিক্ষনীয় হয় সে জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় বয়স্ক ব্যক্তিদেরও ইংরেজি শিখিবার আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, ইহার অনেক করুণ ও হাস্যকর কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। তখন ইংরেজি অভিধান হইতে কয়েকটা শব্দ মুখস্থ করিলেই চাকুরি মিলিত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, বালক রামতনু ডেভিড্ হেয়ারের স্কুলে ভরতি হইবার আশায় তাঁহার পাল্কীর পিছনে মাসের পর মাস ছুটিয়াছিলেন। শুধু তিনি নয় সে যুগে অনেক ছেলেই ছুটিত। ইহার কারণ ঠিক পাশ্চাত্য-দেশ-প্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞান-আহরণের আগ্রহ নহে। ইহার আসল কারণ তখনকার দিনে ইংরেজি শেখা মানে দারিদ্র্যের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া। এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজরা এদেশে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, এক নব শূদ্র-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন যাহাদের কাজ হইল ইংরেজ সরকারে চাকুরি করা। আর এক নব বৈশ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টিও তাঁহারা করিয়াছিলেন যাঁহাদের কাজ ছিল বিলাতী মালের দালালী ও কারবার করা। এই উভয় মার্গে চলিয়া বাঙালীর আর্থিক কষ্ট ঘুচিল। ইংরেজ সরকার হিন্দু বাঙালীর উপর প্রসন্ন হইলেন। এই সময়েই বাঙালীরা ইংরেজশাসিত ভারতে সর্বত্র বড় বড় চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে বাড়-বাড়ন্ত হইয়াছিল, যাহার গল্প আমরা আজও সগর্বে করি, তাহার মূলে ছিল ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুগ্রহ। আমাদের আর্থিক দুঃখ ঘুচিল বটে, কিন্তু আমাদের নৈতিক উন্নতি হইল না, সামাজিক শালীনতাও বাড়িল না। ইহার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়, কারণ সাহিত্যই জীবনের ও সমাজের দর্পণ। ১৮৬১ সনে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার-নকশা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতর বিশেষ নাই ; মাতাল হলে কি রাজাবাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখবার লোক নেই বলেই আমরা রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। সহরে বড় মানুষ মাতালও কম নাই, স্রূদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে এখন মাতলামি করতে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভিতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙালী বড় মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'লোক রহস্য'-পুস্তকে 'বাবু' শীর্ষক ব্যঙ্গ নিবন্ধে লিখিতেছেন—

"বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফটিকপাত্র ইহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—'তামাকু' এবং 'চুরুট' নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন ;···ইহাদিগের আলোচিত

সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি 'মদন আগুন' এবং মনাগুন-রূপে পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতো ইহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন।...যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু।·· যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে এবং রাগ কেবল সদগ্রন্থের উপর নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।"

'চারিত্র পূজা' পুস্তকে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী চরিত্রের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এই :

"আমরা আরম্ভ করি কিন্তু শেষ করি না, আড়ম্বর করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি···"

রসরাজ অমৃতলালের ব্যঙ্গ-রচনায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' পুস্তকে, রজনীকান্ত সেনের ব্যঙ্গ কবিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে চিত্র আছে সেগুলি গৌরবজনক নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের অনুগ্রহে আমাদের আর্থিক দুঃখ ঘুচিয়াছিল, কিন্তু নৈতিক চরিত্র কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই। এ দেশে যে শিক্ষা ইংরেজ প্রবর্তিত করিয়াছিল তাহা অর্থকরীবিদ্যা, তাহা সেই বিদ্যা নহে যাহা বিশুদ্ধ চরিত্র-নির্মাণ করে, যাহা মনুষ্যত্বের উদ্বোধক, যাহা আত্ম-বিকাশের উপযোগী। শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Addison একস্থানে বলিয়াছেন—"What sculpture is to a block of marble education is to the human soul," এ education আমরা ইংরেজ আমলে পাই নাই। আমাদের তখন পয়সার দরকার ছিল, আমরা পয়সা রোজগার করবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহাই করিয়াছি। আমি সাধারণ লোকেদের কথা বলিতেছি। ইংরেজরা বণিক ছিলেন, অর্থই যে পরমার্থ একথা তাঁহারা নিজেও মনে করিতেন এবং আমাদেরও মনে করিতে শিখাইয়াছিলেন। পূর্বে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। 'বিদ্যা বিক্রয়ং ন করোমি'—এই ছিল অধ্যাপকদের আদর্শ। কিন্তু ইংরেজ আসার পর হইতে এ উচ্চাদর্শ রাখা আর সম্ভবপর হইল না। ইংরেজ এদেশের শিক্ষকদিগকেও বিদ্যা বিক্রেতায় পরিণত করিল। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মধ্যযুগের মানুষের কুল কৌলিন্য ও স্থাবর সম্পত্তির বদলে নবযুগের মানুষের দুটি

প্রধান অবলম্বন হল Money and intellect—বিত্ত ও বিদ্যা। বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ছিল কিন্তু বিত্ত ছিল না। বিদ্যা যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সহায় হল এবং নবযুগের সমাজে যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জোরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়াও সম্ভব হল (যা মধ্যযুগে ছিল না) তখন বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময়েও সে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হন নি। বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময় বলতে তাঁর চাকরির কথা বলছি না, ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসার কথা বলছি। তখন ব্যবসায় বুদ্ধি প্রায় প্রত্যেক কীর্ত্তিমান পুরুষের মধ্যেই প্রবল ছিল। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র সকলেই ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে বাণিজ্য বুদ্ধি ও বিদ্যাবুদ্ধির এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল।"

ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সমন্বয়ে ক্রমবিকাশ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা ভয়ঙ্কর। গুরু-শিষ্যের সঙ্গে আজ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক, শিক্ষক এখন ছাত্রের হস্তে লাঞ্ছিত হন, ঘুষ লইয়া বা মারের ভয়ে তাহাকে পরীক্ষায় পাশ করাইয়া দেন, ছাত্রদের হুমকিতে মন্ত্রীরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত, কারণ তাহাদের হাতেই ভোট।

অর্থকরী বিদ্যার প্রবর্তন সত্ত্বেও কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে নবজাগরণ আসিয়াছিল। তাহার প্রথম কারণ নবজাগরণের নেতারা পূর্বপ্রচলিত স্বদেশী সনাতন শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের মেরুদণ্ড ঋজু, চরিত্র বলিষ্ঠ এবং কল্পনা বহুমুখী ছিল। দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। তৃতীয় কারণ, যে রেনেশাঁসের জাগরণমন্ত্রে ইয়োরোপের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল সেই রেনেশাঁসের উজ্জীবনী সুর আমরাও শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাহার রেশ আজও আমাদের কানে লাগিয়া আছে।

এই রেনেশাঁসের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। সমস্ত বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া প্রতিটি ব্যক্তি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। দ্বিতীয়, ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে পারিবারিক বন্ধন এবং সামাজিক কুসংস্কার-শৃঙ্খল ছেদন করিতে হইবে। তৃতীয়, দেশের অতীত ইতিহাসের মধ্যে জীবনের আদর্শ সন্ধান করিয়া নব যুগের আলোকে সেগুলির মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে।

ইহাতে যে সুফল ফলিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের সময় বাঙালীদের বর্তমান দুর্গতির বীজও উপ্ত হইয়াছিল। রেনেশাঁসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সর্বপ্রকার কর্তৃত্বকে অমান্য করিবার মনোভাব রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো লোকের ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করিলেও সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা হিতকর হয় নাই। আমাদের সমাজ-জীবনে ইহা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমাদের নৈতিক অধঃপতন পূর্বেই হইয়াছিল, এই রেনেশাঁসের ধুয়ায় আমাদের ছেলেরা আরও উৎসন্নে যাইতে লাগিল। হিন্দু বাঙালী ছাত্রেরা পার্কে বসিয়া মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে, ধর্মত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইতেছে, সংযমহীন যৌন ব্যাপারে জঘন্যভাবে লিপ্ত হইতেছে, ইহা তখন দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল।

আমাদের দুর্নীতির আগুন এই রেনেশাঁসের হাওয়ায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা বাহিরে সাহেব হইলাম বটে, কিন্তু ভিতরে পশু হইয়া গেলাম।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা-কল্পে আমাদের নেতাগণ নানারূপ শৃঙ্খল ছেদন করিতেছিলেন। এই শৃঙ্খল ছেদন ব্যাপারটা যতদিন সামাজিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল ততদিন ইংরেজ সরকার আমাদের সহায়ক ছিলেন। সমাজ সংস্কারের অনুকূলে নানারূপ আইন প্রণয়ন করিয়া আমাদের সহায়তাও করিতেছিলেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসল শৃঙ্খলটি যেই আবিষ্কৃত হইল এবং বাঙালী যখম সেই দুশ্ছেদ্য পরাধীনতা-শৃঙ্খল-ছেদনে কৃতসংকল্প হইলেন তখনই গোল বাধিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ বাঙালীদের প্রতি বিরূপ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-দলনের আয়োজন শুরু হইল। অর্থাৎ বাঙালী নেতাগণ তাহাই করিতে লাগিলেন, যাহা, শুনিয়াছি কবি কালিদাস নাকি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যে ডালে বসিয়াছিলেন সেই ডালটার মূলেই তিনি নাকি কুড়ুল চালাইতেছিলেন। ইংরজদের যে অনুগ্রহ-নৌকায় আরোহণ করিয়া বাঙালীরা তাঁহাদের দারিদ্র্য-সাগর পার হইতেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া তাঁহারা সেই নৌকাটার তলদেশেই বড বড় কয়েকটা ফুটা করিয়া দিলেন। ফলে, ভরাডুবি হইল। এই প্রসঙ্গে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে আমি একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা হইতেই খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"ইংরেজি শিক্ষার আলোকে কতকগুলি হিন্দু বাঙালী আত্মআবিষ্কার করেছিলেন সেদিন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে ইংরেজ-রাজত্বের মহিমাছত্রের তলে তাঁদের যে সুবিধাই থাকুক না কেন, তাঁরা আসলে পরাধীন। স্বর্ণ-পিঞ্জরে বন্দী বিহঙ্গের সুখের মতোই তাঁদের সে সুখ অলীক। প্রকৃত সুখের ভিত্তি স্বাধীনতা। একার স্বাধীনতা নয়, সকলের স্বাধীনতা। কেবল হিন্দু বাঙালীর স্বাধীনতা নয়, নিখিল ভারতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তাঁরা যা করেছিলেন তাই আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস। বলা বাহুল্য, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয়। এখনও যেমন অধিকাংশ লোক সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করাটাই পরমার্থ মনে করেন, কোনরকম হাঙ্গাম হুজ্জৎ, গোলমাল-আন্দোলন, যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করেন না, তখনও তেমনি ছিল। ছেলেরা বোমার দলে যোগ দিক এ কেউ চাইত না। কিন্তু না চাইলেও ছেলেরা বোমার দলে যোগ দিয়েছিল, বাংলাদেশের উজ্জ্বল রত্নরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই সংগ্রামে, বরণ করেছিল জেল, ফাঁসী, দ্বীপান্তর, নির্যাতন। স্বাধীনতাকামী হিন্দুবাঙালীর আদর্শ মাতিয়ে তুলেছিল সেদিন সারা ভারতের নব যৌবনকে। ইংরেজরা দেখলেন তাঁদের শিল তাঁদের নোড়া নিয়ে আমরা তাঁদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙতে উদ্যত হয়েছি। একি সহ্য করা যায়? আইনের পর আইন, অত্যাচারের পর অত্যাচার করে' তাঁরা আমাদের প্রতিরোধ করবার যে চেষ্টা করছিলেন তার কাহিনী আজ সুবিদিত। তারপর থেকেই শোনা যেতে লাগল বঙ্গভঙ্গের কথা, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা, কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের নোংরামি। তখন থেকেই তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে

প্রদেশে যে সব বৃক্ষের বীজ বপন করে' গেছেন তা যে বিষবৃক্ষ তার প্রমাণ আমরা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি। হিন্দু বাঙালীর বিরুদ্ধে মুসলমানকে, বিহারীকে, আসামীকে, ওড়িয়াকে বস্তুত ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করার মন্ত্র ইংরেজই সৃষ্টি করেছেন প্রতিশোধ কামনায়। আদর্শবাদী হিন্দু বাঙালীর মেরুদণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করে' দিতে চেয়েছেন তাঁরা, কারণ এই হিন্দু বাঙালীই প্রথমে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনায়—"

আমরা স্বাধীনতা নামধেয় একটা কিছু পাইয়াছি বটে। কিন্তু যে বাঙালী তাহার সর্বস্ব পণ করিয়া এই স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছে এই স্বাধীন ভারতে তাহার অবস্থা কি? এক কথায় শোচনীয়। তাহার নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সংহতি বহুপূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজের আমোলে দুই পাতা ইংরেজি পড়িয়া সে বহুদিনের উপবাসের পর দুই মুঠা খাইতে পাইতেছিল, স্বাধীনতার জন্য সেটুকু সে বিসর্জন দিয়াছে। এই স্বাধীনতা তাহার বুকের উপর খড়্গাঘাত করিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, কোটি কোটি শিরামুখ হইতে রক্ত ঝরিতেছে, দেশ ভাসিয়া গেল। ঘরে বাহিরে কোথাও তাহার স্থান নাই, সে সংখ্যালঘু বলিয়া শাসন ব্যবস্থায় তাহার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। সে খাইতে পায় না, চাকুরি পায় না, ব্যবসা করিবার সুযোগ পায় না। তাহার একদা জগদ্বিখ্যাত গৃহশিল্পকে সঞ্জীবিত করিবার সক্রিয় চেষ্টা কোথাও নাই, যাহা দেখা যায় বা শোনা যায় তাহা স্তোক মাত্র। যে একদিন সারা ভারতের উপদেষ্টা ছিল, আজ সকলে তাহাকেই উপদেশ দেয়, অনুকম্পা করে, তাহার বাসস্থান কাড়িয়া লইয়া বা বিলাইয়া দিয়া তাহাকে অরণ্যে যাইতে বলে। এমন কি তাহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভাষা ও সাহিত্যও আজ সঙ্কটাপন্ন। আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতে পারিব বলিয়াই একদা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলাম, আজ শুনিতেছি মাতৃভাষায় নয়, হিন্দীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে বাঙালীদেরও আজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ নাই, বাংলার বাহিরে তো নাইই, বাংলা দেশেও নাই। ১৫ই ফেব্রুয়ারির 'যুগান্তর' পত্রিকায় শ্রীমণীন্দ্র নাথ মোদক লিখিয়াছেন—"আমি ভারত সরকারের সেনা বিভাগের কর্ম্মচারী। আমার মত কর্ম্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশেরই জীবন অতিবাহিত হয় বাংলার বাহিরে। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা-পর্ষদের অধীন বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা দেয়া হয় হিন্দী অথবা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। বাংলা তথায় অবজ্ঞাত ও অবহেলিত। সেজন্য আমাদের সন্তানগণকে বাধ্য হইয়াই হিন্দীভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে হয়। ভাবিয়াছিলাম বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষা অবজ্ঞাত হইলেও, বাংলাদেশে বাংলাভাষা নিশ্চয়ই সম্মানিত এবং আমরা যদি কখনও বাংলাদেশে যাইতে পারি তবে আমাদের সন্তানগণ নিশ্চয়ই বাংলা শিক্ষার সুযোগ পাইবে। এই আশায় আশান্বিত হইয়া চেষ্টা করিয়া বারাকপুরে বদলী হইয়া আসি। এখানে আসিয়া দুইটি হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয় পাই···এদুটির একটিতেও বাংলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। কর্ম্মোপলক্ষে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশই দেখিবার সৌভাগ্য

হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র একটি প্রদেশই দেখিলাম, যে প্রদেশের ভাষা এরূপ অনাদৃত। সে আমার এই বাংলা মা।"

ইহার কারণ বাঙালী একদা ইংরেজি শিখিয়া রাজসরকারে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অন্নসংস্থানের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, এখন হিন্দী শিখিয়া সে তাহাই করিতে চায়। কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছে যে এই সার্বভৌম গণতন্ত্রে ভোটেরই আধিপত্য। হিন্দীভাষীদের ভোটই সর্বাধিক, মহম্মদ জিন্নাসাহেবের ভাষায়—brute majority, সুতরাং গোটা গোটা হিন্দী অভিধানগুলিকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেও অর্থাগমের ক্ষেত্রে, হে বাঙালী, তুমি কোনও সুযোগ পাইবে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ইংরেজরা যখন হইতে আমাদের উপর অপ্রসন্ন হইয়াছেন তখন হইতেই নানাবিধ আইন করিয়া তাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও অনেক ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে যে বাঙালী ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বাংলার বাহিরে বাস করেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের মর্যাদার সহিত পরিচিত নহেন। সেদিন একজন বি. এ. ক্লাসের ছেলের খবর পাইলাম, সে নাকি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং রজনী সেনের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। বঙ্কিম রবীন্দ্রের নাম অনেকে জানে বটে কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ রচনা কেহ পড়ে নাই। আজকাল প্রায়ই অনেক সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উৎসব হয়, কিন্তু সেগুলিতে যাহা হয় তাহার সহিত সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নাই, তাহা একটা 'পিক্‌নিক্' গোছের ব্যাপার, যাহার উদ্দেশ্য আত্মরতি ও আত্মপ্রচার, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন বিশেষ সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক দল নিজেদের ধার-করা মত আস্ফালন করেন, যাহা অনেকটা সেকালের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপেরই আধুনিক চলন্ত রূপ।

বঙ্গসাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য সম্ভারের পরিচয় বাঙালী ছেলে-মেয়েরা আর রাখে না। তাহাদের সাহিত্যচর্চা এখন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লালসা-ক্লিন্ন গল্প পাঠে নিবদ্ধ, তাহাদের নাট্যশিল্প-প্রীতি তৃতীয়-শ্রেণীর সিনেমাতে পরিতৃপ্ত। বাংলায় একটি দৈনিক পত্রিকা নাই যাহা পাঠ করিয়া বাঙালী আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারে। যে সব পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের যুবকদের অন্তরে শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিত, তাহারাই আজ 'যো হুকুম' পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা বাঙালীদের হিতৈষী এবং যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই অধঃপতিত জাতিকে প্রেরণা দিয়া এখনও সঞ্জীবিত করিতে পারেন তাঁহারা সরকারের অনুগ্রহলাভের আশায় গা বাঁচাইয়া চলিতেছেন। নাম করিব না, একজন আমাকে বলিয়াছিলেন—"এসব করতে গেলে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পায়, লোকে বলবে এরা অহঙ্কারী জাতি, আত্মপ্রশংসাতেই পঞ্চমুখ।" ইহার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র বহুকাল পূর্বে দিয়া গিয়াছেন—"অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি। ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলে কি হইবে, আমরা বধির।

আমরা (বাংলার বাহিরে যাঁহারা বাস করি) যাহাতে আরও বধির ও অন্ধ হইয়া পড়ি আমাদের সরকার ক্রমশঃ সে বন্দোবস্ত পাকা করিতেছেন। সম্প্রতি বিহার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা জানাইয়াছেন যে অতঃপর শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম হইবে হিন্দী। বাংলা ও উর্দুভাষীদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষালাভ বন্ধ হইবে। ইহার বিরুদ্ধে নানাস্থান হইতে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু শেষফল কি হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত বিহার বাংলার অন্তর্গত ছিল, এখনও বিহারে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে বাংলাই মুখ্য ভাষা, বিহারের বাহির হইতে সরকারি কর্মের জন্য বহু বাঙালীকে বিহারে বাস করিতে হয়, বহু উদ্বাস্তুকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিহারে বসবাস করিতে হইয়াছে, ইহাদের সকলকে মাতৃভাষা বর্জন করিয়া হিন্দীকে বরণ করিতে হইবে ইহাই আইন হইতেছে। আমাদের Consitution-এ ১৪টি ভাষাকে জাতীয় ভাষার (National language) সম্মান দেওয়া হইয়াছে, কোন বিশেষ ভাষা-ভাষী কোন প্রদেশে অধিক সংখ্যায় থাকিলে সেই ভাষায় তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে এ আশ্বাসও Constitution এ আছে। তবু হিন্দীকেই প্রাধান্য দিবার জন্য সকলে ব্যস্ত, হিন্দীকেই একমাত্র জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রচার করিতে হিন্দী-ওয়ালাদের কুণ্ঠা নাই। প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাঁহারা বলেন—আমরা নীচমনা প্রাদেশিক, আমরা হিন্দীর শত্রু, তাই আমাদের এই আচরণ। আমরা যে হিন্দীর শত্রু নহি, আমরা যে হিন্দী ভাষাকে ঘৃণা করি না, তাহার কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙালীর স্থান ও দান অকিঞ্চিৎকর নহে। বাঙালীর হিন্দী-প্রীতি যে কি পরিমাণ, কৃষ্ণনগর কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা লিখিয়া সম্প্রতি ডি. ফিল ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত সংবাদগুলি তাঁহার পুস্তক হইতেই সংগ্রহ করিয়া দিলাম—

(১) বাংলার ব্রজবুলি সাহিত্যে বাঙালীর হিন্দী-প্রীতির চিহ্ন আছে।

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র হিন্দীতে কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৩) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে 'বেতাল পচীসী' সম্পাদনা করিয়াছিলেন বাঙালী তারিণীচরণ মিত্র, ১৮০৫ সালে।

(৪) রামমোহন রায় হিন্দী গদ্যের মূল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ (বেদান্তসার, বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫) হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজি তাঁহার হিন্দী ভাষার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

(৫) হিন্দী 'বেতাল পচীসী' অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করেন।

(৬) ভারতবর্ষের ঐক্যবিধানের জন্য হিন্দীভাষার গুরুত্ব কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালী চিন্তানায়কগণ বহুপূর্বেই স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন। বিহার প্রদেশে ভূদেবচন্দ্রই হিন্দীকে আদালতী ভাষা করিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিহারে তিনি অনেকগুলি স্ট্যাণ্ডার্ড হিন্দী স্কুলেরও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামে একটি স্বর্ণ-পদক এখনও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়।

(৭) বারাণসীর বাবু তারামোহন মিত্র হিন্দী ভাষার সমর্থক এবং হিন্দী 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদের বাবু সারদা প্রসাদ সান্যালের নামও উল্লেখযোগ্য।

(৮) এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' বাঙালীর। সে প্রেস হইতে হিন্দী 'শব্দসাগর', 'রামচরিত মানস' প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দীর বিখ্যাত পত্রিকা 'সরস্বতী' এই প্রেসেরই কীর্তি। ইহার আদর্শ ছিল রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী'।

(৯) খড়ীবোলী হিন্দীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র 'জাম-ই-জাহান্‌নুমা' বাংলা দেশ হইতে হরিহর দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১০) হিন্দীর প্রথম সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্তণ্ড' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত যুগলকিশোর। হিন্দীর দ্বিতীয় পত্র বাহির হয় রাজা রামমোহনের তত্ত্বাবধানে। নাম 'বঙ্গদূত'।

(১১) কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাহির করেন হিন্দী 'বঙ্গবাসী'। পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল।

(১২) সর্বপ্রথম হিন্দী মহিলা-পত্রিকাও বাহির করেন বাঙালী। পত্রিকার নাম 'সুগৃহিণী', সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী। ইনি পাঞ্জাবের বিখ্যাত হিন্দী সমর্থক নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা।

(১৩) হিন্দী পত্রিকা 'বিশাল ভারত' 'মনোহর কঁহানীয়া' প্রভৃতি মাসিকপত্র আজও হিন্দী সাহিত্যের সেবা করিয়া চলিয়াছে। এগুলি বাঙালীরই সৃষ্টি।

(১৪) ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন জাষ্টিস সারদাচরণ মিত্র নাগরীলিপি প্রসার করিবার জন্য বহুপূর্বে বহু চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহা সব অতীতের ইতিহাস, বর্তমান অতি-আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের স্রোতও যে বাঙালী প্রতিভার প্রাণধারায় পুষ্ট হইতেছে ইহা কে না জানে?

না, হিন্দী ভাষার সহিত আমাদের কোনও শত্রুতা নাই। আদান-প্রদান দ্বারা উভয় ভাষা আরও সমৃদ্ধ হোক, ইহা সাহিত্যিক মাত্রেরই কাম্য। হিন্দী ভাষার সহিত আমাদের শত্রুতা নাই, কিন্তু হিন্দী-জবরদস্তির সহিত আছে। আমরা **British Imperialism** সহ্য করি নাই, **Hindi Imperialism**ও করিব না। ইহারই জন্য প্রয়োজন হইলে এই ভাগ্যহত জাতিকে আবার হয়তো সংগ্রাম করিতে হইবে।

আমাদের দুর্দশা এবং দুঃখ যে কি, তাহার মূল যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তাহা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার প্রতিকার কি? সকল প্রকার সফল প্রচেষ্টার প্রথম ও প্রধান মূলধন নৈতিক চরিত্র। সর্বাগ্রে নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য

আমাদের যত্নবান হইতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজে এচরিত্র নির্মিত হইবে না, সেখানে চারিত্রিক অবনতির ব্যবস্থা আছে, উন্নতির ব্যবস্থা নাই। যে সব বালক-বালিকারা সুকুমারমতি অল্প বয়স্ক তাহাদের পিতামাতাদের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের চরিত্র সুগঠিত হয়। পিতামাতারাই আদি শিক্ষক, তাঁহাদের আদর্শ এবং প্রেরণাই সন্তানের চরিত্র গঠন করে। রাজপুত রমণীগণ সন্তানদের চরিত্রে যে ভাবে আদর্শের মহিমা মুদ্রিত করিয়া দিতেন, এই কিছুদিন আগে বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী তাঁহার সন্তানকে যে ভাবে মানুষ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগের জননীদের তাহাই করিতে হইবে। তাঁহারা এই মহাব্রত যদি নিষ্ঠাভরে পালন করিতে পারেন তবেই এই হতভাগ্য জাতির উদ্ধারের আশা আছে।

যে সব ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক, যাহারা পিতামাতার আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে তাহাদের ভার লইতে হইবে সমাজের আদর্শবাদী সচ্চরিত্র শিক্ষকদের। অবসরপ্রাপ্ত আদর্শবাদী শিক্ষক আমাদের সমাজে এখনও অনেক আছেন, তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজ নাই, তাঁহারা যদি সঙ্গ দান করিয়া, শিক্ষা দিয়া প্রত্যেকে অন্তত দুইটি যুবককেও সত্যপথে চালিত করিতে পারেন তাহা হইলে আর ভাবনা কি? দেশকে বা জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে খুব বেশী সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র একশত আদর্শবাদী বিশুদ্ধচরিত্র যুবক চাহিয়াছিলেন দেশ উদ্ধারের জন্য। আদর্শের অগ্নি যদি স্বল্প সংখ্যক যুবকের হৃদয়েও তাঁহারা জ্বালাইয়া দিতে পারেন, সমস্ত দেশ আলোকিত হইয়া যাইবে। বিশুদ্ধ-চরিত্র যুবক-যুবতীই দেশের দুঃখ দূর করিতে পারে, তাহারা আমাদের মধ্যেই আছে, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তখন নেতারা বুঝিয়াছিলেন যে যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীরা যদি শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী না হয় তাহা হইলে কোন আন্দোলনই সফল হইবে না। তাই প্রথমে তাঁহারা 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ৺সতীশ চন্দ্র বসু। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শরীরে ও মনে বাঙালীকে শক্তিশালী করা। এই সমিতিতে শারীরিক উন্নতির জন্য ডন বৈঠক কুস্তি হইত। লাঠিখেলা শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ছোরা খেলা, তরবারি শিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ, জুজুৎসু প্রভৃতিও শেখানো হইত। নৌকা পরিচালনা, অশ্বারোহণ প্রভৃতির আয়োজন ছিল। সামাজিক কায়দায় ড্রিল ও 'মক্ ফাইট্' (mock fight) হইত। তরবারিতে মার্ত্তাজা সাহেবের পদ্ধতি, বড় লাঠিতে অতুল ঘোষ, ছোট লাঠি ছোরা তলোয়ারে যদুবাবু, মুষ্টি যুদ্ধে নগেন দত্ত, সুরদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। জাপানী ওস্তাদ 'গিঝিন' জাপানী তলোয়ার খেলা শিখাইত। পরে পুলিন দাসও আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদারের লিখিত একটি পুস্তিকা হইতে আমি উক্ত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি লিখিতেছেন—"মানসিক উন্নতির জন্যও নানারূপ আয়োজন ছিল। বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে সকলকেই উৎসাহিত করা হইত। বিশেষ

করিয়া বীরপুরুষদের জীবন চরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার কাহিনী, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, গ্যারিবল্‌ডির জীবন, নিহিলিষ্ট রহস্য প্রভৃতি পাঠ্য ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের কথা ও জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা হইত। ইহার জন্য সখারাম গণেশ দেউস্কর বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি রবিবার রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী গীতা পাঠ করিয়া তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাবিধ উপদেশ ও সাধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিতভাবে স্বদেশ বন্দনা ও সঙ্গীত হইত। সত্যচরণ শাস্ত্রী, স্বামী সারদানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং আরও অনেক জ্ঞানী চরিত্রবান পুরুষ নিয়মিতভাবে সমিতিতে যোগদান করিয়া সমিতির সভ্যদের উপদেশ দিতেন।

আমাদের আবার এইরূপ অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে সখারাম গণেশ দেউস্করকে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে, স্বামী সারদানন্দকে, সত্যচরণ শাস্ত্রীকে। ভিন্ন নামে তাঁহারা আমাদের মধ্যে এখনও আছেন। এই কিছুদিন পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রশ্ন দেশবাসীকে করিয়াছিলেন সেই প্রশ্ন আবার আমাদের যুবক-যুবতীদের শুনাইতে হইবে, প্রকৃত উত্তরের জন্য তাহাদের প্রস্তুতও করিতে হইবে। স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"হে ভাবী স্বদেশ হিতৈষিগণ, তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। উপায় স্থির করিয়াছ কি? তোমরা কি পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে—ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।"

স্বামীজির এই উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে হইবে তবেই আমাদের দুর্গতি ঘুচিবে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্‌টাইলে দেখা যায়, বাঙালীরা শিল্পী এবং সেইজন্যই তাহারা বিদ্রোহী। বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে আছে বাঙালী প্রতিভা। এই সেদিনও সে দলে দলে জেলে গিয়াছে, ফাঁসী গিয়াছে, নির্বাসন নির্যাতন বরণ করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে আবার তাহাকে বিদ্রোহ করিতে হইবে। এখন আমরা স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীন রাষ্ট্রেও যে সব অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, পক্ষপাত, চৌর্য্য-বৃত্তির নমুনা দেখিতে পাইতেছি, তাহা যদি সীমা ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে বিদ্রোহই অনিবার্য পরিণাম। বাঙালী সংখ্য-লঘু বলিয়া দেশের শাসন ব্যবস্থায় তাহার কোন হাত নাই। কিন্তু সংখ্যাধিক্যই সব সময় জয়লাভ করে না, গুণাধিক্য থাকিলে একটি কৃতী পুরুষই অসংখ্য সামান্য ব্যক্তিকে নিষ্প্রভ করিয়া দেদীপ্যমান হইতে পারেন। অসংখ্য নক্ষত্র যে অন্ধকার দূর করিতে পারে না, একটি চন্দ্রই তাহা পারে। সারা দেশ জুড়িয়া আজ যে অনাচার, অবিচার, অত্যাচারের তাণ্ডব চলিয়াছে বাঙালী যুবক-যুবতীরা

তাহাদের প্রতিরোধ-কল্পে যদি প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন তাহা হইলে রাজনীতিক্ষেত্রেও উজ্জ্বল মহিমায় আবার তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আমি আশাবাদী, যাহারা বর্তমান যুগের উপর বীতরাগ, যাহারা ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাহীন, আমি তাঁহাদের দলে নহি।

বাংলা সাহিত্য

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। বঙ্গভারতীর সামান্য সেবক আমি, সুদূর প্রবাসে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে আমাকে আহ্বান করিয়া আপনারা যে সৌজন্য ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বহুদিন পূর্বে, ব্রিটিশ আমলে, ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীরা আমাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নানা কারণে তখন আসা সম্ভবপর হয় নাই। আজ আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিয়াছি বলিয়া সত্যই আমি আনন্দিত।

কিছুদিন পূর্বেই বঙ্গ-সাহিত্যসংসার হইতে কয়েকজন কৃতী সাধকের তিরোধান ঘটিয়াছে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবি জীবনানন্দ দাশ এবং ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নাই। সর্বাগ্রে ইঁহাদের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে কবি এবং সাহিত্যিকের আবির্ভাব কবে ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই। যখনই ঘটিয়া থাকুক, তাঁহারাই যে মানব-সভ্যতার সম্ভাবনা সূচিত করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে ইতিহাসের নির্দেশ আজ সুস্পষ্ট। কবিভাবাপন্ন মানব-শিল্পীদের কিছু কিছু ইতিহাস গুহাগাত্রে চিত্ররূপে আজও উৎকীর্ণ আছে। প্রস্তরযুগের সেই সব গুহাচিত্রগুলি হইতে আমরা তাহাদের জীবনযাত্রার, তাহাদের জীবনদর্শনের কিছু কিছু আভাস আজও পাই। প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা বন্য পশু শিকার করিত কেবল এই খবরটুকুই আমরা পাই না। তাহাদের মৃতদেহ সৎকারের প্রথা হইতে জানিতে পারি যে, মৃত্যুকে তাহারা জীবনের অবসান বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাহারা মৃত্যুকে দীর্ঘ রহস্যাবৃত নবজীবনের আরম্ভমাত্র মনে করিত। তাই তাহারা ভূ-প্রোথিত শবের সহিত খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার দিত, তাহাকে বিবিধ বর্ণসম্ভারে সজ্জিত করিত। সেই সুদূর অতীতের বর্ণবৈচিত্র্য, সুদূর অতীতের সেই শিল্পীদের কীর্তি গুহাগাত্রে আজও অম্লান হইয়া আছে। মনে হয় পরবর্তী যুগের আর্যঋষিরা যে আশ্বাসভরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'তমসো মা জ্যোতির্গময়:', কবি গ্যয়েটে যে বিশ্বাসভরে বলিয়াছিলেন—'Life is but the childhood of

Immortality—(আমাদের ইহজীবন অনন্তজীবনের শৈশবমাত্র)'—সুদূর অতীতের সেই আদিম মানবদের মনেও হয়তো সেই একই আশ্বাস-বিশ্বাস অঙ্কুরিত হইয়াছিল। গুহাগাত্রে খোদিত এই সব চিত্রই পরবর্তী যুগে চিত্রাক্ষর সৃষ্টি করিয়াছে। প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ এই চিত্রাক্ষরের সাহায্যেই আমরা মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাস আজ জানিতে পারিয়াছি। মিশর, উর, ব্যাবিলন, চীন এবং আরও অনেক দেশের ইতিহাস এই চিত্রাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পায় যে সব চিত্রাক্ষর পাওয়া গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই, হইলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক লুপ্ত তথ্য আমরা জানিতে পারিব।

মানবজাতির ইতিহাসে কতবার কত দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে, হিমানীপ্রবাহে, বন্যায়, ঝঞ্ঝাবাতে, দাবানলে প্রাচীন মানবসমাজ বারম্বার বিড়ম্বিত হইয়াছে, পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কত রাজ্য কত জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তাহাদের সহিত আমাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় নাই; তাহার কারণ তাহাদের শিল্পীরা একদা পর্বতগাত্রে ছবি আঁকিয়াছিল, যে ছবি কালক্রমে বিবিধ বর্ণমালায় রূপায়িত হইয়াছে। এই বর্ণমালার মৃত্যু নাই, তাই বোধ হয় আমাদের দেশের জ্ঞানীরা ইহাকে 'অক্ষর' অর্থাৎ ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অক্ষরেই মানবসভ্যতার ইতিহাস বিধৃত হইয়া আছে। মুণ্ডক উপনিষদের ঋষি এই অক্ষর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অণু হ'তে অণুতর যিনি দীপ্তিমান
সর্বলোক, লোকবাসী যাঁর মাঝে লীন,
যিনি মৃত্যুহীন,
যিনি বাক্য, যিনি মন-প্রাণ,
তাঁরেই অক্ষর বলি জান বারে বারে
তিনি সত্য, তিনি লক্ষ্য, ওহে সৌম্য ভেদ কর তাঁরে।

এই অক্ষরকে এবং এই অক্ষরের বাণী-মূর্তি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া এইবার আমার বক্তব্য নিবেদন করি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথা বলিবার আগে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারি কথা বলা বাঞ্ছনীয়, কারণ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকার জন্যই তাহা প্রয়োজন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। প্রাচীনতম বাংলার নমুনা আমরা পাই কয়েকটি শিলা ও ধাতু-লেখে; বাঙালী পণ্ডিত সর্বানন্দকৃত অমরকোষের টীকায় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত বৌদ্ধগান ও দোহায়। ইহার পরই আমরা পাই চণ্ডীদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের উল্লেখ। এগুলি চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। শিখদের আদিগ্রন্থের দুইটি পদ অনেকে জয়দেব কর্তৃক প্রাচীন বাংলায় রচিত বলিয়া মনে করেন। অনেকের ইহাও বিশ্বাস যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ

প্রথমে প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল, পরে তাহা সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়। কবি জয়দেব ছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক।

১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

এই নয় শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু বাংলা গদ্যের স্থান নাই।

বাংলা সাহিত্যের শৈশবে, অর্থাৎ সাহিত্য যখন কেবল কবিতাতেই নিবদ্ধ ছিল তখন সে সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ছিল প্রধানত দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন। ঐতিহাসিকের বিচারে বাংলা ভাষার জন্ম দশম শতাব্দীতে হইলেও, উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্যের সন্ধান আমরা পাই পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে তুর্কিরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে এবং সেইজন্যই সম্ভবত বাঙালীর সাহিত্যসাধনা বহুকাল ব্যাহত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালী-প্রতিভা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই শতকে যে সব কবির দেখা আমরা পাই, তাঁহাদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রভাবিত। এই যুগের কবি রামায়ণকার কৃত্তিবাস ওঝা এবং পদরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার কবি চণ্ডীদাস। এই যুগের অন্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা মালাধর বসু। এই কালেই মিথিলায় মহাকবি বিদ্যাপতির অভ্যুদয়। পরবর্তী কালে কবিশেখর, কবিবল্লভ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির প্রতিভায় প্রভাবিত হইয়া অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি নামে হোসেন শাহের জনৈক কর্মচারীও অনেক পদ রচনা করিয়া দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আদি মনসামঙ্গল পাঁচালিও এই সময় রচিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব তদানীন্তন বঙ্গসমাজের যে রাজনৈতিক ও পারমার্থিক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল তাহার বিবরণ সুধী-সমাজে অবিদিত নাই। তাঁহার প্রতিভা-দীপ্তি শুধু বঙ্গে নয়, বঙ্গের বাহিরেও দিব্যজ্যোতি বিকিরণ করিয়াছিল, আজও করিতেছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কটুকু কেবল সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যদেব' পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেন —"নব বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতের প্রাক্কালে পিক-পক্ষীর অস্পষ্ট কাকলীর ন্যায় মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর ঝঙ্কারে শ্রীজয়দেব, শ্রীগুণরাজ খান প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য সাহিত্যিকগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনী-গীতি গান করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।" গুণরাজ খান মালাধর বসুর উপাধি। এই সঙ্গে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামও তিনি করিতে পারিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। কবিরাই মহাপুরুষদের এবং মহাবিপ্লবের ক্ষেত্রে সর্বদেশে প্রস্তুত

করিয়াছেন, বাংলাদেশেও তাহার অন্যথা হয় নাই। এই শতাব্দীতে আর একটি নূতন ধরনের সাহিত্য-কীর্তির প্রবর্তন বাংলা সাহিত্যে হয়,—সমসাময়িক মনুষ্যের চরিত্র ও মহিমা লইয়া কাব্য-রচনা। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া অনেক বিখ্যাত পুস্তক সে সময়ে রচিত হইয়াছিল। মুরারী গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, পরমানন্দ গুপ্ত, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের বহুল প্রচার এবং কাব্যে-গানে ব্রজবুলির প্রচলনও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সময় হইতে বৈষ্ণব কবিতা বাংলা সাহিত্যের কাব্যে প্রাণসঞ্চার করিল। এই শতাব্দীর আর একটি স্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। মাণিক দত্ত, মাধব আচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ সকলেই চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন; মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, ইনি প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অন্যতম। মুকুন্দরাম কবিতায় নিজের আত্মকাহিনীও লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান-মোগলের সংঘর্ষে বাংলাদেশে তখন ঘোর অরাজকতা চলিতেছে। এই অরাজকতার বিশদ মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই কবিকঙ্কণের আত্মকাহিনীতে। অত্যাচারের ফলে মুকুন্দরামকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছিল, তিনিও একদিন 'রেফিউজি' হইয়াছিলেন—এসবের বিস্তারিত বাস্তবানুগ চিত্র তাঁহার কাব্যে তিনি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যেই আমরা প্রথম বাস্তবধর্মী অর্থাৎ realistic রচনার আস্বাদ পাই। পরে এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেকে নকল করিয়াছেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যও ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শাসনকর্তা মুসলমানেরা সে সময় কবিদের উৎসাহ দিতেন। লস্কর পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাণ্ডববিজয় কাব্য লেখেন, পরাগলের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। কোচবিহারের রাজারাও মহাভারতের পর্বগুলিকে পাঁচালি রূপ দেওয়াইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্ব শুরু হইয়াছে। বাঙালী কবিদের কল্পনা কিন্তু এই গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তনে তেমন বিচলিত হয় নাই। তাঁহাদের কল্পনা তখনও বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ভাবরসে আবিষ্ট। বৈষ্ণবপদাবলী, বৈষ্ণবজীবনী এবং কৃষ্ণলীলাই তখন বাঙালী কবিদের প্রধান প্রেরণা এবং বাংলা কাব্যের প্রধান অবলম্বন। এই সময় শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি বহু পদকর্তার নাম পাওয়া যায়; আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির ভয়ে তাঁহাদের নামের তালিকা আর দিলাম না। এই শতাব্দীর আর একটি কবির নাম কিন্তু না করিলে চলিবে না, তিনি মহাভারতকার কাশীরাম দাস। তাঁহার আসল পদবী দেব, জাতিতে তিনি কায়স্থ ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন তিনি মহাভারতের চারিটি পর্ব—আদি, সভা, বন ও বিরাট পাঁচালি-রূপে লিখিয়াছিলেন; পরবর্তী পর্বগুলি পরে অন্য কেহ লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষকরা বলেন, মহাভারতটাই কাশীরাম দাসের রচনা। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ লইয়াও দুই-একখানি

কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উত্তরবঙ্গে সমাদৃত অদ্ভুতাচার্যের কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম নিত্যানন্দ।

দেবী মনসা, চণ্ডী এবং শিবঠাকুর তখনও বাঙালী কবিদের কল্পনার খোরাক জোগাইতেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মনসামঙ্গল, দেবীমঙ্গল এবং শিবায়ন কাব্য রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই স্বপ্নাদেশে রচিত বলিয়া কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। মুকুন্দ-রামের অনুকরণে ইনিও আত্মপরিচয় ও তাৎকালিক অরাজকতার বর্ণনা করিয়াছেন। সে সময়ে রাঢ়দেশীয় কাব্যরচয়িতারা অনেকেই এই বিশেষ রীতির অনুকরণ করিতেন। রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানি তখন এই মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতর দিয়াও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই সব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটু নূতন ধরনের স্বাদ মেলে কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যে। ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায় এই কাব্যের নায়ক। কুম্ভীর-দেবতা কালুরায়ের কাহিনী এবং পীর বড়খাঁ গাজীর কাহিনীও ইহাতে আছে। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের পূজা করার রীতি পৃথিবীর আদিম মানবসমাজে সর্বত্র আছে। আমাদের রামায়ণের হনুমান জাম্বুবানও পূজনীয় দেবতা। কিন্তু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরকে কাব্যে স্থান আর কেহ বোধ হয় দেন নাই। সেই হিসাবে এই মঙ্গলকাব্যটি নূতনত্বের দাবী রাখে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ভাবধারার প্রধান উৎস বৈষ্ণব গীতি-কাব্য ; বৈষ্ণব ভাবধারার উচ্ছলিত প্রেম-তরঙ্গে তখন বাঙালীর চিত্ত অবগাহন করিতেছে। যে বিদেশী মুসলমানগণ শাসকরূপে বাংলায় আসিয়াছিলেন তাঁহারাও কালক্রমে বাঙালী হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বৈষ্ণবীয় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই সময় কয়েকজন মুসলমান পদকর্তার নাম পাওয়া যায়—নসীর মামুদ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা, আলিরাজা এবং আলাওল। আরাকানের রাজসভাতেও এই সময় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা দৌলত কাজি ও আলাওলের নাম পাই। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় তাঁহার 'কবি দৌলৎ কাজির সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাননী' নামক পুস্তকে বলিতেছেন, "বঙ্গসাহিত্যে এই যে একটানা নিছক ধর্মের সুর এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলাইয়া নূতন ধরনে অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সম্মান মুসলমান কবিদেরই প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মুসলমান কবিরা শুধু যে নিছক ধর্মাত্মক কাব্য-রচনার ধারা পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, ফার্সি ও প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্য হইতে অজ্ঞাত অভিনব কাহিনীসমূহ আনিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি করিলেন।" অধ্যাপক মহাশয় যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার উক্তির যথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে যাহাদের সহিত আমাদের এত বিরোধ, সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে তাহারা আমাদের কত আপন। এই সেদিনও পূর্ব-পাকিস্তানে

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসলমান ছেলেমেয়েরা পুলিসের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যকর্মের ইতিহাস শেষ করিবার পূর্বে ধর্ম-ঠাকুরের ছড়া ও ধর্মপুরাণ-কাহিনীর কথা উল্লেখ করা উচিত। অনেকের মতে ধর্ম-ঠাকুরের নামে বুদ্ধপূজাই বাংলা দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই আদিদেব ধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া কিছু মঙ্গলকাব্যও লেখা হইয়াছিল। এগুলি প্রকৃতই কাব্য এবং এগুলিতে সেকালের রাঢ়ভূমির যে চিত্র অঙ্কিত আছে, লাউসেনের বীরত্বে ও অভিযানগুলিতে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তখনকার বাঙালী-মনের ও বাঙালী-সংস্কৃতির পরিচায়ক। অধ্যাপক সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের জন্ম। ছন্দোবদ্ধ কবিতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্য এবার প্রশস্ততর সৃষ্টির ক্ষেত্র আবিষ্কার করিল। কিন্তু সে সৃষ্টির মহিমা বিকশিত হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পূর্বের মত পদাবলী-সংগ্রহ, রামায়ণ ও মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ কাব্য রচনা, কিছু কিছু মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন ও সত্যনারায়ণের পাঁচালি প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের পূর্বানুবৃত্তি চলিতেছিল, কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব—এ যুগে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সাহিত্যরসিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন, "এ দেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বে বাংলা দেশ ব'লে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হ'ত এই সত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। কেন না ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাগুরুদের মতে বাঙালী জাতির জন্মতারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ···"

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা শক্তিসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে পাইয়াছি। ইনিও একখানি কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীতগুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শৈব সিদ্ধাদিগের কিছু গাথাও বিরচিত হইয়াছিল। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা এই চারিজন সিদ্ধার মাহাত্ম্যকীর্তনই সে সব গাথা ও কাহিনীর উদ্দেশ্য।

ইহার পরই ইংরেজের আগমন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই বাংলা গদ্যের জন্ম। এই সম্পর্কে শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা অবস্থা হইতে তাঁহাদের (অর্থাৎ তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের) সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালীজাতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে একজনমাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর

শেষ দশকে পাই, তিনি ইঁহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত; ইঁহাদের উৎসাহে ও অন্নে প্রতিপালিত; স্বাধীনভাবে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইঁহার কোন কীর্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু।..."

খৃষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পর্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর, কারণ এই বৎসর হুগলী শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে প্রথম বাংলা মুদ্রণ আরম্ভ হয়। বাংলা হরফ প্রথমে স্বহস্তে প্রস্তুত করেন উইলকিন্স সাহেব। পঞ্চানন কর্মকার পরে তাঁহার নিকট ইহা শিক্ষা করে।

উক্ত গ্রন্থে সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার একুশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেইগুলিই গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদের জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোন মৌলিক রচনা এইকালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, তথাপি এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লেখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্বপ্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে যে ছয়জন বৈদেশিক কর্মী বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়ন করিয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের "দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ অভিধানের খন্তা কোদাল চালাইয়া" একটা পথ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—নাথালিয়ান ব্রাসি হালহেড, জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমনস্টোন, হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার, এ. আপজন এবং জন মিলার। সর্বশেষ - উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বজনবিদিত।

ইঁহাদের নিকট আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু এ কথাও ইতিহাসে সুবিদিত যে তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যই এতটা পরিশ্রম করেন নাই, করিয়াছিলেন নিজেদের প্রয়োজনে, বিলাত হইতে আগত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা শিখাইবার জন্য। বাংলা ভাষায় বাইবেল-ধর্ম প্রচার করিবার তাগিদও বড় কম ছিল না। তবুও একথা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিতই স্বীকার করিব যে, বাংলা গদ্যের সেই প্রথম যুগে ওয়ারেন হেস্টিংসের মত লোকের দৃষ্টিও ভারতীয় সাহিত্য-সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় আইন-গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রিত হইবার পর চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। শুদ্ধ এবং কথ্য গদ্যের সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গী তাঁহার রচনাতেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই।

কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় বহু বাংলা পাঠ্য-পুস্তক রচিত হয়। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সম্ভ্রান্ত যে সব বাঙালী ইহাতে যোগ দিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। রামমোহন লিখিয়াছিলেন বেদান্ত দর্শন, শাস্ত্রবিচার বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ, একটি উৎকৃষ্ট বাংলা ব্যাকরণ এবং ব্রহ্মসঙ্গীত। সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমের সংকলন করাইয়াছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ইহা তাঁহার মহতী কীর্তি। এই যুগের অধিকাংশ গদ্যরচনাই সংস্কৃত, ফরাসী বা ইংরেজীর অনুবাদ। মৌলিক রচনা তেমন কিছু নাই। বহু স্থান হইতে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে যুগের মনীষীরা তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করিতেছিলেন। সে সময়ে সাধারণ লোকের রসপিপাসা তৃপ্ত হইত কবিওয়ালাদের গীত ও যাত্রায়, আর্যা তরজা খেউড় কবিগান পাঁচালি ও হাফ-আখড়াইয়ের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক পদ্ধতির পাঁচালি-রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন দাশরথী রায়। তাঁহার রচনায় সেকালের রঙ্গ-রসিকতা, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য এবং সেকালের বাঙালী-মানসের একটা পরিচয় আমরা পাই।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সাময়িক পত্রের আবির্ভাব। 'সমাচার দর্পণ' এবং 'বাঙ্গালা গেজেটি' প্রকাশিত হইল। সাময়িক পত্রের মারফত বাঙালী জনসাধারণ বাংলা গদ্যের রসাস্বাদন করিল। ক্রমশ 'সংবাদ কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হইল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। 'নববাবুবিলাস' তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য কৌতুক-রচনা। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত। বাংলার রসসাহিত্যে তাঁহার আসন কোথায় তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এই 'সংবাদ প্রভাকরে'ই কবিতা লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন।

ইহার পরই বাংলার নবযুগ—ইয়ং-বেঙ্গলদের যুগ। এই যুগের যাঁহারা যুগন্ধর তাঁহাদের প্রধান কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের সদ্য-নির্মিত ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করা। শুধু তাহাই নহে, বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পাশ্চাত্য আধুনিকতার, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে নব-রূপে মূর্ত করিবার বিবিধ চেষ্টাও ইঁহারা করিয়াছেন। যে আধ্যাত্মিকতা, সমাজের যে সব প্রাচীন নিয়মাবলী প্রাণহীন হইয়া কুৎসিত তামসিকতায় পরিণত হইয়াছিল, সে সবের বিনাশ সাধন করিয়া সাহিত্যে ও সমাজে সুস্থ, প্রাণবান, যুক্তিযুক্ত পাশ্চাত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ইঁহারা যত্নবান হইয়াছিলেন। সে যুগে ইঁহারা ছিলেন বিদ্রোহী, সর্ববিধ সংস্কারের অগ্রদূত। অধ্যাপক ডিরোজিও ছিলেন ইঁহাদের গুরু। এই ডিরোজিও-শিষ্যগণের মধ্যে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া আছেন। ইঁহাদের সঙ্গে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রত্যেকেই কৃতী পুরুষ, কিন্তু ইঁহাদের বিস্তৃততর

পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে, তাই তাঁহাদের নামগুলির উল্লেখমাত্র করিলাম। বৈষ্ণব কবিগণ যেমন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সব মনস্বী তেমনি কেহ বক্তৃতা দিয়া, কেহ প্রবন্ধ লিখিয়া, কেহ পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ বা স্বীয় নির্ভীক আচরণ দ্বারা পরবর্তী যুগের প্রতিভাবান কবি ও লেখকদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসূদনের যুগ তবেই আসিয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলায় স্কুল, কলেজ, নানাবিধ এসোসিয়েশন তো হইয়াছেই, স্ত্রী-শিক্ষারও ভিত্তিপত্তন হইয়াছে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলায় নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, ক্রিশ্চান ধর্মকে রোধ করিবার জন্য সদ্য-স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজ আদর্শ হিন্দু সমাজ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শুধু ইঁহারাই নহেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব বিভাগেই নেতৃত্ব করিবেন, তাঁহারাও ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। যে উর্বর ক্ষেত্র প্রেরণা-বীজের অভাবে এতকাল পূর্ণ-ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণায় সে ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিল। এই সব অলোকসামান্য প্রতিভাধরের নেতৃত্বে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সমারোহ আজও অব্যাহত আছে। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অমর গ্রন্থ "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যকীর্তি 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এখন ১৯৫৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স সবে এক শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই স্বল্পকালের মধ্যে বাঙালীর সাহিত্যপ্রতিভা বঙ্গভারতীকে যে ঐশ্বর্যসম্ভারে মণ্ডিত করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধকদের সম্যক পরিচয় দিবার সুযোগ এ প্রবন্ধে নাই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের অস্ত-কিরণ-ছটা বাংলার সাহিত্যাকাশকে এখনও রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত কিছু পরিচয়ও আপনাদের নিশ্চয় আছে, সুতরাং তাহা লইয়া আমি কালক্ষেপ করিব না। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরে যে সব সাহিত্য-সাধক বঙ্গবাণীর সেবায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সৃষ্টির গতি-প্রকৃতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। এই সব সাহিত্য-সাধকের সাধনা এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন শেষকথা বলিবার সময় ইহা নয়। তবে একটা কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অপক্ষপাত বিচার করিলে হতাশ হইতে হইবে না। সমাজে একদল লোক সর্বদাই থাকেন যাঁহারা বর্তমানের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতে পান না, যাঁহাদের মন অতীতকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতে ভালবাসে। এ ধরনের হতাশাবাদী সমালোচক মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের যুগেও ছিলেন এবং নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিছুই হচ্ছে না, যা হচ্ছে সব বাজে।" কিন্তু কিছু যে হইয়াছে তাহার অকাট্য প্রমাণ আজ

আমরা পাইয়াছি। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কিছু হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরও বাংলার সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে নূতন সুর বাজিয়াছে, নূতন রঙ ফুটিয়াছে। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতায় অতি-আধুনিক উপন্যাস ও গল্পসাহিত্য শুধু বাংলার নয় শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের দরবারে সম্মান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। তাহারা নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে, নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়াছে। প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-কাহিনীও অতি-আধুনিক রূপকারদের লেখনীতেই অনবদ্য কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। অতি-আধুনিক গল্প-সাহিত্যই বেশী সমৃদ্ধ, কবিতা বা নাটক তাদৃশ নহে। অতি-আধুনিক গল্প-উপন্যাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্তী একদল লেখক তাঁহাদের সৃষ্টিতে ভারতের আদর্শকেই জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর যে চরিত্র তাহার প্রেমে, আত্মত্যাগে, ক্ষমায়, বীরত্বে, বাঙালীর যে সংস্কৃতি তাহার গ্রামের ঘাটে মাঠে হাটে মেলায় নৃত্যে গীতে পটে পুতুলে জীবন্ত হইয়া আছে, যে সামাজিক পীড়নে রাজনৈতিক অত্যাচারে ইহারা বিপন্ন, সেই সবেরই শিল্পান্বিত রূপ ইহাদের রচনায় পরিস্ফুট। ইহার পর দ্বিতীয় আর একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহারা বিগত মহাযুদ্ধের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেন নাই, যুদ্ধজনিত দুর্দশাও ভোগ করেন নাই, কিন্তু ইউরোপের যে সব লেখক ও কবি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলভাগী হইয়া, সভ্যতার ছদ্মবেশে অন্তরালে ঘৃণ্যতম পাশবিকতার রূপ দেখিয়া সভ্যতা, আভিজাত্য ও মনুষ্যত্বের সম্বন্ধেই আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই জন্যই যাঁহাদের লেখায় নাস্তিক্যবাদ হতাশা এবং যথেচ্ছাচারের সুর স্বাভাবিক ভাবেই বাজিয়াছে, এই দ্বিতীয় দলের লেখকেরা তাঁহাদের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যেও সেই মাল আমদানি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ও-দেশের এই-জাতীয় লেখকদের সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উল্ফ তাঁহার "লীনিং টাওয়ার" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পিতৃধনে শিক্ষালাভ করিয়া পিতৃবিত্তে নির্ভরশীল হইয়া আভিজাত্যের উচ্চ মীনারে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই উচ্চ মীনার হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি ও কল্পনা জীবনের ও সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিত তাহাই প্রধানত তাহাদের সৃষ্টির মূলধন ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধ বাধিতেই সেই মীনারের ভিত্তিতে আঘাত লাগিল, ফলে মীনারটি আর সোজা দাঁড়াইয়া রহিল না, ক্রমশ হেলিয়া পড়িতে লাগিল। এই হেলিয়া-পড়া মীনার-চূড়ায় যে সব লেখক-লেখিকা বসিয়া আছেন তাঁহারা সেখান হইতে নামিতেও পারিতেছেন না, কিন্তু সেখানে বসিয়া স্বস্তিও পাইতেছেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশ বক্র হইয়া যাইতেছে, সহজভাবে তাঁহারা আর কিছুই দেখিতে পারিতেছেন না। শুধু তাই নয়, যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এই যুদ্ধের জনক, তাঁহারা নিজেরাও সেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ফল। তাই আত্মধিক্কারেও তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসও তাঁহাদের আর নাই। সুতরাং সত্য-শিব-সুন্দর, প্রেম-ক্ষমা-ত্যাগ

কোন কিছুতেই আর তাঁহারা আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। সবই তাঁহাদের নিকট অর্থহীন। তাঁহাদের বিপর্যস্ত বিকৃত মনের পরিচয় তাই তাঁহাদের রচনাতেও বর্তমান। তাঁহাদের লেখা কবিতাতে ছন্দ-মিলের কোনও বালাই নাই, অর্থও নাই।" যুদ্ধোত্তর বিদেশী সাহিত্যিকদের এই বিভ্রান্তি এই দ্বিতীয় দলের লেখকদের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার ফলে নাস্তিক্যবাদ, অর্থহীন গদ্য-কবিতা, মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস, মহৎকে বৃহৎকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, নিছক পশুত্বকেই নগ্ন করিয়া প্রকাশ করিবার আগ্রহ এইসব লেখকের রচনায় দেখা গিয়াছে। বিদেশী লেখকেরা যুদ্ধের কবলে পড়িয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, ইহারা তাঁহাদের নকল করিয়া পাগলামির ভান করিতেছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। মিলটন হোমার টাসো মাইকেল মধুসূদনকে, স্কট বঙ্কিমকে এবং বায়রন নবীনচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন, অতি-আধুনিক কবিরা ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—বিদেশের দ্বারে এখনও অনেক বাঙালী লেখক নূতন প্রেরণার জন্য ধরনা দিয়া থাকেন। এই অতি-আধুনিক বিদেশী কবিদের প্রেরণা যদি মিলটন হোমার টাসো স্কট বায়রনের প্রেরণার মতো সুস্থ হইত তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজিত, কিন্তু এখন যাহা বাজিতেছে তাহা বেসুরা, কারণ যাহার অনুকরণ করা হইতেছে তাহাই যে সুর-হীন। কিন্তু এসব সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই লেখকরা অনেকেই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে এখন বুঝিতেও পারিয়াছেন যে, বিদেশী 'কারি পাউডার' দিয়া স্বদেশী ব্যঞ্জনের ঠিক স্বাদটি আনা যায় না। দুই-একজন একেবারে মত ও পথ পরিবর্তনও করিয়াছেন।

বাংলার গল্প-সাহিত্যে তৃতীয় যে ধারাটি লক্ষ্য করা যায় সেটির উৎস বিদেশী রাজনীতি, প্রধানত কম্যুনিজ্‌ম্। সাম্যবাদ ভারতবর্ষেরও প্রাচীন আদর্শ, কিন্তু রুশীয় কম্যুনিজ্‌ম্ এবং ভারতীয় সাম্যবাদে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতীয় সাম্যবাদ আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, রুশীয় কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি বিষয়-বাসনা দীন-দরিদ্র চাষী-মজুর নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা হর্ষ-বেদনা লইয়া কাব্যরচনা বাংলা সাহিত্যে নূতন নহে, মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এ কাব্যরস আমরা উপভোগ করিয়াছি, শরৎচন্দ্রের অমর লেখনীও ইহাদের কথাই চিত্রিত করিয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িলে মনে হয় যে, দেশের মাটির সহিত সে সব কাব্যের যোগ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরে যে সব লেখক শ্রমিকদের লইয়া কাব্যরচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাঁহাদের লেখা পড়িয়া মনে হয় না যে তাঁহারা এই শ্রমিকদের সুখদুঃখের অংশীদার। বরং মনে হয়, গল্প বলিবার ছলে তাঁহারা যেন শ্রমিকদের স্বপক্ষে ওকালতি করিতেছেন। সেই জন্য অনেকক্ষেত্রেই কাব্যের সুরটা ঠিক জমে নাই। এ গোষ্ঠীর মধ্যেও অনেক শক্তিমান লেখক আছেন, অনেকের মনীষা এবং বিদ্যাবত্তাও সম্মানযোগ্য, কিন্তু ইহাদের লেখায় সৃষ্টিধর্মী কাব্যের সুর তেমন জমে নাই। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যে গোর্কি বা শলোকভের দেখা আমরা এখনও পাই নাই।

সম্প্রতি আর একদল নবীন লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহারা প্রথমোক্ত দলের মতো ভারতবর্ষের আদর্শে বিশ্বাসবান, দেশের জল মাটি মানুষকেই যাঁহারা কাব্যের উপকরণ করিয়াছেন, কোন 'ইজ্‌ম্' বা ঢং ইঁহাদের প্রভাবিত করে নাই। ইঁহারাই সাহিত্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে বাংলা কবিতা ও নাটকের মান কিন্তু অনেক নামিয়া গিয়াছে। গদ্য-কবিতা বলিয়া যাহা মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে তাহা কবিতা নয়, অদ্ভুত হেঁয়ালি মাত্র। তবে সুখের বিষয়, তাহারা ক্রমশ বিলীন হইতেছে, তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে প্রকৃত কবিতা। কয়েকজন শক্তিশালী তরুণ কবির দেখা আমরা পাইয়াছি, কিন্তু এখনও কিছুদিন না গেলে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাল নাটকেরও খুব অভাব আছে। ইহার কারণ, পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির সহিত কোনও প্রতিভাবান নাট্যকার সংশ্লিষ্ট নাই। পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান; তাঁহাদের লক্ষ্য অর্থোপার্জন, দর্শকদের রুচির মান উন্নীত করা নয়। জাতীয় নাট্যশালা না হইলে এবং সে নাট্যশালায় প্রতিভাবান নাট্যকারদের সম্মানের স্থান না দিলে আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতির আশা নাই।

মোটামুটি ইহাই বর্তমান সৃষ্টিধর্মী বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আর একটা বড় দিক গড়িয়া উঠিতেছে, যাহার উল্লেখ না করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। সে দিকটি উপকরণ-সংগ্রহের দিক। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে অনেক সাধক ও গবেষক ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান ও পরিভাষা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য সাহিত্য-সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়েও পুস্তক রচিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের জীবনী-সাহিত্যও বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অনেক বিলুপ্ত-প্রায় পুস্তক প্রকাশ করিয়া সেগুলিকে আবার সাধারণের গোচরে আনিয়াছেন। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে পথে অগ্রণী ছিলেন সে পথে এখন অনেক যোগ্য সাধকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে আমরা দেখিয়াছি যে, সে যুগে বাঙালী মনীষীরা প্রধানত উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং সেই উপকরণের ভিত্তির উপরই আধুনিক সাহিত্যের হর্ম্য নির্মিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের সাহিত্য-সাধকরা যে সব মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন তাহাও যে ভবিষ্যৎ সাহিত্য-স্রষ্টাদের সৃষ্টিকর্মে সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর। ইহার মধ্যে আমরা নয় শত বৎসর কাটাইয়াছি কবিতা লইয়া এবং সে কবিতার প্রধান বিষয় দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন, সর্প-ব্যাঘ্র-কুম্ভীরের মধ্যেও দেবত্ব আরোপ করিয়া আমাদের প্রাচীন কবিরা কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা গদ্যযুগ আরম্ভ হইবার পর হইতেই, অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের পর হইতেই আমাদের কাব্যলোক

হইতে দেব-দেবীরা নির্বাসিত হইয়াছেন এবং আমাদের মনে হইতেছে আমরা কুসংস্কার বর্জন করিয়া যুক্তিবাদী হইয়াছি; এখন মানুষই আমাদের কাব্যের একমাত্র আশ্রয়। ইহার স্বপক্ষে আমরা প্রায়ই এই কবিতাটি উদ্ধৃত করি—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

বড়ু, দ্বিজ, দীন চণ্ডীদাস যিনিই এ কবিতার রচয়িতা হউন তিনি নিজেই ছিলেন একজন দেব-দেবী-মাহাত্ম্য-কীর্তনকারী কবি। মনে প্রশ্ন জাগে, তবে তিনি হঠাৎ এমনভাবে মানব-বন্দনা করিলেন কেন? ইহার উত্তর, কবিরা চিরকালই শক্তির উপাসক, সে শক্তি দেব-দেবী বা মানব-মানবী যে রূপেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, কবির প্রশস্তি সে লাভ করিবেই। শক্তিময়ী রজকিনী রামীর প্রেমই উক্ত কবিতার উৎস—এ কথা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের উক্তি—"শত শত বাশুলী তাঁহাকে যে প্রেম শিখাইতে পারিতেন না, ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া যে জ্ঞান দিতে পারিতেন না, রামী তাঁহাকে তাহা দিয়াছে।" সুতরাং যে মানুষের বন্দনা তিনি গাহিয়া গিয়াছেন সে মানুষ সাধারণ মানুষ নহে, সে মানুষ দেবত্বের স্তরে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব-দেবীদের দ্বন্দ্ব-কলহের যে চিত্র আমরা পাইয়া থাকি, সে চিত্রের কল্পনা কবিরা দেব দেবীদের মধ্যে ততটা পান নাই—যতটা পাইয়াছিলেন আন্দোলিত নিষ্পিষ্ট জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মানসের মধ্যে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন মনসা শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরও অনেক ছোটখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি প্রবল ভূমিকম্পে সমাজের উপর উঠিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।" ইহার সরল অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, নিম্নস্তরের এক-একটি মানবগোষ্ঠীর এক-একটি দেব বা দেবী প্রতীকস্বরূপ ছিল এবং সেকালের মঙ্গল-কাব্যগুলি সেই প্রতীকগুলিরই প্রশস্তি-কাব্য। আজ যে আসনে আমরা জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি পুরাকালে সেই আসনেই দেব-দেবীরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দেব-দেবীরা সাহিত্য বা কাব্য হইতে এখনও নির্বাসিত হন নাই, কেবল ভিন্ন নামে আমরা তাঁহাদের পূজা করিতেছি মাত্র। ভারতবর্ষের জনসাধারণের চিত্তে তাঁহারা স্বনামেই এখনও সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মন্দিরে লক্ষ লক্ষ দেবতার সম্মুখে আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী করজোড়ে সাশ্রুনেত্রে প্রণাম করিতেছে। সাহিত্য লইয়া যাঁহারা ব্যবসায় করেন তাঁহারাও বলেন, রামায়ণ মহাভারত গীতা উপনিষদ পুরাণ ভাগবতের ক্রেতার অভাব নাই, যতই ছাপা যায় ততই বিক্রয় হইয়া যায়। আধুনিক কোনও সাহিত্য-পুস্তক এতটা জনপ্রিয়তার দাবী করিতে পারে না।

সিনেমার যুগেও যাত্রা উঠিয়া যায় নাই, পৌরাণিক দেব-দেবীদের গল্পই সে সব যাত্রাকে আজও টিকাইয়া রাখিয়াছে। আজকাল সিনেমার বিষয়বস্তুও পৌরাণিক গল্প হইলে তাহা বেশী জনপ্রিয় হয়। আমাদের সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে দেবগুণবর্জিত হইলে সংবাদপত্রের মতো ক্ষণস্থায়ী হইত। নিতান্ত-মানবীয় বাস্তবধর্মী সাহিত্যে ক্ষুধিত চিত্তের জন্য চিরন্তন সুধা সঞ্চিত হইয়া থাকে না। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর লেখকদের কাব্য হইতে এমন অনেক উদাহরণ আহরণ করা যাইতে পারে, যাঁহারা নামেই মানুষ কিন্তু আসলে যাঁহারা দেব-দেবীরই সমগোত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, দেবীচৌধুরাণী, শ্রী, ভ্রমর, জগৎ সিংহ, ভবানী পাঠক, সত্যানন্দ, সীতারাম ; রবীন্দ্রনাথের পরেশ, আনন্দময়ী, গোরা, নিখিলেশ, সুচরিতা, হৈম ; শরৎচন্দ্রের বিন্দু, সিদ্ধেশ্বরী, গিরীশ, নরেন, প্রিয়বাবু, কৈলাস, সব্যসাচী প্রভৃতি চরিত্রের অন্তরালে কি দেব-দেবীরা লুকাইয়া নাই ? নিশ্চয় আছেন। সাহিত্যে কাব্যে পুরাণে এই দেব-দেবীদের অলৌকিক মহিমাচ্ছটাই অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাইতেছে। আমরা নিতান্তই অসহায়, দেব-দেবীরা আজও আমাদের ভরসা। সর্বদেশের কাব্যেই যুগে যুগে তাঁহারা নানা মূর্তিতে প্রকাশিত। পৃথিবীর আধুনিকতম প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুলিও মঙ্গলকাব্য, কারণ সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কাব্যেরই লক্ষ্য – মানবজাতির মঙ্গল, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ।

আপনাদের এই সম্মেলন শুধু সাহিত্য-সম্মেলন নহে, সংস্কৃতি সম্মেলনও বটে। তাই সংস্কৃতি বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

অনেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, কিছু পার্থক্য আছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধার-আধেয় সম্পর্ক। যদি ফুলের উপমা দিয়া বলা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ফুলের পাপড়ি বৃন্ত বর্ণ, যে গাছে বা লতায় যে ফুলটি ফুটিয়াছে তাহার স্বরূপ প্রভৃতি সভ্যতা, কিন্তু ফুলের রূপ এবং সৌরভটি সংস্কৃতি। যদি প্রদীপের উপমা দিই তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রদীপের আকৃতি, গঠন-কৌশল, উপাদান, প্রদীপের পিলসুজ, তৈল, সলিতা, যে গৃহে যে পরিবেশে তাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ প্রভৃতি সভ্যতা, কিন্তু প্রদীপের আলোটি সংস্কৃতি। মানবসমাজে সভ্যতার রূপ যুগে যুগে বদলাইয়াছে, আমরা পূর্বে গরুর গাড়ি চড়িতাম, এখন প্লেনে চড়িতেছি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে সভ্যতার বেশ নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। দশম বা একাদশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের সহিত বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের বাহিরের চেহারায়, বাহ্যিক সামাজিকতায় অনেক অমিল আছে। কিন্তু চরিত্রের, চিন্তার, আচরণের যে দীপ্তিকে যে মাধুর্যকে যে সৌরভকে আমরা সংস্কৃতি বলি তাহা কি খুব বেশী বদলাইয়াছে ? অতি প্রাচীন কালেও যে সকল মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী সুসংস্কৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত, আজও সেই সকল গুণাবলীর দ্বারাই আমরা সংস্কৃতির বিচার করি। পুরাকালে আর্য-ঋষিরা যে চারিত্রিক সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণত্ব আখ্যা দিয়াছিলেন, আজও প্রকৃত ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই চারিত্রিক সংস্কৃতি বিদ্যমান। অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রকৃত উৎস আত্মজ্ঞানে,

আত্মসংযমে এবং আত্মত্যাগে। সভ্যতার বহিরঙ্গের নানা পরিবর্তন যুগে যুগে ঘটিয়াছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির এই প্রাচীন আদর্শ আজও বদলায় নাই। তাই আজ সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর বিকারগ্রস্ত অহঙ্কার-স্ফীতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরু পঞ্চ-শীলের যে বাণী আজ ঘোষণা করিতেছেন তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিরই বাণী, তাহা ভগবান বুদ্ধের বাণী, তাহা আজও পুরাতন হইয়া যায় নাই, পৃথিবীর সন্ত্রস্ত মানব-সমাজ সে বাণী আজ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে।

ব্রহ্মদেশের সহিত বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু প্রাচীন। ডাক্তার সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া নিঃসংশয়ে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রধানত ভগবান বুদ্ধের বাণীই আমাদের উভয় দেশকে আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সম্রাট অশোকের প্রেরিত আচার্য ব্রহ্মদেশে আসিয়া যে মিলন-সেতু নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা আজও অটুট আছে।

পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন, বাঙালী জাতি, বাঙালী সমাজ, বাঙালীর আহার-বিহারের অনেক বৈশিষ্ট্য, এমন কি বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য দ্রবিড়, নিগ্রোবটু, অস্ট্রিক, ভোটচীন, মঙ্গোলীয়, আর্য, পাঠান, মোগল এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার নিকট ঋণী। ব্রহ্মদেশবাসীদের সম্বন্ধেও ইহা অনেকাংশে সত্য। সেদিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদের সহিত আমাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। সম্প্রতি মার্কিন এবং সোভিয়েট সভ্যতার প্রভাবও আমাদের উভয় দেশের উপর পড়িয়াছে। এই যুগল প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া আমরা কালক্রমে তাহাদের নবরূপ দান করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই নবরূপের মধ্যেও মানবজাতির সনাতন সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যাহা মানব-পশুকে মহামানব হইবার প্রেরণা দিয়াছে তাহা তাহার চির-জ্যোতির্ময় রূপে সভ্যতার সেই নব-প্রকাশকেও শাশ্বত মহিমায় মণ্ডিত করিবে। বাহির হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জাতির এই নিত্যনব অথচ শাশ্বত প্রকাশই সংস্কৃতি, ইহাই তাহার জীবন্ত অস্তিত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। এই প্রকাশের দেবতাই বাণী, এবং কবিই সে বাণীর বার্তাবহ। ইহা লইয়া বহুকাল পূর্বে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।—

প্রকাশের বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছে হিমালয়
প্রস্তর-পঞ্জর ভেদি' লক্ষধারা হয়েছে বাহির।
প্রপাতের কলোল্লাসে
নির্ঝরের সঙ্গীত-ধারায়
তরঙ্গিছে পাষাণের বিগলিত আত্ম-নিবেদন,
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি'

উদ্বেলিত সমুদ্র-সঙ্গমে
সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র তারস্বরে করিছে ঘোষণা,
'হে সমুদ্র আমি আছি,
অতিক্রমি' বহুদূর পথ
আসিয়াছি অবশেষে
বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

২

প্রকাশের বেদনায় উন্মুখ অধীর হিমালয় ;
অনন্ত নিখিল শূন্যে সমুৎসুক চূড়ায় চূড়ায়
অতি দূর তুঙ্গলোকে
সন্ধানিছে নব ছন্দ, নবতর ভাষা
আত্মপ্রকাশের।
ভাব-মৌন শান্ত শুভ্রতায়,
গম্ভীর গর্জনে কভু ঝঞ্ঝা-আলোড়নে,
বাণী তার শূন্যে শূন্যে মাগিছে প্রকাশ
তন্দ্রাহীন নিত্য নবরূপে।
সে-ও কহিতেছে,
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি'—
রাধানাথে, গৌরীশৃঙ্গে, কাঞ্চনজঙ্ঘায়
ঊর্ধ্বমুখী অসংখ্য চূড়ায়
অবিরাম চলেছে ঘোষণা,
'হে আকাশ, আমি আছি,
অতিক্রমি বহু বিঘ্ন বাধা
আসিয়াছি এতদূর বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি।
যে বহ্নি তোমার ওই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে করেছে উজ্জ্বল
সেই বহ্নি মোরও শিরে পরায়েছে তুষার-মুকুট।
যে পূর্ণতা শূন্যতায় হয়েছে অসীম তোমার অনন্ত বক্ষে,
সেই পূর্ণতাই আমারে দিয়াছে সীমা ;

তুমি আমি ভিন্ন নহি
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

৩

কবির অন্তরলোকে ধ্বনিত হইল মহাবাণী।
অতি ক্ষুদ্র জড় হিমালয়
প্রকাশের আবেগেতে
সাগরের আকাশের সন্ধান পাইয়া থাকে যদি,
হে মানব,
তোমার সন্ধান হবে নাকি মহত্তর আরও ?
তোমার কল্পনা
অঙ্কিত করিবে নাকি মহাকাল-ভালে
নিষ্কলঙ্ক নব চন্দ্র-লেখা ?
নবীনা উমার ক্রোড়ে নবীন কুমার সম্ভব হইবে না কি !
নব-প্রেরণায় করিবে না নব-সৃষ্টি তুমি
দূর করি' সর্ব মলিনতা ?
নিখুঁত নবীন-সৃষ্টি-পরিকল্পনার
তুমিই তো একমাত্র যোগ্য অধিকারী
হে কবি, হে সৃষ্টিকর্তা
জাগো, তুমি ওঠ— ।*

সিপাহী বিদ্রোহ

বীর সাভারকর সিপাহীবিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বস্তুত, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বিতাড়নের সর্বভারতীয় ব্যাপক প্রচেষ্টা সিপাহীবিদ্রোহেই প্রথম মূর্ত হইয়াছিল। খণ্ড খণ্ড ভাবে এ প্রচেষ্টা অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের পর এই বাঙলা দেশেই একাধিকবার হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ জঙ্গল মহালের বিদ্রোহ, ঝাড়গ্রাম-ঘাটশীলার যুদ্ধ, বীরভূমের যুদ্ধ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বীরত্বও কিছু কম ছিল না। নরহরি চৌধুরী, মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, গোবর্ধন দিকপতি, অচল সিংহ, তিতু মীর; রামা ও সুন্দরা মাঝির অদ্ভুত রণকৌশল ও একাগ্র দেশাত্মবোধ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী ও লছমীবাইয়ের রণকৌশল ও দেশাত্মবোধ অপেক্ষা কিছু কম ছিল

* ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ

বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই সকল বিদ্রোহ নিখিল ভারতীয় মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাদের কার্যকলাপ প্রদেশ-বিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের ব্যাপ্তি ছিল আরও অনেক বেশি। বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, বুন্দেলখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এই সমস্ত অঞ্চলেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। অনেক স্থানে ইংরেজশাসন বলিয়া কিছু ছিল না। শুধু সিপাহীরা নহে, দেশের জনসাধারণও অনেক স্থানে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহকে অংশত গণবিপ্লবও বলা চলে।

বিদ্রোহের প্রধান কারণ বিদেশীশাসনে অসন্তোষ। বিদ্রোহীদের একটি ঘোষণা-পত্রে লেখা ছিল—"মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু তাহার ধর্ম, তাহার জাতি, তাহার আত্মসম্মান, তাহার নিজের ও প্রিয়জনের প্রাণ এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি। ব্রিটিশ শাসনে ইহার একটিও নিরাপদ নহে।"

এই বিদ্রোহে আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল—হিন্দু-মুসলমানে মৈত্রী। অনেক মুসলমান নেতা গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সম্রাট সরাসরি গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশও দিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট বাহাদুর শাহ জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, আলোয়াড় প্রভৃতি হিন্দু রাজাদিগের নিকট স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত অশোক মেটার "আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সম্রাট লিখিয়াছিলেন—যে-কোনও উপায়ে হিন্দুস্থান থেকে ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে দেওয়াই আমার অভিলাষ। সমগ্র হিন্দুস্থান স্বাধীন হোক এই আমার ইচ্ছা। কিন্তু দেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে পারে, তাদের আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিতে পারে, তাদের শক্তিকে যথাযথরূপে নিয়োজিত করতে পারে, আন্দোলনের ভার বহনে সক্ষম এমন একজন নেতা এগিয়ে না এলে বিদ্রোহ সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের পরেও রাজত্ব করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই আমার। যদি আপনারা সমস্ত দেশীয় নৃপতিরা মিলে শত্রুকে তাড়াতে অস্ত্রধারণ করেন তবে আপনাদের সম্মতিক্রমে গঠিত যে-কোন নৃপতিমণ্ডলের হস্তে শাসনভার অর্পণ ক'রে সিংহাসন ত্যাগে আমি প্রস্তুত।"

ইহার পরেই শ্রীযুক্ত মেটা লিখিয়াছেন—"হিন্দুরাও মুসলমানের বন্ধুত্ব-অর্জনে সম-পরিমাণ আগ্রহ ও ঔদার্য দেখিয়েছেন। কানপুরে নানাসাহেব যখন তাঁর পৈত্রিক পতাকা 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' উত্তোলন করলেন, তখন তার পাশে ছিল অর্ধচন্দ্র-অঙ্কিত মুসলিম পতাকা। তিনি যে ঘোষণা প্রচার করলেন তাও সম্রাট বাহাদুর শাহের নামে। নেপালের মহারাজা জংবাহাদুরের সঙ্গে সে সময় তাঁর যে পত্র ব্যবহার হয়েছে তার সবগুলিতেই ছিল হিজরী সালের তারিখ। নানাসাহেবের উপদেষ্টা এবং মন্ত্রী ছিলেন একজন মুসলমান—আজিমুল্লা খান। বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে রণক্ষেত্র রঞ্জিত করেছে।"

প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধে আমরা যখন পরাজিত হইলাম তখন কিন্তু এই মৈত্রীতে ফাটল দেখা গেল। ইংরেজের ভেদ-নীতিই এই ফাটল সৃষ্টি করিল। দেশে পুনরায় যখন ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল তখন ইংরেজরা হিন্দুদের অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মুসলমানরা যে মৈত্রীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা মায়া-মরীচিকার মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। রাজানুগৃহীত হিন্দুদের দিকে তাকাইয়া স্বভাবতই তাহাদের মনে হইল উহারা আমাদের কেহ নন। উহাদের বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের মুখোশমাত্র। হিন্দু-মুসলমানের এ বিচ্ছেদ আজও জোড়া লাগে নাই। বন্ধুত্বের পর যে বিচ্ছেদ হয় তাহা মর্মান্তিক, তাহার তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা সহজে ঘোচে না। সিপাহীবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমানের সেই মৈত্রী এবং ইংরেজদের চক্রান্তে সে মৈত্রীর বিনষ্টির ফলভোগ আজও আমরা করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী খিলাফত আন্দোলন করিয়াছিলেন, সাময়িকভাবে তাহাতে সামান্য কিছু ফল ফলিয়াছিল, কিন্তু সে ফল পাকে নাই, ঝরিয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুরা যে মুসলমানদের প্রতি নিগ্রহ নীরব দর্শকদের মত নিরীক্ষণমাত্রই করিয়াছিল একথা মুসলমানেরা আজও ভুলিতে পারে নাই। সেই আক্রোশের ফল মুসলিম লীগ, মিস্টার জিনা এবং পাকিস্তান। একশত বৎসর পূর্বে সিপাহীবিদ্রোহ হইয়াছিল, তির্যকভাবে তাহার ফলভোগ আমরা আজও করিতেছি।

সিপাহীবিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত বাঙলা দেশের মাটিতেই হয়। ব্যারাকপুরে এবং বহরমপুরেই প্রথমে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যায়। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিই বিদ্রোহের উদ্বোধন করে। একজন Adjutant নিহত হন। দশ দিন পরে মঙ্গল পাণ্ডেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক মুখ্য ব্যাপারে বাঙলা দেশ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে, সিপাহীবিদ্রোহের ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিহার তখন বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরার নিকটবর্তী জগদীশপুরের কুনওয়ার সিং বিদ্রোহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যে এত বড় বিদ্রোহের কোন উল্লেখযোগ্য ছাপ নাই। মাইকেল মধুসূদন তখন রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করিতেছিলেন। বাঙলা দেশে তখন 'ইয়ং বেঙ্গল'দের যুগ। বাঙলার নবজাগ্রত মনীষা তখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, 'সাহেব' হইতে পারিলেই বুঝি আমাদের দুঃখদুর্দশা ঘুচিবে। তাই সম্ভবত সাহেবদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বিদ্রোহকে তাহারা সুচক্ষে দেখেন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে কিন্তু চাকা ঘুরিয়াছিল। বাঙালী ক্ষুদিরামের হাতেই প্রথম বোমা ইংরেজের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

সিপাহীবিদ্রোহে আমাদের পরাজয় কেন হইল ঐতিহাসিকগণ তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরাজয়ের কারণ এইগুলি—

(১) সিপাহীদের বন্দুক সাহেবদের বন্দুকের মত দূর-পাল্লার ছিল না।

(২) টেলিগ্রাফ এবং ডাক-বিভাগ ব্রিটিশদের অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

(৩) সাহেবদের সেনানায়করা অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ছিলেন। বুদ্ধিমান এবং দক্ষ সেনানায়করা সংখ্যাতেও ছিলেন অনেক। সিপাহীদের পক্ষে সুদক্ষ সেনানায়কের অভাব ছিল।

(৪) সাহেবরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সিপাহীদের সে পদ্ধতি তেমন জানা ছিল না। তাঁহারা সেকেলে মধ্যযুগীয় রীতিতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

(৫) অনেক বিদ্রোহী সিপাহী এমন ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছিল যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ক্রমশঃ তাহারা হারাইতে থাকে। অনেক গুণ্ডা ও ডাকাত-জাতীয় লোক এই সুযোগে ভদ্র-গৃহস্থের উপর নির্যাতন করিয়াছিল। সেজন্য অনেক স্থানেই বিদ্রোহ জনসাধারণের সমর্থন পায় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ কি এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইহা জঙ্গী (Military) বিদ্রোহ মাত্র। অনেকে আবার বলেন, রাজচ্যুত রাজাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং আক্রোশই ইহার কারণ। জাতীয় জাগরণের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার। এক বা একাধিক ব্যক্তির নিতান্ত ব্যক্তিগত ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গই যে অবশেষে জাতীয় জাগরণের দাবানলে রূপান্তরিত হইয়াছে ইহার নজির ইতিহাসের পাতা উল্টাইলেই পাওয়া যাইবে। বেশি দূর যাইবার দরকার নাই, দেশপূজ্য স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি একজন আই. সি. এস. অফিসারের হাতে লাঞ্ছিত না হইতেন তাহা হইলে কি তিনি এতবড় একটা জাতীয় জাগরণের নেতা হইতে পারিতেন? মূল কারণ যাহাই হোক বিদ্রোহের লক্ষ্য, ব্যাপকতা এবং মহত্ত্বই তাহাকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়া থাকে। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে সিপাহীবিদ্রোহকে আমরা মহতী মর্যাদা দিতে বাধ্য। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র যে ভারতের স্বাধীনতাপ্রয়াসের প্রথম ব্যাপক প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করিতেছেন তাহাতে আমিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করিয়া আনন্দিত হইলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র আজ যে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন সেই গণতন্ত্রের প্রথম উদ্বোধন হইয়াছিল বাঙলা দেশে অষ্টম শতাব্দীতে। জনগণনির্বাচিত গোপালদেব সে গণতন্ত্রের নায়ক ছিলেন। এতবড একটা যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক উৎসব করা কি আমাদের কর্তব্য নয়?

প্রেমচন্দ স্মরণে

আমাদের এই বিশাল ও সুপ্রাচীন দেশের যে ঐতিহ্য অব্যাহত ধারায় আমাদের অতীতের সহিত আমাদের বর্তমানকে সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির বন্ধনে সংযুক্ত করিয়াছে সে

ঐতিহ্যের মর্মবাণী সত্যসন্ধান। ভারতীয় সাধকেরা বহুপথে বিবিধ সাধনায় এই সত্যের সন্ধান করিয়াছেন। সে সন্ধানে ধর্ম-পথই একমাত্র পথ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই,—কাব্য শিল্প ও সঙ্গীতও সে সন্ধানের মার্গরূপে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে সম্মানিত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকার উৎকৃষ্ট কাব্য-স্বাদকে ব্রহ্ম-স্বাদ সহোদর বলিয়াছেন। আমাদের দেশের কাব্যকার, মহর্ষি বাল্মিকী, বেদব্যাস, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধার্মিক বলিয়া আজও আমাদের পূজা পাইতেছেন। তাঁহাদের সৃষ্ট কাব্যরাজিকেও পূজার সিংহাসনে বসাইয়া আজও আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছি। সঙ্গীতও আমাদের নিকট আত্মারই পরম বিকাশ। সেইজন্য হরিদাস, বৈজুবাওরা, নায়ক-গোপাল, তানসেন, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতবিশারদগণ আজও আমাদের মানস-মন্দিরে সত্যদ্রষ্টা ঋষি-রূপেই শ্রদ্ধা-অর্ঘ লাভ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার প্রণেতা স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হংসবাহিনী পদ্মারূঢ়া ভারতী। ভাস্কর্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। বীটপাল ও ধীমান আমাদের নিকট সামান্য পটুয়া বা ভাস্কর মাত্র নহেন, তাঁহারা সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক সত্যদ্রষ্টা যোগী। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত আমাদের দেশে ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত। এদেশে সত্য-সন্ধানের সাধনা কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডীতে বা সন্ন্যাসমার্গেই নিবদ্ধ নহে। রবীন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমাদের দেশে এই মুক্তি-সাধনা অনেক বিচিত্র প্রেরণায় বহু বিচিত্র পথে সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সাহিত্য-সাধনা সেই সত্য-অনুসন্ধানেরই একটি পথ।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই এদেশের সাহিত্য-সাধনা—বস্তুত সর্বপ্রকার শিল্প-সাধনাই, যুগে যুগে নানাবর্ণের আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। বেদের যুগ, উপনিষদের যুগ, বৌদ্ধ যুগ, পাঠান যুগ, মোগল যুগ এবং ইংরেজি যুগ—আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভাকে যুগে যুগে নিজ নিজ স্বকীয়তায় আবিষ্ট করিয়াছে। যাঁহারা প্রথম-শ্রেণীর কবি তাঁহারা সেই যুগ-ধর্মের আবহাওয়াতে সেই বিশেষ যুগের মানব-মানবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার উপাদান লইয়াই কাব্য-সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টিতে এমন একটি সুর বাজিয়াছে যাহা শাশ্বত, যাহার বাণী সেই বিশেষ যুগের সহিতই স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, যাহা আজও পিপাসিত মানব-মানবীর নিকট চিরন্তন সুধার প্রস্রবণরূপে বিরাজ করিতেছে, যাহার দিগ্‌দর্শন আজও আদর্শ মানব সভ্যতারই দিগ্‌দর্শনরূপে আদৃত।

কবি প্রেমচন্দজী এইরূপ একজন প্রথম শ্রেণীর সত্য-সন্ধী সাহিত্য-সাধক ছিলেন। যে যুগে যে পারিপার্শ্বিকে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি জীবন-যাপন করিয়াছিলেন সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা সে যুগের আনন্দ-বেদনা সে যুগের পুণ্য-পাপ তাঁহার দিব্য প্রতিভার স্পর্শে শুধু যে অপরূপ কাব্য-সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নয় সে যুগের নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানব-আত্মার মর্মবাণী তাঁহার সৃষ্টিতে আগামী যুগের মানব-সমাজের জন্যও সত্যের পাথেয় রাখিয়া গিয়াছে। সে-সত্য এমনই তীক্ষ্ণ যে তাহা 'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।'

প্রেমচন্দজীর সমগ্র সৃষ্টির সম্যক আলোচনা করা এ সভায় সম্ভব নহে। বহু যোগ্য লেখক তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে প্রেমচন্দজী মানবতার কবি ছিলেন। কবি চণ্ডীদাসের মতোই ইনি নিজের সৃষ্টিতে নিজস্ব ভঙ্গীতে ইহাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' অনেকে প্রেমচন্দজীকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। অনেকে ইহাও বলেন যে তিনি নাকি এদেশের ম্যাক্সিম্ গোর্কি। এসব তুলনা অর্থহীন। কমল কমলই, তাহার সহিত গোলাপের কিছু সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে সাদৃশ্য দ্বারা কমলের মহিমা নির্ণীত হয় না। প্রত্যেক সাহিত্য-স্রষ্টার মতো প্রেমচন্দজীও, নিজের গৌরবে, নিজের মহিমায়, নিজের বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই।

আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক দলও প্রেমচন্দজীকে আপন আপন স্বগোত্র মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা আমি বলিতেছি না। যে কোনও প্রথম শ্রেণীর লেখকের রচনার এমন একটা সার্বভৌমতা থাকে যে তাঁহার রচনা হইতে যে কোনও লোক, এমন কি শয়তানও নিজের স্বপক্ষে কিছু না কিছু যুক্তি আহরণ করিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা যে জগৎ সৃষ্টি করেন সে সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টির মতোই বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহাতে উচ্চনীচ, ভালোমন্দ, সর্বশ্রেণীর লোকই থাকে, সেখানে আলো এবং অন্ধকারের সমান আদর; পুণ্যাত্মা বা পাপী, শোষক বা শোষিত তাঁহার সৃষ্টির উপাদান মাত্র, নিখিল জগৎস্রষ্টার মতো কাব্যস্রষ্টাও তাহাদের শিল্প-রূপ দান করিয়া আনন্দিত হন। কিন্তু নিজে তিনি নির্বিকার। যে স্রষ্টা ঈশ্বরের মতো নিজের সৃষ্টিতে ওতপ্রোত থাকিয়াও নির্লিপ্ত তিনিই প্রথম শ্রেণীর কবি। প্রেমচন্দজী এই শ্রেণীরই কাব্য-স্রষ্টা ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সৃষ্টিতে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক মতবাদ আরোপ করিয়া আনন্দ পান তাঁহাদের কথা ভাবিলে অন্ধের হস্তীদর্শনের গল্পটি মনে পড়িয়া যায়। তিনজন অন্ধ একবার একটি হস্তীর সমীপবর্তী হইয়াছিল হস্তী কেমন তাহা জানিবার জন্য। যে অন্ধ হাতীর কানটা স্পর্শ করিল সে ভাবিল হাতী বুঝি কুলার মতো। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল সে চীৎকার করিয়া উঠিল, হাতী প্রকাণ্ড সাপের মতো। তৃতীয় অন্ধ হাতীর একটি পায়ে হাত দিয়াছিল, সে বলিল—আরে না, না, হাতী থামের মতো। যাঁহারা হাতীকে সমগ্রভাগে দেখিতে পান তাঁহারা জানেন হাতী সত্যই কি। তেমনি যাঁহারা সাহিত্যরসিক তাঁহারা জানেন প্রেমচন্দজী কি। তিনি দেশকালপাত্র দ্বারা আবদ্ধ নহেন, তিনি কোনও বিশেষ ভাষাভাষীর সম্পত্তি নহেন, আমরণ দুরূহ তপস্যা দ্বারা যে লোকে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা স্বর্গলোক অপেক্ষাও গরীয়ান, তাহা প্রেম-লোক। ধনপৎ রায় বা নবাব রায় তাই আজ প্রেমচন্দে রূপান্তরিত, তাঁহার আসন আজ যে কোনও সিংহাসন হতেই মহত্তর কারণ তাহা কবির আসন। আমাদের দেশে কবির বড় সম্মান, এদেশে স্বয়ং ভগবানও কবির আসন পাইবার জন্য আগ্রহশীল।

প্রেমচন্দজীর পুণ্য মৃত্যু-তিথিতে আজ তাই আমার একান্ত অনুরোধ তাঁহার মহিমাকে আমরা যেন খণ্ডিত করিয়া না দেখি—তাঁহার সমগ্র সম্পূর্ণতার মধ্যেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস যেন আমরা করি।

কিন্তু একটা খট্‌কা লাগিল।

'মৃত্যু-তিথি' শব্দটি লিখিয়াই আমার মনে প্রশ্ন জাগিল—সত্যই কি প্রেমচন্দের মৃত্যু হইয়াছে? এই স্বাধীন ভারতে কি তিনি বাঁচিয়া নাই? স্মারক-স্মৃতি-স্তম্ভের প্রাণহীন পাষাণ স্তূপে কি তাঁহার বাণীর অজস্র ধারা শেষ হইয়া গেল?

ঠিক এই সময়ে দ্বারে কে যেন করাঘাত করিল।

"ভিতরে আসতে পারি কি?"

"আসুন—"

দ্বার ঠেলিয়া এক সৌম্য গৌরবর্ণ পুরুষ প্রবেশ করিলেন। মুখের উপর এক জোড়া পৌরুষ-ব্যঞ্জক ঘন-গুম্ফ, চক্ষুর দৃষ্টি হাস্য-প্রদীপ্ত।

"নমস্কার—"

"নমস্কার। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

"আমি প্রেমচন্দ।"

বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলাম। তাহার পর সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।

প্রেমচন্দজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা তাহলে ঠিকই ক'রে ফেলেছেন যে, আমি মরে গেছি?···আপনার তো অন্তত জানা উচিত যে আমি মরিনি।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া—"আমি মরিনি, বরং আমি আরও প্রসারিত হ'তে চাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ভাষার কারাগারে আমি বন্দী হয়ে গেছি। ভারতের প্রতি পুরুষ নারী বালক বৃদ্ধ যুবার অন্তরে আমি প্রবেশ করতে চাই, শুধু ভারতেই-বা কেন বিশ্বের প্রতিটি লোকের হৃদয় স্পর্শ করতে চাই আমি। কিন্তু পারছি না, বন্দী হয়ে আছি। আপনি কি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"

নিজের চক্ষু কর্ণকে আমি যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। নির্বাক হইয়া রহিলাম।

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া প্রেমচন্দজী বলিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যিই আমি প্রেমচন্দ! এই দেখুন, যাদের আমি ভালবাসতাম তাদের আজও আমি বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি—"

শ্রীরামভক্ত মহাবীরজী একদা যেমন বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে রামসীতার যুগল মূর্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে প্রেমচন্দজী তেমনি তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখাইলেন, সবিস্ময়ে দেখিলাম—এক বিরাট জীবন্ত জগত—গ্রাম্য কৃষক, মজুর পাশী, তামাক-ওলা, এক্কা ওলা, ধূর্ত বণিক, সুদখোর ধনী, শোষক জমিদার, দোকানদার, পাণ্ডা, পুঁজিপতি, নববধূ, গ্রাম্য কিশোরী, বৃদ্ধা, সতী-অসতী—সব।

ইহাদেরই মধ্যে দেখিলাম হোরি, গোবর, ঝুনিয়া, পুনিয়া, রায় সাহেব, মালতী, খন্না, ঘিসু, মাধো, বুধিয়া, হলকু, সুরদাস, নির্মলা, তোতারাম, মনসা-রাম, প্রেমশঙ্করবাবু—এমন কি টমি এবং জাবরাও। সকলেই নিজ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত—

যেই আমি প্রেমচন্দজিকে কিছু বলিতে যাইব অমনি তিনি অন্তর্ধান করিলেন। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তাহার পর প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে কালজয়ী অমর, আমারই ভুল, তোমার মৃত্যু হয় নাই, তুমি মৃত্যুঞ্জয়।"*

আমরা বাঙালী

আসামে বাঙালীদের উপর যে অবর্ণনীয় অকথ্য বীভৎস অত্যাচার হয়েছে তাতে আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়েছি, আমাদের সকলেরই মনে সন্দেহ জেগেছে এই স্বাধীন ভারতে আমরা আর ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে পারব কিনা। আসামের বাঙালীদের প্রতি অনেকে অনেক রকম উপদেশ বর্ষণ করছেন। অনেক কুম্ভীরের চোখ দিয়েই অশ্রু ঝরছে দেখতে পাচ্ছি। ভুয়ো অহিংসা এবং মেকি প্রেমের মন্ত্রও আওড়াচ্ছেন অনেকে। হঠাৎ চমকে উঠলাম এক বাঙালী লেখকের লেখা পড়ে। তিনি লিখেছেন এর জন্যে বাঙালীরাই না কি দায়ী! বাঙালীদের অনেক দোষ কীর্তন করে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, বাঙালীরা নাকি কলহপরায়ণ, স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর বলেই এই উচিত শাস্তি পেয়েছে। তিনি বলেছেন যে, বাঙালীদের স্বাজাত্যবোধ বড বেশী উগ্র, তারা আত্মম্ভরী, তাদের উচ্চম্মন্যতা (Superiority Complex) আকাশচুম্বী, তারা আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না। সুতরাং যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যে তিনি ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ তো হনই নি, তার সমর্থনই করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন সব প্রদেশ থেকে বাঙালীরাই কেবল বিতাড়িত হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই তাদের দোষ।

তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে। বাঙালীদের যে সব দোষ তাঁর চোখে পড়েছে সে সব দোষ কি অন্য প্রদেশবাসীর নেই? স্বাজাত্যবোধ কি দোষের? আমরা বাঙালী বলে যদি গর্ব অনুভব না করতে পারি ভারতবাসী বলেই বা তাহলে গর্ব অনুভব করব কোন যুক্তি অনুসারে? পৃথিবীর কোন্ সভ্য-দেশবাসী এ দোষে দুষ্ট নয়? আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি আত্মম্ভরী নন? তিনি কি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে এমন সব কাণ্ড ক'রে বসেন না যা অনেক সময় শোভনতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে যায়? তা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা ভালবাসি এবং সম্মান করি কেন? বাঙালীর উচ্চম্মন্যতা কি ভুয়ো জিনিস? তার গর্ব করবার মতো কিছুই কি নেই? যদি থাকে তাহলে তা নিয়ে সে গর্ব করবে না কেন? সবাই তো করে। গর্ব করবার শিক্ষাই তো আমরা পেয়েছি

* বারাণসীতে নাগরী প্রচারিণী সভায় প্রেমচন্দের স্মারক-সভায় প্রদত্ত ভাষণ

পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ থেকে। কে না নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছে? সরকারী আত্মপ্রচার কি তাঁর চোখে পড়ে নি বা কানে ঢোকেনি? জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, সংসারে বেঁচে থাকতে হলে নিজেকে জাহির করতেই হবে। যে কারণে সিংহ গর্জন করে, সাপ ফণা তোলে, ময়ূর পেখম মেলে, পাপিয়া গান গায় ঠিক সেই কারণেই মানুষও আত্মপ্রচার করে। তার এ প্রচার বহুমুখী। ওটা পশু-নীতি সন্দেহ নেই, কিন্তু সংসারে থাকতে হলে ও নীতি অবলম্বন করতেই হয়। সবাই করে, এর জন্য শুধু বাঙালীকেই দোষী করা কেন?

সব প্রদেশ থেকে শুধু বাঙালীদেরই বিতাড়ন করা হচ্ছে কেন এর কারণ লেখক মশাইয়ের কাছে এখনও অস্পষ্ট আছে দেখে বিস্মিত হলাম। আশা করেছিলাম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসটা তাঁর জানা আছে। তিনি কি জানেন না ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের একমাত্র শত্রু ছিল বাঙালী? বাংলা দেশেই স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, বাঙালী ছেলেমেয়েরা দেশের জন্যে দলে দলে প্রাণ বিসর্জন করেছিল। ইংরেজ এ শত্রুতার শোধও নিয়েছেন ভীষণভাবে। অগ্নি-মন্ত্রের সাধকদের যে নির্যাতন তাঁরা করেছেন তা ভয়াবহ। সে ইতিহাস যদি পড়ে দেখেন শিউরে উঠবেন। সেই মার আমরা এখনও খাচ্ছি আমাদের স্বদেশবাসীরই হাত দিয়ে। কারণ প্রাদেশিকতার বীজ তাঁরাই বপন করে গিয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বিষ তাঁরাই ছড়িয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর দল ইংরেজদের শত্রু ছিলেন না, বন্ধু ছিলেন, তাদের সঙ্গে প্রেম-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চেয়েছিলেন। তাই ওঁরা জেল খেটে-ছিলেন বটে, কিন্তু নির্যাতিত হননি। বরং জেলে বসে ওঁরা যে কায়িক সুখ ভোগ করেছিলেন তা অনেকের পক্ষেই জেলের বাইরে দুর্লভ। পারিপার্শ্বিক ঘটনা-পরম্পরার চাপে ইংরেজ তাই যখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলেন তখন তাঁদের বন্ধুদেরই গদিতে বসিয়ে গেলেন আর বাঙালীকে ধ্বংস করবার জন্যে দেশটা ভাগ ক'রে দিয়ে গেলেন। তাঁরা যে প্রাদেশিকতার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, এঁরা তার চারাকে তাই সমূলে উৎখাত না করে সার দিয়ে পুষ্ট করেছেন। সত্যিকার দেশ-প্রেমিক বাঙালীর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক অনেক আগেই ছিন্ন হয়েছে। এখন যাঁরা গদিতে সমাসীন বাঙালীদের প্রতি তাঁদের মনোভাব ইংরেজদেরই মনোভাবের মতো। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাষা ও সাহিত্যকেও তাঁরা বাঙালীদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। বাংলার বাইরে কোথাও তার স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না, কারণ করলে নিজেরাই পৃথিবীর চক্ষে হেয় হয়ে যাবেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর প্রতি তাঁদের আচরণ বিদ্বেষভাবাপন্ন। লেখক মশাইকে অনুরোধ করছি—বাঙালীদের সম্বন্ধে তিনি সশ্রদ্ধ হোন। 'আমরা বাঙালী' এ গর্ববোধ যদি আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা অপর প্রদেশবাসীর ন্যায্য স্বাজাত্যবোধকেও সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারব না। আমরা ভারতবাসী এ আস্ফালনও শূন্যগর্ভ বলে মনে হবে। আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে যদি আমরা সচেতন না থাকি,

তাহলে আমরা বানের জলে পচা খড়ের মতো ভেসে বেড়াব, জীবন্ত বনস্পতির মর্যাদা কখনও পাব না।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ বহুকাল আগে যা বলেছিলেন, তা উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"প্রেম বিস্তারের একটা বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই প্রসারিত হওয়া। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া আসর জমাইয়া বসে তবে সে প্রেমের ভিতর কোনও পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই—তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর মাত্র। এ সকল ইঁচড়ে-পাকা প্রেম, হাঁটিতে শিখিবার পূর্বেই দৌড়িতে ও লম্ফ দিতে আরম্ভ করে। আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না পাইতেই অপর লোককে মা-বাপ বলিতে শেখে। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ কেহ বলেন, সার্বভৌমিক উদারতা, কেহ বলেন, বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা, আমরা বলি, গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি‥"।

বাংলার বাহিরে বাঙালীর শিক্ষা-সমস্যা

কিছুদিন পূর্বে যখন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির আন্দোলন হয়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয়ে বাঙালী লেখকদের সম্মতি সংগ্রহ করেছিলেন। অনেক লেখক সম্মতি দিয়েছিলেন, আমিও দিয়েছিলাম। আমি দিয়েছিলাম কিন্তু একটি শর্তে। আমার সম্মতির কথাটা কাগজে বেরিয়েছিল কিন্তু শর্তের কথাটা বেরোয়নি। আমার শর্ত ছিল—সংযুক্ত বঙ্গ-বিহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভার সম্পূর্ণরূপে বাঙালীদের হাতে থাকবে। ডাক্তার রায় খবরের কাগজের মারফৎ এ আশ্বাস পূর্বেই দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম এ আশ্বাস শুধু কাগজে নিবদ্ধ থাকলেই চলবে না, কাজে করতে হবে। বাঙালী ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষার ভার বাঙালীদের হাতেই ন্যস্ত করতে হবে। এ ঘটনার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিচত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতিরূপে আমি বলেছিলাম—"আমরা তিন পুরুষ বিহারে বাস করছি। আমার জন্ম বিহারে, বিহারী সমাজে এবং বিহারী পরিবেশেই আমি মানুষ হয়েছি, তাদের মধ্যে থেকেই আমি সাহিত্যচর্চা করেছি, অন্নসংস্থানও করছি। তাদের আমি ভালবাসি, তাদের মহত্ত্বে ও সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করি। বিহারী জনসাধারণও বাঙালীদের মতোই গুণগ্রাহী এবং সাহিত্যরসিক। কিন্তু ভয় করি আমি রাজনৈতিক নেতাদের। তাঁরাই যত গণ্ড-গোলের মূল। বিহার-বাংলার একীকরণ শুভ ফলপ্রসূ হবে বলেই মনে হয় যদি তাতে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবার সুযোগ থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর বিবৃতিতে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে, সে সুযোগ থাকবে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের নিরাপত্তার জন্যে সংবিধানে তাঁরা রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখবেন। এইখানেই আমার একটু ভয় আছে। সংবিধানে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা থাকলেই তা যে বর্ণে বর্ণে পালিত হবে এ প্রত্যয় অন্তত বিহারবাসী বাঙালীদের নেই। এখনই সংবিধানে সংখ্যা-লঘু-সম্প্রদায়ের জন্য যে সব উদার আইন আছে সে সব যদি ঠিকভাবে অনুসৃত হতো তাহলে বিহারবাসী বাঙালীদের মন এত বিষিয়ে উঠত না। বিহারে হিন্দী ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য যে খরচ বিহার গভর্ণমেণ্ট করছেন, শুধু বিহারেই বা কেন, সমস্ত ভারতে হিন্দী ভাষা প্রচার করবার জন্য যে খরচ ভারত গভর্ণমেণ্টও করছেন অন্য ভাষার জন্য তার সিকির সিকিও করেন নি। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, হিন্দী ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছে। আর্থিক এবং রাজনৈতিক চেষ্টা তো হয়েছেই, শারীরিক বলপ্রয়োগ করাও হয়েছে এমন সংবাদও খবরের কাগজে পড়েছি। বিহারে বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া করবার সুযোগ খুব কম বিদ্যালয়ে আছে, যেসব বিদ্যালয়ে আছে সেগুলি শাসকসম্প্রদায়ের কৃপাদৃষ্টি-বঞ্চিত। যে সব বিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয় সেখানকার পাঠ্যপুস্তকগুলি বাংলা হরফে মুদ্রিত বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মর্যাদার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রন্থকর্তারা প্রায়ই অবাঙালী। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক কলেজেই বাংলা পড়াবার অধ্যাপক নেই। হাজারিবাগ কলেজে শুনেছি প্রায় শতকরা ৫ জন মুসলমান ছাত্রের জন্য দু'জন উর্দু'র প্রফেসার আছেন কিন্তু প্রায় শতকরা ২০ জন বাঙালী ছাত্রের জন্য একজনও বাংলার প্রফেসার নেই। বিহারের অনেক কলেজ সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। ইংলণ্ডে জার্মানীতে বাংলা পড়াবার অধ্যাপক আছে, কিন্তু বাংলার প্রতিবেশী বিহারে নেই। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পূর্বে গভর্ণমেণ্টের কাছে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য পেত, এখন তারা তার বদলে পায় কিছু হিন্দী বই। বাঙালী ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেও যথোচিত সম্মান পায়নি এরকম একাধিক উদাহরণ আমার জানা আছে। যেখানে প্রতিযোগিতা দ্বারা যোগ্যতা নির্ণীত হয় সেখানে কিছু কিছু চাকরি বাঙালীরা পায়, কিম্বা যেখানে যোগ্য বিহারী দুর্লভ সেখানেও পায়, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে বাঙালীর ছেলের চাকরি পাওয়ার আশা নেই, এমন কি নিয়োগকর্তা যদি বাঙালীও হন তবু তিনি যোগ্য বাঙালীকে চাকরি দিতে ভয় পান। হিন্দী সর্বসম্মতিক্রমে এখনও রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হয়নি, এ বিষয়ে প্রচুর মতভেদ এখনও আছে, কিন্তু বিহারী নেতারা তাঁদের ভাষণে বলতে কসুর করছেন না যে, হিন্দীই ভারতের জাতীয় ভাষা, National language। সংবিধানে ১৪টি ভাষা National language রূপে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাকি তেরোটিকে কোণঠাসা করবার প্রয়াসের অভাব নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রভাষা আর National language যে এক জিনিস নয় তা ওঁরা মানতেই চাইছেন না। বাঙালী সাহিত্যিকদের বই বিহারী প্রকাশকরা বিনামূল্যে এবং বিনা

অনুমতিতে ছেপে যাচ্ছেন। দেশের আইন নাকি ওঁদের পক্ষে। বিনা প্রতিবাদে ও প্রতিকারে এই সব অনাচার ও অত্যাচার বাংলা ভাষার উপর চলছে। এ নিয়ে যে সব সাহিত্যিক দিক-পালদের আন্দোলন করা উচিত, পুরস্কারের নামে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের বাৎসরিক কিছু টাকা দিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করেছেন। সাহিত্যিকরা এখন গভর্ণমেণ্টের ধামাধরাদের পর্যায়ে গিয়ে পড়ছেন। এই সব কারণে মনে হচ্ছে রক্ষা-কবচের কাগজী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অনেকে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, তাঁদের ভয় হচ্ছে হিন্দী অটোক্র্যাসি মদমত্ত মাতঙ্গের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পদ্মবনকে বিদলিত করবে ··"

সংযুক্ত বঙ্গ-বিহারে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পাবে ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে এই আশ্বাস পাবার পরই আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। বস্তুত, ওই শর্তেই সম্মতি দিয়েছিলাম।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্ত হয়নি। বিহারবাসী বাঙালীদের অবস্থা সুতরাং আরও শোচনীয় হয়ে আসছে। সম্প্রতি বিহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছেন অদূর ভবিষ্যতে (১৯৬০-এর পর থেকে) বিহারের বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা আর মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও করতে পারবে না, পরীক্ষাও দিতে পারবে না। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে তারা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারে বটে, কিন্তু তার পরই যদি তাদের হিন্দী পড়তে বাধ্য করা হয় তাহলে তাদের যে কতটা অসুবিধা হবে তা সহজেই অনুমেয়। এর ফলে তারা ম্যাট্রিকুলেশনেও আর বাংলা পড়বে না, হিন্দীই পড়বে। অর্থাৎ বাঙালী ছেলে-মেয়েদের বাংলা-ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে হবে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যই বাঙালীর একমাত্র সম্পদ। এর থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের আর একটা অসুবিধা তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি অতিশয় নিম্ন শ্রেণীর। বাংলাভাষার মর্যাদার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, হরফগুলো শুধু বাংলা, তাও ছাপার ভুলে কণ্টকিত। দ্বিতীয়তঃ এই বইও সময়মতো ছাপা হয় না এবং বাজারে পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলে-মেয়েদের বাধ্য হয়ে হিন্দী বইই কিনতে হয়। অ-হিন্দীভাষী ছেলে-মেয়েদের হিন্দী শেখাবার এও কি একটা কৌশল না কি!

এখন এর প্রতিকার কি?

এ বিষয়ে আমার যা মনে হয়েছে, বলছি :—

(১) দেশব্যাপী আন্দোলন ক'রে বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রভাবিত করা,—যাতে তাঁরা আমাদের মাতৃ-ভাষার-মাধ্যমে পড়াশোনা করবার ব্যবস্থা করেন এবং পাঠ্য-পুস্তকগুলি যাতে সুনির্বাচিত হয়ে ঠিক সময়ে বাজারে বেরোয় সেদিকে দৃষ্টি দেন।

(২) বিহার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যদি কিছুতেই প্রভাবিত করা সম্ভব না হয় তাহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নিতে বলা উচিত। এটা তাঁরা দু'রকম উপায়ে করতে পারেন। (ক) বাংলার বাইরের

কোন শিক্ষালয় (কলেজ বা স্কুল) যদি বাঙালী-প্রধান হয় এবং তারা যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাহলে তাদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের দেশেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ, জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পড়া হয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরীক্ষা নেন, সার্টিফিকেট দেন। এতে কোন বাধা হয় না। ভারতবর্ষে বসে যদি কেম্ব্রিজের পরীক্ষা দেওয়া চলতে পারে বিহারে বসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া কেন চলবে না তা তো সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। এর বিরোধী যদি কোন আইন থাকে তাহলে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত। আমার তো মনে হয় এই সব বাংলাভাষী স্কুল কলেজগুলিকে পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যও করা উচিত শিক্ষা দপ্তর থেকে। বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য তাঁরা অনেক খরচ করেন শুনেছি, এটাও তার অঙ্গ হওয়া উচিত। তাঁদের মনে রাখা উচিত বাঙালীর শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার বাইরের বাঙালীর দানও কম নয়। (খ) কোনও বাঙালী ছাত্র বা ছাত্রী যদি বাড়ীতে বসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে চায় তাহলে তাদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত। এ সুযোগ আছে শুনেছি, কিন্তু কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। মুশকিল হয় বিজ্ঞান পড়া-শোনায়। তার জন্যে ল্যাবরেটরি অপরিহার্য। কিন্তু তারও একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হতে পারে কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন। আমরা বিহার-বাসী বাঙালীরা ঘটনাচক্রে বিহার নামক ভূখণ্ডে বাস করি বলে এবং রাজনৈতিক দাবা খেলায় বিহার গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আছি বলে আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সব বিসর্জন দিতে হবে? বাংলাদেশও কি আমাদের পর করে দিতে চান? এক রাজনৈতিক দাবাখেলায় আমরা বাংলাদেশের অর্ধেককে পূর্ব পাকিস্তান করে পর করে দিয়েছি, আর এক চালে ঐতিহাসিক বাঙলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি, (যথা পূর্ণিয়া, সিংভূম প্রভৃতি) মূল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর হতে বসেছে। বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়রা তাদের বাংলায় পড়াশুনা পর্যন্ত করতে দিতে নারাজ। খাস কলকাতা সহরেই শুনছি অবাঙালীরাই এক সাহিত্য ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে হর্তাকর্তা বিধাতা। সাহিত্য ক্ষেত্রেও অবাঙালীরা আমাদের বানচাল করে দেবার নানা উপায় অবলম্বন করছে, নেপথ্যে এবং প্রকাশ্যে। যে স্বাধীনতার জন্যে বাঙালী একদিন সর্বস্ব পণ করেছিল সে স্বাধীনতা পেয়ে তার কি লাভ হয়েছে? অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, চাকরি নেই। শেষে কি তার মাতৃভাষাটাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে? ট্যাক্সভারে জর্জরিত হয়ে শুধু কি আমরা কতকগুলো চোর-জুয়াচোর সৃষ্টি করবারই সাহায্য করে যাব?

বাংলার বাইরে বাঙালীদের এই মহতী বিনষ্টির বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা-ভাষাভাষীদেরই বদ্ধপরিকর হতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের বাঙালীদের। বিহারবাসী বাঙালীরা বিহারীদের অন্ন-দাস হয়ে পড়েছে, তাদের বুক ফেটে গেলেও মুখ খোলবার উপায় নেই, সাহস নেই।

বাংলাদেশের সব নেতারা যত্রতত্র বক্তৃতা করছেন যে, ভারতের ঐক্য, ভারতের

সংহতি যেন নষ্ট না হয়। কিন্তু যে সব ছোট ছোট কাঁটা এই কাল্পনিক ঐক্য-বেলুনকে ক্ষত-বিক্ষত করছে সে সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন। ভাষা সমস্যার যদি সন্তোষজনক সমাধান তাঁরা না করতে পারেন, তাহলে এই ঐক্য হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। নিজের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি কেউ বিসর্জন দিতে রাজি হবে না।

বাঙালী জাতির শুভানুধ্যায়ী যাঁরা, তাঁদের দৃষ্টি আমি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম-বার্ষিকীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ইহা আমি জানি, সভায় এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে একটা সস্তা নাটকীয়তা আছে, ইহাও সুবিদিত যে নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করাই শ্রদ্ধা নিবেদনের শোভন ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কিন্তু তবু আমরা এই সভার আয়োজন করিয়াছি, প্রতিবৎসরই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়, ইহার কারণ সরবে শ্রদ্ধা নিবেদন না করিলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। সর্বকালে সর্বদেশে এই নিয়মই প্রচলিত।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

বেদগুলি ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতিগুলিও তাই। মুনিদের মধ্যেই প্রবল মত ভেদ, ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ।

মহাজনদের পথ অনুসরণ করিয়া তাই আজ আমরা ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলিতেছি—হে কীর্তিমান, আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। আমাদের পূর্ববর্তী কোনও ঋষি কবি শ্রদ্ধাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মাধ্যন্দিনং পরি
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিরুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ মাম্‌।

হে শ্রদ্ধা তোমাকে আমরা প্রাতে, মধ্যদিনে এবং সূর্যাস্তকালে পূজা করি। হে শ্রদ্ধা, তুমি আমাকে শ্রদ্ধাবান কর।

তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও আজ বলি—হে শ্রদ্ধেয়, তোমাকে আমরা প্রাতে, মধ্যদিনে এবং সূর্যাস্তকালে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। হে গুণি, তোমার আদর্শ আমাদিগকে মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান করুক।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আপনাদের প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন কর্মী ও হিতৈষী—স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যরতন চক্রবর্তী মহাশয় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথের জীবন-কথায় লিখিয়াছেন "উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ভারতবর্ষে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাহার প্রভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জড়বাদ এবং প্রাচ্যের এক মহত্তম জীবনবোধ ও অধ্যাত্মবাদের সংঘাতে নূতন এক শ্রেয়োবোধের বিকাশ তখনকার তরুণদের মনকে অধিকার করিয়া লইল ·····অতি তরুণ বয়সে যখন নরেন্দ্রনাথ কুমিল্লার ছাত্র তখন হইতেই এই নবজাগরণের ডাক তাঁহার প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছিল। 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবী চেতনা তাঁহার তরুণ প্রাণকে প্রভাবিত করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতেন তখন এই পথের কর্ম্মী ছিলেন ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমূল্য উকিল, বাঘা যতীন, ডাঃ দাশগুপ্ত—ইঁহাদের সঙ্গে রাজনৈতিক অভিমত এবং পন্থা বিষয়ে প্রায়ই তাঁহার আলাপ আলোচনা হইত সঙ্গোপনে, কিন্তু তিনি অগ্রণী হইয়া সক্রিয়ভাবে ইহাদের কাজে অংশ গ্রহণ করেন নাই।"

এই যুগের অধিকাংশ স্বদেশপ্রাণ কর্মীই হয় প্রত্যক্ষভাবে না হয় পরোক্ষভাবে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। যদিও তিনি সক্রিয়ভাবে ইহাদের কাজে অংশগ্রহণ করেন নাই কিন্তু এই আদর্শের মহান প্রভাব তাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'—এই ছিল সে আদর্শ। মন্ত্রের সাধন করিতে হইলে যে তপস্যা প্রয়োজন বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ সেই তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সে তপস্যার মূল লক্ষ্য আত্মোৎকর্ষ। এই আত্মোৎকর্ষই কর্মযোগীর প্রধান অবলম্বন। নরেন্দ্রনাথ সত্যই একজন কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, যে আত্মসম্মানের ভিত্তির উপর না দাঁড়াইতে পারিলে আত্মোৎকর্ষ সম্ভব হয় না সেই আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি কি কৃচ্ছ্র-সাধনই না করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তিনি উপার্জন করিয়াছেন, মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় রাত্রে খিদিরপুর ডকে কুলির কাজ করিয়া নিজের খরচ নির্বাহ করিয়াছেন, তবুও অর্থের জন্য কাহারও নিকট হাত পাতেন নাই, এমন কি নিজের পিতার নিকটও নয়। তাঁহার এই অটল আত্মসম্মান তাঁহার প্রকৃত স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। নিজের প্রয়োজনের জন্য কাহারও নিকট প্রার্থী হইব না, কাহারও নিকট মাথা নত করিব না, নিজের যাহা প্রয়োজন তাহা সসম্মানে নিজের শক্তিতেই অর্জন করিব—এই নীতিই তাঁহাকে আমরণ চালিত করিয়াছে। এই অনড় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, অনলস কর্মী হইতে হইবে এবং সে কর্মের লক্ষ্য হইবে দেশের ও দশের হিতসাধন। নিজের স্বার্থের জন্য পশুরাও কর্ম করে, কিন্তু মানুষের কর্মের লক্ষ্য পরার্থ, কর্মী উপলক্ষ মাত্র।

এই যে শিক্ষা, আদর্শের পথে নির্ভীক পদক্ষেপ করিবার এই যে উৎসাহ ইহার উৎস কোথায়? আমার বিশ্বাস ইহার উৎস সে যুগের অনুশীলন সমিতি, সে যুগের শিক্ষকদের আন্তরিক প্রয়াস এবং আদর্শ চরিত্র।

আর একটা প্রবল উৎসও ছিল। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মের প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে আর এক নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হন। আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবও ক্যাপ্টেন দত্তকে কম উদ্বুদ্ধ করে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'কর্ম্মযোগ' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন ক্যাপ্টেন দত্তের জীবনে ও কর্মে তাহা যেন প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

ক্যাপ্টেন দত্তের বাল্য ও কৈশোর জীবনে এমন কি তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভেও তাঁহাকে দারিদ্র্য ও দুঃখের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। স্বামীজি তাঁহার কর্ম্মযোগ প্রবন্ধে গোড়াতেই বলিয়াছেন—

"In studying the great characters the world has produced, I dare say, in the vast majority of cases, it would be found that it was misery that taught more than happiness, it was proverty that taught more that wealth, it was blows that brought out their inner fire more than praise."

ইহার ভাবার্থ :—পৃথিবীর মহৎ চরিত্রগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে সুখ নয়, দুঃখই তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষক, আর্থিক সাচ্ছন্দ্য নয় কঠোর দারিদ্র্যই তাঁহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। প্রশংসায় নয় কঠোর আঘাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি, তাঁহাদের উজ্জ্বল চরিত্রমহিমা।

ক্যাপ্টেন দত্ত একজন আদর্শ কর্মী ছিলেন। এই কর্মের আদর্শকে তিনি কল্পনাতেই নিবদ্ধ রাখেন নাই, বাস্তবেও মূর্ত করিয়াছিলেন।

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।

গীতার এই মহাবাণীর অর্থ—যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ, বাক্য প্রভৃতি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় স্মরণ পূর্বক অবস্থান করে তাহাকে মিথ্যাচারী বলে।

ক্যাপ্টেন দত্ত কখনও নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, পঞ্চেন্দ্রিয়কে সার্থক ভাবে নিযুক্ত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা আজ সুবিদিত। আলস্যজনিত মিথ্যাচারের প্রতিবাদ তিনি তাঁহার সারাজীবন দিয়া করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজির 'কর্ম্মযোগ' প্রবন্ধের একস্থানে আছে :—

"Even the lowest forms of work are not to be despised, let the man who knows no better, work for selfish ends, for name and

fame ; but everyone should always try to get towards higher and higher motives and to understand them."

ইহার ভাবার্থ :—হীনতম কাজকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। যাহাদের উচ্চাদর্শ নাই তাহারা নাম এবং যশের জন্যই কার্যে প্রবৃত্ত হোক। কিন্তু প্রত্যেকেরই উচিত কর্মযোগের উচ্চাদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখা। এই উচ্চাদর্শের কথা গীতায় আছে "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।"

ক্যাপ্টেন দত্তের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যদিও তিনি প্রথম জীবনে স্বার্থ, নাম ও যশের জন্যই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ক্রমশ কর্মযোগের উচ্চাদর্শমহিমা তাঁহার কর্মজীবনকে আলোকিত এবং কর্মপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তাহা যদি না করিত তাহা হইলে তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিসের সুখময় পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে মরণোন্মুখ বেঙ্গল ইমিউনিটির দুর্বহ ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতেন না।

দুঃখকে এবং বিপদকে তিনি কখনও ভয় করেন নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতার বাণী

আরও, আরও, প্রভু আরও আরও
এমনি করে আমায় মারো, মারো।

কিম্বা

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে যেন করিতে পারি জয়

তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল, বিপদকে বা দুঃখকে তিনি ভয় করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন বিপদ বা দুঃখ যতই নিদারুণ হোক না কেন তিনি চরিত্র বলে তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

স্বামীজির 'কর্ম্মযোগ' প্রবন্ধে আছে—"To advance we must have faith in ourselves first and then in God. He who has no faith in himself can never have faith in God."

জীবনে উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে আত্মবিশ্বাস চাই, তাহার পর ঈশ্বরে বিশ্বাস। যাহার আত্মবিশ্বাস নাই তাহার জীবনে ভগবৎ বিশ্বাসও আসিতে পারে না।

এই আত্মবিশ্বাস নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। They can conquer who believe they can, মহাকবি ভার্জিলের এই উক্তির যাথার্থ্য নরেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা প্রমাণিত হইতে দেখিয়াছি। এই আত্মবিশ্বাসের বলেই শত প্রতিকূলতার মধ্যে নানা সঙ্কটের জটিলতা ভেদ করিয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে জয়ী হইয়াছেন। তাঁহার কর্মকুশলতা, কর্মী নির্বাচনে তাঁহার দূরদৃষ্টি, তাঁহার প্রবল আত্মসম্মানবোধ, বিরাট আদর্শের প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই তিনি বেঙ্গল-ইমিউনিটির মতো

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে রূপ দিতে পারিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ে নরেন্দ্রনাথের মতো কর্মবীরের জীবনী আলোচনা করার প্রয়োজন। বাংলার যে সব সুসন্তান একদিন শুধু বাংলার নয় সমস্ত ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া নিজেদের জগৎ-সুধী-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারি তাঁহারা কেবল যে প্রতিভাবান ছিলেন তাহা নয় তাঁহারা চরিত্রবানও ছিলেন। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথও এই যুগান্তকারী অগ্রণীদের একজন। হয়তো সৃষ্টিধর্মী প্রতিভায় ইনি অনেকের সমকক্ষ ছিলেন না কিন্তু চারিত্রিক বলে যে ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই জানিতে পারি। প্রতিভা ভগবানের দান কিন্তু চরিত্র মানুষ নিজে অর্জন করে। তাই প্রতিভাবান অপেক্ষা চরিত্রবান আমাদের দেশে বেশী পূজনীয়। কিন্তু এরূপ পূজনীয় ব্যক্তি আমাদের দেশে আজ কয়জন আছেন? বাঙ্গালীর আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, কর্ম নাই, কর্ম প্রেরণাও নাই! তাহার দেশ আজ দ্বিখণ্ডিত, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য আজ সে পায় না, তাহার ভাষা ও সাহিত্য আজ বিড়ম্বিত। তাহার কারণ তাহার চরিত্রের অভাব, তাহার মেরুদণ্ড নাই, সে সত্যকথা বলিতে ভয় পায়। অন্যায়কে অন্যায় বলিবার সাহস তাহার নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিবার শক্তি আজ সে হারাইয়াছে। তাহার বিজ্ঞানসভায় আজ অবিজ্ঞানীর ভীড়, তাহার সাহিত্য সভায় অসাহিত্যিকের প্রাধান্য। মিথ্যাচারপূর্ণ রাজনীতি লইয়াই সে আজ মাতিয়াছে, ভাবিয়াছে বুঝি এই প্রার্থনা-প্রধান রাজনীতিই তাহাকে ক্ষুধার অন্ন, আপিসের চাকরি এবং সামাজিক সর্বপ্রকার সুবিধা আনিয়া দিবে। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে সৎচরিত্রজাত শক্তি না থাকিলে পৃথিবীতে অতি তুচ্ছ সাংসারিক সুখও মেলে না। সুবিধাবাদী মতলববাজরাই ক্ষীণশক্তি ক্ষীণকণ্ঠ দুর্বলদের উপর অত্যাচার করিয়া নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করে। এখনও তাহাই হইতেছে। 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' এই মহামন্ত্র আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি প্রাথমিক গ্রন্থেও যে সকল মনুষ্যত্ব-দ্যোতক নীতিকথার বাণী শিখিয়াছিলাম তাহাও আর আমাদের মনে নাই। আমরা সত্য কথা বলিতে অপারগ, পরের দ্রব্যে আমাদের লোভের অন্ত নাই। পরশ্রীকাতরতা আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে। আজ আমাদের দক্ষতা কেবল সিনেমা এবং সাহিত্যের নামে ন্যক্কারজনক কামনা উদ্গারে। উচ্চাদর্শের কথা এখন হাস্যকর। অন্য প্রদেশবাসীর সাহায্য না পাইলে আমাদের সংসার চলে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাও অচল হইয়া পড়ে। আমরা সর্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, আমাদের কে বাঁচাইবে? বাঁচাইতে পারে ক্যাপ্টেন দত্তের মতো মহজ্জীবনের আলোচনা যদি সে আলোচনা করিবার আমরা সময় পাই এবং সে আলোচনা অনুসারে কাজ করিবার উৎসাহ যদি আমাদের প্রাণে জাগে। বাঁচাইতে পারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী, যদি সে বাণী আমাদের প্রায়-বধির কর্ণে প্রবেশ করিয়া

মর্ম স্পর্শ করে। এই কিছু দিন আগে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, একবার নয় বার বার বলিয়া গিয়াছেন—"বাইবেলে আছে—'You shall not eat except by the sweat of your brow'—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পরিশ্রম করে, ভোগে অধিকার তারই আছে। যে অলস, যে পরভাগ্যোপজীবী তার বেঁচে থাকার অর্থই নেই। যে কেউ সৎপথে থেকে আপন পরিশ্রমে আপনি উপার্জন করে সেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র—সে ছোটলোক নয়—ভদ্র-শ্রেষ্ঠ এই কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে"।

আজ কর্মবীর নরেন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকীতে উপস্থিত হইয়া অন্তরের একটি কামনাই শেষে নিবেদন করিব—"দেশের আজ বড় দুর্দিন। কোথায় তুমি সেই ভদ্রশ্রেষ্ঠ, নিজের মহিমায় দশদিক আলোকিত করিয়া আত্মপ্রকাশ কর। আমি কবি তোমাকে অভিনন্দন করিয়া ধন্য হই। আমি জানি তুমি আছ, কিন্তু ঘুমাইয়া আছ। জাগো, জাগো, জাগো।

তোমরা জাগিয়া ওঠ ভাই
আর তো সময় বেশী নাই।
দুর্গমের অভিসারে তুচ্ছ করি অন্ধকারে
উচ্চে তুলি শির
পণ করি মন-প্রাণ হবে যারা আগুয়ান
তোমরা কি নহ সেই বীর ?
মিথ্যাচারে দীনতায় ধূর্ততার হীনতায়
আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা
পড়ে না কি তাহা চোখে আলস্যের স্বপ্নলোকে
হেরিতেছ কোন্ মরীচিকা ?
ভিক্ষাপাত্র করি সার করে যারা হাহাকার
বিসর্জিয়া সকল সম্মান
অত্যাচারী পদ লেহি করে যারা দেহি দেহি
তাহারা কি বাঙালী সন্তান ?
এদেরই বাঁচাবে বলে' প্রাণ দিল দলে দলে
একদা কি শহীদের দল ?
আসিল বিবেকানন্দ রবীন্দ্রের দিব্য ছন্দ
ফুটাইল বাণী শতদল ?
কই তারা কোথা তারা কোথা সে আদর্শধারা
কে করিবে নব উদ্বোধন ?
সবে বলে মরে' গেছে সে কুসুম ঝরে গেছে
কেন বৃথা অরণ্যে রোদন !

কিন্তু জানি বৃথা নয় হবে জয়, হবে জয়
ভস্মস্তূপে জাগিবে অঙ্কুর
আজ যাহা ছিন্ন-তন্ত্রী আসিলে নবীন যন্ত্রী
সে বীণাই গাবে নব সুর !

তোমরা জাগিয়া ওঠ ভাই
আর তো সময় বেশী নাই।

ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার ভাগ্যগগন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছে, ইংরেজ ও নবাবের দ্বৈতশাসন চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া বাংলাদেশ আর্তনাদ করিয়াছে, ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অবাধ লোলুপতা, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের কবলে পড়িয়া বাংলা দেশের ওষ্ঠাগতপ্রাণ যে করুণ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। বিচারের নামে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারকে হত্যা করা হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশের জীবনীশক্তি শোষণ করিয়া বাংলার নর-নারীকে পশুর স্তরে নামাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেখানে নামিয়াও তাহারা বাঁচে নাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের আনন্দ-মঠে আমরা ইহার ভয়াবহ বর্ণনা পাই। তখন বাঙালী কল্পনাও করিতে পারে নাই যে তাহার তমসাচ্ছন্ন জীবনে আবার আলো দেখা দিবে। কিন্তু আলো দেখা দিয়াছিল। শুধু দেখা দেয় নাই, দিগ-দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া জ্যোতির যে প্লাবন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল তাহার তুলনা সম-সাময়িক ইতিহাসে আর দেখিতে পাই না। ঊনবিংশ-শতাব্দীতে বঙ্গদেশের অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া বহু জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার সেই জ্যোতিষ্কদের অন্যতম। তাঁহার জীবন-চরিতের বিশদ আলোচনা করিবার সুযোগ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। আমি তাঁহার জীবনী হইতে কিছু কিছু উপকরণ লইয়া কেবল দেখাইবার চেষ্টা করিব কি করিয়া পরিবেশের প্রভাব ও আনুকূল্য তাঁহার জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিল।

যখন তিনি তিন বৎসরের শিশু তখন ঝড়ে তাঁহার পৈতৃক আবাসভূমি বিধ্বস্ত হয় এবং তাঁহার পিতা-মাতা সপরিবারে জয়নগরে নিজেদের তত্রস্থ গৃহে চলিয়া যান। জয়নগরে নীলরতনের মাতুলালয় ছিল এবং তাঁহার মাতুল অতি সহৃদয় ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় বারো বৎসর মাতুল চরিত্রের শুভ-প্রভাব নীলরতনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। অনেকের মতে তাঁহার চরিত্রের বহুগুণেই তিনি মাতুলের মতই ছিলেন। তাঁহার ক্ষেত্রে নরাণাং মাতুলক্রমঃ এই বাক্যটি সার্থক হইয়াছিল।

এইখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। নীলরতনের মাতুল যদি তাঁহার চরিত্র-গঠনে সহায়তা না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভা-অঙ্কুর কি শৈশবে এরূপ সুললিত হইত ? জানিতে ইচ্ছা করে এখন আমাদের সমাজে কয়জন এমন সক্ষম সহৃদয় মাতুল আছেন যিনি বিপন্ন ঝঞ্ঝাহত আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে ব্যগ্র। পথে নিত্য বহু অসহায় শিশু ও বালককে দেখি যাহাদের বন্ধু ও অভিভাবক কে বা কাহারা তাহা জানা যায় না। কে জানে তাহাদের মধ্যে কোনও নীলরতন আছে কি না।

নীলরতন মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন :—

As a boy he would spend hours reading the Ramayana and Mahabhaıata to her.

আজ জানিতে ইচ্ছা করে কয়জন বালক মাকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনায়। আরও জানিতে ইচ্ছা করে আজ কয়জন মাতা ধৈর্যভরে পুত্রের রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনিতে প্রস্তুত। নীলরতনের মা দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিয়া প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তাঁহার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীলরতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং সারাজীবন রোগার্ত নরনারীর দুঃখলাঘবের চেষ্টা করিবেন।

আমাদের দেশে প্রত্যহ বহু মাতা অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজকাল কয়জন বালক এমন প্রতিজ্ঞা করেন ? নীলরতন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িবার সময় এবং পড়িবার পরেও বহুকাল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া তাঁহার দরিদ্র পরিজনদের অর্থসাহায্য করিতেন। তথাপি স্কুলে তাঁহার পরীক্ষার ফল এত ভালো হইয়াছিল যে কলেজের প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষকগণ তাঁহার অধিকতর উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে উৎসাহবোধ করিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজেও যখন তিনি ছাত্র তখনও তাঁহার মেধা ও কৃতিত্ব তাঁহার অধ্যাপকগণের আন্তরিক আশীর্বাদ ও সাহায্য লাভ করিয়াছিল। এখনও অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে পড়িতে পড়িতে অভাবের তাড়নায় অন্যত্র চাকরী করিতেছে শুনিতে পাই। কিন্তু তাহারা কি আজকালকার অধ্যাপকদের সস্নেহ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে ? আজকাল ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক তেমনি মধুর আছে কি ? পূর্বে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বড় মিষ্ট, বড় ঘনিষ্ঠ ছিল। এখন ক্রমশঃ তাহা যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবসায়িক সম্পর্কই আজকাল মুখ্য। আন্তরিক সম্পর্ক নিতান্তই গৌণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অবস্থা এইরূপ চলিতে থাকিলে আমরা কি আর একটি নীলরতনকে পাইব ?

কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র তাঁহার খ্যাতি আলোর মতো চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার জীবনীকার ইহাকে 'phenomenal' আখ্যা দিয়াছেন। এই বিপুল সাফল্যের মূলে তাঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্রনৈপুণ্য তো ছিলই, কিন্তু কেবলমাত্র তাহা থাকিলেই তিনি অত বড় হইতেন না। তিনি হৃদয়বান ছিলেন বলিয়াই অত বড়

হইয়াছেন। তিনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে জানিতেন, আকস্মিক বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা সঙ্কট পার হইবার কৌশলও তাঁহার জানা ছিল, প্রতিটি রোগীকে তিনি আন্তরিক যত্নসহকারে সেবার মনোভাব লইয়া পরীক্ষা করিতেন। গরীব রোগীদের নিকট পারিশ্রমিক লইতেন না, অনেক সময় তাহাদিগকে বিনামূল্যে ঔষধপথ্যও দিতেন। তাঁহার নিকট উপকৃত রোগীর সংখ্যা অগণিত। তাঁহার জীবনীকার বলিতেছেন—"He received innumerable people known and unknown, rich or poor, friends and strangers from other provinces and countries with their families into his own home for treatment. It is known he had picked up sick persons from the street and brought them home."

আজকাল যে সব ডাক্তার আমাদের দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহারা একাধারে উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী? নীলরতন কেবলমাত্র ডাক্তার ছিলেন না। স্বদেশ-প্রেমিকও ছিলেন। যে প্রেরণা, যে উদ্দীপনা, যে মহতী নিষ্ঠা সেকালের সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীকে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল-কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা অতি কর্মব্যস্ত চিকিৎসক নীলরতনের চিত্তেও সাড়া তুলিয়াছিল। আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কার, আমাদের চিকিৎসকগণের আত্মসম্মান রক্ষা, আমাদের পরমুখাপেক্ষী দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন করিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা একজন কর্মব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে বিস্ময়কর। আমাদের দেশে ডাক্তারী পড়িতে হইলে তখন গভর্ণমেণ্টের কলেজ স্কুলেরই শরণাপন্ন হইতে হইত। তিনিই এদেশে স্বাধীন স্কুল-কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল, কলেজ অব্‌ ফিজিসিয়ানস্‌ এণ্ড সার্জনস্‌ তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য। এই সব দুরূহ কর্মে তিনি সফলকাম হইতে পারিয়া ছিলেন তাঁহার অনিন্দনীয় অপূর্ব চরিত্রবলে। তাঁহাকে আপামর ভদ্র সকলেই শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। লর্ড কারমাইকেলও তাঁহার এই ব্যক্তিত্বের অপূর্বতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ ওই স্কুল ও কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছিল। কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্‌ এণ্ড সার্জনস্‌ই পরে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাব, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, যাদবপুর টিউবারকুলসিস হাসপাতাল—কোথায় না তিনি ছিলেন! নিজের বাড়ীতে ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া তিনি তরুণ চিকিৎসকদের গবেষণা করিবার সুযোগ দিতেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গবেষণার জন্য Cardiogram আনিয়া তাঁহার শর্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক বিখ্যাত Cardiologist তাঁহার এই বাড়ীতেই কাজ শিখিতে শুরু করেন।

তিনি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিতেন। তাই দেশের অন্যান্য শিক্ষার সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন থাকেন নাই। স্বদেশীযুগের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সহিত নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের সহিত। এই ইনস্টিটিউটই পরে যাদবপুরের কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্‌নলজি নামে বিখ্যাত হইয়া এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার মধুর স্বভাব এবং নিষ্কলুষ উদারতার জন্য দেশের অনেক বড়লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এই বন্ধুত্বকেও তিনি দেশের কাজে লাগাইয়াছিলেন। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান মন্দিরে যে বিপুল অর্থ দান করিয়াছিলেন তাহা এই বন্ধুত্বের জন্য। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—The Rashbehari Ghosh endowment, the Khaira endowment and many others enriched the university as well as individual institutions, such as the Jadavpur T. B. Hospital, through such friendships.

তাহার জীবনী পড়িয়া মনে প্রশ্ন জাগে আধুনিককালে এমন বিদ্বান এমন হৃদয়বান এমন স্বদেশ-প্রেমিক দিকপালের দর্শন কি মেলে? যে সকল সদগুণের প্রভাবে তিনি দেশের আপামরভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্রকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন এবং বাঁধিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই যিনি দেশের জন্য এত সৎকাজ করিয়া গিয়াছেন সে সব গুণাবলী আমাদের কয়জনের মধ্যে আছে?

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন, অনেক বৎসর ধরিয়া Dean of the Faculties of Medicine and Science ছিলেন। Post Graduate and Councils of Arts and Scienceএর President হইয়াছিলেন। Empire University Conferenceএ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া তিনি লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে DCL এবং Edinburgh বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে LLD-উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি বিশ্বভারতীর একজন ট্রাষ্টি এবং প্রধান ছিলেন। বোস ইনষ্টিটিউটেরও ট্রাষ্টি এবং পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন। ইহা ছাড়াও বহুকাল তাঁহাকে Indian Association for the Cultivation of Science নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে থাকিতে হইয়াছিল। Indian museumএর ট্রাষ্টিদের মধ্যেও তিনি একজন ছিলেন।

এই বিপুল ও বিচিত্র কর্মভারের মধ্যেও তাঁহার আদর্শবাদী মন ক্লান্ত হয় নাই। কি করিলে দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে এ চিন্তাও তিনি করিয়াছিলেন। ন্যাশনাল সোপ্‌ ফ্যাক্‌টরি এবং ন্যাশনাল ট্যানারি এই চিন্তার ফল। যদিও এসব করিতে গিয়া তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হন, কিন্তু এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বের প্রমাণও জাতির ইতিহাসে লিখিয়া রাখিবার মতো।

নীলরতন ইহলোকে আর নাই। কিন্তু তাঁহার কীর্তি, তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্য কাহিনী, তাঁহার দেবতাসুলভ স্বভাব, তাঁহার অমিত বীর্য এবং ধৈর্য আজ তাঁহাকে

অমরত্বদান করিয়াছে। আমরা আজ ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। সত্যই তিনি প্রণম্য, সত্যই তিনি শ্রদ্ধেয়। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে।

জীর্ণসন্নং প্রশংসীয়াদ্
ভার্যাঞ্চ গত যৌবনাম্
রণাংপ্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ
গৃহমাগতম্।

জীর্ণ হওয়ার পরই আহার্যের প্রশংসা করা উচিত। অতিক্রান্ত-যৌবনা স্ত্রীই প্রশংসা-যোগ্যা, বীর যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিলেই প্রশংসালাভের উপযুক্ত হয় এবং শস্য ঘরে উঠিলেই তবে তাহাকে প্রশংসা করা উচিত।

নীলরতনের কীর্তির দিকে চাহিয়া আজ আমরা বিস্মিত। তিনি আজ প্রশংসার অতীত, অনর্গল প্রশংসা করিয়াও তাঁহার কীর্তির মূল্য নির্ধারণ করা শক্ত।

আমাদের দেশ আজ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহার দুঃখ কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে, আমাদের এই ক্রমবর্ধমান দুঃখের জন্য আমাদের বর্তমান রাজনীতি ও রাজপুরুষরা কতটা দায়ী তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নয়। যে জিনিসটা প্রত্যহ অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি তাহাই পরিশেষে নিবেদন করিব। ইহা বুঝিয়াছি যে, আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা এবং আমাদের চারিত্রিক ত্রুটিও আমাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য কম দায়ী নয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমি তাই মাঝে মাঝে দুই-একটি প্রশ্ন করিয়াছি। আমার মনে হয় ডাক্তার নীলরতন সরকারের মহজ্জীবনী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান দুঃখের দিনে এই আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে।

সম্বর্ধনার উত্তর

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

বিদেশী রীতি অনুসারে এই সম্বর্ধনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ না দিলে আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ক্ষুণ্ন হইবেন। কিন্তু শুষ্ক ধন্যবাদ দ্বারা আপনাদের এই পরম প্রীতির ঋণ শোধ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। মনে পড়িতেছে আমার প্রথম সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন আমার মা, আমার সেই সুদূর শৈশবে, আমার জন্মদিনে। আমার ললাটে চন্দনের তিলক দিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত পরমান্ন দ্বারা আশীর্বাদ-পূত স্নেহদৃষ্টিসিঞ্চনে তিনি যে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই নাই, যাহা দিয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়, তাহা অনির্বচনীয়। আপনাদেরও আমি সেই অর্ঘ দিতে চাই, কারণ আপনাদের এই সম্বর্ধনা দেশ-মাতৃকারই আশীর্বাদ। সম্বর্ধনা ব্যাপারে আমার একটু সঙ্কোচ ছিল, তাহা আপনাদের নিকট অকপটে নিবেদন করিতেছি।

সঙ্কোচের প্রধান কারণ, এই প্রশ্নটি আমার মনে জাগিয়াছিল সত্যই কি আমি সম্বর্ধনা-যোগ্য ? কিন্তু ইহার একটা উত্তরও আমি পাইয়াছি, না পাইলে হয়তো আপনাদের সম্মুখীন হইতে পারিতাম না। মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল সম্বর্ধনাটা তোমার নয় সম্বর্ধনা বঙ্গসাহিত্যের, তুমি উপলক্ষ মাত্র। বঙ্গসাহিত্যের সেবক হিসাবেই তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় সঙ্কোচের কারণটা আরও ব্যক্তিগত। সাধারণত আমি ভীড় হইতে দূরে থাকিতে চাই। আজকাল দেখিতেছি সম্বর্ধনার ভীড় ভয়াবহ, সকলেই যেন সকলকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য উৎসুক। দিল্লীর দরবারে তো সম্বর্ধনা-প্রার্থীরা 'কিউ' দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অনেকে আবার নিজের জন্মদিনে নিজেই বাহিরের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে বসিয়া সম্বর্ধিত হইতেছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সম্বর্ধনা-ব্যাপার হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আর সম্ভবপর হইল না। বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধেয় পবিত্রদা এবং আমার বৈবাহিক শামুবাবুর আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করা কঠিন। আমার সম্বন্ধে আপনারা যাহা বলিলেন তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিবার সাধ্য আমার নাই। সে ভার মহাকালের উপর দিয়া আপনাদের শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসার অকৃপণ উপহার শিরোধার্য করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

এই ধরনের সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলা উচিত। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শাশ্বত সৃষ্টি কতটা হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান বর্তমান যুগের কোনও লেখক দিতে পারিবেন না। তাহার বিচার শাশ্বত কালের দরবারে যথাসময়ে হইবে। তবে একটা জিনিস বলা যায় বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর লেখা হইতেছে এবং তাহাদের বৈচিত্র্যও কম নয়। এই প্রাচুর্য আনন্দজনক। বাগানের প্রত্যেক গাছে যখন প্রচুর মুকুল আসে, মাঠে যখন কচি ধানের শ্যাম সমারোহ দেখি তখনই প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত কয়টা আম পাকিয়া ঘরে আসিবে অথবা কয় মণ ধান ভাণ্ডারে উঠিবে এ হিসাব করিতে মন চায় না। সরস্বতী প্রকাশের দেবতা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বহুল সৃষ্টির বহুমুখী প্রকাশ লীলায় তাঁহার মহিমার স্বাক্ষর। প্রকাশের আগ্রহ ঔৎসুক্য এবং উন্মুখতাই জীবন্ত প্রাণের পরিচয় বহন করে। আজ যদি বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের জোয়ার আসিয়া থাকে তাহা তো আনন্দের কথা। যে সব সমালোচক 'আজকাল বাংলা সাহিত্যে কিছুই হইতেছে না' বলিয়া বিলাপ করেন তাহাদের মধ্যে কাব্যরসিক হয়তো থাকিতে পারেন, কিন্তু জীবন রসিক যে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যিনি জীবনরসিক তিনি শুধু বর্তমানের লাভক্ষতি লইয়াই মাথা ঘামান না, তাঁহার দৃষ্টি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বিগত আগত অনাগত সর্বকালে সঞ্চরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

জীবনের সম্বন্ধে এই পূর্ণ দৃষ্টি সাহিত্যের সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। বাণীর পাদপীঠ-তলে কত যে ঝরাফুলের পাপড়ি, কত যে অস্ফুট কুসুমের আকুতি বিছানো আছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু তবু তাহারা ব্যর্থ নয়, তাহাদের আত্মপ্রকাশের আগ্রহই তাহাদিগকে সার্থক করিয়াছে। মানুষের স্মৃতির দৌড় বেশী নয়, তথাকথিত সমালোচকদের বিচার বিবেচনাও নির্ভুল নয়। মানুষ সুন্দরকেও বেশী দিন মনে রাখিতে পারে না, সমালোচকরা অনেক সময় শাস্ত্রের সংস্কার-খর্ব মাপকাঠিতে সব কাব্যের বিচার করিতে পারেন না, এক যুগের অজ্ঞাত লেখক অন্যযুগে দিগ্বিজয়ী প্রতিভারূপে স্বীকৃত হইয়াছেন এমন ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। যাঁহাদের কথা আজ লোকে ভুলিয়াছে তাঁহারা একদিন যে অনেক লোককে আনন্দ দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি! বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরুন—কবি লজ্জাবতী বসু বা বিনয়কুমারী ধরকে আজ কয়জনের মনে আছে? অথচ প্রবাসী পত্রিকার প্রথম যুগে ইহাদের সাহিত্য-সাধনা নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। আজ আমরা তাঁহাদের মনে করিয়া রাখি নাই বলিয়া, অথবা সমালোচকদের খাতা বহিতে তাঁহাদের নাম চড়ে নাই বলিয়া তাঁহাদের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস যে বৃথা হইয়াছে একথা মনে করি না। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রচনাপ্রাচুর্যে তাই উৎফুল্ল হওয়াই উচিত। যাঁহারা 'কিছু হইতেছে না কিছু হইতেছে না' বলিয়া রব তুলিয়াছেন, মনে রাখা উচিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যর্থকাম লেখক। আমার ধারণা বর্তমান সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ বর্তমান যুগের কোনও লেখকের পক্ষে সহজ নয়। বোধ হয় সম্ভবও নয়। সেইজন্য তরুণ সাহিত্য সাধকদের প্রতি আমার নিবেদন, আপনারা সমালোচকদের দুর্বাক্য শুনিয়া হতাশ হইবেন না। আপনাদের যাহা দিবার আছে দিয়া যান, মহাকালের বিচারে যাহা টিকিবার টিকিয়া যাইবে। আর যদি নাই টেকে তাহাতেই বা ক্ষতি কি। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা যখন ঐশ্বর্যশালী ছিল তখন তাহাদের মধ্যে কবি বা সাহিত্যিকও নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাহাদের কোনও সন্ধান আর পাই কি? তাঁহারা আত্মপ্রকাশের আনন্দেই নিজেদের বিকশিত করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই সার্থক হইয়া ছিলেন, আমার মনে হয় স্রষ্টার পক্ষে ইহাই চরম প্রাপ্তি। সৃষ্টির আনন্দটাই সবচেয়ে বড় লাভ, সমানধর্মা কোনও রসিকের নিকট হইতে যদি দুই একটা 'বাহবা' পাওয়া যায় তাহা হইলে সেটা উপরি পাওনা। কিন্তু ওই বাহবার প্রত্যাশায় যদি কান পাতিয়া থাকি তাহা হইলেই দুঃখ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা পালন করা শক্ত। কিন্তু পালন করিতে পারিলে অনেক দুঃখের হাত হইতে এড়ানো যায়। উপদেশটি সুবিদিত—কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই তো আমরা যত দুঃখ ভোগ করি। সাহিত্য সাধকরা যদি প্রকৃত সাধক হন, সত্য শিব সুন্দরকে যদি নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে নিজের কল্পনা মাধুরী দিয়া সাজাইয়া ফলের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষী প্রশংসা বা পরানুগ্রহ-সাপেক্ষ বিত্ত বৈভব খ্যাতির মোহ তাহাদের বিচলিত করিতে পারিবে না।

আমি জানি ফল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সহজ নয়, মোটেই সহজ নয়, কিন্তু একথাও জানি অত্যধিক ফললোভী হইলে সাহিত্যসাধক ভ্রষ্ট-চরিত্র হন এবং তাঁহার দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে সাহিত্য-সাধনা ব্রহ্ম সাধনারই সমকক্ষ ছিল, বিদেশীদের নকলে এবং যুগ-প্রভাবে আমরা সাহিত্য এবং ব্রহ্ম উভয়কেই ব্যবসার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছি, তাই আমাদের দুঃখ ও লাঞ্ছনার শেষ নাই। তাই ভেকধারী লোলুপ সন্ন্যাসী ও সাহিত্যিকে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু ইহা লইয়া বেশী পরিতাপ করা বৃথা কারণ দুর্নিবার যুগ-প্রভাবকে স্বীকার করিতেই হইবে। সাধনার ধনকে আমরা যখন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়াছি তখন তাহার অনিবার্য দুর্গতি সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। তবু আশা করিয়া থাকিব আধুনিক সাহিত্যের দিগদিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে অসংখ্য অঙ্কুর মন আজ আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধ্রুব সত্যে সন্ধান করিতেছে তাহাদের মধ্যে একজনও অন্তত মহামহীরুহের নভশ্চুম্বী মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বকীয়তার সৌন্দর্যে নিজের প্রতিভাকে সার্থক করিবে, তাহার অভিনব বৈশিষ্ট্যের নূতন আলোকে সনাতন সত্য শিব সুন্দর আবার নূতন রূপে প্রতিভাত হইয়া রসিক চিত্তকে নন্দিত করিবে।

আপনাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের নাম 'রবীন্দ্র-শরণী', এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষণা করা। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, আশা করিব যে এ উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে যে উদ্যম ও বিদ্যাবত্তা প্রয়োজন তাহা আপনাদের আছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ খাড়া করা সহজ। কিন্তু তাহা গবেষণা নহে। রবীন্দ্র সাহিত্য বা রবীন্দ্র-চরিত্রে যদি কোন অনুদ্ঘাটিত তথ্য বা সত্য থাকে তাহাকে প্রকাশিত করাই গবেষণা। আমরা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা করি না, আমরা বহুবার চর্বিত তথ্যকেই পুনর্বার চর্বণ করিয়া পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অর্জন করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে যুগপৎ বিশাল অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বত এবং বিরাট সমুদ্র বলা যাইতে পারে। কবি, প্রবন্ধকার, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত-স্রষ্টা, নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক, ধর্ম-উপদেষ্টা, চিত্রশিল্পী, নৃত্যকলা প্রবর্তক, বহুদেশদর্শী, শিক্ষাবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, দেশপ্রেমী, মানবতার উপাসক রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেন পল্লব-গ্রাহিতার অতিসহজ সংক্ষিপ্ত পথে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করি। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে যে সুমহতী তপস্যা তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাকে বিকশিত করিয়াছিল তাহা সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদেরও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিষয়ে আমাদের দেশে এবং বিদেশে কিছু আলোচনা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নৃত্য-গীতের প্রসারও কম হয় নাই। স্বভাবতঃই রবীন্দ্র-প্রতিভার শিল্প-সুষমার প্রভাবই সাধারণ মানুষকে বেশী আবিষ্ট করিয়াছে। রবীন্দ্র চরিত্রের বলিষ্ঠ দিকটা আজও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। তাঁহার আত্মসম্মান যে কত প্রবল ছিল তাহার অজস্র নিদর্শন তাঁহার রচনাবলীতে এবং সমসাময়িক ইতিহাসের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত

হইয়া আছে। সেগুলিকে একত্র করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা উচিত, শুধু তাহাই নয়, মনুষ্যত্বের যে প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে একদা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া একান্ত কর্তব্য। যে নপুংসক ভীরু মনোবৃত্তি আজ বাঙ্গালী জাতিকে বাক্‌সর্বস্ব হাস্যাস্পদ বিদূষকে পরিণত করিয়াছে তাহার অবসান যদি আমরা ঘটাইতে না পারি তাহা হইলে আমাদের পূর্ব-গৌরব আর অক্ষুন্ন থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের এখন আত্মানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতা পাইবার পর আমাদের মনুষ্যত্ব দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে তাই নিজেদের ঘরেও বাংলাদেশেও আমাদের আর সম্মানের স্থান নাই, আমরা আজ ধনীর দুয়ারে নিঃস্বের মতো দাঁড়াইয়া আছি। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ 'কাঙালিনী' শীর্ষক একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে

যদিও কবিতাটির বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র তবু আমার মাঝে মাঝে মনে হয় দূরদর্শী কবি হয়তো বাংলা মায়ের ভবিষ্যৎ অবস্থা কল্পনা করিয়াই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। আমাদের নেতারা সর্বভারতীয় একাত্মতা, সমান নাগরিক অধিকারের জয়-গান আজ সর্বদা সর্বত্র করিতেছেন। এ সব কথা শুনিতে ভালো। কিন্তু আমার প্রশ্ন যেখানে একদিকে দম্ভ ও পদানতদিগের প্রতি প্রসাদ বিতরণের আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে কাঙালপনা সেখানে এই সব বড় বড় কথা কি পরিহাসের মত শোনায় না? সর্বভারতীয় একাত্মতা করিতে হইলে যে সবল আত্মার প্রয়োজন তাহা বাঙালীর আজ আর নাই। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া সে আজ যাহা করিতেছে তাহা একাত্মতা নয়, আত্ম-বলিদান। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই আজ আত্মসম্মানহীন বাঙালীর ভীড়, যদিও তাহার বাহিরের পোষাকে চাকচিক্য আছে, মুখের দাপটে আস্ফালন আছে, কিন্তু তাহার অন্তর শূন্য, মনে শান্তি নাই, পূর্বপুরুষের গৌরব ভাঙাইয়া তাহার আর কত দিন চলিবে? সাহিত্যের কাজ মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগরিত করা। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রবীন্দ্র সাহিত্যের উত্তরাধিকারী আমরা, আমাদের দুর্লভ প্রাপ্তি যে রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট পুরুষের সান্নিধ্যে এই সেদিন পর্যন্ত আমরা ছিলাম। আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এবং রবীন্দ্র চরিত্রের অনুশীলন যদি সশ্রদ্ধ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া করি তাহা হইলে আমাদের মূর্ছিত আত্মা আবার সুস্থ হইবে। জাতির আত্মাকে জাগরিত করাই আপনাদের গবেষণার বিষয় হউক। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সাহিত্য আমাদের প্রেরণা দিতে পারে, উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু আমাদের চরিত্রবান করিতে পারে না। বাল্য-কাল হইতে তিল তিল করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হয়। সে দায়িত্ব প্রথমতঃ পিতামাতার এবং প্রধানত পিতামাতার। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন

করিবার সুযোগ আজকাল শিক্ষকরাও পান না। যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলে চরিত্র গঠন করা সম্ভবপর সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আজকাল আর হয়না। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি আমাদের ভদ্রভাবে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশের পিতামাতাকে সে বিষয়ে আগ্রহশীল হইতে হইবে। লেখক, শিক্ষক বা নেতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশে এখন মানুষেরই বিশেষ অভাব। মানুষ গড়ার কাজেই এখন আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বাঙালী সৃষ্টি নয়, ভারতবাসী সৃষ্টি নয়, উদ্দেশ্য সেই মানুষ সৃষ্টি যে কোনও দেশে যে কোনও অবস্থায় যে নিজের মনুষ্যত্বের জোরে মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে পারিবে। মানুষের একটা সামাজিক বা দেশ-গত পরিচয় নিশ্চয় থাকিবে, কিন্তু শুধু মাত্র সেই লেবেলের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমরা যেন সীমাবদ্ধ না থাকি, মোহরের গায়ে যে ছাপই থাক সে ছাপেরই জোরে সে বাজারে চলিবে না যদি তাহার স্বর্ণত্ব সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ না হয়। আজ মানুষের জয় যাত্রার পথ এই গ্রহেই সীমাবদ্ধ নয়, আজ মানুষের মন হইতে জাতীয়তার সঙ্কীর্ণতা ক্রমশ অবলুপ্ত হইতেছে, তাই আমাদের দায়িত্ব ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে, আমাদের চারিত্রিক সম্পদ যদি এই অগ্রগতির অনুরূপ না হয় তাহা হইলে আমরা শুধু পিছাইয়া থাকিব না মৃত্যু আমাদের হইবে। তাই আজ আমাদের প্রার্থনা হোক—

দুর্জয়ে করিয়া জয় বরমাল্য আমরা পরিব
মিথ্যাকে লঙ্ঘন করি সত্য পথে মোরা উত্তরিব।
লোভ মোহ বঞ্চনা সংশয়
জয় করি সর্ব তুচ্ছ ভয়
হব মোরা নির্মল নির্ভয়
মৃত্যুঞ্জয়ে আমরা বরিব।
মিথ্যাকে লঙ্ঘন করি
সত্য পথে মোরা উত্তরিব।



বনফুল

রচনাবলী ১৫